

কুচবিহার দপ'ণ

756.3

প্রথম খণ্ড ১৩২৩

সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যরতন গুপ্ত এম-এ

সূচীপত্র

টঙ্কাখ - আশ্বিন

বিষয় সূচী—বর্ণানুক্রমিক

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
জ্যোত ও রবী নাথ (প্রবন্ধ)	ডক্টর শ্রীশশিকৃষ্ণ দাশগুপ্ত এম-এ, পি-আর-এস, পি-এটচ-ডি	১৫৩
জ্যোত ও বাহিরে (কবিতা)	শ্রীঅক্ষয়কুমার দাশগুপ্ত	১৫৫
জামাব চন্দ্রকুমার (কবিতা)	শ্রীমপূর্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়	১২৭
অঃগাঃতি (গল্প)	শ্রীরমেন বৈরা	১৪৩
জাতিমান (গল্প)	শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র	১৫৩
উদ পুর ও নেপাল (প্রবন্ধ)	ডক্টর শ্রীমুখেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, পি-আর-এস, পি-ইচ-ডি	
	বি-লিট (অঙ্গন)	১৫৩
উপনদী (উপন্যাস)	শ্রীঅনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়	৩২, ৭৭, ১১১, ১৭১, ২১৭
একটি শ্রুতি (কবিতা)	শ্রীঅনিল বোষ	১৬২
এক মিনিটের গল্প (গল্প)	শ্রীমহম্মদ আলী	২৬৫
কবিতার রবি (আলোচনা)	শ্রীমুদ্ররঞ্জন মলিক	৬
কবি (কবিতা)	শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত	২৫২
কবি (কবিতা)	ডাঃ শ্রীমদীপক দে	২৬৩
কবিতার খেলা (গল্প)	শ্রীরঞ্জনকুমার সেন	
কুচবিহারে সবজী চাষ (প্রবন্ধ)	শ্রীমদীপকুমার চট্টোপাধ্যায় বি-এ	২১২



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কবিগোবিন্দ সাহিত্যসাধনা ও জ্ঞান	শ্রীমতী সারদা দেবী এম-এ	১০৫
চর্চা (প্রবন্ধ)		
কৈ চাঁদ ? (কবিতা)	শ্রীমতী সারদা দেবী	১০৬
খেলাধুনা	৪০, ১৩, ১৩৮, ১৮১, ১১৬	
গান	শ্রীমতী সারদা দেবী	৩১
গান	শ্রীমতী সারদা দেবী	১১৫
গোবিন্দস (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীমতী সারদা দেবী এম-এ, ব্রজ বংশীদেব	১৩৩
কবিতা		১১৭
কবিতা নব নবীকবিতা প্রথম (প্রবন্ধ)	শ্রী ব্রজেননাথ সরকার বি-এস-সি	২০৪
চিত্র পটিকা		৪৭
কবিতা (গল্প)	শ্রীমতী সারদা দেবী বি-এ	১১১
কবিতা (কবিতা)	ডাঃ শ্রীমতী সারদা দেবী	১৪৫
কবিতা প্রথম না প্রথম (কবিতা)	শ্রীমতী সারদা দেবী	১৬
১৩১২ সাংসার আর্থিক ভারত (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীমতী সারদা দেবী এম-এ	২৪
কবিতা কবিতা কবিতা প্রথম (কবিতা)	শ্রীমতী সারদা দেবী	২০৭
৫৫ (প্রবন্ধ)	শ্রীমতী সারদা দেবী	৮৩
পুষ্টিশীলতা (গল্প)	শ্রীমতী সারদা দেবী আই-সি-এস	১২৩
দেশ বিদেশের কথা	৪২, ৮২, ১৩১, ১৭৬, ২২২, ২৬৭	
কবিতা সংকলন (গল্প)	শ্রীমতী সারদা দেবী	৪৬
নবীকবিতা প্রথম (কবিতা)	শ্রীমতী সারদা দেবী	৬০
নাম রূপ রহস্য (প্রবন্ধ)	শ্রীমতী সারদা দেবী	১৭
নামক বিবর্তিতা প্রথম (প্রবন্ধ)	শ্রীমতী সারদা দেবী	১৩১
নামক (কবিতা)	শ্রীমতী সারদা দেবী	১০৮
নামক (কবিতা)	শ্রীমতী সারদা দেবী	১১২
নামক (কবিতা)	শ্রীমতী সারদা দেবী	১১৫
নামক (প্রবন্ধ)	কবিতা প্রথম শ্রীমতী সারদা দেবী	১১৫
নামক (কবিতা)	কবিতা প্রথম শ্রীমতী সারদা দেবী	১১৫



১০

বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক
পরমেশ্বর (কবিতা)	শ্রী ব্রজেননাথ কাহ্নরী	২২০
পাগল (গল্প)	শ্রী হিমাদ্রি ভট্টাচার্য	২০৮
পাহাড়ী (কবিতা)	শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক	২৪৭
পুনঃজীবন (কবিতা)	শ্রী অগ্নীশ শুভ	২৫১
প্রবাস্য চরিত্র (গল্প)	শ্রী সত্যভূষণ সেন	২০১
পূর্বরাগের আগে (গল্প)	শ্রী ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ বি-এল	২৫২
পুস্তক পরিচয়		২৭১
পুস্তক সমালোচনা		১১০
প্রার্থনা (কবিতা)	শ্রী কলীকঙ্কর সেন শুভ	২৪৭
বন্দী (কবিতা)	ডাঃ শ্রীমনীলাল দে	২০০
বংশা (প্রবন্ধ)	শ্রী ব্রজেননাথ সেন বি-এ	২৩২
বাঙ্গালার আত্মতত্ত্ব (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রী দেবী প্রসাদ ঘোষ এম-এ, বি-এল	৬৬, ১১১
বিছাতি (কবিতা)	শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক	১৫৭
বিনয় (গল্প)	'ভাস্কর'	১০১
বিশ্বকানন (কবিতা)	শ্রী হেমেন্দ্র চক্রবর্তী বিদ্যাবিনোদ	১২
চিত্র (কবিতা)	ডাঃ শ্রীমনীলাল দে	২০০
ভূমি (কবিতা)	শ্রী প্রবোধচন্দ্র পাল	১৮৮
ডাঃ বাখ্যাতা ব্রজেননাথ (প্রবন্ধ)	কবিপ্রেমী শ্রী কলীকঙ্কর সেন	২২৭
ভারতে সোনা ও রূপার দর (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রী কামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ	১২২
ম, সুন্দর (কবিতা)	শ্রী ব্রজেননাথ দাশগুপ্ত এম-এ, বি-এইচ-ডি, সি-সিটি, সি-আই-ই	২৫
মহারাজ শিবেন্দ্রনাথগিরী (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রী দেবী প্রসাদ সেন এম-এ	২২৫
মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের শ্রীমান মন্তোত (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রী দেবী প্রসাদ সেন এম-এ	৭১
মাঝে মাঝে (কবিতা)	শ্রী ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৭
মুকুন্দর পল্লীশ্রী ও কুসুমবিশার (প্রবন্ধ)	শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ রায় এম-এল-বি	৩৬
যোগাযোগ (প্রবন্ধ)	শ্রী ব্রজেননাথ হালদার আই-সি-এস	৫০
রাজপরিবারের সংবাদ	ডাঃ, ৮৫, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬	
লোভ-সংহার (প্রবন্ধ)	ডাঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম এ, ডি-সিটি	১৬৩

বিষয়	লেখক	পত্রিক
সাহিত্যিকের মন (প্রবন্ধ)	শ্রীপ্রমোদকুমার ঘোষ	১৬৩
শেষবাস্তব (কবিতা)	শ্রীমমতা দেব	৫
শ্রীশঙ্করদেব (প্রবন্ধ)	শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২৪৮
সংস্কৃতের ক্ষেত্রে (কবিতা)	শ্রীকরণানন্দান বন্দ্যোপাধ্যায়	৫২
সাময়িক প্রসঙ্গ	৪৫, ২১, ১৩৩, ১৩৪, ২২৪, ২৩১	
সাহিত্যিকের মন (প্রবন্ধ)	শ্রী বনৌপ দে চৌধুরী	১৮২
সাহিত্যের অধর্ম (প্রবন্ধ)	শ্রীহরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আই-এ-এস	১
সাহিত্যে বাস্তবতা (প্রবন্ধ)	শ্রীবিজুভিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬
সে কি হবে অগোচরে বিস্তারিত সম (কবিতা)	শ্রীঅপূর্বকুমার ভট্টাচার্য	২৫১
স্থানীয় সংবাদ	৪০, ৮৬, ১২২, ১৭৫, ২২১, ২৬২	
কল্প (কবিতা)	ডাঃ শ্রীনীলানন্দ দে	১৭৫
হাসি (কবিতা)	ডাঃ শ্রীনীলানন্দ দে	২৬৩
বহু প্রাপ্ত (অন্য বৃত্তান্ত)	শ্রীঅমিতেন্দ্রনাথ সেন বি-এ	১২

লেখকসূচী—বর্ণানুক্রমিক

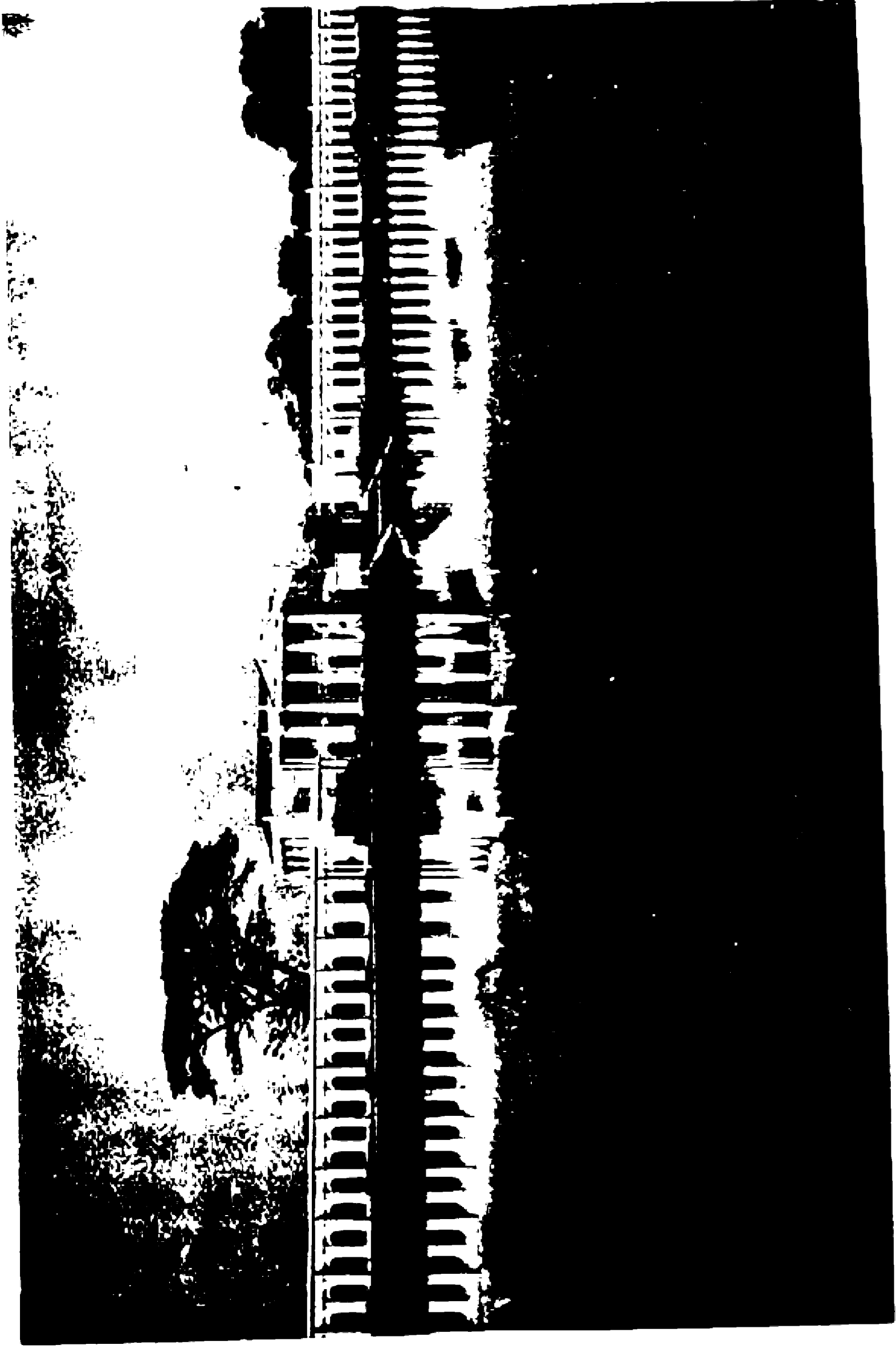
লেখক	বিষয়	পত্রিক
শ্রীঅনিন ঘোষ	একট শ্রুতি (কবিতা)	১৬২
শ্রীঅমিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	উপনয়ন (উপন্যাস)	৩১, ৭৭, ১১১, ১৭২, ২১৭
শ্রীঅপূর্বকুমার ভট্টাচার্য	আমার জন্মভূমি (কবিতা)	১২৭
	তুমি যোর প্রিয় না প্রভু (কবিতা)	১৬
	দক্ষিণা বাতাস কিরিয়া এলোনা জার (কবিতা)	২০৭
	সে কি হবে অগোচরে বিস্তারিত সম (কবিতা)	২৫১
শ্রীঅমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	নদীর ধারে হোর (অনুবাদ)	৩০
	নীলব (কবিতা)	২৩৮
শ্রীঅমলাকান্ত গুপ্ত (এম, এ)	বুচকিয়ারে সাহিত্যসাধনা ও অন্যান্য (প্রবন্ধ)	২৭৭
শ্রীঅরুণকুমার গুপ্ত	অন্তরে ও বাহিরে (কবিতা)	১০০



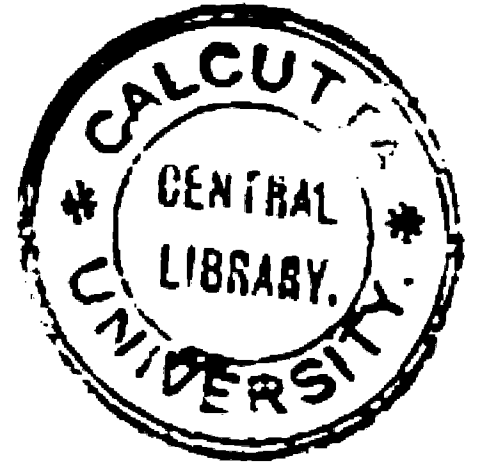
লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীঅসমুদ্র মুখোপাধ্যায়	দ্বিতীয় সংস্করণ (গল্প)	৫৬
শ্রীউপাধিষ্ট ঘটক	নাগন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ (প্রবন্ধ)	১২৭
শ্রীকল্পানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়	সাঁঝের সুরে (কবিতা)	৫৩
শ্রীকালিকঙ্কর সেন গুপ্ত	প্রার্থনা (কবিতা)	২৭৭
শ্রীকালিদাস রায়	পঞ্চকবি (প্রবন্ধ)	১৫৫
	পদাংলী (কবিতা)	১১০
	ভাবব্যাখ্যাতা রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)	২২৭
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	কণিকার রবি (আলোচনা)	৬
	কে চার (কবিতা)	৭৬
	নূতন (কবিতা)	১২২
	পাহাড়ী (কবিতা)	২৪৭
	বিজাতি (কবিতা)	১৬৭
শ্রীগেহুনাথ মিত্র	গোবিন্দ দাস (প্রবন্ধ)	১৩২
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র	অভিমান (গল্প)	২১২
শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন বর	নামরহস্য (প্রবন্ধ)	১৭
শ্রীজগদীশ গুপ্ত	পুনরুজ্জ্বলন (কবিতা)	১৫১
শ্রীজ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায়	মাঝে মাঝে (কবিতা)	১১৮
শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ	বাঙ্গালার আন্তরিকতা (প্রবন্ধ)	৬৬, ১১৬
শ্রীদেবীপ্রসাদ সেন	মহারাজ নিবেদনারায়ণ (প্রবন্ধ)	২৫৫
	মহারাজ শরৎচন্দ্রনাথের শ্যামাসমীচ (প্রবন্ধ)	৭১
শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী	সাহিত্যিকের মন (প্রবন্ধ)	১৮৭
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	পন্নবন (কবিতা)	২১০
শ্রীনন্দীশ দে	কর্ম (কবিতা)	২৬৩
	ঠাই (কবিতা)	১৪৫
	বন্দী (কবিতা)	২০০
	বিভিন্ন (কবিতা)	২০০
	হরণ (কবিতা)	১৫৫
	হাসি (কবিতা)	২৬৩



লেখক	বিষয়	পাতা
শ্রীপারিমোহন সেনগুপ্ত	কবি (কবিতা)	২০২
শ্রীপ্রবোধকুমার ঘোষ	শাস্তিনিবেশন (প্রবন্ধ)	১৬৩
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পাল	কৃষ্টি (কবিতা)	১৮৮
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	সাহিত্যে বাস্তবতা (প্রবন্ধ)	২৬
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার	চরিত্রহীনের নারী চরিত্রে প্রেম (প্রবন্ধ)	২০৪
'ভাস্কর'	বিশ্ব (গল্প)	১০১
শ্রীমন্তা ঘোষ	শেষ বাসর (কবিতা)	৫
শ্রীমতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	পশ্চিমে বৈশাখ (কবিতা)	৮৫
শ্রীকৃষ্ণভিৎকুমার সেন	কীর্তন গৌণ (গল্প)	১৮
শ্রীরমেন গৈত্র	অব্যাহতি (গল্প)	১৭৬
শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত	অতীত ও বর্তমান (প্রবন্ধ)	২০৩
মহম্মদ শওকতজাহ	লোক-সংস্কার (প্রবন্ধ)	১৮৩
শামসুদ্দীন	একমিনিটের গল্প (গল্প)	২১৬
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দাস	গান	১৫
শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৫১ সালের আর্থিক ভারত (প্রবন্ধ)	২৭
	ভারতে সোনারপারি দর (প্রবন্ধ)	১৫৩
শ্রীসত্যভূষণ সেন	পুরুষের চরিত্র (গল্প)	২০১
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দাস	যুদ্ধের পরোক্ষ ও বৃচলিহার (প্রবন্ধ)	৫৬
শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার	দৃষ্টিহীনতা (গল্প)	১২৩
	মোহাগাধাগ (প্রবন্ধ)	৫৩
শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	পূর্বাঙ্গের আগে (গল্প)	২১২
শ্রীসুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়	কুচলিহারে মজা চাষ (প্রবন্ধ)	২১২, ২৫৮
শ্রীসুধাংশুকুমার চক্রবর্তী	কড়ের অন্ধকারে (গল্প)	১২১
শ্রীসুধেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	মধুসূদন (কবিতা)	২১
ডক্টর শ্রীসুধেন্দ্রনাথ সেন	উদয়পুর ও নেপাল	৪৩
শ্রীসুধেন্দ্রনাথ সেন	বংগে রাজনৈতিক বস্তু (প্রবন্ধ)	২৩২
	হুডক প্রপাত (অমণ বৃত্তান্ত)	১২
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীশঙ্করদেব (প্রবন্ধ)	২৪৮
শ্রীহিমাদ্রি ভট্টাচার্য	পাগল (গল্প)	২৮৮
	গান	৩১
শ্রীদ্বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়	সাহিত্যের আদর্শ (প্রবন্ধ)	১
শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্তী	বিবেকানন্দ (কবিতা)	২২



ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମାଗି—କୁହାବତୀ



কুচবিহার দর্পণ

নবম বর্ষ { বৈশাখ ১৩৫৩ সন, রাজশক ৪৩৭ } ১ম সংখ্যা

সাহিত্যের আদর্শ

শ্রীহরিশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস

সেদিন এক সাহিত্যসভার গিরেহিনাম। আলোচনার বিষয় ছিল সাহিত্যের আদর্শ। অনেকের অনেক কথা বলায়। কেউ বললেন সাহিত্যে ধর্ম বিষয়ক আলোচনার প্রাধান্য লাভ করা উচিত। কেউ বললেন সাহিত্যে সুনীতি প্রচার করা উচিত, সাহিত্যে দুর্নীতি সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়। কোন নবীনপন্থী বললেন দেশের লোকের মধ্যে যাতে জাতীয়তাবোধ প্রস্ফুট হয়, সাহিত্যিকের সেই বিষয় নজর রাখা উচিত। কেউ বা বললেন আধুনিক যুগে সাহিত্যের সাহায্যে সাম্যবাদ প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। স্লাম বাহন্য এখানে সাহিত্য অর্থে ললিতসাহিত্যই আলোচ্য বিষয় ছিল।

এইরূপ যতের বিভিন্নতা আলোচনাকে যেন বিচিন্ন করে তুলেছিল। একটা অভাব কিন্তু বড় পরিলক্ষিত হয়েছিল। সাহিত্যের একটি ব্যাপক দিক এ আলোচনায়

সম্পূর্ণ অস্পষ্ট রয়ে গেল। কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন।

সাহিত্য হল এক প্রকারের রূপকর্ম। পৃথিবীতে রূপবস্তুর অনেক প্রকার আছে, যেমন সুন্দর ফুল, সমুদ্র, জ্যোৎস্না রাত্রি, পাখীর বিচিত্রিত পালক। এদের আমরা বলব 'রূপবস্তুর', 'রূপকর্ম' নয়; কারণ এরা প্রকৃতির হাতে আপনি সৃষ্টি হয়ে থাকে, মানুষ এদের সৃষ্টি করে না, এদের উপভোগ করে মাত্র। আবার এমন রূপবস্তুরও সম্ভব যা মানুষের হাতে সৃষ্টি হয়। চিত্র, সুন্দর মূর্তি, অটোনিকা, উদ্যান, কবিতা, গল্প, উপক্ৰাস তার উদাহরণ। অকৃত্রিম রূপবস্তু হতে বিভিন্ন করে দেখবার জন্য আমরা তাদের রূপকর্ম বলতে পারি।

সকল রূপকর্মেই দুটি দিক আছে। একটি তার আখের বস্তু, অপরটি তার আধার। একটি বাহ্যিকের দিক, অপরটি ভিতরের দিক। কোন রূপকর্ম

যাকে রূপ দেয় বা প্রকাশ দেয়, তাই হল তার আধার এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করবার ক্ষমতা তার যে রূপ সৃষ্টি হয়, তাই হল তার আধার। কবিতার আধার একটি সুন্দর ভাব, তার আধার হল ছন্দোময়ী ভাষা। গল্পের আধার হল কোন চিত্তাকর্ষক ঘটনা বা অবস্থাবিভাস, তার আধার হল যে রচনাকে অবলম্বন করে তা প্রকাশ হয়েছে তাই। এই আধার ও আধারের মধ্যে একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রয়েছে, যেমন দেহের সঙ্গে দেহীর সম্বন্ধ, ভাবার সঙ্গে ভাবের সম্বন্ধ। উভয়েই উভয়ের প্রয়োজনীয়, এক ব্যতিরেকে অপরের সার্থকতা নাই।

সাহিত্যও একটি বিশেষ শ্রেণীর রূপকর্ম। তার আধার হল তার বিষয়বস্তু বা আলোচ্য বস্তু। তার আধার হল তার ভাষা, তার বর্ণনাতন্ত্র। এখন বোঝা সহজ হবে যে উপরের আলোচনাগুলি বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সজাগ কিন্তু সাহিত্যের আধার বলতে যা বুঝি সেই ভাষা বা বর্ণনাতন্ত্র সম্বন্ধে তা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। তার কারণ, সাহিত্যের এই দিকটা আলোচনা-কারীদের সম্পূর্ণ অনক্ষিত রয়ে গিয়েছে। সাহিত্যের আধারবিষয়ক সমস্যা হল তার ভাষাবিষয়ক সমস্যা, তার বর্ণনাতন্ত্রের আদর্শবিষয়ক সমস্যা। ভাষা বিদ্যাসাগরী হবে না বীরবলী হবে, ভাষা আড়ম্বর-পূর্ণ হবে না সরল হবে, এই ধরনের প্রশ্ন হল সাহিত্যের আধারবিষয়ক সমস্যা। এ সমস্যার কথা আজ না হয় এড়িয়েই গেলাম।

বলা বাহুল্য আলোচনা যে পথে চলেছিল, তা সাহিত্যের বস্তুবিষয়ক সমস্যাকেই উত্থাপন করেছে। সাহিত্যের আলোচ্য বস্তু ধর্মবিষয়ক হবে, না নীতিসম্মত হবে, না তা রাজনীতি প্রচার করবে, না সমাজনীতি প্রচার

করবে—এই হল কথা। এই প্রশ্নটিরই আজ আমরা উত্তর খুঁজব।

যিনি প্রাচীনপন্থী, অর্থাৎ সেকালের আদর্শের প্রতি ধীর আকর্ষণ আছে, তাঁর স্বভাবতই ইচ্ছা হবে বলতে, যে সাহিত্যের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে হক ধর্ম বা নীতির রাজ্য হতে। যিনি আধুনিক, যিনি প্রগতিশীল, তিনি ক্রুদ্ধিত করে বলবেন, তা কেন? সাহিত্যকে দেশের সেবার লাগাতে হবে, সাহিত্যকে দেশের কাজে লাগাতে হবে। তাই সাহিত্য দেশপ্রেম প্রচার করুক, সাহিত্য সাম্যবাদ প্রচার করুক।

বিভিন্ন মানুষের ব্যক্তিগত সংস্কার অনুসারে, এদের কোন মতটি ভাল লাগবে, কোনটি লাগবে না। কিন্তু বিশ্লেষণ করে দেখে সত্য কথা বলতে গেলে বলতে হয়, এদের কোন মতটিই ঠিক মত নয়, সবগুলিই সমানভাবে একটি দোষযুক্ত হয়েছে। সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা এদের নাই।

পূর্বেই বলা হয়েছে, সাহিত্য একটি রূপকর্ম। তার উদ্দেশ্য হল আনন্দবস্তু সৃজন করা। জগতে অসংখ্য আনন্দকণা ছড়িয়ে রয়েছে, সাহিত্যিক তাদের সংগ্রহ করে করে স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে চান। আনন্দই সাহিত্যের প্রেরণা। সেই স্থায়ীরূপে আনন্দকে অধিষ্ঠিত করবার কৌশলই হল সাহিত্যিকের কলাবিদ্যা। তার উপাদান দুটি, মনোজ্ঞ বস্তু ও তার অনুরূপ ভাষার সজ্জা। সংস্কৃতে সেই কারণে, কাব্যের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তা খুবই ঠিক হয়েছে। কাব্য ত রসাত্মক বাক্যই বটে। রসাত্মকতাই কাব্যের প্রাণ। সাহিত্যকে রসসিক্ত করাই হওয়া উচিত আমাদের একমাত্র মূল উদ্দেশ্য। তা না থাকলে আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হব।

এক জায়গার পড়েছিলাম যে একজন বড় সাহিত্যিক লিখেছেন সাহিত্যিকরা হচ্ছেন মানব মনের ডুবুরী। কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের মনে প্রতিদিনই কত মনোহর ভাবকণা উদ্ভিত হয়, আবার লোপ পেয়ে যায়। এমনও ভাবকণা আছে, যা এখনও উদ্ভিত হয়নি, অবচেতন রাজ্যে অনাবিকৃত রয়ে গিয়েছে। সাহিত্যিক নিজের মনসমুদ্রে মগ্নন করে করে এমন করেই সুন্দর ভাবকণা সংগ্রহ করে তাকে স্থায়ী রূপ দেন ভাষার সজ্জার সাজিয়ে। ভাষা ও ভাবের মনোরম বন্ধনে আনন্দ স্থায়ীরূপে ধরা দেয়। সেই ত সাহিত্য।

একেই রবীন্দ্রনাথ বলেন, আনন্দ সাগরে স্থায়ী তীর্থ বীধান। সাহিত্যের সংজ্ঞা সম্বন্ধে তাঁর নিজের কথাই এই প্রসঙ্গে কিছু উদ্ধৃত করে দেওয়া যাক। “সত্যকে যেখানে মানুষ নির্বিড়রূপে অর্থাৎ আনন্দরূপে অমৃতরূপে উপলব্ধি করিগো, সেইখানেই আপনার একটি চিহ্ন কাটিগোছে। সেই চিহ্নই কোথাও বা মূর্তি, কোথাও বা মন্দির, কোথাও বা তীর্থ, কোথাও বা রাজধানী। সাহিত্যও এই চিহ্ন। বিশ্বজগতের যে কোন ঘাটেই মানুষের হৃদয় আঁসিয়া ঠেকিতেছে, সেইখানেই সে ভাষা দিয়া একটি স্থায়ী তীর্থ বীধাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে—এমনি করিগাই বিশ্বতটের সকল স্থানকেই সে মানবযাত্রীর হৃদয়ের পক্ষে, ব্যবহারযোগ্য করিয়া তুলিতেছে।” (১)

আনন্দকে স্থায়ীরূপ দেবার প্রধান উপকরণ হল মনোজ্ঞ বা রসাত্মকভাৱ সংগ্রহ করা। যত প্রশস্ত ক্ষেত্রে আমরা তাকে অন্বেষণ করব, ততই আমাদের সৃষ্টিলাভ সম্ভাবনা পরিবদ্ধিত হবে। আমরা যদি অন্য গৌণ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সেই ক্ষেত্রে সঙ্কুচিত করি, মনোহর ভাব সংগ্রহের সম্ভাবনা আমাদের সেই কারণে

কমে যাবে এবং সেই কারণেই সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনার ক্ষেত্রও সঙ্কুচিত হবে।

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। আমার ইচ্ছা হয়েছে একটি সুন্দর উদ্যান রচনা করব। এখানে আমার উদ্দেশ্য একটি রসবস্তুর সৃষ্টি করা। সুতরাং উদ্যানকে যতদূর সম্ভব মনোরম করে সৃষ্টি করতে হলে আমার প্রয়োজন যেখানে যেখানে ভাল ফুল গাছ মেলে তাকে সংগ্রহ করে এনে বাগান সাজান। সে ফুল নাসারী হতে ছুটে পারে, বন হতে ছুটে পারে, পাগড় হতে ছুটে পারে, বিজ্ঞান হতে ছুটে পারে। উৎপাদিহানের প্রতি উদাসীন হয়ে আমরা যত সংগ্রহ কার্য সম্পাদন করব, উদ্যানের শ্রীবৃদ্ধি ততখানি উত্তমরূপে সাধ্য হবে। কিন্তু তার মধ্যে যদি গৌণ বস্তুকে টেনে আনি, তা হলেই হয়ে পড়ে মুক্তি। কোন ধার্মিক লোক হরত উপদেশ দেবেন শুধু উদ্যান রচনার কোন সার্থকতা নাই, ফুলকে দেবতার অর্চনার লাগাতে হবে। অতএব সেই রকমের ফুল সংগ্রহ করবে যা পূজার লাগে। কোন ব্যক্তি হরত একটু বেশী পরিমাণ স্বদেশপ্রেমিক। তিনি বলবেন কেবলমাত্র স্বদেশী ফুল দিয়ে বাগান সাজিও, বিদেশী ফুলকে সম্পূর্ণ বর্জন করা উচিত। কেউ হরত বেশী রকম নীতিশিক্ষা দিতে উৎসুক। তিনি বলবেন নিছক রঙের বাহার অস্তঃসারহীন, মানুষকে তার কিছু শিক্ষা দেবার নাই; অতএব কেবল গন্ধযুক্ত ফুলই বেন তোমার বাগানে স্থান পায়।

এদের এই বিভিন্ন উপদেশের পশ্চাতে যে সৃষ্টিবির বিশেষ জোর নাই, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। উদ্যান-রচনার উদ্দেশ্য ত মানুষের ধর্মবোধ হুটান নয়, বা স্বদেশ প্রেম জাগান নয় বা নীতিবোধ ছড়ান নয়, তার উদ্দেশ্য নিছক একটি সৌন্দর্যবস্তুর রচনা করা যা মানুষের মনকে আনন্দ দেবে।

উদ্যান সম্বন্ধে যে কথা খাটে সাহিত্য সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দবস্তু সৃষ্টি করা। তার অন্য কোন গোণ বা মুখ্য উদ্দেশ্য কিছু থাকতে পারে না। সুতরাং সাহিত্যবস্তু চয়নে কোন বাধা-ধরা নিয়ম থাকতে পারে না। নিয়ম যদি আরোপ করি তা আমাদের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য ধর্ম প্রচার নয় বা নীতিপ্রচার নয় বা দেশপ্রেমবিকাশ নয় বা কোন বিশেষ সমাজনীতিপ্রবর্তনও নয়। তার জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা হতে পারে। তার জন্য বক্তৃতার ব্যবস্থা চলতে পারে, সংবাদপত্রের ব্যবহার চলতে পারে, কথকতা চলতে পারে, কিন্তু তার দ্বারা অসুপ্রাণিত হয়ে স্থায়ী সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব হয় না। জোর করে তা করতে গেলে যা দাঁড়ায় তাকে বড় জোর ‘প্রপাগান্ডা’ বলা চলতে পারে। তাকে আদৌ সাহিত্য আখ্যা দেওয়া যায় কিনা ঘোর সন্দেহ।

আমাদের এই উক্তির স্বার্থতা প্রমাণের জন্য এখন কিছু উদাহরণের আবশ্যক হয়েছে। বেশী দূরে যেতে হবে না, আমার মনে হয় শরৎসাহিত্যের একটি বিশেষ দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলেই কথাটা বেশ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে একটি সাধারণ অমুযোগ শোনা যায় এই যে তাঁর লেখা পড়তে বেশ ভাল লাগে, কিন্তু তিনি অত্যন্ত বেশী রকম দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়েছেন। এই অমুযোগের কারণ এই যে, তিনি সাহিত্যবস্তু চয়নে কোথাও সমাজনীতির অমুমোদন খোঁজেন নি। কোথাও তাঁর নারীকা বাইজী, কোথাও বারাননা, কোথাও বা কুলটা বিধবা। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে সেইটাই তাঁর গুণের বিশিষ্টতা বলে প্রমাণ হবে।

তাঁর একটি ক্ষুদ্র কাহিনীর কথা এখানে এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর “অঁধারে আলো” গল্প

বোধ হয় সকলেরই পড়া। কাজেই গল্পটি অতি সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। নায়ক একটি সুদর্শন কলেজে পড়া যুবক, সংসারের কুটিলতার কোন পরিচয় তার নাই। নারীকা একটি সুন্দরী বারাননা, সংসারের পঙ্কিলতায় তার বাস। উভয়ের পরস্পরের সহিত গল্পার ঘাটে দেখা, ও পরে পথ চলতে চলতে আলাপ। কলে উভয়েই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট। কিন্তু বিড়ম্বনা এই যে উভয়ে উভয়কে ভুল বুঝেছে। ছেলেটি ভাবে মেয়েটি অনাঘ্রাত কুসুমের মতই নির্মল। মেয়েটি ভাবে ছেলেটি তার রূপে আকৃষ্ট এবং তাকে ভ্রষ্টা জেনেও ধরা দিতে উন্মুখ। তারপর তাদের ভুল ভাঙার দিন এল। তার বাড়ীতে এক নাচের মজলিসে সে ছেলেটিকে ডেকে পাঠাল এই বলে যে তার অমুখ করেছে। নিরতিশয় মনের উদ্বিগ্ন বহন করে সে বধন সেখানে এল তখন নারীকা বাইজীর বেশে। ছেলেটি তার স্বরূপ তখন হৃদয়হীন করল এবং মেয়েটির কলুষিত প্রণয় আহ্বানকে একান্ত রূঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যান করল। সেই প্রত্যাখ্যানের প্রচণ্ড আঘাত কিন্তু বাইজীর জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিল। আসন্ন জন্মল না। অপর সঙ্গীরা তাকে নাচতে বলল; সে জবাব দিল, বাইজী মরেছে। একজন একটু মাতলামির খোঁকে রসিকতা করে জিজ্ঞাসা করল, কোন রোগে বাইজী? সে উত্তর দিল, যে রোগে আলো আসলে অঁধার মরে। বাস্তবিকই নির্মলহৃদয় নায়কের হস্তে তার কলুষিত প্রণয়-নিবেদনের রূঢ় প্রত্যাখ্যান তার অন্তরকে সেদিন পরি-মার্জিত করে দিয়েছিল।

এই ঘটনাপরম্পরার মধ্যে যে একটি অতি মনোরম ও সত্য আত্মপ্রকাশ করেছে তাতে কি কোন সন্দেহ আছে? নীতিহীন জীবনের পঙ্কিলতার নারী কলুষযুক্ত হয়, কিন্তু তার নারীত্ব কখন নষ্ট হয় না। তেমন অবস্থার



বৈশাখ ১৩৫৩

শেষ বাসর

৫

সংঘাতে পড়লে সে পাশবিক পক্ষিতাকে পদদলিত করে
কুমারী নারীর নিরুৎসাহ প্রেমকেও হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করবার
ক্ষমতা রাখে।

শরৎচন্দ্র যদি সমাজের নীতিরকার দোহাই মেনে এমন
ঘটনাটিকে তাঁর অপরূপ ভাষায় স্থায়ীরূপ না দিতেন,

তাহলে আমাদের সাহিত্যের সমৃদ্ধির দিক হাতে কতি হত
না কি? এমন আরও কত জ্বোতির কণিকা তিনি
সমাজনীতির গণ্ডির বাহির হতে সংগ্রহ করে করে

আমাদের সাহিত্যের আকাশকে মণ্ডিত করেছেন।

তাদেরও সেই সঙ্গে আমরা হারাতাম।

শেষ বাসর

শ্রীমমতা ঘোষ

তোমার পায়ে দিলেন হৃৎকণ, —সম্ভবনে ছিলে,
লগ্ন কখন পার হরেছে —দৃষ্টি নাহি দিলে।
হঠাৎ তোমার পা লেগে যে পড়ল পায়ের তলে,
এ প্রাণ-কুসুম শুকিয়ে গেল; কাটাই চোখের জলে।

সেই থেকে মন মন্মরা যে, গুপ্তে কঁদে বুক;
অনাদৃতার হৃৎকণ পাছে জাগায় বা কোতুক
সেই ভয়েতে কঁটা হয়ে আড়ালে আড়ালে
লুকিয়ে রাখে আপনাকে হার সবার অন্তরালে।

আকাশভরা তারার মেল। —জ্যোৎস্না-জ্যোৎস্নার বধ,
চির বিদায় নেবার মত এই তো সুসময়।
হাস্তা লাগে বৃকের বাধা চেয়ে চাঁদের পানে,
এমন সময় এ কার আওরাজ বাজে উত্তল কানে?

চিরকালের চাঁওরা আমার বাকুল অশ্রুজল
বাবার বেলায় পেলো তোমার কোন্ ব্রতেরি কলে?
মুখ কুটে আঁধার মনের কথা বলার সময় কই?
তুমি বল, প্রাণের পরশ প্রাণে আমার নই।

পুরুষ তুমি, পুরুষ তুমি, নেই মমতা মনে,
মধু মাসে এলেনা মোর জাগন্ত যৌবনে।
নীতের বেলা আসছে প'ড়ে অকালে আঁধার হার,
ঘুম পাড়ানো আশা কেন জাগাও পুনরার?

আসল নিতে ভাঙ্গা হৃদয় —তন সন্নয় লাগে,
অনক্ষিতে দেহে মনে কাণ্ডন করে জাগে।
নারীর গলায় জোর কোটে না —আঁধারে বাসর বরে
শোনাও তুমি মনের কথা দরাজ গভীর স্বরে।

কণিকার রবি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

যিনি বিরাট—উঁচু ক্ষুদ্র সৃষ্টিতেও বিরাটের ছাপ
আছে। র্যাকেলের রেখাচিত্রে বা ফিডিয়াসের গড়া
পুতুলেও তাঁহাদের প্রতিভার পরিচয় থাকে। অমৃতের
ছিটোও অমরত্ব বহন করে। ‘কণিকা’ রবীন্দ্রনাথের
ক্ষুদ্র কাব্য, কতকগুলি ছোটো ছোটো কবিতার মালা।
ছোট হইলেও উহা এক একটা মৃগনাভির কণা—
পারিজাতের পত্র। কবি বলিয়াছেন—

আনি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
তবু শিশির টুকরে ধরা দিতে পারি
বাসিতে পারি যে ভালো।
শিশিরের কুকে আসিয়া,
কহিল তপন হাসিয়া
“ছোট হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি’
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব
হাসির মতন করি।”

কবি এই কণিকার নিম্নে সেই ভাবেই রহিয়াছেন এবং
সেই ভাবে ইহাকে গড়িয়াছেন।

এক এতটী কবিতা পার্থের শরের ফলার ন্যায়
ভীক্ষু। কবি হয়তো তাঁহার দিওনাগাচার্য সমালোচক-
দের প্রতি এই শব্দক্ষেপ করিয়াছেন—জষ্টিমধুর বষ্টির
আঘাত দিয়াছেন।

পেঁচা রাষ্ট্র করি দেয় পেলে কোনো ছুতা,
জান না আমার সাধে সূর্যের শত্রুতা।

হাউই কহিল মোর কি সাহস ভাই,
• তারকার মুখে আমি দিবে আসি ছাই।
কবি কহে তার গায়ে লাগে নাক কিছু,
সে ছাই ফিরিয়া আসে তোরি পিছু পিছু।

• • •
বোলতা কহিল, এবে ক্ষুদ্র মউচাক
এরি তরে মধুকর এত করে ঝাঁক!
মধুকর কহে তারে তুমি এস ভাই,
আরো ক্ষুদ্র মোচক রচ দেখে বাই!

• • •
কানা কড়ি পিঠ তুঁলি কহে টাক টিকে
তুমি ষোল আনা মাত্র নহ পাঁচ শকে!
টাকা কহে আমি তাই মূল্য মের যাই,
তোমাঃ বা মূল্য তার চেঃ বেশী কথা!

• • •
তৃষিত গর্দভ গেল সরোবর তীরে
‘ছি ছি কালো জল বলি’ চলি এলো ফিরে,
• কহে জল ‘জল কালো জানে সব গাধা,
যে জন অধিক জানে বলে জল সান্না!’

কবি বড়ই ছাখে বলিয়াছেন—কথাও অত্যন্ত সত্য—
শক্তি যার নাই নিম্নে বড় হইবারে,
বড়কে করিতে ছোট তাই সে কি পারে ?

রবীন্দ্রনাথের উদারতা ও মহামুত্তমতার কথা সর্বজন-
বিদিত, তিনি কত নামগোত্রহীন কবি ও সাহিত্যিককে
মর্যাদা দিয়া বশব্দী করিয়াছেন—

প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন
ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন,
ধিক্ ধিক্ করে তারে কাননেঃসবাই—
স্বর্ঘ্য উঠি বলে তারে ভাল তাই তাই।

বর্তমান কবিদের মধ্যে প্রায় সকলেই তাঁর এ সমাদর
পাইয়াছে।

স্বর্ঘ্য হ্রঃ করি বলে নিন্দা তুনি খীর
কি করিয়া হব আমি সকলের প্রিয় ?
বিধি কহে ছাড় তবে এ সৌর সমাজ।
ছুতারি জনেরে লয়ে কর ছোট কাজ।

এ ব্যথা এ প্রশ্ন কবির নিজের নয় কি ?

ছোট টুনটুনি ময়ূরের অপূর্ণ সুন্দর পুচ্ছতার দেখিয়া
কাতর, করুণার তার চক্ষু জল আসিতেছে—সে
বলিতেছে—

এ বে দেখিতে বেআড়া
দেহ তব কত বড় পুচ্ছ তার বাড়।
ময়ূর কহিল, শোক করিয়া না মিছে
কেনো তাই তার রূহে গৌরবের গিছে।

কবিকে বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও অনন্ত গৌরবের সহিত
চিরদিন কর্তব্যের গুরুভার বহন করিতে হইয়াছে।

রাজা, দেশ, ও সমাজের কর্তব্য গুণীকে, মনোবীকে,
প্রতিভাবানকে, মহৎকে রক্ষা করা, সম্মান দেওয়া—কবি
এই কবিতার কি সুন্দরভাবে তাহা বলিয়াছেন—

ছাতা বলে “ধিক্ ধিক্ মাথা মহাশয়
এ অন্যায় অবিচার আমারে না মর।
তুমি যাবে হাতে মাঠে দিয়া অকাতরে,
রোজ বৃষ্টি বত কিছু সব আমা পরে,
তুমি যদি ছাতা হতে কি করিতে দাদা ?”
মাথা কর “বুঝিতাম মাথার মর্যাদা
বুঝিতাম যার গুণে পরিপূর্ণ ধরা
মোর একমাত্র গুণ তারে রক্ষা করা।”

বল বল, মর্যাদা বল, ক্ষমতা বল, স্বাধীনতা বল, উহা
নিজের ক্ষমতার অর্জন করিতে হয়—বাহারা উহা পাইয়াছে
বহু ভাগে বহু কষ্টে বহু পরিশ্রমে উহা পাইয়াছে—তাই
কবি বলিয়াছেন—

আমরা পেয়েছি বাহা ঘুরিয়া পুড়িয়া
তোমারি হাতে কি তাহা আসিবে উড়িয়া ?

আজ এই নিত্য নব আন্দোলনের দিনে এ কথা স্মরণ
রাখিতে হইবে।

কীৰ্ত্তনখোলা

শ্রীৰামজিৎকুমার সেন

কাল ৰাত্ৰে মগনদাস বৈরাগী খুন হইয়াছে। সকাল হইতেই বাতাসে ঘেন ঘটনাটা চাৰিপাশে ছড়াইয়া পড়িল। লোক আৰ ধৰে না কীৰ্ত্তনখোলায়। লাসটা এখনও বাব্‌লার আড়ালে পড়িয়া আছে। এখনও কুৰেৰ কত বহিয়া ধাৰায় রক্ত বৰিত্তেছে : কালো রক্ত। আসামী সনাক্ত কৰিতে হয়ত এখনই পুলিচ আসিয়া পড়িব। কীৰ্ত্তনখোলাৰ হৰিৰ নামে একটা মস্তবড় কলঙ্ক থাকিয়া বাইবে ইতিহাসেৰ পাতায়। কিন্তু যিনি হৰি, তিনিই কৃষ্ণ। প্রেমবৰ্ণ পালন কৰিয়া যদি শ্রীকৃষ্ণ অবতায় হইতে পাৰিলেন, তবে মগনদাস বৈরাগীই বা খুব বেশী রক্তমেৰ অপয়াধ কৰিয়াছিল কিসে? চাক্ৰ বৈষ্ণবীকে তো সে হৰিমাহাশ্বৰ্ণ্যেই বাছ কৰিয়াছিল! কিন্তু চৈতন ব্রহ্মচাৰীৰ অন্তটা খাতে সহে নাই। ঘাপৰে আৰ কলিতে পাৰ্খকাটা দীৰ্ঘ কুপেৰ। অহ আৰ তহ, দেহাতীত আৰ দেহ—বিষয়গুলি কঠিন। অত গভীৰে বাইয়া কাজ নাই। বৈরাগী আৰ ব্রহ্মচাৰীতে খুনাখুনি। লোকে অসন্তোষ তাহাই দেখিয়া গেল। কিন্তু বুঝিতে পাৰিনা, লোভ যদি মানুহকে এই রক্তেৰ অন্তলেই টানিয়া নেৰ, তবে এই অসার প্রপঞ্চৰ সঙ্গাৰে ভোগী আৰ ত্যাগীতে পাৰ্খকা কি?

মগনদাস বৈরাগীৰ রক্তাক্তিত দেহটোৰ দিকে চাফিয়া এই কথাটিই সৰ্ব প্রথমে মনে আসিল। আৰ মনে হইল—চিন্তেৰ আতাবিক বস্তুগত নিবৃত্তি ভিন্ন হয়ত সঙ্গাৰে সজিই বড় ধৰ্ম্মে পৌছা যায় না। মগনদাস গৃহ ছাড়িয়া বৈরাগী হইয়াছিল বটে, কিন্তু একতাৰায়

গান ধৰিয়াও মনকে উৰ্দ্ধমার্গে পৌছাইতে পাৰে নাই। বাৰ বাৰ সে আলোৰ পাশে পতঙ্গের মতো কামনার বহিতে নিজের মধ্যে নিজেকে দহন কৰিতে ছুটিয়াছে। —বৈরাগীৰ শেষ গায়চিহ্ন এই খুন।

পাশাপাশি ঘন বাব্‌লার সান্নিধ্য। এটা একেবারে উত্তরের অংশ। কাছেই সৰু খালের মতো জলের রেখা দেখা যায়। লাসেৰ পাশে কমণ্ডলুৰ মতো ন্যাকড়া বাঁধা কি ঘেন একটা পড়িয়া আছে দূৰে। মাটিৰ খানিকটা অংশ ভিজা। হয়ত খুনের মুহূৰ্ত্তে এই পথ দিয়াই মগনদাস কুটিৰে ফিৰিতেছিল। খালের ঐদিকটায় স্বতন্ত্ৰভাবে সান্নিধ্যাপন কৰে চাক্ৰ বৈষ্ণবী। গোলপাতায় ছাওৱা ছোট্ট একখানি ঢালা। কাছাকাছি দেশোৱালী দুই একজন মুক্ত আকাশেৰ নীচে ইট পাতিয়া মাটিৰ হাঁড়িতে ভাত চড়াই। সকালসন্ধ্যা চিৰাচৰিত সুর শোনা যায় তাহাদেৰ গলায়—

লকাসে কোন্ আয়া রে,

বিতৌষণ কি নাম?

হুমানজী কিন্ গিয়া তো

মার দিয়া সব কাম।.....

পূৱা ৰামায়ণখানিৰ একেবারে লক্ষ্যকাণ্ড। কিন্তু কাছাকাছি জলন্ত উনানেৰ পাশে তাহাদেৰ ঐক্যতানিক সুর ঘেন বাতাসকে একেবারে মগ্ন কৰিয়া তোলে।

এইদিকে দক্ষিণ দিক বেধিয়া কীৰ্ত্তনখোলা। বৰেন্দ্ৰ-ভূমিৰ একটা নিম্ন পল্লীপ্রান্ত। ঝাঁচামাটিৰ চড়াই উৎসাহ পথ সন্ন্যাসপেৰ মতো চলিয়া গিয়াছে নাটোৱ

পর্যন্ত। এই দিকটার ঈষৎ বাঁকিয়া বাস চলাচলের নতুন পথ গিয়াছে রাজসাহী বরাবর। অর্ধবৃত্তাকৃত এই গণ্ডিটুকুতে আসিয়াই ইদানিং ড্রাইভারেরা বাস থামাইয়া নতুন পেট্রোল নেয়, টমটমের ঠং ঠং আওয়াজে লাটু ঘোড়া কিছুটা বিশ্রামের অবকাশ পায়, আর পাশের হরিমোহনের দোকান হইতে মুড়ি বাতাসা কিনিয়া নতুন উদ্যমে আবার ধাই ধাই করিয়া বলদের মত পিঠে চাবুক চালায় গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান। অর্ধবৃত্তাকৃত গণ্ডি এই ‘ত্রিমোহনী’ শেষ রাতটা চলিয়া গিয়াছে পুঠিয়ার মহারানীর সদর দুয়ার পর্যন্ত। ‘ত্রিমোহনী’র দর বাড়িয়াছে বৈকি ইদানিং! —কীৰ্ত্তনখোলা আরও একটু দক্ষিণে : মাঠের পারে বন বেঁধিয়া। বৈরাগীর আখড়া, সকালসন্ধ্যা নাম কীৰ্ত্তন চলে। মঠ মন্দিরের বাগাই নাই। শুধু চারিফুট উঁচু বাঁধানো বেদীর উপর প্রকাণ্ড হরি-তুলসী। ধর্মাত্মশাসনে আসলে তুলসী দেব কি দেবী—তাহা লইয়া এ-যুগের সেবাইতদের মধ্যে যদিও তর্কের অবকাশ নাই, তবু মানুষের পরিকল্পিত দেবসত্তার মতই আয়তনে বৃহৎ বটে তুলসীগাছটি। মগনদাসের কাছেই শুনিয়াছিলাম—শ্রীহরির জাগ্রত প্রতিভা এই তুলসী। কত মানুষ স্বপ্নে পাইয়াছে! নিষ্ঠা আর ত্যাগ চাই, ব্যস,—। মানত করো, ধূপধূনা, নৃত্য দাও, খোলকীৰ্ত্তনে প্রাণ তরিয়া সেই তথাগতকে ডাকো,—তোমার অভীষ্ট অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। ভৈরব তরুণদার এই মানত করিয়াই এক সময় পুরা সাত বৎসরের দেওয়ানী পাইয়াছিল পুঠিয়ায়। যোগে, তিথিতে দলে দলে তাই লোক আসে এই কীৰ্ত্তনখোলার ঠাকুর-দর্শনে। ঠাকুর বৈ কি, সেবাইতদের নথ্যকাস্তি ঠাকুর এই তুলসী। বাইশ বৎসর ধরিয়া ঠাকুর কত ভাবেই না তাহাদের কৃপা করিলেন! যোগে, তিথিতে আনি, ছ’আনি, সিকি, আধুলির

নৃত্য-মিছিল হয় বেদীর সামনে। মাটির পঙ্কপ্রদীপের আলোর সেগুলি চক্‌চক্ করে। আর তার সাথে প্রসন্ন আবেগে চক্‌চক্ করিয়া ওঠ সেবাইতদের ‘নাম’-মুখ চোখগুলি। হরির ভোগ হরিই মিলাইয়া দেন। যোগে, তিথিতে সারা বৎসরের দুর্ভোগের ভাবনা দূর হইয়া যায় শ্রীহরির ভোগের ব্যবহার। তাহারা তো তদগতপ্রাণ—নিমিত্তমাত্র।

বরেন্দ্রভূমি পরিক্রমায় প্রথম বধন এই কীৰ্ত্তনখোলার আসি, তখনও সেবাইতের সংখ্যা বেশী হয় নাই। মগনদাস বৈরাগী, চৈতন ব্রহ্মচারী, তা ছাড়া আরও দুই একজন কেবল মাথা মুড়াইয়া হাতে কমণ্ডলু আর একতারা নিরাছে। কোনো বৈষ্ণবীর তেমন বড় একটা মাড়া পাই নাই। বলিলাম, “গান শুনাও বৈরাগী ভাই।”

মগনদাস কিছুক্ষণ অভিভূতের মতো মুদিত চক্ষে বসিয়া রহিল, তারপর মুখে মৃদু হাসির রেখা টানিয়া কহিল, “দূর দেশ থেকে গান শুন্তে এসেছ, কিন্তু গান তো আমরা জানি না। শুধু নাম ক’রতে জানি।”

বলিলাম, “সেই তো আসল গান বৈরাগী ভাই। নদী, জল, আকাশ, মাটি আর মানুষ—সবার মধ্যে সেই হরিই তো সত্য! সবার মধ্যে যে তাঁরই সুর মিশে আছে।”

বড় ধুসী হইল যেন এবারে মগনদাস। কহিল, “তুমি বড় আচ্ছা লোক ভাই। তোমার মধ্যে প্রেম আছে।”

কথাটা বুঝিতে একটু সময় লাগিল। ভাবিলাম, মগনদাস এ বলে কি! প্রেমের প্রশ্ন এখানে আসিল কোথা হইতে? কহিলাম, “প্রেম কি রকম?”

সম্ভবতঃ আমার ইতস্ততঃ ভাবটা ধরিয়া কেলিয়াছিল মগনদাস। সারল্যের দৃষ্টিতেই একবার হাসিয়া উঠিল সে। কহিল, “অন্ত প্রেম ভাই, এ একেবারে ছনিয়াছাড়া

প্রেম। যার ভিতরে এ প্রেম আছে, সে যে একেবারে
ব্রহ্মাণ্ড লুটে নিয়েছে; যার আর তার কাছে তখন কী?”

ভাল লাগিতেছিল কথাগুলি। একেবারে গভীর
প্রত্যন্তে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলাম; দেখিলাম—ঠিকই
বলিয়াছে মগনদাস। এ প্রেমে যে মজিয়াছে, মিথ্যা
হইয়া গিয়াছে তার কাছে এই দুনিয়া আর সংসার।
প্রহ্লাদ, বুদ্ধ, চৈতন্য তাহিতো একেবারে উন্মাদ হইয়া
বাহির হইয়া পড়িয়াছেন পথে, বুকে ঠাই দিয়াছেন
জনে জনে। কিন্তু সম্ভবতঃ মগনদাস গোড়াতেই ভুল
করিয়াছে! শত ক্রিমি-উৎপীড়িত আমার মধ্যে এমন
চুলভ সাধন-প্রেম আসিবে কোথা হইতে? বলিলাম,
“অজ্ঞান লোক আমরা—মন, প্রাণ, চোখ, কান সবই
আছে, অথচ কাণা অন্ধ। বুঝিই বা কি, ভাবতেই বা
পারি কতটুকু! তাহিতো সাধু-দর্শনে এসেছি। একটা
প্রেম-নামই শোনাও, বৈরাগী তাই।”

মগনদাস এবারে বেন সত্যিই কিছুটা আত্মচরিতার্থতা
লাভ করিল। দুনিয়ার কাহারও অধিনায়কত্ব স্বীকার
করিয়া গইলে আত্মচরিতার্থতাই সে বোধ করে বটে!
আবার কিছুক্ষণ চক্ষু বুজিয়া ধ্যানস্থের মতো বসিয়া রহিল
মগনদাস, তারপর কহিল, “ভজনা না ক’রে কিছু কি বলা
যায়! বসো তবে, শোনাই।”

একতারাটা কাছে টানিয়া দক্ষিণ হাতের তর্জনী দিয়া
টুং টুং করিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল মগনদাস, তারপর
ভজনা আরম্ভ করিল:—

প্রথমে বলিলাম আমি গুরুর গুরু-পায়ে,
তারপরে বন্দি যে আমার পরম গুরু মশায়।

গুরুর আমার রূপ ধরে না ॥

রাজার গুরুর এক গুরু যে পরম গুরু হরি,
রাজার রাজা দয়াল আমার সেই রাজারে স্মরি।
গুরুর আমার রূপ ধরে না ॥

মগনদাস কহ ভজন দিনা (তীর) চরণ কোণায় পাশি?
(হোয়) বিষয়-কর্ম শেষ হ’লে তো গুরুর হাটে যাবি!

গুরুর আমার রূপ ধরে না ॥

শেষের দিকটায় দ্বিগুণতর শব্দে একতারাটি মুখর করিয়া
ভাবাবেশে মগনদাস অনবরতঃ পুনরাবৃত্তি করিতে
লাগিল—‘গুরুর আমার রূপ ধরে না’। সত্যিই
আবেগময় সঙ্গীত। মগনদাসের ‘নামের’ মধ্যে যে এত
সঙ্গীত নুকাইয়া আছে, ভাবিতেই পারি নাই। স্বভাব-
কবি মগনদাস। সাহিত্যের দিক দিয়া বিচার করিলে
এই সুর আর ধ্বনিময় রচনা হয়ত একেবারেই কাদামাটি
হইয়া যাইবে, কিন্তু মগনদাসের ভক্তকণ্ঠে তাহা যে কি
অপূর্ব শুনলাম, বর্ণনা করিতে পারি না।

ধামিল না মগনদাস। একতারায় সমানেই তর্জনী
চলিতেছিল, কহিল, “প্রেমের কথা শুনতে চাও, শোনো।”
বলিয়া আবার সুর ধরিল:

প্রেম-সাগরে ডুব্বি যদি, সংসার-বৈঠা হাতে কেন?
ডাকে যে ঐ প্রেমের ঠাকুর, যোগ দিতে প্রাণ পারিস্ কেন?

ও মন, প্রেম কি সবাই জানে রে!!

দাসের দাস তুই মগন দাস হার রইলি মগন ঘুমেই যে রে,
এবার নিদ্রা ভেঙে সাধন-ধনে নে না রে তুই লুটে কেড়ে।

ও মন, প্রেম কি সবাই জানে রে!!

সত্যিই এ প্রেম সবার জন্যে নয়। রক্তমাংসের
দেহে সবাই যদি অতো হৃদয়ভরে পৌছিতে পারিত, তবে
তো রাতারাতি শ্রীচৈতন্য হইয়া যাইত সকলে। মনে
করিলাম—সত্যিই বড় সাধক-পুরুষ মগনদাস; একেবারে
মূলে আসিয়া নোঙর ফেলিয়াছে। এমন করিয়া তথাগতের
পায়ে নিজেকে যে অঞ্জলি দিতে পারে, সেও যে বড় কম
প্রণয় নয়!

অনেক 'নাম' শুনাইল মগনদাস, বেশীর ভাগই তাহার নিজের রচিত, কোনো কোনোটি অজ্ঞাত পদকর্তাদের। গোসাই-ছড়া, ভজন, তদন্ত সুন্দর আবেশমধুর ভাবনর সঙ্গীত। সবগুলি আগ মনে নাই, স্মরণলি শুধু কানে ভাসে; আর ছই চোখে আগিয়া ওঠে সেই নথরকাস্তি হরি-ভুলসীর চারি ফুট উচু বাধানো বেদীটা।

অনেকক্ষণ পরে গান থামাইল মগনদাস, কহিল, “আমার মধ্যে তুমি ভাব এনে দিয়েছিলে, তাই বেন একেবারে নামে মিশে গিয়েছিলাম! ঠাকুর তোমাকে সুখী ক’রবেন।”

বলিলাম, “তোমার কেউ শিষ্য নেই, বৈরাগী তাই?”

এবারও মগনদাস ধীরকণ্ঠে কহিল, “আমরা শিষ্য ক’রতে কাউকে জানি না। সবাই এক ঠাকুরের ছেলে আমরা; সবাই আমরা সেই পরমাত্মার অংশ। তিনিই তো মস্ত দেন মানুষকে, ডাক পাঠান অঙ্করে। আমরা শুধু তাঁর ভজনার কথা বলে দিতে পারি। শিষ্য ক’রবার অধিকার আমরা রাখি না।”

সুন্দর মনোময় অভিব্যক্তি। ক্রমশঃই বেন একটা নিব্বিরোধ আসক্তি আসিতেছিল মগনদাসের প্রতি। কহিলাম, “আজ আমাকে বড় নতুন কথা শুনিবে প্রাণ ত’রে দিলে, বৈরাগী তাই, আশ্রম-দর্শন আজ আমার সার্থক হোলো।”

দেখিলাম, আত্মমুখে মগনদাস আবার কিছুক্ষণ নিজের মধ্যে তন্ময় হইয়া রহিল, তারপর আপন খেয়ালেই গুণ গুণ করিয়া আবার কি একটা নামের কলি ভাজিতে লাগিল।

কহিলাম, “এবারের মতো তবে আসি। আবার যদি কখনো আসতে পারি—মনে রেখো বৈরাগী তাই।”

“ভুলতে কি পারি?” ঠিক যেন বিদায়বিধুর ব্যাধাদীর্ণ চোখে চাহিয়া মগনদাস উত্তর করিল,

“বললামই তো, সবাই আমরা সেই পরমাত্মার অংশ, সবাই মধ্যই সকলের যোগ আছে। দূরে গেলেও তাই প্রাণ প্রাণকে টানে। ভুলবো কেমন করে, বলো?” তারপর নিজের মধ্যে একটা তারি নিঃশ্বাস চাপিয়া লইয়া কহিল, “সময় ক’রে আবার এস।”

মারামুখ্য মুহূর্ত্ত। কথার ছবাব দিতে পারিলাম না। ধীরে ধীরে সামনের দিকে আগাইয়া বাইয়া একটি ঘোপা মুদ্রা সেই বেদীর উপরে রাখিলাম, তারপর একরকম চিত্রাচরিত সংস্কারবশেই তাহাতে একবার ললাট স্পর্শ করিয়া ধীরপদে চলিয়া আসিলাম। যতদূর দৃষ্টি যায় সম্ভবতঃ মগনদাস আমার চলাপথেই চাহিয়াছিল। কেমন যেন একটা অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আছে মগনদাসের মধ্যে, সামান্যক্ষণের মধ্যে একেবারে দীর্ঘকালের আত্মীয়তাব গ্রথিত করিয়া ফেলে সেই শক্তি।—চলিতে চলিতে এই কথাটাই সারাপথে কেবল মনে হইতেছিল।

ইহার পর মাঝখানে দীর্ঘ দিন কাটিয়া গিয়াছে। প্রাত্যহিক নানা সংঘাতের মধ্যে ডুবিয়া আর বড় একটা কোথাও পা বাড়াইতে পারি নাই।

সেবার রথযাত্রার উৎসব পুটিয়ায়। মস্তাহ ধরিয়া এত বড় মেলা বাংলায় খুব বেশী হয় না। ধিঘেটার, বাজা, পুতুলনাচ, ঢপ, আলোকচিত্র : চূড়ান্ত উৎসব। প্রকাণ্ড মহুমেটের মতো পিড়লের রথ, বজ্রহীন ঘোড়া দুইটা যেন কদমে ছুটিয়াছে! জগন্নাথ ঠাকুরের পিড়লের মূর্ত্তিতেও যেন বিচ্ছুরিত হাসির আভাস।

কিছুদিন হইতে বিশেষ এক আত্মীয় বাসা নিয়াছিল পুটিয়ায়। খবর পাইয়া আবার দুই দিনের জন্য বাহির

হইলাম। পথেই একটু দূরে কীর্তনখোলা। না আসিয়া পারিলাম না। বৈরাগ্যসাধনায় মন না টানুক, অন্ততঃ মগনদাসকে ভুলিতে পারি নাই।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কাছে আসিতে দেখিলাম বেদীর সামনে চক্রাকারে বসিয়া সেবাইতেরা নাম-কীর্তন করিতেছে। সংখ্যার বে খুব বাড়িয়াছে, তাহা নয়; আরও হরত দুই একজন, এবং তাহার মধ্যে বিশেষ একজন বৈষ্ণবী। নাকে ও কপালে শ্বেত চন্দনের তিলক। স্নানর স্ফডোল গৌরবর্ণ চেহারা। দুই হাতে খড়্গনৌ বাজিতেছে। ক্রমে নাম জানিলাম—চাকু : চাকু বৈষ্ণবী।

প্রতিদিন কত লোক আসে যায়। বিস্তৃত সমাজ। কে কাহাকে মনে করিয়া রাখে? কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম, প্রথম দৃষ্টিতেই মগনদাস আমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছেন। সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, এই বে, ঠাকুর ডাক দিয়েছেন, দেখা না হ'লে কি পারে! বস' তাই বস'।"

বলিলাম, "সাধু না হ'লে তুমি এমন করে মনে রাখতে না। তোমার কাছে এ জীবনে আমার কম ঋণ থেকে গেল না বৈরাগী ভাই।"

ভাবার্থ হরত কিছুটা বুঝিল মগনদাস, কহিল, আত্মার আত্মার বে প্রেম হয়, তাকে কি ঋণ বলে ভাই। ঠাকুরের কাছে সবাই এক ঠাই।"

যুদ্ধ হইয়া গেলাম কথা শুনিয়া।

ওপাশে বসিয়া ঠেতন ব্রহ্মচারী নাম-কীর্তনের শেষে কি একটা মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। একরকম সৌজন্যের খাতিরেই গলা উচাইয়া কহিলাম, "ব্রহ্মচারী ভাই, ঠাকুরের প্রসাদ কিছু দাও।"

কিন্তু তাহার উঠিবার পূর্বেই চাকু বাইয়া একপাত্র চরণামৃত ও কিছু ফল-বাতাসা আনিয়া সামনে ধরিল। মগনদাস কহিল, "গ্রহণ কর।"

বলিলাম, "নতুন মানুষ দেখছি আরও এবারে। আসতে না আসতেই তো একেবারে নাম-কীর্তন শেষ ক'রে দিলে! কতকাল শুনি। ধরো না হ'একখানা,— বৈরাগী ভাই?"

হাসিয়া মগনদাস কহিল, "তুমি ভাই দেখছি আরও পাগল ক'রে দেবে আমাকে।" তারপর কিছুক্ষণ থামিয়াই একতারাটি হাতের মুঠায় টানিয়া লইয়া স্বল্প তুলিল :—

হরির নামে পাগল আমি, পাগলামি ভাই বাবে কিসে?
প্রাণ হোলো যে জরজর প্রাণ ঠাকুরের প্রেমের বিষে।

চিকনকণ্ঠে খড়্গনৌ বাজাইয়া সাথে সাথে ধূয়া ধরিল চাকু বৈষ্ণবী। অনবস্থ ঐক্যতানিক হয়। একতারার অপূর্ণ বন্ধারে সেতারও বেন হার মানিয়া যায় :—

ভবের পাগল মগন বলে, পাগলা ছাড়া কেবা কিসে?
(এই) পাগলা-ধোঁকার ধুঁকে যে ভাই ধূলায় অঙ্গ বাবে মিশে।

ধানিক মাটি লইয়া কপালে লেপন করিল মগনদাস। কহিল, "মাটিই তো খাঁটি ভাই। অধেও মাটি, অস্তেও মাটি। ঠাকুর দূরে ন'ন, ঠাকুরের খেলা যে এই মাটিতেই। দেখনা, মাটিকে কেমন ক'রে আঁকড়ে ধ'রে আছেন ঠাকুর।" বলিয়া ভাববিহ্বল চক্ষে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল একবার বেদীর উপরে সমস্তে বদ্ধিত হরিভুলসৌটির দিকে।

কথা না বলিয়া পরিবেশ বিচারে যুক্তকর স্পর্শ করিলাম ললাটে। মগনদাসকেও দেখিলাম, তেমনি বিহ্বলনেত্রেই চাহিয়া আছে বেদীর দিকে।

স্বর ধরিল এবারে চাক্র বৈষ্ণবী : আখা পূর্বীর সঙ্গে
দেশী পল্লী—

বহ রূপ ধ'রেছ ব'লে স্বরূপ তোমার চিনতে নারি,
স্বরূপ তোমার কিরূপ আকার, চিনায়ে দাও দরাল হরি।...

ধূয়া ধরিল এবারে মগনদাস। কিন্তু দেখিয়া আশ্চর্য
হইয়া গেলাম বে, প্রথম চরণ শেষ করিতে না করিতেই
তাহাকে থামাইয়া দিয়া স্বর ধরিল চৈতন ব্রহ্মচারী।
চাক্র বৈষ্ণবী থামিল না, স্থললিত কোকিলকণ্ঠে স্বর টানিয়া
টানিয়া খঙনোতে দিলি তাল ঠুকিয়া চলিল। কিন্তু
কেমন যেন বিরক্তি বোধ হইল চৈতন ব্রহ্মচারীর সুরে।
একটুকুও লালিত্য আছে বলিয়া মনে হইল না। অথচ
মগনদাসের মুখে তখন এমন একটা স্নান আভা কুটিয়া
উঠিয়াছে যে, উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহাকেও কিছু আর
অনুরোধ করা শোভন বলিয়া মনে করিলাম না।

গান শেষ হইলে, চৈতন ব্রহ্মচারী দেখিলাম এক রকম
নীরবেই কোথায় একদিকে উঠিয়া গেল। রাত্রি
অনেকখানিই হইয়াছিল বটে। চাক্রও সম্ভবতঃ উঠিয়া
খালপাড়ের নিজের ঘরের উদ্দেশ্যেই পা বাড়াইল।

মগনদাস কহিল, “সংসারী হ'য়েছ?”

উপস্থিতক্ষেত্রে প্রশ্নটা অপ্রসঙ্গিক হইলেও কহিলাম,
“না।”

মগনদাস বলিল, “চাক্রী ক'রছ বুঝি?”

বলিলাম, “ক'রেছিলাম কিছুদিন, কিন্তু দেখলাম,
অতবড় দাসত্ব খাতে পোষাবে না; ছেড়ে দিয়া তাই
ব্যবসারে মন দিয়াছি। কিছু করতে পারবো কিনা
শ্রীহরিই জানেন।”

কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল মগনদাস আমার
ললাটের দিকে; তারপর কহিল, “সামনে ভালো

সময় আসছে; পরিশ্রম কাকি বাবে না। লেগে
থাকো।”

সারা মনে সংসার আর দুর্দলতা; কহিলাম, “হাত
দেখতে জানো, বৈরাগী তাই?”

মগনদাস যুহু একবার হাসিল, কহিল, “বা ব'ললাম,
তাই শুনে রাখো; হাত দেখতে আর হবে না।”

আর দ্বিতীয় প্রশ্ন তুলিলাম না।

কিছুক্ষণ থামিয়া মগনদাস মাটিতে কি বেন কতকগুলি
রেখাচিত্র আঁকিল, তারপর কহিল, “তোমার এখন বয়স
কতো?”

উত্তর করিলাম, “উনত্রিশ বছর সাত মাস, সামনের
শ্রাবণে ত্রিশ পূর্ণ হবে।”

রেখাচিত্রগুলির উপরে বার কতক আঙুল বুলাইয়া
মগনদাস কহিল, “আর দু'বছর তিন মাস। কল পেনে
ঠাকুরের উদ্দেশ্যে কিছু ভোগ দিও, আর অন্ততঃ পাঁচজন
দরিদ্রকে নৈমন্ত্যর করে খাইয়ো। ঠাকুর কল্যাণ করবেন।”

বলিলাম, “বেশ, আমি তবে ঠিক ঐ দু'বছর তিন
মাস বাদেই আবার এসে দেখা করবো। কথার তোমার
কাজ হলে হাতীর দাঁত আর বাঘের ছালে তোমাকে আসন
তৈরী করে দেব। আমার হয়ে বরঞ্চ একটু নিবেদন
কোরো ঠাকুরের কাছে।”

“নিবেদন অবশ্য নিশ্চয়ই করবো।” মগনদাস কণ্ঠের
উপরে এবারে বিশেষ একরকম জোর দিল, “কিন্তু ঐ
আসক্তির কথা আর তুলো না। ঠাকুরের পায়ে নিবেদিত
আমরা, ভোগের বাসনার আমাদের পুড়তে নেই।
বিষয়-আশা কবেই তো ছেড়েছি, আর কি তা মনে পড়ে!
সব না ছাড়তে পারলে আসন পাওয়া হয় না। নকল
নিরে জীবন চলে ক'দিন? আসলে যদি ডুবতে পারো,
তবে দেখবে—নকলে আর আনন্দ নেই, একেবারেই

তুচ্ছ তা। বলছিলাম না, মাটিই খাঁটি। এই মাটিতে বসে একতারা যখন 'নাম' করি, তখন মনে হয়, রাজার আসনও যেন কত তুচ্ছ।"

অভিভূতদৃষ্টিতে মগনদাসের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আশ্চর্য্য হইলাম না। আশ্চর্য্য হইবার ভাবটা প্রথম দিনের আলাপেই কাটিয়া গিয়াছিল। মনে করিলাম, মগনদাস যদি ভাল লেখাপড়ি জানিত, তবে বাংলার দর্শনশাস্ত্রে অন্ততঃ স্থায়ী কিছু বস্তু দিয়া যাইতে পারিত।

কহিলাম, "সময় নেই, নইলে ইচ্ছে ছিল, তোমার কাছ থেকে 'কছু কিছু জিনিষ লিখে নেব। সমাজে আজ চারদিকে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, ধুক, বিদ্রোহ, হাঙ্গামা; তোমার এই সুন্দর 'নাম' আর সত্যোপলব্ধি দেশে কিছু শান্তির বাণী শানাতে পারতো।"

ভাবগগন কর্তে মগনদাস উত্তর করিল, "ওকথা বোল না; ওতে মোহ আসে। অপেক্ষার থাকো, স্বয়ং প্রভুই আমার অবতার হয়ে একদিন এসে অমৃত ছড়িয়ে দিয়ে বাবেন সারা দেশে। তাঁকে ধ্যান করো।"

বলিলাম, "ধ্যান কি একটু আধটু ক'রছি, হৃদয়টা খুলে যদি দেখাতে পারতুম, তবে দেখতে পেতে, প্রভুর জন্যে দিনরাত কতবড় আহুতি যজ্ঞ চ'লেছে সেখানে। চারপাশে শুধু লোক ঠকানো, ফাঁকিবাজী, হিংসা আর জুলুম। পাপে ছেয়ে আছে সারা দেশ। এ পাপের বিনাশ না হ'লে ধর্ম্ম স্থান পাবে কেমন ক'রে?"

"সেই জন্তেই তো নামের আবশ্যক।" উচ্ছ্বসিত কর্তে উচ্চারণ করিল মগনদাস, "দিনরাত শুধু নাম চাই তাই, হাজার হাজার লোক যদি দিনরাত শুধু খোল, যুদ্ধ আর একতারার ঠাকুরের নাম ক'রতে পারে, তবেই পাপের বিনাশ সম্ভব, নইলে পাপে পাপে আরও অন্ধকার হয়ে যাবে দেশ।"

বস্তুতাত্ত্বিক জগতে এ কথার বিরুদ্ধে কত যে তর্ক আছে, তাহা জানি; কিন্তু তাহার অবতারণা এখানে অবান্তর। তাই মগনদাসের কথাকেই নানাভাবে ঢালিয়া সাজাইয়া একথা-সেকথায় ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিলাম। পুঠিয়া যাইবার সন্ধ্যা কাটাতে রাত্তাটা তখন রাত্রির অন্ধকারে শ্মশানের মতো হইয়া উঠিয়াছে। কিছুদূর আসিতেই সামনে একটি যাত্রীবাহী গরুর গাড়ো পাইলাম, কহিলাম, "চলো, পুঠিয়া চারআনী বাজার।"

এই ঘটনার পর পূরা দুই বৎসর তিন মাসও কাটে নাই; মগনদাসের সেই রেখাচিত্র মিলাইয়া তাই নিজের ভাগ্য-সুপ্রসন্নতার বিষয় আন্দাজ করা কঠিন। ব্যবসারে যে বিশেষ কিছু একটা লাভ যাইতেছিল, তাহা নয়। রাশিচক্রে হরত গলদই ছিল খানিকটা। কিন্তু শ্রমে শৈথিল্য আসে নাই। যে ভাবেই হউক, ব্যবসা-চক্রে মগনদাসের কথা রক্ষা করিয়াছি; নিজের তৃপ্তির কাছে এইটুকুই শুধু ফাঁকি নয়।

ইতিমধ্যে খুব ভোরে ভোরেই একদিন হঠাৎ বজ্রপাতের মত হঃসংবাদ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম—কীর্ত্তনখোলায় মগনদাস বৈরাগী খুন হইয়াছে। হঠাৎ সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া কেমন একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। লোটা-কম্বলহীন বৈরাগীর আবার খুন হইবার কারণ থাকিতে পারে কি? তা ছাড়া মগনদাসের মত লোক—বিশ্বাসই হইতেছিল না সংবাদটা।

উঠিয়া সেই ট্রেনেই রওনা দিলাম। বেশীক্ষণ লাগিল না। ঘটনা তিনেকের মাত্র পথ। মাথার উপরে ক্রমশঃ

মুদ্রিত তাম্রা উঠিতেছে। মাঝবেলায় আসিয়া ঘটনা-ক্ষেত্রে পৌছিলাম। দিনটা বেশী দূরের নয়, আজকেই কাহিনী। মিথ্যা নয় জনশ্রুতি। সত্যিই মগনদাস বৈরাগী খুন হইয়াছে :—খুন হইয়াছে কাল রাত্রে। এখনও ক্ষতস্থান দিয়া ধারায় রক্ত ঝরিতেছে। আশ্চর্য্য পুরুষ মগনদাস, এত রক্তও মানুষের দেহে থাকে !

ভিড়ের মধ্যে সেবাইতদের ছই একজন কাছে ছিল। পূর্বের বার ‘নামের’ আসরে সামান্য চোখের পরিচয় হইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি ক’রে এই ব্যাপার ঘটিলো ?”

উত্তরে অপেক্ষাকৃত কাঁচাবয়সী সেবাইতটি একটু আড়ালে আসিয়া যে বর্ণনা দিল, তাহা এইরূপ :—

সাধনপথে কামিনীকাঞ্চন ত্যজা—কথাটা মিথ্যা নয়। চাক্র বৈষ্ণবী সাহিত্যপথে থাকিয়াই নাম-জপ করিত বটে, কিন্তু বয়স বেশী নয়, একাকিন্স বড় বেশী হৃদয় অভিলাষ হইয়াই দেখা দিয়াছিল তাহার কাছে। মগনদাসের সঙ্গে কিছুকাল হইতেই কেমন যেন জড়াইয়া পড়িয়াছিল সে। যখন নান-কীর্তন চলিত, মগনদাসের জুড়িমার দেখা যাইত চাক্রকেই। চৈতন ব্রহ্মচারী স্বর ধরিলে হাতের খঞ্জরী আর তেমন একটা তালে চলিত না চাক্র বৈষ্ণবীর। একদিন কী একটা ওসঙ্গে চৈতনের মুখে স্পষ্টই শোনা গেল—বাহ করিয়াছে মগনদাস চাক্র বৈষ্ণবীকে। কিন্তু ঘটনা হৃদয় আসলে অতদূর সত্য নয়। চৈতনও যে চাক্রকে হাত করিতে চেষ্টার বাকী রাখিয়াছিল—কথা ভাবাও ঠিক হইবে না। কীর্তনখোলার অগ্রজ সেবাইত চৈতন আর মগনদাস—কাহারও সম্বন্ধে কিছু বলা তরুণ সেবাইতদের ধর্ম্মে আঘাত করিবে—এই মনে করিয়াই তাহার কিছু বলিতে যাইত না। কিন্তু একদিন নাকি পাহারা চালাইয়া চৈতন স্পষ্ট দেখিল—অধিক রাত্রে

মগনদাস বাহির হইয়া আসিল চাক্র ঘর হইতে। অপর আশ্রম ত্যাগ করিয়া রাত্রে কোথাও কাহারও বাওয়া এখানে নিয়ম বিরুদ্ধ। চাক্রর ব্যবস্থা অবশ্য আলাদা ছিল গোড়া হইতেই, কারণ সে নারী। নিজেই সে নিজের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়া নিরাছিল। কিন্তু এ সন্দের পরিণতি যে এই খুনে আসিয়া দাঁড়াইবে, তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। তারপর আজ তো ঘটনা আসিয়া এই পর্য্যন্তই ঠেকিয়াছে।

কহিলাম, “খুনটা তা হ’লে চৈতন ব্রহ্মচারীই ক’রেছে ?”

“তাই বা ঠিক বোঝা যায় কি ক’রে ?” সেবাইতটি উত্তরে বলিল, “প্রতিনিধের মতো আজও তো তিনি একই ভাবে আশ্রমে ব’সে ‘নাম’ ক’রছেন।”

বুঝিলাম—ষড়যন্ত্র কম নয়। বৈষ্ণবিক ভ্রমের আইন-বস্ত্রের ফাঁকগুলি পুরামাত্রায়ই তবে মগজে পাকা করিয়া রাখিয়াছে চৈতন ব্রহ্মচারী।

জিজ্ঞাসা করিলাম, “চাক্র বৈষ্ণবীর এখন কি অবস্থা ?”

শুনিলাম—ভোরের দিকে কিছুটা চাক্র্য দেখা দিয়াছিল অবশ্য তাহার মধ্যে, কিন্তু আশ্রমে সে আর আজ আসে নাই ; ঘরে ঝাঁপ আঁটিয়া পড়িয়া আছে।

অধিক বেলায় ধীরে ধীরে লোক কমিতে শুরু হইল। আসিবার পূর্বে ইচ্ছা ছিল, কীর্তনখোলার একবার বসিয়া আসিব। কিন্তু মন সরিল না। সাগ্রহে কাছে ডাকিয়া ‘নাম’ শুনাইয়া মুগ্ধ করিবার মতো আজ আর সেখানে কেহ নাই। মগনদাসের মৃত দেহটার দিকে চাহিয়া অভিভূতদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিলাম। এখনও তাহার ঐ মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখমণ্ডল হইতে যেন ঐতিহার্য্য অপকল্প ঘোঁড়ি উৎসারিত হইতেছে। এতদূরও যখন

আসিল না মগনদাসের প্রতি। পাপ, পুণ্য, আদর্শ, তেজ
আর দুর্বলতা ইহা লইয়াই তো মানুষ। মগনদাস সংসার
ছাড়িয়া বৈরাগী হইয়াছিল, হস্ত সাধনার সে সিক্ত হয়
নাই, কিন্তু সত্যিই কি সে পাপ করিয়াছে? মনে
পড়িল মগনদাসের সেই কথাটি : 'মাটিই তো খাঁটি ভাই,
অধেও মাটি, অধেও মাটি।' জীবনান্তে সেই মাটির শীতল
বুকেই আশ্রয় নিয়াছে আজ মগনদাস। নিজের জীবনে
বৃহত্তর ধর্ম পৌছাইতে না পারুক মগনদাস, কিন্তু যে
বৃহত্তর জ্ঞান ও শক্তির সুরণ তাহার মধ্যে দেখিয়াছিলাম,

তাহাও যে বড় কম নয়।— এখনও যেন মনে মনে তার
সেই ভাবমধুর ভঙ্গনা শুনিতেছি :

মগনদাস কর ভজন বিনা (তোর) চরণ কোথায় পাবি ?

(তোর) বিষয়কর্ম শেষ হ'লে তো গুরু হাতে যাবি !

গুরু আমার রূপ ধরে না।

এই খুনের পিছনে হস্ত মগনদাস সেই গুরুর আহ্বানই
শুনিয়াছিল। গুরুর হাতে যেন তাহার হাতে আজ আমার
নতুন করিয়া একতারা বাজিতেছে।

তুমি মোর প্রিয়-না-প্রভু ?

শ্রীঅপরূপ ভট্টাচার্য

ঝড়ের রাতি এসেছে যখন ত্রাসের পক্ষ বিছারে তার
মেঘগর্জন-বিতীষিকাতরা গগনে গহন অন্ধকার ;
ঘন বরিষায় একেলা বসিয়া বাতায়ন হতে চাহিয়া দূরে
বা ছিল গোপনে আমার স্বপনে মেঘমল্লার ব্যথার সুরে
শরণ লাগিয়া শুনায়ে তোমারে বরোছি প্রণাম দেবতা মম,
আত্মদানের প্রণাম আমার অপূর্ণতার বেদনা সম।

শেষবিদ্যার চিত্র আঁকিয়া নবযাত্রার রচিছ পথ,
সেই পথ দিয়ে চলার পাথের সাথে নিয়ে চলে বিশ্বরথ ;
সে রথে তোমারে সাক্ষীর রূপে দেখেছে ধ্যানের ভক্তগণ,
আমি তো সেভাবে হেরিনি কখনো হেরেছি নিত্য নিরঞ্জন
বেগুনি-পারের জ্যোতিভেদ করে

ভুলালে আমারে ভুলালে প্রিয়,
এ লাল-উজ্জ্বল আলোর খেলায় উড়িয়ে তোমার উত্তরীয়।

প্রভাত এসেছে সুন্দরতম উজান-ভাটিতে চলেছে তরী
বাদামীরঙের ফাঁকা মাঠে মোর ভাবভূবনের ছলিছে নরী।
তরুপল্লব মর্ম্মরধ্বনি নদীকল্লোল বিহগগীতি
আমার মনের মাধুকরীসনে জাগায় প্রাণের পুলকপ্রীতি।
ছক্কি কিনারে বীথিবন ছায়ে শোভিছে পাতার পল্লীগেহ,
বেদিকে নিরখি হেরি যে তোমারে

তুমি ছাড়া মোর নাহি যে কেহ!

ভালোমনের অশ্রুহাসিতে' ভয়ভাবনার নানা ধারাতে
কতরঙে তুমি রাঙায়েছ মোরে

লোকলোকে আর গ্রহণরাত্রে।
নবসংসারোহে' স্বতুপধ্যানে ভেসে যায় চির জীবন-ভেলা
তোমাতে আমাতে অনিত্য পথে এমনি করিয়া নিত্য খেলা।
তোমার বালী যে কানাকানি করে'

ভালো করে তারে বুঝিনি কত,
মর্ম্মছয়ায়ে দাঁড়িয়ে বারেক

বলো—তুমি মোর প্রিয়-না-প্রভু ?

নামরূপ রহস্য

শ্রীগিরিজাশঙ্কর ঘর এম-এ

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবন—প্রত্যেক মানুষের এই আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু সে জানে তাহাকে মরিতেই হইবে, তাহার এই সাজান দেহ নষ্ট হইবেই। তথাপি মৃত্যুর পরেও নামটা বজায় থাকে—ইহা তাহার অন্তরের অন্তরতম আকাঙ্ক্ষা। তাহার ধারণা—তাহার নাম বাঁচিয়া থাকিলে সেও বাঁচিয়া থাকিবে। এট ধারণার বশবর্তী হইয়া রাজা সন্তো গিড়িগাত্রে ভাষ্যপট্টে স্বনাম উৎকীর্ণ করে, কবি কাব্য লেখে, দাতা দান করে, বোকা সম্মুখ বুক্রে প্রাণত্যাগ করে। নামের জন্য মানুষ সব করিতে প্রস্তুত।

যে নামের জন্য মানুষ এত লালায়িত সে নামের সঙ্গে তাহার কি সম্বন্ধ? নাম কি নামীর স্বরূপ? নাম নামীর মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা দেখা যাউক।

মাতাপিতা পুত্রের নাম কালিদাস না রাখিয়া যদি অমূল্যত্রে রাখিতেন তাহা হইলেও রঘুবংশ মেঘদূত অভিজ্ঞান শকুন্তলের সৌন্দর্যের কোন হানি হইত না। গোলা একে অন্য নাম দিলে তাহার সৌন্দর্যের তারতম্য হয় কি? নামে। সঙ্গে নামীর কোন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাট। বলেছের ছাত্রদের রোলনন্দর যেমন কেয়লী কল্পিত, নামও সেইরূপ মাতাপিতা প্রভৃতি কর্তৃক কল্পিত।

ইংলণ্ডে একই ব্যক্তি কখনও মিষ্টার উড, কখনও লর্ড আরউইন, কখনও লর্ড আলফ্রাঙ্ক নামে পরিচিত হয়। ভারতও একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে নরেন্দ্রনাথ,

বিবিধিবানন্দ, সচ্চিদানন্দ এবং বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হয়। আমরা নাম গ্রহণ ও বর্জন করিতে পারি।

কোন নাম কোন ব্যক্তির একচেটির সম্পত্তি নয়। কালিদাসের পূর্বে পরে এবং সমন্বয়ে হাজার হাজার লোকের কালিদাস নাম ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতে থাকিবে। বাহা অপরের কল্পিত, বাহা গ্রহণ ও বর্জন করিতে পারা যায় এবং বাহা অপরেও ব্যবহার করিতে পারে তাহা স্বরূপ হইতে পারে না। নামের অমরতার নামীর কোন উপকার হয় না।

নাম শুনিতেই শ্রোতার চিত্তে একটা চিত্র ভাসিয়া উঠে। শব্দশব্দ, আকাশকুসুম প্রভৃতি কোন সত্য বস্তু নাই, তথাপি ঐ সকল শব্দ শুনিবামাত্র আমাদের মনে এক একটা রূপ কল্পনা করিয়া লয়। মনের এই কল্পনা-শক্তি আছে বনিয়াই উপন্যাস নাটক লেখা এবং পাঠকদের তাহার রসমস্তোগ করা সম্ভব হইয়াছে। আমরা বাস্তব এবং কল্পিতের মধ্যে পার্থক্য করি কিন্তু কালিদাস নাম শুনিয়া আমাদের মনে যে চিত্র উঠে এবং কপালকুণ্ডলা উপন্যাস পড়িয়া নবকুমার সম্বন্ধে যে চিত্র উঠে সত্যতার সন্ধি হইতে এ উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। উভয়েই সমানভাবে বাস্তব কিম্বা কল্পিত।

কালিদাসকে আমরা দেখি নাই, তিনি ঘোঁষা না হয়, গৌর না কৃষ্ণ কি ছিলেন জগৎ আমরা জানি না। মকমসেই স্ব স্ব কল্পিত আকারে এক একটা কল্পনা করিয়া থাকেন। এই কল্পনা চিত্রে কিম্বা মূর্তিতে প্রকাশ করিতে

পাড়িলে দেখা যাইত যে এই কল্পনাগুলির মধ্যে কত আকাশপাতাল পার্থক্য। বিভিন্ন দেশের গোল্ডরা বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ করিয়াছে। এই সকল মূর্তি দেখিলে আমরা দেখি যে বাঙ্গালীদের বুদ্ধ আকারে বাঙ্গালী, তিব্বতীদের তিব্বতীকলোচন এবং অবনতনাসিক এবং গাঁকারদের পেশোয়ারীদের মত দীর্ঘ ও দৃঢ়কায়। কালিদাসের চিত্র কিংবা মূর্তি পাওয়া না গেলেও বাঙ্গালীরা তাঁহাকে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানীরা পাগড়িধারী এবং মাল্লারীরা নেড়ামাথা মনে করে। কালিদাসের নাম এবং রূপ উভয়ই কল্পিত। নাম ঃ বাপের কল্পিত, রূপ পাঠকদের কল্পিত। কল্পিত রূপ দৃষ্টরূপের সমান হয় না। কোন লোককে দেখিবার পূর্বে আমরা তাহার যে রূপের কল্পনা করি আমরা সকলেই জানি দর্শনের পর সে রূপের সহিত দৃষ্টরূপের মিল হয় না। কিন্তু এই কল্পিত নামরূপই আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাই। আমরা যে কিসের অমরতা চাই, কপালকুণ্ডলার অমরত্ব এবং কালিদাসের অমরত্বের মধ্যে পার্থক্য কি তাহা আমরা তলাইয়া দেখি না।

আলোকচিত্রের সাহায্যে আমরা আমাদের রূপ ধরিয়া রাখিতে পারি। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল রূপের মধ্যে কোন রূপটি আমাদের স্বরূপ? আমাদের বাল্যে একরূপ, যৌবনে আর একরূপ, বার্দ্ধক্যে আবার আর একরূপ। জন্মের পূর্বে মাতৃগর্ভে মাসে মাসে বিভিন্ন রূপ, তারও পূর্বে পিতৃ শরীরে জীবাণু রূপ। এখানেই শেষ নয়, তারও পূর্বে তারও পূর্বে ইত্যাদি ক্রমে অসংখ্য রূপ আছে। আবার মৃত্যুর পরে আমাদের পঞ্চভৌতিক দেহ ভস্মসাৎ হইয়া পুনরায় পঞ্চভূতে রূপ ধারণ করে। উহাতেই শেষ হইল না। উহার পুনরায় বৃক্ষসত্তা কীট-পতঙ্গ পশুপক্ষী ইত্যাদি অসংখ্যরূপে পরিণত হইবে। অনাদিকাল ধরিয়া আমরা অনন্তরূপের মধ্য দিয়া অভিসার করিতেছি। কত নামরূপ গ্রহণ করিলে, কত নামরূপ বর্জন করিলাম, ইহার মধ্যে কোন্ট আমার কোনটি

আমার নয়? সকলরূপই আমার কিন্তু মহামায়ার এমনই মায়ী যে যখন যেক্রপ ধরি তখন সেই রূপকেই ধরিয়া থাকিতে চাই, সেইটাকেই আমার নিজ স্বরূপ মনে করি। নামরূপের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাদে।

দেবগণ বরাহদেবের নিকট আসিয়া বলিলেন, “প্রভো, কার্যোদ্ধার হইয়াছে, এখন বৈকুণ্ঠে চলুন।” বরাহদেব বলিলেন, “ও কথা বলিও না, আমি শূকরের নইয়া কাদায় গড়াগড়ি দিয়া দেশ আছি, আমি বৈকুণ্ঠে যাইব না।” ইহা উপাখ্যান মাত্র কিন্তু ইহার অস্তিত্বিত সত্যটি ফেলিবার নয়। সত্যই আমরা নানারূপের মধ্যে দিয়া গতায়ত করিতেছি এবং যখন যে রূপ ধরি তখন সেইটাকেই আপন মনে করি এবং সেই রূপ রক্ষা করিবার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করি। শূকরের বাঁচিবার ইচ্ছা মনুষ্যের বাঁচিবার ইচ্ছার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। রবিঠাকুরের মত তাহারও ইচ্ছা মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। কিন্তু তাহাকেও মরিতে হয় এবং তাহার দেহ ইংরাজভক্ষিত হইয়া সুসভ্য ইংরাজরূপ ধারণ করে, সেই ইংরাজ জামেগীতে নিহত হইয়া জামাণ হই এবং ইংলণ্ডের ধ্বংস কামনা করে।

এই যে পুনঃ পুনঃ নামরূপ গ্রহণ এবং বর্জন ইহাকেই সংসার বলে, ইহার জন্যই আমাদের যত দুঃখ এবং এই নামরূপের বন্ধন হইতে মুক্তিই মুক্তি। বাহা গ্রহণ এবং বর্জন করিতে পারা যায় তাহা আমাদের স্বরূপ নহে, যথা চশমা। নামরূপ আমাদের স্বরূপ নয় কিন্তু স্বরূপ মনে করি। বাহা আমি নই তাহাতে আমিঅবোধ, বাহা নিত্য নয় তাহাতে নিত্যঅবোধ—এইরূপ বিপরীত-বোধকে অবিদ্যা বলে। মানুষ যখন বিচার করিতে বসে, যখন তাহার স্বার্থ নিত্যনিঃস্বার্থবৈবেক উদ্ভিত হয় এবং বৈরাগ্য ও শমদমাদি হইয়া যুগ্মকৃত্ত অর্থাৎ মুক্ত্যভের ইচ্ছা জন্মে তখন

অধাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

ভড়ক-প্রপাত

শ্রীমুরেশ্বরনাথ সেন বি-এ

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় বৎসরে রাঁচি বেড়াইতে যাই। তখন দুর্গাপুর ছুটি। কলিকাতার অনতিদূরে এক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে আমি প্রধান শিক্ষক। আমার একজন অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় রাঁচিতে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। ঐক্কেই দূরদেশ হইলেও আশ্রয়ের ভাবনা ছিল না। যাত্রী আমরা পাঁচজন; আমি, আমার একটি ছাত্র, দুই বন্ধু, আর আমার ইস্কুলের ড্রাইংমাষ্টার।

রাঁচিকে এখন আর দূরদেশ বলা চলে না, রেলের মহিমায়। তখন রেল ছিল না। পুরুলিয়া হইতে প্রায় আশী মাইল পথ “পুসপুস” নামক একপ্রকার ঠেলাটানা গাড়ীতে পাণ্ডাজঙ্গল অতিক্রম করিয়া বিপন্ন স্থান পথে যাইতে হইত। পথে বাঘ ভালুকের ভয় ছিল খুব। স্থানে স্থানে দুইধারে গভীর জঙ্গল, মাথায় উৎরাই চড়াইর সরু পার্শ্বপথ। স্তব্ধ অতিক্রান্তভাবে বিদ্যুৎবেগে বাঘ আসিয়া পড়িলে সুরক্ষিত যাত্রীরও আত্মরক্ষার অবসর মিলিত না। ঐরূপ ঘটনার কথা মধ্য মধ্য প্রায়ই শুনা যাইত। “পুসপুস” আমাদের যাত্রীবাহী ছৈ দেওয়া গরুর গাড়ীর মতন, তফাৎ এইমাত্র যে, ইহা গো-যান নয়, নরযান এবং যুগপৎ ঠেলা ও টানা দুই শক্তিতে চালিত। পুরুলিয়া পর্যন্ত তখন রেল ছিল। পুরুলিয়ার দুপরের আহাির সারিয়া আমরা দুইখানা “পুসপুস”এ যাত্রা করি। দুই গাড়ীর জন্য বারজন আদিবাসী কুলী সঙ্গে চলিল। গাড়ীর মালিক অভয় দিয়া বলিলেন—“বাবু সাব, কুছ ডর নেহি, বহুৎ হাঁসিয়ার রহো।” স্তব্ধ অত্যাশঙ্কিত

মুরোদ সহজেই বুঝিয়া গইলাম এবং ‘দুর্গা’ বলিয়া যাত্রা কলিলাম। দীর্ঘ এবং দুর্গম পথ। সেনিন সেরাত্রি এবং পরের দিন, পরের রাত্রিও পথেই কাটিল, তৃতীয় দিন বেলা বারটার যথাস্থানে পৌঁছিলাম। ব্রাডলি-বার্ট সাহেব তাঁহার ছোটনাগপুরের ইতিহাসে ঐ দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ভগতে অনুপম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভগতের খবর রাখি না, তবে ভারতে উহা অনুপম বলিলে বোধহয় অত্যাধিক হয় না। এমন কঠিন ও কোমল একত্র সমাবেশ, এমন বর্ণ-বৈচিত্র্য, এমন হরিৎ ও হিরণ্যের মধুর মিশ্রণ, একমাত্র বোম্বাই হইতে পুণা যাইবার পথে ব্যতীত আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। এই যাত্রার পূর্বে আর কখনও এরূপ পার্শ্বপথ পথে বেড়াই নাই; বিশেষতঃ “পুসপুস”এ ভ্রমণ প্রায় পারে হাঁটাধৈর্য সামিল। রেল ভ্রমণে চারিদিকের দৃশ্য বায়স্কোপের ছবির মতন দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যায়, দেখিবার সাথ তৃপ্তি লাভ করে না; কিন্তু আমাদের এইবারের ভ্রমণে আমরা যেন অসীম সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতিজননীর কোলে বসিয়াই তাঁহার শ্রীমুখের অপূর্ণ রূপলাবণ্য নিম্পলক নয়নে দেখিবার অবসর পাইয়াছিলাম। পথে দিনের বেলায় চক্ষু বুজি নাই, কেবলই দেখিয়াছি। কোন বিশেষ চিত্তাকর্ষক দৃশ্য দেখিলেই তার ছবি তুলিয়া লওয়া হইত। সময়ে সময়ে আনন্দাতিশয্যে আমরা চীৎকার করিতাম, প্রতিধ্বনি আমাদের ব্যঙ্গ করিত। পথে পুরুলিয়ার সংগৃহীত কিছু চিঁড়া, মুড়কী ও মিষ্টি যাহা সঙ্গে আনিয়াছিলাম, তাহা দিয়াই প্রায় চরিত

ঘণ্টা ক্ষুদ্রবৃত্তি করি। পরদিন বেলা দশটার হাড়োর'তি নামক স্থানে এক সুশীতল বর্ণীয় স্নান করিলাম, এবং এক পাছশালার ডাইলে চাউলে এক হাড়ি আধপোড়া রাঁধিয়া পেটের আশায় তাহার শেষ কণাটি পর্যন্ত সকলে মিলিয়া উদরসাৎ করিলাম। পার্শ্বত প্রদেশের আদিবাসী কুলীরা তখনও অতি সত্যবাদী এবং বিশ্বাসী ছিল। তাহাদের সততার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করা যাইত। দ্বিতীয় দিন আহারাদির পর দুপুরবেলায় গরমে যখন পুস্পুসের মধ্যে থাকা কষ্টকর হইল, তখন আমরা ত্রিনিষপত্র সহ গাড়ী ছুখানা তিনচারিজন কুলীর ভিয়ার রাধিয়া গরি-বন-প্রান্তর পরিক্রমায় বাহির হইয়া পড়িলাম। মহাবনের দিকেই আমাদের কোঁক ছিল বেশী। মহাবর ফুল ভালুকদের অতি প্রিয় খাদ্য বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াই নাকি সেখানে ঘোড়াকেরা করে, এইরূপ শুনিয়াছিলাম। আশা ছিল যে, সেখানে গেলে হৃদয় উহাদের সাক্ষাৎ মিলিতে পারে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় নাই। যেখানেই দেখিবার মতন কিছু আছে বলিয়া সন্ধান পাইয়াছি নির্ভয়ে সেইখানেই বাইরা তাহা দেখিয়াছি। ক্লান্ত না হইলে গাড়ীতে ফিরি নাই।

যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, আমি তখন হাতযুগ ধুইবার জন্য, গাড়ী হইতে নামিয়া নিকটেই একটি অনতিবৃহৎ পার্কভ্য হ্রদের কিনারে গেলাম। একজন কুলি আমার সঙ্গে গেল। সম্মুখেই জলমধ্যে বেশ বড় বকমের পিঠউচু একখানা কাল পাথরের মতন দেখিয়া আমি যেমনই উহার উপরে পা বাড়াইতে গিয়াছি, অমনি সঙ্গী কুলী ছুটিয়া আসিয়া “খবদার” বলিয়া আমাকে পিছের দিকে টানিয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গেই পাথরখানা সরিয়া যাইয়া হ্রদগর্ভে অদৃশ্য হইল। কুলী আমাকে হাত নাড়িয়া এবং চোখ ঘুরাইয়া বুঝাইয়া দিল যে ঐ কুর্খাবতার

বংশধরের পৃষ্ঠে একবার পদার্পণ করিলে আমাকে মলিনমাধি এবং কুণ্ডোদরগতি হইতে কেহই রক্ষা করিতে পারিত পারিত না। আমরা পূর্ববাংলার লোক, কুর্খমাংসে আমাদের অকুচি নাই। নিরামিষ পণ্ডিতেরা বলেন, যে “মাংস” শব্দের অর্থ সে আমাকে থাকে (অবশ্য মাংসাশারীর পক্ষে)। সুতরাং এযাত্রা মাংসা-হারের পণ্ডিতী পরিণাম হইতে বহুভাগ্যে অতি অল্পের জন্য বাঁচিয়া গেলাম।

পথে বাঘভানুকের সঙ্গে দেখা হওয়া দূরে থাকুক, তাহাদের গন্ধও পাই নাই। কুলীরা জঙ্গলের কাছ দিয়া চলিবার সময়ে খুব হাঁকডাক করিয়া চলিত এবং সন্ধ্যার পরে হাতে মশালও রাখিত। ‘পুস্পুস’ যাত্রার তৃতীয় দিন দুপুরে রাঁচি পৌছিয়া আত্মীয়ের গৃহে পরম আদরে চর্ক্য, চোষ্য, লেছ, পেয় সহযোগে উদরযাত্রা নির্বাহ করিলাম। রাঁচি মুদ্রসমতল হইতে ২১০০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। শরতের শেষেই সেখানে বেশ শীত লাগিল। আফ্রিকার তুলনায় রাঁচি তখন বিরলবসতি মাঝারি আয়তনের একটি সাধারণ সহর মাত্র ছিল। রাস্তায় আদিবাসী নারী পুরুষের অবাধ সাবলীল গতিবিধিই সর্বোপরি নবাবগড়ের কোতুল দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। স্বাস্থ্যের জন্য রাঁচির তখন বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। বিলেতজেরতারা এবং সৌখীন ধনীরা কেহ কেহ রাঁচির ত্রাত্রি কালটার গ্রাম্যকালেও এমন একটু শীতের আমেজ থাকে বাহা ইংলিশ ক্লাইমেটের অনুরূপ বলিয়া সেখানে স্বাস্থ্যনিবাস নির্মাণ শুরু করিয়াছেন। বর্তমানের তুলনায় জীবন যাত্রার মূল্য তখন ছিল অকিঞ্চিৎকর। শুধু দুধ ঘিৰ দামই এখন প্রায় বারগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। রাঁচি সহরে তখন রাঁচি পাহাড় এবং রাঁচি হ্রদ ব্যতীত দ্রষ্টব্য আর

কিছুই ছিল না। এখনও বোধ হয় নাই। সহর হইতে
চার পাঁচ মাইল দূরে জগন্নাথপুরে জগন্নাথদেবের একটি
মন্দির আছে। উহার নিকটেই একটি অতি প্রাচীন
গাছের গুঁড়ি তখন দণ্ডায়মান ছিল। আমাদের প্রদর্শক
(Guide) বলিলেন যে সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে স্থানীয়
বিদ্রোহী রাজাকে ঐ গাছের ডালে ঝুলাইয়া ফাঁসি দেওয়া
হইয়াছিল।

রাঁচি হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে সুবর্ণরেখা নদীর
জলপ্রপাত একটি পরম রমণীয় দৃশ্য বলিয়া গণিত হইয়াছিল।
আদিবাসীরা উহাকে 'হুঙ্ক-প্রপাত' বলে। বিশেষভাবে
উহাই দেখিবার জন্য রাঁচি গিয়াছিলাম। ঐ স্থানটি তখন
অত্যন্ত চর্গম ছিল। উহার চতুর্দিক গভীর জঙ্গলসমাকীর্ণ
গিরিমালার পরিবেষ্টিত এবং হিংস্র ঋষ্যপদমন্ডল। হুঙ্ক
অঞ্চল তখন কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন। বাবু ত্রিপুরাচরণ
বায় নামক অতি সজ্জন একজন বাদ্রানী ভদ্রলোকের
হাতে তখন উহার কর্তৃত্ব। তাঁহারই উদ্যোগ সহায়তায়
আমাদের হুঙ্ক দেখা সম্ভব হইয়াছিল। ম্যানেজারবাবু
নায়েব গোমস্তাদের নিকট আদেশপত্র পাঠাইয়া আমাদের
নিরাপত্তা এবং সর্বপ্রকার সুখ সুবিধার ব্যবস্থা
করাইয়াছিলেন। ত্রিপুরাবাবু বলিয়াছিলেন যে হুঙ্ক
প্রপাতে বাঘ, ভালুক, হাতী প্রভৃতি কষ্ট জলপানের জন্য
সর্বদাই আনাগোনা করে, এবং একটি সিংহকেও নাকি
মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইত। এই পশুরাজ কোথা
হইতে কেমন করিয়া লোহারডাগার জঙ্গলে প্রবেশ করিল,
তাঁহা স্থানীয় কেহই অনুমান করিতে পারেন না। এই সকল
কারণে তিনি আমাদের সাবধানে চলাফেরা করিতে
বলিয়া দিয়াছিলেন। হুঙ্কর পথে, সহর হইতে ২৫/২৬
মাইল দূরে, সেতলসোনা একটি ছোট চাবাগান। আমরা
একদিন বিকালের দিকে ছুইখানা পুস্পুস লইয়া তথায়

যাত্রা করি। ঐ বাগানের ম্যানেজারবাবু রামচরণ পালকে
ত্রিপুরাবাবু পূর্বেই আমাদের অভিযান বিষয়ে পত্র দ্বারা
জানাইয়াছিলেন। ঐ সময়ে কলিকাতার নববিধান
সমাজের একজন প্রচারক রাঁচিতে উপস্থিত ছিলেন।
তিনিও আমাদের সংযাত্রী হইলেন। চা বাগানে
পৌঁছিতে আমাদের গভীর রাত্রি হইয়াছিল। ম্যানেজার
বাবু আমাদের জন্য প্রস্তুত ছিলেন এবং পরম সমাদরে
আমাদিগকে উত্তম জলবোগে আপ্যায়িত করিলেন।
সেতলসোনা হইতে জলপ্রপাত প্রায় তিন চারি মাইল
দূর। সুবর্ণরেখা পার হইয়া কিছু কিছু উৎরাই চড়াই
অতিক্রম করিয়া প্রপাতে পৌঁছিতে প্রায় তিনঘণ্টা সময়
লাগিবার কথা। কাজেই আমরা রাত্রি ভোর হওয়ার
পূর্বেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। একখানা 'পুস্পুস',
এবং চাবাগানের একখানা টমটম গাড়ী আমরা সঙ্গে
লইলাম। গাড়ীটাকেও কুলীরাই রিক্সার মতন টানিয়া
লইয়া চলিল। পথে গাড়ীদ্বয় সুবর্ণরেখা পার হইতে
অত্যন্ত বেগ পাইতে হইল। নদীতে বর্দা এক হাঁটুর
খুব বেশী উপরে জল ছিল না, তথাপি আমাদের পরিহিত
বস্ত্রাদি কিছু কিছু ভিজিয়া গেল।

সুখময়ী উষার মৃদু হাসিতে তখন গগনমণ্ডল পুনরিত
হইয়া উঠিতেছে। আমাদের তখন উৎসাহ ও আনন্দের
সীমা নাই। উষা সুন্দরীর স্বর্ণাঞ্চল প্রাচীমূলে
ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। প্রকৃতিদেবী তাঁর
অফুরন্ত ঐশ্বর্য-ভাণ্ডারের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ নবসুখোদয়ের
বরণ ডালা লইয়া বিশ্বপ্রাণের স্নেহসিক্ত কোলে সুষুপ্ত
জগৎকে নবচেতন্যে জাগিবার জন্য মাঙ্গল্য আহ্বান
ওনাইতেছেন। সেদিনের ঐ ব্রাহ্মমূর্ত্তে নবন মেলিয়া
যে অপক্লপ দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাঁহা ভুলিবার নয়।
উর্দ্ধে নবাক্ষরের প্রথম কিরণসম্পাতে অলঙ্কারগরিত

এক টমটম ফেলিয়া রাখিয়া আমরা পদব্রজেই চলিলাম। অল্পক্ষণ পরেই আমরা বাহিত অধিত্যকার পৌছিলাম, এবং সেখানকার অনির্কচনীর মহান দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধবিশ্বয়ে কিছুক্ষণ বাস্তব-নিষ্পত্তিবিমূঢ় হইয়া রহিলাম। প্রপাতের গভীর গর্জনে আমরা যেন অন্য কোন শব্দই শুনিতে পাইতেছিলাম না। দেখিলাম প্রায় শতহস্ত উচ্চ এক কৃষ্ণপ্রস্তরের বিরাট প্রাচীর এক প্রকাণ্ড অনাদিলিঙ্গের ন্যায় গিরিনদীবক্ষে দণ্ডায়মান; তাহার সাহস্রদেশে আর একটি খণ্ডগিরির ন্যায় বিশাল প্রস্তর-স্তূপ; আর সূর্য্যরেখা তাওবনুত্যে শিরী রবিবর্ম। অক্লিষ্ট শিবজটার গঙ্গাবতরণের মতন ঐ অনাদিলিঙ্গের মস্তক এবং সমস্ত দেহ শতধারে পরিপ্লাবিত করিয়া প্রচণ্ডবেগে নিরঙ্কিত খণ্ডগিরিশিরে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে এবং সেখানে প্রতিহত হইয়া ক্রোধোন্মত্ত অনন্ত নাগের ন্যায় সহস্রকণা উদ্ভাত করিয়া অমিতভেজে পুনরায় লাফাইয়া নীচে পড়িতেছে; তারপরে ঐ ফেনিল জলরাশি নদীর ধাতে ছবার গতিতে ধাবিত হইতেছে। কঠিন প্রস্তরের প্রতিহত জলরাশি সহস্রধা বিচ্ছুরিত এবং বিক্ষিপ্ত হইয়া রবিরশ্মিরপাতে চূর্ণ হীরকের জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে। জলীয় বাষ্পপুঞ্জে সম্মুখের দিক এমনভাবে সমাচ্ছন্ন যে শত চেষ্টা করিয়াও প্রপাতের একটি সুস্পষ্ট ছবি তোলা সম্ভব হইল না। শরতের শেষে নদী স্বল্পতারা তাহাতেই এই বিরাট ব্যাপার সৃষ্টি করিতেছে স্মরণে বধন নদীতে বর্ষার প্লাবন দেখা দেয়, তখন যে কী অঘটন ঘটে তাহা কল্পনা করাও শক্ত। দেখিতে দেখিতে বেলা বাড়িয়া চলিল। আমরা তখন প্রপাতের পশ্চাদিকে নদীগর্ভে উপত্যকায় বিভিন্ন প্রস্তরোপরি বসিয়া পরমানন্দে স্নান করিয়া লইলাম। প্রপাতের সম্মুখের দিকে স্নানচেষ্টা অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে হইয়াছিল। পরে পেট

ভরিয়া জলযোগ করা গেল। অবশেষে রক্তনাদির ভার গৌমস্তাদের হাতে ন্যস্ত করিয়া বন্দুকসহ কয়েকজন আদিবাসীর সঙ্গে আমরা পরিক্রমায় বাহির হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ সকলে একসঙ্গে ঘুরিয়া বধন ভয় ভাঙ্গিয়া গেল, তখন আমরা খুশীমত বিভিন্ন দিকে চলিয়া গেলাম (অবশ্য আদিবাসী সঙ্গে লইয়া)। আমি একজন স্ত্রীর সাহায্যে প্রপাতের পশ্চাতে নদীগর্ভে উদ্রীত মস্তক পাথরগুলির উপর পা রাখিয়া চলিতে চলিতে একটি অতীব রমণীয় স্থান দেখিতে পাইলাম। নদীর মধ্যেই একস্থানে দুইটি প্রকাণ্ড পাথর উঁচু হইয়া মাথায় মাথা ঠেঁকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে; মধ্যে আটদশ হাত লম্বা পাঁচছয় হাত প্রশস্ত এবং প্রায় ৪ হাত উচ্চ সুরঙ্গপথ। অত্যন্তের শিলাতল একদিকে একটু উঁচু কিন্তু বেশ মসৃণ। অপরদিকটা একটু নীচু; এই নিম্ন দিক দিয়া নদীর একটি ক্রৌণ জলধারা ঝির ঝির করিয়া প্রপাতের দিকে বাহির হইয়া বাইতেছে। প্রকৃতির বহুনির্মিত এই নির্জন মন্দিরে বন্ধুদের লইয়া পবিত্র ব্রহ্মনাম কীর্তনের ব্যবস্থা হইল। সৈন্যত্রী প্রচারক মহাশয় আচার্য্যের আসন লইলেন। আমি মহাত্মা রাজা রামমোহনের রচিত নিম্নলিখিত গানটি গাইলাম—

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি,
তোমারি রচনা মধ্যে তোমারে দেখিয়া ডাকি।
দেশভেদে কালভেদে রচনা অসীম,
প্রতিক্ষেপে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা।

তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী॥

পরিক্রমায় এবং উপাসনার বেলা প্রায় দুইটা বাজিয়া গেল। দিন তখন ছোট, কাজেই আমরা আর বিলম্ব না করিয়া আহায়ে বসিলাম, এবং গল্পগুস্তাবে অতিশয়

পরিচুপ্তির সঙ্গে এই স্মরণীয় প্রপাতভোজন শেষ করিলাম। গৌমস্তা এবং আদিবাসী বন্ধুরাও কিছু কিছু খাইয়া লইল। প্রপাতের সম্মুখ দিকে নদীর অপর পারে অনতিদূরে একটি ঘনবনসমাকীর্ণ সুউচ্চ পর্বতের দিকে আমাদের দৃষ্টি প্রায় সর্বদাই নিবদ্ধ ছিল। ভয় ছিল যে, ঐ পর্বত হইতে হঠাৎ বে কোন সময়ে বাঘ ভাংক বা হাণী এমন স্বয়ং পশুরাজও জলপানের জন্য নামিয়া আসিতে পারে; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য বশতঃ জানি না, কেহই নামিয়া আসিল না। পুনঃ পুনঃ বন্দুকের আগুয়াজই উহার কারণ কিনা বলিতে পারি না। আর একটি জিনিষ বিশেষভাবে আমাদের কৌতুহলদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। প্রপাতের সম্মুখেই ডাহিনে গিরিপাত্রে কে একজন অসম-সাহসী সৌধীন পুরুষ একটি মথের নিরাস নির্মাণ করাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নির্মাণকাণ্ড বেশ কিছুদূর অগ্রসরও হইয়াছিল। কিন্তু ঐ নির্ভীক বিলাসীর হুকুম সাধ কি কারণে নিতিবার অর্ধপথেই পঞ্চত পাইল, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। প্রায় পাঁচটার সময় বধন সেই গিরিবনবেষ্টিত অধিত্যকার সন্ধ্যার কাল ছায়া নামিয়া আসিতেছিল, তখন আর আমাদের ঐ ভয়ঙ্কর রাজ্যে অপেক্ষা করিবার সাহস রহিল না। আমরা সমস্ত দিনের ক্রান্তিজনিত অবসন্ন দেহে এবং বিষন্ন হৃদয়ে ‘সেতলসোনার’ দিকে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। আদিবাসীরা আমাদের ‘পুস্পুস’ এবং টমটম দিবাভাগেই কাছাকাছি আনিয়া রাখিয়াছিল। এবারে বনপথে বাইবার সময় অনেকগুলি মশাল জ্বলাইয়া আদিবাসীরা খুব হাঁকডাক এবং মধ্যে মধ্যে বন্দুকের আগুয়াজ করিতে করিতে আমাদের লইয়া চলিল। দুই একবার বন্যাচড়িয়ার তীব্র দুর্গন্ধ নাকে কাপড় দিতে হইয়াছিল।

১৩৫২ সালের আর্থিক ভারত

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ

হুঁজুগাক্রমে যুদ্ধের জালে জড়াইয়া পড়িয়া ভারতবর্ষ গত ছয়বৎসর হ্রাসহ কষ্টভোগ করিয়াছে। গত শতাব্দীতেও ভারতবর্ষ যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু সেবার ভারতের তটপ্রান্তে যুদ্ধের ঢেউ বিশেষ না লাগায় ভারতবাসীর ধনপ্রাণ তেমনভাবে বিপন্ন হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে এবার যুদ্ধ হইয়াছে ভারতের মধ্যেই। ভারতসরকার সময় থাকিতে সাবধান হন নাই বলিয়া সময়োজ্ঞানে সনাত্ত শক্তি নিয়োগ করিতে তাঁহারা বাধ্য হইয়াছিলেন এবং এদেশের শিল্প, কৃষি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত সকল দাবিই অগ্রহেলা করিয়াছিলেন।

১৩৫২ সাল ভারতের পক্ষে বিশেষ অসুখী; কারণ এই বৎসরের প্রথম দিকেই ভারতবর্ষ যুদ্ধের লাহুনা হইতে রেগাই পাইয়াছে। তবে যুদ্ধ শেষ হইলেও যুদ্ধজনিত দুর্ভোগের হাত হইতে ভারত এখনও মুক্তি পায় নাই। যুদ্ধের সময় ভারতে যে বিদেশীর দল আশ্রয়প্রার্থী, বন্দী ও রক্ষক হিসাবে সমাগত হইয়াছিল এখনও তাহাদের অনেকেই ভারতের পরিনিতি অন্নবস্ত্রের উপর ভাগ বসাইতেছে; সামরিক বিভাগের সুবিধা জোগাইবার বাধ্যবাধকতার ভারত-সরকার এখনও অসামরিক দেশবাসীর স্বার্থের প্রতি নজর দিবার সময় বা সঙ্গতি করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। যুদ্ধের মধ্যে বন্টননীতিতে সমতারক্ষার জন্য বহু ভোগ্যপণ্যের উপর নানা বিচিত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চানু হইয়াছিল, যুদ্ধবিবর্তির সাত সপ্তাহ মাস পরে এখনও এইসব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বর্তমান থাকায় দেশের লোকের

দুর্দশার শেষ নাই। ১৩৫২ সালের ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতি একান্তভাবে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির অনুরূপ। আশা করা গিয়াছিল যে, প্রথম বছরমাস যাহোক করিয়া কাটিয়া গেলেও ১৯৪৬-৪৭ সালের নূতন বাজেট উপস্থিত করিবার সময় ভারতসরকার দেশবাসীর অভাব অভিযোগ বিবেচনা করিবেন এবং বহু অবহেলিত অসামরিক বিভাগগুলির উন্নতিসাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। কার্যতঃ কিন্তু সাধারণ ভারতবাসীর স্বার্থের দিক হইতে দেখিতে গেলে ভারতসরকারের এবারের বাজেটও বিশেষ আশাপ্রদ হয় নাই। যুদ্ধের আগে ভারতসরকারের সামরিক বিভাগের ব্যয়ের পরিমাণ ছিল বৎসরের গড়ে ৪৬ কোটি টাকা, এবার যুদ্ধ-বসানেও এই ব্যয়ের পরিমাণ ধরা দিয়াছে ২৪ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা এবং অর্থাভাবে ফলে আয়ের তুলনার ব্যয় অধিক হওয়ায় এবারের বাজেটে শেষ পর্যন্ত ৪২ কোটি টাকা ঘাটতি অনুমিত হইয়াছে। এ বৎসর সামরিক বিভাগে ব্যয় ধরা হইয়াছে প্রায় আড়াইশত কোটি টাকা, কিন্তু অসামরিক ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছে মাত্র ১১১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা। কলা বাহুল্য, যুদ্ধোত্তর অসংখ্য অসামরিক সমস্যার পক্ষে এই ব্যয়বরাদ্দ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। ১৯৪৫-৪৬ সালের যে সংশোধিত বাজেট অর্থসচিব স্যার আর্চিবল্ড রোল্যান্ডস্ গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, এই বৎসর ভারত সরকারের মোট ১৪৪ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি



হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে এবং এক বৎসর পূর্বে প্রাথমিক বাজেট পেশ করিবার মাত্র পাঁচমাস পরে যুদ্ধ শেষ হইলেও সামরিক বিভাগের ব্যয় প্রাথমিক বাজেটের তুলনায় মাত্র ২০ কোটি টাকার মত কমাইয়া সংশোধিত বাজেটে ৩৭৬ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। ভারতবর্ষ অভ্যন্তরীণ দরিদ্র দেশ; যুদ্ধের মধ্যে ভারত সরকারকে ১১৭৮ কোটি টাকার ঋণ সংগ্রহ করিয়া সামরিক বিভাগের ব্যয় নির্বাহ করিতে হইয়াছে; এখন যুদ্ধান্তর কালেও এই বিভাগের পিছনে অনাবশ্যক ব্যয় বাহুল্য করিলে জরুরিতে ভয়পায় অধিক বিনিয়োগ একেবারে ভাবিয়া পড়িবে বলিয়াই আশঙ্কা হয়। এখনও সামরিক বিভাগের এইরূপ ব্যয়বাহুল্য চলিতে থাকিলে অসামরিক বিভাগ সমূহ এবং যুদ্ধান্তর সমস্যাগুলির অবহেলা হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

১৩৫২ সালের অধিকাংশ সময়কে যুদ্ধান্তর কাল ধরিলেও ই দেশে খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র ও বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম এ বৎসরও অতিরিক্ত রকম চড়া থাকিয়া গিয়াছে। বিদেশ হইতে যান ও কিছু কিছু আসিয়াছে বলিয়া অনেক সৌধীন বিদেশী পণ্য ও ঔষধাদির উপর চোরাবাজারের উৎপাত কতটুকু কমিয়াছে, তবে চাহিদার তুলনায় জোগান একান্তভাবে কম হওয়ায় সাধারণের পক্ষে সর্বদা খোলাবাজারে ন্যায্য মূল্যে এই সকল দ্রব্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। এ দেশে উৎপন্ন দ্রব্যাদির উপর সরকারী চাহিদা এখনও পুরানোভাবে বজায় ছিল, কাজেই এ বৎসরও অনেক ভারতীয় পণ্যের পক্ষে দেশবাসীর নিকট অভাবকালীন পরিস্থিতি লাভের সুবর্ণ সুযোগ ব্যর্থ হইয়াছে। শেষ দিক ছাড়া মোটামুটি ১৩৫২ সালে ভারতবর্ষে খাদ্য দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে। রেশন এলাকা ও রেশনহীন এলাকার খাদ্যমূল্যের বিশেষ

ভারতমাত্র ছিল না। কিন্তু বস্ত্রের দিক হইতে এ বৎসর ভারতবাসীকে চরম দুর্ভাগ্য ভোগ করিতে হইয়াছে। এই দুর্ভোগ সব চেয়ে বেশী ভূগিতে হইয়াছে বাংলার অধিবাসীদের, কারণ বাংলায় এ বৎসরের প্রথম দিকে বৎসরে মাত্র ১০ গজ হিসাবে কাপড় বরাদ্দ হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরেও ভারত হইতে খাদ্য এবং বস্ত্র রপ্তানী বন্ধ হয় নাই। মাদ্রাগারী চেয়ার অফ কমার্সের সভাপতি মিঃ থেমকার এক বিবৃতিতে প্রকাশ ১৯৪৫ সালের ১লা অক্টোবর হইতে ২৫শে অক্টোবর মাত্র এই ২৫ দিনে একমাত্র কলিকাতা বন্দর হইতে ২১ হাজার টন চাউল বাণিবে রপ্তানী হইয়াছে। বস্ত্রের জন্য এই বৎসর ভারতবাসী যে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে—কর্তৃপক্ষ একটু সাবধান হইলে তাহা বহুলাংশে এড়ান বাইত। সম্প্রতি টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাজ শ্বাকারসে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ১৯৪৫ সালে ভারতে মোট ৪৬৮ কোটি ৭০ লক্ষ গজ কাপড় ও ১৬২ কোটি ৫০ লক্ষ গজ সুতা উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহা হইতে সৈন্য বিভাগের জন্য ৪১ কোটি ৭০ লক্ষ গজ কাপড় এবং ২ কোটি ৫০ লক্ষ গজ সুতা সংরক্ষিত করিতে হইয়াছে। ইহা ছাড়া ১৯৪৫ সালে ভারত হইতে ৩৮ কোটি ৭০ লক্ষ গজ কাপড় ও ১ কোটি ৩০ লক্ষ গজ সুতা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। বলা নিপ্রয়োজন, লুকাইয়া ভারত হইতে ব্রহ্মদেশে, সিংহলে, তিব্বতে ও চীনে যে কাপড় রপ্তানী হইয়াছে তাহা এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই। এই ভাবে রপ্তানী না হইলে এবং বিদেশী সৈন্যদের জন্য বিদেশ হইতে কাপড় আনাইবার ব্যয়সাধ্য করিলে ভারতের অসামরিক জনসাধারণকে যে এক বৎসর অধিক উন্নত অবস্থার দিন কাটাইতে হইত না, তাহা বলাই বাহুল্য। বৎসরের শেষেই রেশন এলাকার রেশন

প্রচলিত হওয়ার কিছু লোক অপেক্ষাকৃত কমদামে সামান্য পরিমাণ কাপড় পাইয়াছে এবং মিলজাত বস্ত্র এই ভাবে বিলি হওয়ার জন্য তাঁতের কাপড়ের দামও এইসব অঞ্চলে কিছু কমিয়াছে।

মাত্র দুই বৎসর আগে মহামহন্তেরে ভারতে প্রায় অর্ধকোটি নরনারী জীবন বিসর্জন দিয়াছিল। এই হত্যাক্রমের জন্য মানুষের অকর্মণ্যতা, লোভ ও নির্ধুরতা যে পরিমাণে দায়ী, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ততটা নহে। ত্রিভুজবাসানে গ্রেগরী কমিটি ও হত্যাক্রম তদন্ত কমিশন ভবিষ্যতে হত্যাক্রম প্রতিরোধ সম্বন্ধে ভারত সরকারকে বহু মূল্যবান উপদেশ দিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় কর্তৃপক্ষ এইসব উপদেশ অনুসারে কাজ না করায় ১৩৫২ সালেই আবার ভারতের খাদ্যপরিস্থিতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ভারত সরকার অবশ্য প্রথম আটমাস এই খাদ্যাভাবের কথা লুকাইতেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু পোষ মাসের মাঝামাঝি সময় হইতে সরকারও খোলাখুলিভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে শীঘ্রই ভারতে দারুণ খাদ্যসঙ্কট দেখা যাইবে। গ্রেগরী কমিটি ভারত সরকারকে হত্যাক্রম প্রতিরোধার্থে অন্ততঃ পক্ষে ১৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সর্বদা মজুত করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন, ভারতসরকার কিন্তু ১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক লক্ষ টনের বেশী খাদ্যশস্য মজুত রাখিতে পারেন নাই। সরকারী হিসাবে ভারতে এবার মোট অভাব হইবে ৬০ লক্ষ টন খাদ্যের। পৃথিবীর অধিকাংশ উদ্ধৃত খাদ্য এখন সম্মিলিত খাদ্যবোর্ডের হাতে। ভারত হইতে স্যার রামস্বামী মুদালিয়রের নেতৃত্বে একটি খাদ্যাংশন সম্প্রতি সম্মিলিত খাদ্যবোর্ডের নিকট সাক্ষাৎ প্রার্থনার ওয়াশিংটন গিয়াছিলেন। সম্মিলিত খাদ্যবোর্ড মহাহুভূতির সহিত ভারতের আবেদন শুনিয়াছেন বটে, কিন্তু ১৯৪৬ সালের প্রথম ছত্রমাসে ২০ লক্ষ টন ও শেষ

ছয় মাসে ২০ লক্ষ টন খাদ্য সাহায্য না করিলে ভারতের হত্যাক্রম দোড় কোটি লোককে বাঁচান যাইবে না জানিয়াও খাদ্যবোর্ড ভারতের জন্য ১৯৪৬ সালের প্রথম ছয় মাসের জন্য ১৪ লক্ষ টন গম ও ভুট্টা এবং ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টন চাউল বরাদ্দ করিয়াছেন। ১৯৪৬ সালের শেষ ছয় মাসে কত চাউল বরাদ্দ করা হইবে তাহা আগামী ২০শে মে আন্তর্জাতিক খাদ্যসম্মেলনে স্থির হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। সম্মিলিত খাদ্যবোর্ড ছাড়া ভারতবর্ষ পৃথকভাবে শ্যাম, রাশিয়া প্রভৃতি উদ্বৃত্ত দেশ হইতে কিছু খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছে। এই সঙ্গে ভারত সরকার ভারতের রেশন অঞ্চলে মাথাপিছু দৈনিক খাদ্য বরাদ্দ ১৬ আউন্স হইতে ১২ আউন্স নামাইয়া দিয়াছেন এবং অপচয় বন্ধের জন্য অনেক স্থানে অতিথি-নিয়ন্ত্রণ আদেশও চালু করিয়াছেন। বড়সাঁট ভারতের খাদ্য সঙ্কটের সমাধানকল্পে মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিন্নার সহযোগিতায় একটি খাদ্যবোর্ড গঠনেরও প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তবে বর্তমান আমলাতান্ত্রিক সরকারের সহিত কাজ করিলে স্বাধীনভাবে দেশসেবার সুযোগ পাওয়া যাইবে না বলিয়া গান্ধীজী বড় লাঠের প্রস্তাবে রাজী হন নাই এবং ফলে খাদ্যবোর্ড গঠিত হয় নাই। অবশ্য গান্ধীজী এবং মিঃ জিন্না উভয়েই জনসাধারণকে এবার খাদ্যের ব্যাপারে গভর্ণমেন্টের সহিত অকারণে অসহযোগিতা করিতে নিবেদন করিয়াছেন। মহাত্মাজী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি খাদ্যসঙ্কট সমাধানের জন্য বথাক্রমে ৮ গফা ও ১৫ দফা পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতসরকার এই পরিকল্পনা অনুসরণ করিলে যথেষ্ট কাজ হইবে।

যুদ্ধের সময় ভারতে শিল্পপ্রসারের সুবর্ণ সুযোগ ছিল; কিন্তু ভারত সরকারের ওদাসীনে সেই সুযোগ সার্থক হয়

নাই। ভারতের শিল্পপ্রসারে ব্রিটিশ ও মার্কিন সহযোগিতা লাভের আশায় ১৯৪৫ সালের ২ই মে ভারত হইতে মিঃ টাটা, মিঃ বিড়লা, মিঃ এন আর সরকার প্রমুখ ২ জন শিল্পপতি ইংলণ্ড ও আমেরিকা সফরে যাত্রা করেন। ভারতের বাজারে কার্বেসী স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার ভয়ে ব্রিটিশ ও মার্কিন শিল্পপতিগণ অবশ্য এই ভারতীয় শিল্পনির্মানকে যেমন কোন সাধ্যায়ের প্রতিশ্রুতি দেন নাই। তবে এই শিল্পের প্রত্যাঘর্ষনে পর মিঃ বিড়লা বিখ্যাত বিনাতী শিল্পনায়ক লর্ড হুাক্সলের সহযোগিতায় “হিন্দুহান মোটরস্” নামে ভারতে প্রথম মোটর গাড়ীর কারখানা খুলিয়াছেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে রেলওয়ে বাজেট উপস্থিত করিবার সময় যানবাহনসচিব স্যার এডওয়ার্ড বেঙ্কল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদকে জানাইয়াছেন যে, ভারতে রেল ইঞ্জিন ও গুয়াগন তৈয়ারীর কারখানা নির্মাণ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

১৩৫২ সালের পৌষ মাসে ভারতবর্ষ ব্রেটন উড্‌স চুক্তিপত্রে (আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার সম্পর্কিত চুক্তিপত্রে) স্বাক্ষর করিয়াছে। তবে এই স্বাক্ষরদান ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সম্মতিক্রমে হয় নাই; গত ২৪শে ডিসেম্বর বড়লাট এক অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিবার অধিকার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং তাঁহারই নির্দেশক্রমে গত ২৭শে ডিসেম্বর আমেরিকান ভারতীয় এজেন্ট জেনারেল স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরদানের ফলে ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক তহবিল হইতে ঋণলাভের অধিকারী হইয়াছে। কিন্তু ভারতের বর্তমান সমস্যা ঋণলাভ নয়, ব্রিটেনের নিকট পাওনা ১৮ শত কোটি টাকা কিরিয়া পাওনাই এখন তাহার প্রধান সমস্যা। এই টাকা আদায় সম্বন্ধে ১৩৫২ সালে ভারতে আন্দোলন বড় কম হয়

নাই, কিন্তু ভারত সরকার এখনও এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীরব রহিয়াছেন। যুদ্ধের সময় বৃহৎ ভারতের মুখের গ্রাম হইতে ব্রিটেনকে মাল জোগাইয়া বে ষ্টার্লিং পাওনার পাহাড় জমিয়া উঠিয়াছে, ব্রেটন উড্‌স চুক্তিপত্র তাহার হিসাব মিটানো সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করে নাই। ষ্টার্লিং পাওনার সহিত নিঃসম্পর্কিত ব্রেটন উড্‌স চুক্তিতে স্বাক্ষরদান ভারতের পক্ষে কন্যাণকর বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। এই সব বিবেচনায় এবং বিশেষ করিয়া চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরদানের সময় ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সম্মতি লওয়া হয় নাই বলিয়া কেন্দ্রীয় পরিষদ ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছে এবং চুক্তি মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছে।

ভারতে মুদ্রাস্ফীতি এখনও সমানতালে চলিতেছে। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১০৮ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা, ১৯৪৬ সালের ৫ই এপ্রিল ইহা ১২৩১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ১ বৎসরে বর্ধাক্রমে ৯৮ কোটি ও ৭২ কোটি টাকা বাড়িয়া গত ২২শে মার্চ ৭০৪ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা ও ২২৬ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। বাজারের উপর এই মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব অন্ততঃ কতকটা কমাইবার জন্য ট্যাক্স প্রদেয় সমস্ত টাকার সন্ধান করিতে ভারত সরকার গত ১২ই জানুয়ারী নোট সম্পর্কিত এক অর্ডিন্যান্স জারি করেন। এই অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ৫ শত ও তদূর্ধ্ব টাকার সমস্ত নোটের প্রচলন বাজারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যবস্থার আনুসঙ্গিক শাস্তির ভয়ে অনেক চোরা কারবারী (কোন কোন ক্ষেত্রে অকারণ ভীতিগ্রস্ত জনসাধারণও) ঘর হইতে নোট বাহির করিতে সাহস

করে নাই। এই নোট অর্ডিন্যান্স জারীর সঙ্গে সঙ্গে সোনার দর ভারতের বাজারে ৭৫ টাকা হইতে প্রতিভরি ১০০ শত টাকায় উঠিয়া গিয়াছে। এখন পর্যন্ত সোনার মূল্য বিশেষ কমে নাই। এবারের বাজেটে প্রতিভরি সোনার ২৫ টাকা হারে শুধু নির্ধারণও এই বৃদ্ধিত মূল্য সংরক্ষিত হইবার অন্যতম কারণ। বাজেটে এবৎসর অতিরিক্ত মুনাফার বাতিল হইয়াছে, অথচ সেই সঙ্গে শিল্প বাণিজ্য প্রসারের উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবস্থা হয় নাই; কাজেই বাড়তি টাকা শিল্পপতিগণ ও ব্যবসাদারেরা শেয়ার অথবা সোনার বাজারে খাটাইতে সহজেই উৎসুক হইবেন। ইহাও শেয়ার ও সোনার বাজারের তেজীভাবের কারণ মনে হইবে। টাকা লম্বীর অপ্রবিশেষ জন্য ব্যাঙ্কের সুদের হার এত কমিয়া গিয়াছে যে, ব্যাঙ্কে টাকা ফেলিয়া রাখিতে অর্থবান লোকদের কুণ্ঠিত হওয়া স্বাভাবিক। তবু রক্ষণশীল লোকেরা নিরাপত্তার জন্য ব্যাঙ্কের আশ্রয় হওয়ার ব্যাকপ্লির আশানতের পরিমাণও প্রভূত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আগেই বলা হইয়াছে, সামরিক ব্যয় বাহ্যিক ও মস্তব্য আর হ্রাসের অভূহাতে এবারের যুদ্ধোত্তর প্রথম বাজেটেও এদেশে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কর্তব্য ভারতসরকার উদাসীনা দেখাইয়াছেন। তবে উপস্থিত কর্তব্য পালন করিতে না পারিলেও ভারত

সরকার ১৩৫২ সালে একটি যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে আগামী পাঁচ বৎসরে ভারতসরকার কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য ১ হাজার কোটি টাকা, সার্জেন্ট কীম অনুসারে শিক্ষার জন্য ২৭৭ কোটি টাকা, রাস্তাঘাট সম্প্রসারণের জন্য ৪৫০ কোটি টাকা ও রেলপথের উন্নতির জন্য ৩১৯ কোটি টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অবশ্য ভারতের ন্যায় প্রভূত সম্ভাবনাময় দেশে কৃষি ও শিল্পের জন্য পাঁচ বৎসরে এক হাজার কোটি টাকা ব্যয় কিছুই নয়, তবু ভারত সরকার যে এই অবশ্য কর্তব্য স্বীকার করিয়াছেন ইহা আমরা শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে করি। তবে এবার যুদ্ধোত্তর বাজেটেও ভারত সরকার অসামরিক দেশবাসীর স্বার্থ সম্পর্কিত সাধারণ কার্যসমূহেও যেভাবে অবহেলা করিয়াছেন তাহাতে যুদ্ধোত্তর কোন ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তাঁহারা যে যথা সম্ভব কার্যকরী করিবেন, এরূপ আশা করিতে আমাদের স্বতঃই সন্দেহ হয়। বলা নিশ্চয়োক্তন আমাদের এই মন্তব্য বর্তমান ভারতসরকার সম্বন্ধে। মন্ত্রীমণ্ডলের সাক্ষ্যে ভারতে যদি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ভারতে যে সুযোগ সম্ভাবনা আছে, তাহারা অতি অল্পকালের মধ্যেই ভারতকে প্রথম শ্রেণীর আর্থিক শক্তিতে পরিণত করা যাইবে বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

বিবেকানন্দ

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্তী বিদ্যাবিনোদ

সুদূর শতাব্দী আগে সভ্যতার ঘন তমসার,
যখন ভারতবর্ষ ধারে ধীরে অধঃপাতে যায়;
পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে অভিভূত হয়ে জনগণ
আত্মবিশ্বাসের পথে ধরে তাঁরা করে বিচরণ;
জাতীয় আদর্শ ভঙ্গ—বিপর্যস্ত ধর্ম সনাতন,
নাস্তিকতা, অবিশ্বাস, ভোগবুদ্ধি উদয় যখন;
সেই যুগ সন্ধিক্ষণে—আসন্ন সে সঙ্কট সময়
ভারতে ভগৎগুরু রামকৃষ্ণ হইলা উদয়!
চকুতি বিনাশ করে সাধুদের করিতে উদ্ধার,
যুগে যুগে পরমাত্মা দেখা দেন হ'য়ে অবতার!
তোমনি সে বিপ্লবের যুগে তাঁর হ'ল অভ্যুদয়,
রামকৃষ্ণ রূপে তিনি আসিলেন হইয়া সদয়!
তাঁর সাথে দেখা দিলা কত কত লীলা সহচর,
নরেন্দ্র—তাঁদের মাঝে নীলশ্রেষ্ঠ সাধক প্রবর।
চিন্তে তাঁর ছিল সত্যসন্ধানের প্রবল সংস্কার,
অধীর অস্থির ভাবে কেটে যেত দিনগুলি তাঁর।
কি দারুণ উৎকর্ষায় সত্য শিব সূন্দরের তরে,
যাপিতে ন দিবা নিশা উছলিত অশান্ত অন্তরে।
অদৃশ্য শক্তির এক অলঙ্কিত শাস্ত্র বিধান,
অবশেষে দিল তাঁরে সুহৃৎ সত্যের সন্ধান।
রামকৃষ্ণ কৃপাবশে হয় তাঁর ত্বা নিবারণ,
সত্যের সন্ধান মিলে, বিবেকের হয় উদ্বোধন!
লভি' মহা দিব্যজ্ঞান পরশনে নরেন্দ্রে তাঁহার,
করিলেন অভিযান সেবাধর্ম করিতে প্রচার

বিবেকানন্দের রূপে, দিকে দিকে গাহি মুক্তি গান
—শুনায় বেদান্ত বাণী কাগারে তুলিতে মৃতপ্রাণ!
জ্ঞানময়ী বাণী তাঁর—বরুণী, শরণ্য, তক্ষর;
অমর সে কর্মধো'গী মুক্তকণ্ঠে গাহি তাঁর জয়।
স্বামীজি বিবেকানন্দ! মহাপ্রাণ! স্বরণে তোমা
জ্ঞেয়ে ওঠে আত্মশক্তি—চেতনার হয় যে সঞ্চার!
বেদান্তের শিক্ষা তুমি ছড়াইয়া দিলে বিশ্বময়,
প্রতীচীরে শুনাইলে সত্যবাণী হইয়া নির্ভয়।
সেবা ধর্ম, জীবে প্রেম করিয়া গগন প্রঃসূতন,
কর্ম-যোগি! তুমি যে গো ভারতের অপূর্ব বতন
'বহুরূপে সম্মুখে তোমার'—তব এই মহামূল্য বাণী,
এমন সরল ভাবে কে পারে কহিতে নাহি জানি!
জীবে প্রেম করিলে যে ঈশ্বরের সেবা করা হয়,
চমকি' শুনিব বিশ্ব তব সেই বাণী পূণ্যময়।
হিন্দু মিশনের ত সেবাধর্ম সব প্রতিষ্ঠান,
সে বাণী মানিয়া কত দুর্গতেরে করিতেছে ত্রাণ!
লোকোত্তর শক্তি বলে যোগীবর! করিলে গমন,
পশ্চিম সাগর তীরে প্রচারিতে ধর্ম সনাতন।
শুনিলো তোমার বাণী চিকাগোর ধর্মের সভায়,
যুদ্ধ জনগণ সবে পরাইল ত.মার গলায়
বিজয় গোরব মালা; জয়টীকা আঁকিল ললাটে;
ভোগাসক্ত জনগণ গাহে তব জয় পথে ঘাটে!
মহান্ চরিত্র তব করে স্পর্শ চিত্ত সবার,
কত নর কত নারী লুপ্তহীন চরণে তোমার।

অগ্রিমর তব কৰ্ম প্রেরণার আলোকিক বলে,
অনায়াসে নিবেদিতা তব রাজ্য চরণ কমলে
নিবেদিতা আগনারে। হেদি এই লীলা অভিনব
বিস্মিত বিশ্বের মাঝে ওঠে তব জয় জয় রব!
করুণা সাগর তুমি হে বিরাট পুরুষ প্রধান,
দরিদ্র বে নারায়ণ মর্মে তব পেরেছিল স্থান।
মেথালে বেলুড়মঠে কৰ্মের বখার্ত পরিচয়,
স্বরণে তোমার কথা শ্রীচরণে মাখা নত হয়।

তব মহাক্রান্ত ছিল অগতির সাধিতে কল্যাণ,
জীবে প্রেম, ত্যাগ, সেবা, নিরন্তর মুখে অন্নদান।
বিরাট প্রতিভা তব—ছিলে তুমি সর্বগুণাশ্রয়
মহান জীবন তব লোকহিতে ছিল কৰ্ম্মর।
জীবন আদর্শ তব এ দেশেতে হোক বরণীয়,
পবিত্র কাহিনী তব ঘরে ঘরে হোক স্মরণীয়।
স্বামোজি বিবেকানন্দ! মহাপ্রাণ স্বরণে তোমার
শ্রদ্ধার আনত শিরে আজি তোমা নমি' বারবার।

• রঙ্গপুর আনন্দময়ী সেবাশ্রমে বিবেকানন্দ স্মৃতিসভায় পঠিত।

নদীর ধারে ভোর

শ্রীঅমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শেষ রাতে নদীর ধার যেন শান্ত জলের একটা বিশাল
বিস্তৃতি হয়ে ওঠে। বাজে শব্দ আর চীৎকার একেবারে
ভূবে যায়, যেন শতাব্দী শেষে সমুদ্র হয়ে গেছে তুঁতের
ক্ষেত। কেবল থাকে নদীর শব্দ তীর চাপড়ানোর জন্য।
এই কপিক থামা, কপিক শোনা আওয়ার যেন অসীম
শূন্যে আঘাত করবার জন্য উত্তেজিত হয়ে উঠেছে; বলে
চলেছে তার অনন্তকালের স্বপ্নত ভাষা।

নদীর ধারে রাস্তাটা চলে অন্তহীন তার আয়নার
চেয়েও সমান আর মসৃণ পিঠ নিয়ে। ফাঁকা আকাশ
আর চওড়া মাটির মতই সেটা বিরাট আর রিক্ত।
কাটম-হাউসের মাথার উপরের ছড়িটা আকাশের গায়ে
কেন কল্যাণে সন্ধ্যা ওঠা চায়। যেটির ধারে গাছাঝাওয়া

রাত্রির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, দেখে ধারে বঁধী
নৌকাগুলো চেউয়ের সঙ্গে দুলছে; দেখে মাঝ নদীতে
নঙ্গর করা বুক জাহাজের তীর আলো জলে পড়ে চোখ
ঝলসানো সোনার তালে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু কারকিউ অর্ডারের সময় পার হলেই আবার সব
চলন্ত হয়ে উঠবে।

গলির ভিতরে নাচঘর বন্ধ হয়ে যায়। বিদেশী
একদল নৌ সেনার সাথে কয়েকজন নর্তকী প্রথমে বড়
রাস্তায় বেরিয়ে আসে। ওরা নিশ্চকে হেঁটে চলে কিন্তু
নৌ সেনারা তখনও হৈ হৈ করে গান করছে "টী লা
লা, লা।" গলিঘুঁজির পিছন থেকে বেরিয়ে আসে
কেশরাস্তা, ক্রেদাস্তা, বিধাধিনীর দল, তাদের শেষ

খরিদারের আশায়। এরা ওই চাকামুখো এক্সেটের
মজ্জি উপনিবেশিক সহরের বিশিষ্ট উপানান আর এরা
আদর পায় ওই রক্তচক্ষু, কটাচুলো বিদেশী গোরাদের
হাতেই।

আর একদল লোক এই হিমভোরের হুয়াংপুকে
(নদী) অভ্যর্থনা জানায়। তাদের মধ্যে কেউ বাঁশের
চুপড়ি, কেউ চটের থলে, কেউ বা বাক ঘাড়ে পূবমুখো
হেঁটে চলেছে; কেউ এদিকে, কেউ বা ওদিক দিয়ে।
এরা সব কিরিওয়ালা; প্রাণপ্রবাহের একেবারে নীচে
এদের আবর্তন। সহরের যে সব কোণে আমাদের পা
কখনও পড়ে না সেখান থেকে আসে এরা। এক
ভুলগায় জটিলার পর এরা ছুটে চলে নদীর পারে সজীর
হাটে। চড়া নামে কেনে বহু হাত ফেরতা মূলো আর
সজী, তারপর সহরে বাবুদের কাছে সেটা সিকি পরমা
লাভে বিক্রীর অপেক্ষায় আশা কোরে বসে থাকে।

উল্টো দিকে দূরে দেখা যায় একটা বৃহৎ কম্পমান
কালো বিন্দুর রেখা, সঙ্গে শোনা যায় একটা কাঁপা
আওয়াজ। ক্রমে কাছে এসে দেখা যায় একদল চাবুড়ে
মাহুব, সঙ্গে ছোট বড় একপাল গোক। কাঁধের পুঁটুনি
আর বিছানা দেখলেই বোঝা যায় এরা বহুদূরের পথিক।
হু হু তো ওদের ভুরুতে এখনও লেগে আছে বিভূঁইএর
বাতাস আর কুয়াসার রং হয় তো ওরা ভাবছে ওদের

ঘরের কথা, রডীন দীপ্তি ওদের চোখ হয় তো এখনও
ধিরে আছে। কংক্রীটের বাড়িগুলোর সামনে দিয়ে ওরা
হেঁটে চলে, কাদা ছোটানো পারে, আশাহীন—বিরামহীন।
কেউ জানে না ওরা কোথা থেকে আসছে, কেউ জানে না
তাগ্য ওদের কি ভাবে সংবর্ধনা করবে। তবে একই
উদ্দেশ্য নিয়ে এরা নিজেদের শৈশবের মাটি থেকে উপড়ে
এনে দিগন্তের পানে এগিয়ে চলেছে; অধীন এলাকার
আগুন আর মৃত্যু। গোকগুলো শান্বীধানো রাস্তা
মাড়াতে অভ্যস্ত নয়, ওদের কষ্টের ডাক নদীর ধারের
শান্ত বাতাসে আঘাত করে, সে শব্দতরঙ্গের কম্পন তীক্ষ্ণ
করে কানে লাগে, যেন এখনই ওরা অবাইধানার ছায়া
দেখতে পেয়েছে।

কয়েকটা মানগাড়ি আর সজী-চালানো গাড়ি ক্রমে
দেখা দেয়। স্থির নদীর ধার অস্থির মাহুকের চলন্ত
ছায়ার ভরে ওঠে। নদীতে ভোরের রোদের একটা
ঝলক জলে। নিশাচররা এতক্ষণ যে ঘর বিছানার
ওয়ে পড়েছে। সহরের সব লোক এখন স্বপ্নালু।

এই চক্ষে সাংহায়ে একটি দিনের ত্রাঙ্কমুহূর্ত। এই
'সুন্দরী ঘোপের' মনের কোণের বথার্থ উন্মোচন।*

*মূল চীনা হইতে অনূদিত।

গান

শ্রীহিমাদ্রি ভট্টাচার্য্য

ঘন প্রাণ রতনী ॥

বারিষ স্বরণ, বর বর বর—

বর্ষা আকুল ধরনী ॥

ভেজা-হাওয়া শন্ শন্ বাহিরে বহে ;

মোর পরাণ ওড়ে তার ক্লাস্ত প্রবাহে—

অজানা হৃদয়—

পাঠায় যে স্বর,

তাঁহে আবাহন ধ্বনি ॥

বনের মাঝারে কাঁধে ভেঁজা পাতা।

মোর কাছে তাহার কান্দন—

বয়ে আনে যেন এক অজানা বারতা।

মেঘ-মেহুর ধম্ ধম্ শুক আকাশ,

কহে বাহিরে শুধু সেই সিক্ত বাতাস ;

(তার) স্মরণোত্তে হার

ভেসে যেতে চায়,

মোর পরাণ তরঙ্গী ॥

উপনদী

(পূর্বসূচী)

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য

উদ্ভেকসনে রোতিমত সূর্য্যন ঘটিয়াছে দেখা বাইতেছে।
পালসের বিটি খানিকটা স্বাভাবিকতার মাঝে ফিরিয়া
আসিয়াছে।

মৃদুলা চোখ মেলিল।

অশোক কোমল কণ্ঠে কহিল—ভালো বোধ করছে
তো? মৃদুলা ইঙ্গিত প্রকাশ করিল—বুকে ভীষণ
বম্বা হচ্ছে। অশোক টেবিস্কোপ দিয়া হার্ট পরীক্ষা
করিল। তারপর গম্বুজের সঙ্গে খানিকটা ভাইনাম
গালিসিয়া খাওয়াইয়া দিল।

কিশোরী বাবুকে লক্ষ্য করিয়া অশোক কহিল—
আপনি শুয়ে পড়ুনগে; মৃদুলায় অবস্থা এখন বেশ
স্বাভাবিক। আজকে আর কোন পরিবর্তন ঘটবে না।
আমি আর কিছুক্ষণ থাকছি। মৃদুলায় মা এবং আমি
এখানে আছি।

খুসী মনে কিশোরী বাবু চলিয়া গেলেন। দুর্ভাবনায়
আধিক্যে তিনি অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন!
অশোকের কথায় তিনি শান্ত হইলেন।

মৃদুলায় মা অশোকের হাত জড়াইয়া ধরিয়া
কহিলেন—তোমাকে আর কো বলবো বাবা? আমার
এই একটি মাত্র মেয়ে।

অশোক তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহিল—আপনাকে
কিছুই বলতে হবে না। আপনি বস্তু এখানে নিশ্চিন্ত
মনে শুয়ে পড়ুন।

নিশ্চয় বরখানি ক্রমশঃ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতে
লাগিল। মৃদুলায় মাও পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছেন;
মনে তাঁহার নিশ্চিন্ততার ভাব।

মৃদুলায় রোগবন্ত্রণা প্রশমিত হইয়াছে। আধ নিবীলিত
চক্ষে মাঝে মাঝে সে অশোককে দেখিতেছিল;
দেখিতেছিল তরুণ অশোক ডাক্তার কী দৃঢ়তার সহিত
তাহাকে সারাইয়া তুলিতেছে। শুধু মায় ডাক্তারী ঔষধ
দিয়া নয়—অমুরাপের একাগ্রতা ও কত নিবিড়তার
মাঝে তাহার চোখে মুখে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইতেছে।

রোগশয্যায় শুইয়া নিবস্তুর অমুহূতার মাঝে মৃদুলা
হঠাৎ অনুভব করিতে লাগিল—রোমাঞ্চকর জীবনকে।
এ জীবনের সঙ্গে ইতিপূর্বে তাহার পরিচয় ঘটে নাই।
রাত্রির নিবিড়তার ঐশ্বর্য্যের ডালি লইয়া স্বর্গ আজ
অস্বাচিত ভাবে মর্তের পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছে।
ভালো লাগিতেছে—অত্যন্ত ভালো লাগিতেছে তাহার
রাত্রির এই মূহূর্ত। এত সৌখিন, এত সুখ, জীবনে
কোনদিন সে উপভোগ করে নাই। মৃত্যুর কালো গুহা
হইতে যে পুরুষটি তাহার জীবনকে আলোকিত পথে
টানিয়া আনিতেছে সে একজন শুধুমাত্র পেশাদার
ডাক্তার নয়। কয়েকটি টাকা ভিজিটের বিনিময়ে অশোক
যে এখানে শুধু আসে না—তাহা উপলব্ধি করিতে পারিল

বৈশাখ ১৩৫৩

উপনয়নী

৩৭

আজ যুহলা। খুশীর আমেজমেন তাইহ তার হৃদয় উঠিতেছে।

ঘড়িতে একটা বাজে।

অশোক সচকিত হইয়া উঠিল। বুদ্ধির শাসন তাহাকে চোখ রাঙ্গাইতেছে। শুধু কী কর্তব্যের খাতিরেই এত রাত্রি পর্যন্ত সে এখানে বসিয়া আছে? হাতখানি কখন না জানি তাহার অলক্ষ্যে যুহলার করতল স্পর্শ করিয়াছে—সেখানে ধমনীর উষ্ণ রক্ত স্রোত বহিতেছে। অশোক তাহার হাতখানি সরাইয়া লইতে চাহিলে যুহলা দৃঢ়তার সহিত তাহা চাপিয়া ধরিল।

অশোকের বাহুধর কাঁপিয়া উঠিল। প্রথম ইন্ডেকশন দিবার সময় যুহলার বাহুধর যেমন কাঁপিয়া ছিল—অশোক ডাক্তারের দৃঢ় বাহুধরও আজ তেমনই দুর্বলতার কাঁপিতে লাগিল। দস্তুরমত ঘাবড়াইয়া গেল সে। এ কিসের সন্দেহ? জীবনে এ কোন হুর্ন্যতিক সে প্রশ্ন দিতেছে? কিন্তু নিজেকে সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। বুদ্ধি, যুক্তি, বিবেকের অহুশাসন, দৃঢ়তা—সমস্ত কিছুই মন হইতে তাহার সরিয়া গেল। ক্ষণিক দুর্বলতার মোহে সে যুহলার হাতখানি মুঠিবদ্ধ করিয়া লইল। কতক্ষণ এমনভাবে কাটিয়াছে—তাহা সে জানে না। তবুও বেহিসাবী নীরব মুহূর্তগুলি সমস্ত হৃদয়কে তাহার অহুরঞ্জিত করিয়া রাখিল।

হঠাৎ সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। যুহলার মারও কিছুটা তন্দ্রা আসিয়াছিল হ্রস্বত। অশোকের কর্তব্যেরে তিনি জাগিয়া উঠিলেন। যুহলা তখন নিদ্রার তীন করিয়া পড়িয়া আছে।

অশোক কহিল—যুহলা এখন ঘুমাচ্ছে। আর কোন ভয়ের কারণ নেই। কাল আমি ওষুধ পত্রের

ব্যবস্থা করে দেবো। আচ্ছা, তা হ'লে চলুন মাসিমা।

অশোকের কণ্ঠে আত্মীয়তার সম্বোধন শুনিয়া যুহলার মা পুলকিতা হইলেন। কিশোরী বাবু কোন নিষেধ শুনিলেন না—এত রাত্রে অশোককে তিনি কিছুতেই একলা ফিরিতে দিবেন না। অশোকের গৃহদ্বার পর্যন্ত তিনি আগিয়া তাহাকে পৌছাইয়া দিয়া গেলেন। বাড়ি ফিরিয়া অশোকের প্রচুর অমুশোচনা জাগিল। দুর্বল হৃদয়বৃত্তি তাহার আত্মিক অপরিণত মনের রঙিন করনার মাসিয়া ওঠে! জীবনে সে আদর্শের পূজারী! সে আদর্শ হইতেছে তাহার স্বাতন্ত্র্যবাদ। তাহার শিক্ষা, নীতি, ত্যাগ, সংঘম এবং সমাজ-সচেতন মন তাহাকে সমাজের এবং দেশের সেবকরূপে গড়িয়া তুলিবে।

যে দেশ পরাধীন, দুর্ভিক্ষপীড়িত—সেখানে প্রেমের কুঞ্জন গাহিয়া দিনাতিপাত করা অপরাধ। শুধু অপরাধ নয় চরম নীতিহীনতা। এ নীতিহীনতাকে সে কিছুতেই প্রশ্রয় দিবে না। দুর্বলতাকে সে পরিহার করিবেই। অককার রাত্রে নিদ্রাহীনতার মাঝে অশোক পুনরায় দেখিল :—অসংখ্য ছায়ার ককাল। ছায়ার ককালেরা সমষ্টিবদ্ধভাবে তাহার দরজার আঘাত হানিতেছে। বিশীর্ণ দেহ, ক্ষুধাকাতর দৃষ্টি, অসহায়তার বোকা লইয়া তাহার তাহার কাছে আবেদন জানাইতেছে, মিনতি জানাইতেছে—ডাক্তার বাবু বাঁচাও, আমাদের বাঁচাও!

পরাধীন ভারতের মুখু জনসমাজ তাহার—ক্ষুধার কাতর, শিক্ষার অন্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া নিরন্তর যত্ন করাল গ্রাসে পতিত হইতেছে। অশোক মন হইতে

তাঁহাদের ছবি মুছিয়া ফেলিতে পারিল না—তাঁহারা তাঁহার দেশ, তাঁহারা তাঁহার সমাজ, তাঁহারা তাঁহার জাতি! অশোক উঠিয়া বসিল—সে কী ইহাদের জন্য কিছুই করিতে পারে না?

কিছুদিন হইতে সুলেখা তাঁহার মনকে দৃঢ়তার বাঁধিয়া লইতেছিল। অশোকের প্রতি তাঁহার দুর্বলতা ক্রমশঃ বর্ধিত হইতেছে। সুলেখাকে এখন সে স্রীকরে। অশোক না আসিলে অস্বস্তিতে মন তাঁহার ভরিয়া ওঠে।

সুলেখার কাছে আর কোন অস্পষ্টতার আবরণ নাই—অশোককে সে ভালবাসিয়াছে। পঁয়ত্রিশ বছরের নারী-জীবন তাঁহার জীবন-সুখের কাতরতা প্রকাশ করিতেছে। এই কয়েকটি দিনের মেলামেশার অশোক তাঁহার সমস্ত অন্তরকে জয় করিয়া লইয়াছে। কিন্তু এ ভালোবাসার পরিণতি কোথায়? সে কথা ভাবিতে গিয়া রাত্রে অকস্মাতে সুলেখার দুই চক্ষে অশ্রু বনাইয়া আসিয়াছে। তাঁহার ব্যর্থ নারী জীবনে এ আশা যে একান্তই দুঃখ। আর অশোক তাঁহার ছোট ভাইয়ের বন্ধু; শুধু তাহাই নয় বরষেও সে তাঁহার অপেক্ষা ছোট। জীবনে তাঁহার আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে—ভবিষ্যৎকে সে সোনালী স্বপ্নে গড়িয়া তুলিবে—সুলেখা তাঁহার পাশে কী ঐশ্বর্য লইয়া দাঁড়াইতে পারে? সুলেখা তাহাকে কী দিতে পারে? পূর্বের দিন হইলে সুলেখার মনে সংস্কারের বিধা জাগিত না, বিচার করিয়া যেখানকার অবকাশ ঘটিত না। নদী তাঁহার আপন জোয়ারের মাঝে যেমন সব কিছু পরিমার্জিত করিয়া দেয়—তেমনি শুধু নদীর উচ্চারণ—

ভালোবাসার আবেগবন্যার অশোককে লইয়া সে শুধু ভাসিয়া যাইত।

কিন্তু সে নদী মজিয়া আসিয়াছে।

সুলেখার মনে তাই শুধু বিষমতা জাগে—জীবনে তাঁহার দিবার মতন আর কোন ঐশ্বর্য নাই।

সুলেখা নিজেকে শক্ত করিয়া লইতেছিল। তাঁহার নারীজীবন ব্যর্থ হইলেও কোন পুরুষের কাছে সে কখনও পরাভব স্বীকার করে নাই।

হঠাৎ সে প্রদোষদার সন্ধান পাইল। অগাধ সমুদ্রগর্ভে উত্তাল তরঙ্গাঘাতে মন যখন তাঁহার অবিরাম হাবুডুবু খাইতেছিল ঠিক সেই সময় প্রদোষদাকে অবলম্বন করিয়া সে তীরে উঠিবার প্রচেষ্টায় আকুল হইয়া উঠিল। তরঙ্গের মাঝে তীরের সন্ধান সে পাইয়াছে।

জীবনে তাঁহার রাজনৈতিক চেতনা বিশেষ কিছুই ছিল না। তাঁহার পারিপার্শ্বিক জীবন-ধারার মাঝে দেশ, জাতি, সমাজ কোন দিনই বড় হইয়া জীবনের ক্ষেত্রে দেশাত্মবোধের মহান কোন আদর্শবাদের সৃষ্টি করে নাই। সমাজের মধ্যে তাঁহারা ছিল ভিন্ন গোত্রীয়। বাল্যকাল হইতে বিশেষ কোন নীতির প্রভাবে মন তাঁহার সংস্কারক রূপে গড়িয়া ওঠে নাই। আদর্শ, সংঘ, নীতি, সংস্কার এবং শাসনের বাহিরে সে শুধু হালকা হাওয়ার উড়িয়া বেড়াইয়াছে। আর যে সমাজের আবেষ্টনীতে সে মানুষ হইয়াছে সেখানে জাতীয় জীবনের সংস্পর্শ ছিল না। আত্মীয়স্বজন বলিতে যা এবং তাঁহার ছোট ভাই সমস্ত ছাড়া আর কাহাকেও সে দেখে নাই। পিতার কথা একেবারেই তাঁহার মনে পড়ে না। শুনিয়াছে শৈশবেই তাঁহারা পিতৃহারা হয়। সে তখন মাত্র চার বৎসরের বালিকা আর সমস্ত তখন মাতৃগর্ভে। সেই সময় তাঁহার পিতা দূর কর্মস্থলে কৃত্যযুগে পতিত হন। বন্ধ হইয়া

মা তাহার চিরদিনই সে প্রসন্নকে চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাই রহস্যের ঘবনিকা আশ্রয়ও পরিপূর্ণরূপে উন্মোচিত হয় নাই। শুধু এই মাত্র সে জানিয়াছে সামাজিক নীতির ভিত্তিতে তাহার পিতামাতার বিবাহ হয় নাই এবং তখনকার দিনে তাহার জনা মাতাকে তাহার অনেক নির্যাতন সহ করিতে হইয়াছে।

সংসার তাহাদের চলিয়াছে। তাহার মা তাহাকে এবং স্ত্রীকে আর্থিক অভাব কোনদিনই জানিতে দেন নাই। কোথা হইতে টাকা আসিত, কেমন করিয়া সংসার চলিত—তাহা তাহারা ভাইবোনে কেহই জানিতে পারিত না। দক্ষিণ কলিকাতার অতি এক নির্জন পল্লীতে তাহারা ছোট একখানি বাড়িতে বাস করিত। তখনকার বেলতলা রোড এখানকার মত ঘন বসতিপূর্ণ পল্লী হইয়া ওঠে নাই। ওই বাড়িতেই তাহাদের আশৈশব জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। লরেটো হইতে বি,এ পাশ করিয়া বি, টি পড়িবার কালে স্ত্রীকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইল। অতি আকস্মিক দুর্ঘটনার সত্ত্বেও ক্ষুদ্র হইল। স্ত্রীকে মারা বাইবার পর স্ত্রীকে মার শরীর একেবারেই ভাঙিয়া গেল। এক বৎসর রোগ বশত ভোগ করিয়া সহসা তিনিও একদিন ইহলোকের মারা পরিত্যাগ করিলেন। মায়ের মৃত্যুর পর স্ত্রীকে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় অনুভব করিল। পৃথিবীতে আপন বলিয়া মনে করিবার তাহার আর কেহই নাই। মা কিছুই তাহার ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া বাইতে পারেন নাই। স্ত্রীকে পিতৃরহস্য মায়ের মৃত্যুর পর প্রকাশ পাইল। তিনি অবাকানী ছিলেন। বিবাহের পর তাহার নৃশংস হৃদয়হীনতার পরিচয় পাইয়া স্ত্রীকে মা বুঝিতে পারেন জীবনে কো ভুল তিনি করিয়াছেন।

স্ত্রীকে জন্মের পর হইতেই তাহার মা তাহার পিতার সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করেন। ইহার পর হইতে স্ত্রীকে পিতার একজন অন্তরঙ্গ বান্ধবী বন্ধুই তাহাদের সংসারের বাবতীর ব্যয়ভার এখানে গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। স্ত্রীকে জন্ম ইহারই মাঝে আরও রহস্যের কৃষ্ণাঙ্ক জাল সৃষ্টি করে। তিনি অত্যন্ত সঙ্কোপনে তাহাদের বাবতীর সংসারের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন তিনি কেন আশ্রয় গোপন করিয়া থাকেন সে কথা ভাবিতে গিয়া স্ত্রীকে নারী মন বৃণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। মায়ের মৃত্যুর পর স্ত্রীকে তাই পিতৃবন্ধুর দান প্রত্যাখ্যান করিল। সে শিক্ষিতা নিজে ব্যয়ভার গ্রহণ করিবার যোগ্যতা সে অর্জন করিয়াছে। আর তাহার কলঙ্ক জীবনের পুরুষ বন্ধুরাও কয়েকজন আসিয়াছিল—অবাচিত সাহায্য এবং বিবাহের প্রস্তাব লইয়া। স্ত্রীকে তাহাদের প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। মায়ের জীবন তাহাকে বেদনা দিয়াছে প্রচুর এবং প্রেম বা ভালবাসা সত্ত্বেও তাহার সংসারগত বৈরাগ্য আসিয়াছে। ভালবাসাকে অবলম্বন করিয়া বিবাহের নামে তাই সে শিহরিয়া ওঠে। বয়সের চপলতার বহু পুরুষকে ইতিপূর্বে সে নাচাইয়াছে কিন্তু হৃদয়ের দিক হইতে কোন পুরুষকেই সে এপর্যন্ত ভালবাসে নাই।

মায়ের মৃত্যুর পর দক্ষিণ কলিকাতা বেলতলার বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া সে মফঃস্বলে চাকরি লইল। ইহারই মধ্যে কয়েকটি গ্রামে কয়েক জায়গায় শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিয়াছে।

এখানে আসিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। হঠাৎ অশোকের আবির্ভাবে আবার সব ওলট হইয়া গেল।

কিন্তু যেমন করিয়াই হোক না কেন অশোককে পরিহার করিতে হইবে। স্ত্রীকে দৃঢ়তা অবলম্বন করিল। প্রদোষদাকে অবলম্বন করিয়া অশোককে সে ভুলিয়া বাইবে। অশোককে সে উপেক্ষা করিবে।

(ক্রমশঃ)

যুদ্ধোত্তর পল্লী-শিল্প ও কুচবিহার

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় বি-এ, এল-এল-বি

পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ শেষ হইয়াছে এবং যুদ্ধোত্তর নবযুগের সূচনা সমাগত। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলি নূতন করিয়া সংগঠন করা হইতেছে। এই পুনর্গঠনে দেশের শিল্পোন্নতির জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পনা কার্যকরী করিয়া তুলিতে হইবে। যুদ্ধের সময় বিদেশের শিল্প দ্রব্যাদি এদেশে আসিতে পারে নাই, অপর দিকে যুদ্ধের কারণে নানা প্রকার শিল্পের চাহিদা বর্ধিত হওয়ার দেশীয় শিল্পদ্রব্যাদি বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইয়াছে এবং বাজারে চলিয়াছে। কিন্তু বিদেশী দ্রব্যের জন্য ভারতের তথা বাংলার বাজার খুলিতে আর দেরী নাই। যুদ্ধের প্রয়োজন শেষ হওয়ার সরকারী চাহিদাও কমিয়াছে। এখন বিদেশী দ্রব্যের প্রতিযোগিতার দেশীয় শিল্পদ্রব্য চলিবে কি না, দেশের নূতন শিল্প প্রচেষ্টাগুলি বাচিয়া থাকিবে কি না এই বিরাট সমস্যা আমাদের সম্মুখে আগত-প্রায়। দেশীয় শিল্পদ্রব্যাদি ভারতের বাজারে না চলিলে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন বিপন্ন হইবে, অপর দিকে তেমনই লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে ১৯৪৩-৪৪ সালে একমাত্র ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতেই যুদ্ধ পূর্বকালের তুলনায় ৩ লক্ষের অধিক শ্রমিক নিযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ অন্যান্য দেশীয় শিল্পের লক্ষ লক্ষ বাড়তি শ্রমিক অচিরে বেকার হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। এই সমস্ত লোক বেকার হইলে পরোক্ষভাবে দেশের বিবিধ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি—যেমন ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স প্রভৃতিও—বিপদাপন্ন হইবে সন্দেহ নাই।

দেশীয় শিল্পের পূর্বোক্ত সমস্যা সম্পর্কে একইভাবে পল্লী-শিল্পও আগিয়া উঠিতে উঠিতেই আবার বিপদগ্রস্ত হইতে চলিয়াছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে গবর্ণমেন্ট বিবিধ হাতের কাজ জনসাধারণকে দিয়া করাইয়াছেন এবং সেইজন্য বহু শিল্পী কাজ পাইয়াছে, বহু পরিবারের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কিত নান। প্রকারের কাজ বিতরণ করা হইয়াছে; কিন্তু যুদ্ধের জন্য দ্রব্যসস্তার প্রস্তুত কার্য বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বহু কারিগর ও শিল্পী-পরিবার বেকার হইতেছে। যুদ্ধ থাকা কালে বিদেশী প্রতিযোগিতা, বিশেষভাবে জাপানী সস্তা দ্রব্যসস্তারের প্রতিযোগিতা হইতে মুক্ত হইয়া দেশীয় পল্লী-শিল্পের প্রভূত প্রচার ও প্রসার সাধন হইয়াছে। দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠা ও ব্যাপকভাবে শিল্প গড়িয়া না উঠিলে লোকের একটি বিশেষ উপজীবিকার পথ বন্ধ হয়। একমাত্র চাষি আবাদের উপর নির্ভর করিলে দেশের উর্বরা বাড়—বেকারের সংখ্যা বেশী হয়। কৃষির সহিত শিল্প গড়িয়া না উঠিলে কৃষকও বিপন্ন হয়। যখন বিদেশীরা ভারতীয় কৃষকের কাঁচা মাল লইতে অস্বীকার করে, তখনই কৃষিজাত দ্রব্যের দাম পড়িয়া যায়, কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়—ব্যাপকভাবে শিল্প গড়িয়া উঠিলে কৃষক এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিব্রত হয় না। আবার দেশীয় জিনিষ ক্রয় করিবার উপরও দেশবাসীর জোর দিতে হইবে, নতুবা বিদেশী দ্রব্যসস্তার আসিয়া দেশ ছাইয়া ফেলিবে। মনে রাখিতে হইবে আমাদের শিল্প আমাদের প্রয়োজনের অতি সামান্য অংশ সরবরাহ করে মাত্র। সুতরাং আমাদের শিল্প

প্রসারের যথেষ্ট ক্ষেত্র বর্তমান এবং এই নব পুনর্গঠনকাল এই শিল্প গঠনের পরম মুহূর্ত।

এই ভাবে দেখা বাইতেছে যে যুদ্ধোত্তর ভারতে তথা বাংলা দেশে বহুসংখ্যক নরনারী বেকার হইয়া পড়িতেছে ও পড়িবে। যুদ্ধ সংশ্রবে বিভিন্ন কার্যে লিপ্ত থাকিয়া যে লক্ষ লক্ষ লোক অন্ন সংস্থান করিতেছিল যুদ্ধোত্তর শান্তির দিনে ঐ সমস্ত লোক কর্ম্মাভাবে অসহায় বেকার হইবে। তাহাদের সকলকে ব্যাপকভাবে নিযুক্ত রাখিতে পারে দেশের শিল্পোন্নতি—এবং বিশেষভাবে দেশের পল্লী-শিল্প। বৃহৎ শিল্প দেশের স্থানবিশেষে গড়িয়া উঠে এবং উহার শ্রমিক ও কর্ম্মশিল্পীগণ ঐ স্থানবিশেষেই সামাবদ্ধ হইয়া থাকিতে বাধ্য হয়; কিন্তু পল্লী-শিল্প গড়িয়া উঠে প্রতি নরনারীর গৃহ সমাজ ও আত্মীয় পরিজনদের আবেষ্টনীর ভিতরে—তাই পল্লী-শিল্প ব্যাপক ও যুগ যুগ ধরিয়া দেশের বুকে আপন বৈশিষ্ট্য লইয়া বাচিয়া আছে।

পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধের সুদীর্ঘ দিনে এই পল্লী-শিল্প আমাদের দেশে নানাভাবে যুদ্ধ কার্যের চাহিদা কতকাংশে মিটাইয়াছে একথা পূর্বেই বলিয়াছি। নাম করিতে হইলে অতি সামান্য অথচ প্রয়োজনীয় পল্লী-শিল্প বা কুটির শিল্পের দু'একটির বিবরণ বলা যায়; যেমন “সোলার টুপি” বা “সোলা হ্যাট,” তাঁতে নিষ্পিত প্যারাসুট কাপড়, হস্তনিষ্পিত কাগজ ইত্যাদি অনেক সামগ্রীই পল্লী-শিল্প সংগঠন করিয়া উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে।

বাংলার নরনারী যখন বস্ত্রাভাবে লজ্জা নিবারণে অক্ষম হইয়াছে, বাংলার তাঁতশিল্প তখন স্বাধাধা তাঁতের কাপড় যোগান দিয়াছে ও দিতেছে এবং সূতার অভাব

না হইলে এবং তাঁতিগণ প্রয়োজনীয় সূতার যোগান পাইলে তাঁতের কাপড় বাংলার লজ্জা নিবারণে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারিত। পল্লী-শিল্প সংগঠিত ও উন্নত হইলে দেশের কল্যাণ। পল্লী-শিল্পের সংহত শক্তি দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কম কার্যকরী নহে, ইহা আজ দেশবাসী এবং দেশের গবর্ণমেন্ট স্বীকার করিয়াছেন।

বাংলা গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত শাসন-সংস্কার কমিটির রিপোর্টে এবং কুটির কমিটির রিপোর্টে পল্লী-শিল্প প্রসারের জন্য বিশেষভাবে বলা হইয়াছে এবং সমবায় নীতির ভিত্তিতে গঠিত পল্লী-শিল্প গড়িয়া তুলিবার জন্য বাংলা গবর্ণমেন্ট একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলার বিভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে কুটির-শিল্প প্রতিষ্ঠান (work centres) খুলিয়াছেন। এক্ষণে প্রায় এক শত প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে কার্য আরম্ভ করিয়াছে এবং ক্রমে ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইতেছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে পল্লী-শিল্পীগণ নিম্ন নিম্ন বাড়ী হইতে আসিয়া কাজ করে এবং মজুরী পায়। গবর্ণমেন্টের সেন্ট্রাল স্টোরস এর সাহায্যে ও অন্যান্য বিক্রয় কেন্দ্র বা এজেন্টের দ্বারা ঐ সমস্ত পল্লী-শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুত প্রিন্সিপল বিক্রয় করা হইতেছে। এইভাবে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনার প্রায় সকল প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টই কুটিরশিল্প উন্নয়নের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় ভারত সরকারও যুদ্ধোত্তর ভারতে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিভিন্ন স্থানে “কর্ম্মনিয়োগ সহায়তা কেন্দ্র” (Employment Exchanges) স্থাপন করিতেছেন। পুনর্গঠনের এই পরিকল্পনাতেও কুটির-শিল্প তথা পল্লী-শিল্পকে একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইয়াছে। ঐ

পরিকল্পনার বিস্তৃত আলোচনার স্থান এই প্রবন্ধে নাই। গত দশ বৎসরেরও অধিককাল আমি কুটির-শিল্প সমূহের বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছি ও এইগুলি কার্যকরী করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি এবং কুটিরশিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট আছি, তাই কুটির-শিল্প তথা পল্লী-শিল্প আজ সর্বত্র উন্নয়ন পরিকল্পনার স্থান পাইয়াছে ও কার্যকরী হইতেছে দেখিয়া সত্যই আনন্দ হয়।

কুচবিহার রাজ্যের পল্লী-শিল্প সংস্থান বাংলার অনুরূপ। বাংলার সমস্যা এখানেও প্রযোজ্য। কুচবিহার রাজ্য বাংলা প্রদেশেরই অন্তর্গত একটি উন্নতিশীল ভারতীয় রাজ্য। কুচবিহারের প্রজাহিতৈষী মহারাজ ভূপালাহার তাঁহার দূরদর্শী দৃষ্টিতে তাঁহার রাজ্যে পল্লী-শিল্প উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা বহু পূর্বেই অনুভব করিয়াছিলেন এবং বিগত মহাযুদ্ধের পূর্বেই পল্লী-শিল্প উন্নয়নের জন্য এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মহারাজ ভূপালাহারের ইচ্ছা ও আদেশে আমি এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য প্রায় আট বৎসর পূর্বে এই রাজ্যের শিল্পবিভাগের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিলাম।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কুচবিহার রাজ্যের পল্লী-শিল্প বিষয়ে একটি তদন্ত করিয়া (Industrial Survey) বখাসময়ে উক্ত বিস্তৃত বিবরণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা মহামান্য রাজসভায় উপস্থিত করিয়াছিলাম। ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে বা মহাযুদ্ধ আশঙ্কের সম-সময়ে পল্লী-শিল্প উন্নয়ন কার্য আরম্ভ হইয়াছিল। ঐ শিল্প-তদন্ত রিপোর্টে বর্ণিত কুচবিহারের বিভিন্ন পল্লী-শিল্পের বিষয় বধা, কুলীবাড়ী, সান্দারবাড়ী, কালমাটী, দশগ্রাম প্রভৃতি বিভিন্ন তালুকের তাঁতশিল্প, দ্বিবেশ তালুকের মাত্র-শিল্প, পাঃমেধনীগঞ্জ শাখার পাড়া তালুকের শঙ্খ-শিল্প, চিলাখানা বলরামপুর ভল্লিগুড়ি

ডাউরাগুড়ি প্রভৃতি তালুকের ঘানি-শিল্প, বিভিন্ন তালুকের সোলা-শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ ইতিপূর্বে বিভিন্ন সংখ্যা দর্পণে প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং মংগলীত “কুটির-শিল্প” নামক ইংরেজী গ্রন্থেও (Cottage Industries in relation to Bengal's Industrial Progress) বিবহ ভাবে উহা বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্বোক্ত পরিকল্পনা অনুসারে কুচবিহার রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামে বৎসরের তিন মাস করিয়া উন্নত প্রণালীর সরঞ্জামাদি দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন পল্লী-শিল্পের ল্যাম্যান কেন্দ্র স্থাপন করিয়া স্থানীয় শিল্পী ও শিক্ষার্থীগণকে শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং ঐ সমস্ত কেন্দ্রে শিল্পী তৈয়ারী হইলে ক্রমে পল্লী-শিল্প প্রতিষ্ঠান ঐ সমস্ত কেন্দ্রে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ঐ পরিকল্পনার ছিল। উপরে বর্ণিত বাংলা গবর্ণমেন্টের যুগান্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনার বিভিন্ন “কর্ম-কেন্দ্রের” (Work Centres) অনুরূপ উদ্দেশ্যে এই সমস্ত ল্যাম্যান শিল্প-শিক্ষা কেন্দ্রের ছিল।

বিগত মহাযুদ্ধে সূতা, মাকু, সাবানের তৈল, রসায়ন-দ্রব্যাদি, তামা পিতলের পাত ইত্যাদি নানা জিনিষ দ্রুতপা হইলে ঐ সমস্ত পরিকল্পনা বিশেষভাবে কার্যকরী হইতে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে ল্যাম্যান শিল্প-শিক্ষা কেন্দ্রের কাজ বন্ধ হইয়া যায়।

বর্তমানে কুচবিহারের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য পৃথক উন্নয়ন বিভাগ খোলা হইয়াছে এবং ডেভিলপমেন্ট কমিশনার মহোদয়ের যুগান্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা রচিত হইতেছে। বাংলার পরিকল্পনার অনুরূপ কুচবিহারে পল্লী-শিল্পের ব্যাপক প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধির নূতন পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে এ রাজ্যের প্রভূত উপকার ও অচিরাপ্ত বেকার সমস্যার সমাধান হইবে।

রাজপরিবারের সংবাদ

গত ৫ই এপ্রিল জয়পুর অধিপতি ও জয়পুর মহারানী সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর বিমানযোগে কলিকাতা গমন করেন। ৬ঠা এপ্রিল রাতে জয়পুর মহারানী আর্ন্তগণের সাহায্যার্থ মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণ ক্লাবে একটি ভ্যারাইটি সো-এর ব্যবস্থা করেন।

৮ই এপ্রিল মাতৃশ্রী মহারানী সাহেবা বিমানযোগে বোম্বাই হইতে কলিকাতায় আগমন করেন এবং ১১ই এপ্রিল শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরসহ কূচবিহারে আগমন করেন। এখানে আসিয়াই মহারানী সাহেবা তাঁহার নিজ বায়ে পরিচালিত পরিপালিতা আশ্রম সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজ-খবর লন। তিনি নারী শিশু শিক্ষালয় সম্বন্ধেও যথেষ্ট আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন।

১৫ই এপ্রিল হইতে ১৮ই এপ্রিল পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর রাজভ্রাতা মহারাজকুমার শ্রীইন্দ্রজিতেন্দ্রনারায়ণ ও প্রধান মন্ত্রী সর্দার ডি, কে, সেন-এর সহিত তুফানগঞ্জ মহকুমার সদর ও পল্লী অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। তুফানগঞ্জ সদর, বকসোরহাট, বলরামপুর প্রভৃতি স্থানের অধিগামী প্রজাকৃন্দ মহারাজ ভূপ বাহাদুরকে মানপত্র প্রদান করিয়া তাঁহার শাসনব্যবস্থার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। মহারাজ ভূপ বাহাদুর নিভৃত পল্লী অঞ্চলে পর্য্যন্ত গমন করেন এবং পল্লীবাসীদের অভাব অভিযোগের বিষয় ধৈর্য্যসহকারে শ্রবণ করেন।

স্থানীয় সংবাদ

কুচবিহারে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব—

গত ৭ই ও ৮ই এপ্রিল কুচবিহারে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ৭ই এপ্রিল ৮মনমোহন বক্সী মহাশয়ের বহির্কীর্টিতে পূজা, হোম, পাঠ প্রভৃতি হয়; এবং ৮ই এপ্রিল ল্যান্ডাউন হলে এক জনসভার অনুষ্ঠান হয়। এই সভার বেমুড় মঠের স্বামী অজয়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও সাধনা সম্বন্ধে এক স্বয়ংগ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন ও বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর উপযোগিতা কি বুঝাইয়া দেন।

মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণ ক্লাবে “ভ্যারাইটি শো”—

মহারাজের ভগিনী অমরপ্রমহারানী শ্রীশ্রীগায়ত্রী দেবীর পৃষ্ঠপোষকতার মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণ ক্লাবে গত ৪ঠা এপ্রিল একটি “ভ্যারাইটি শো” এর ব্যবস্থা হইয়াছিল। ভারতীয় নৃত্য, গীত ও ম্যাজিক প্রভৃতির সুন্দর আয়োজন করা হইয়াছিল; দর্শকগণও নানাবিধ বিশেষ প্রদর্শনীতে বোগদান করেন। টিকেট বিক্রয় করিয়া এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল; আমরা জানিতে পারিলাম যে উদ্বৃত্ত সমুদয় অর্থই দুর্গতদের সাহায্যার্থে ব্যয়িত হইবে।

অমরপ্রমহারাজ ও মহারানী এবং কুচবিহারের মহারাজ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া সকলের আশীর্ব্বাদ করেন।

এরোডোমের মরদানে দৌড় প্রতিযোগিতা—

শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপবাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতার এং সৈন্যবিভাগের তত্ত্বাবধানে গত ১২ই এপ্রিল কুচবিহার এরোডোমের মরদানে ঘোড়া, হাতী, গোরুর গাড়ী প্রভৃতির এক দৌড়-প্রতিযোগিতা হয়। কুচবিহারের জনসাধারণ দলে দলে এই প্রতিযোগিতা দেখিতে যায়। অনেক ঘোড়দৌড়ের উপর বাজি রাখে। মহারাজ ভূপ বাহাদুর ও মহারাজকুমার সাহেব ঘোড়দৌড়ে বোগদান করেন।

বঙ্গীয় অলিম্পিক সমিতিতে কুচবিহার দলবাদের দান—

কুচবিহার দলবাদের চিরদিনই শারীর চর্চার উৎসাহ প্রদানে অগ্রণী। গত বৎসর হইতে দলবাদের বঙ্গীয় অলিম্পিক সমিতিতে বার্ষিক টাকা দিয়া আসিতেছেন; গত বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও টাকা প্রেরিত হইয়াছে।

মহারাজকুমারের শাসনকার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ—

শাসনকার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভের নিমিত্ত মহারাজকুমার লেপ্টেন্যান্ট-কর্নেল শ্রীহরীজিতেন্দ্র নারায়ণ শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপবাহাদুর কর্তৃক কুচবিহার গভর্নমেন্টের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি আপাততঃ জেনারেল সেক্রেটারিয়াটে নিযুক্ত থাকিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।

এখানে ষষ্ঠে অভিজ্ঞতা লাভের পর মহারাজকুমার উন্নয়ন বিভাগে কার্য্য করিবেন।

রাজকুমার গৌতমনারায়ণের মেজর পদ প্রাপ্তি—

শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপবাহাদুরের আদেশে রাজকুমার শ্রীগৌতমনারায়ণকে নারায়ণ গার্ডসের অনারারী মেজর নিযুক্ত করা হইয়াছে। রাজকুমার বর্তমানে ভারতীয় সৈন্যবিভাগে কার্য্য করিতেছেন।

শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরের তুফানগঞ্জ পরিদর্শন—

গত ১৫ই এপ্রিল মহারাজ ভূপ বাহাদুর, মহারাজকুমার ও প্রধানমন্ত্রী সমভিব্যাহারে তুফানগঞ্জ মহকুমা পরিদর্শনে গমন করেন। এই উপলক্ষে তুফানগঞ্জের প্রজাবৃন্দের মধ্যে অভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। তুফানগঞ্জ, বলরামপুর, বজীর হাট প্রভৃতি স্থানে প্রজাবৃন্দ ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে মহারাজ বাহাদুরকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হয়। মহারাজ বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে প্রজাবৃন্দের বক্তৃত্য শ্রবণ করেন এবং অভিনন্দনপত্রের উত্তরে প্রজাবৃন্দকে ধন্যবাদ দিয়া ও তাঁহাদের রাজভক্তির প্রশংসা করিয়া বলেন,—“প্রজার কল্যাণ ও রাজ্যের উন্নতিই ছিল আমার পিতা ও পিতামহের রাজ্যশাসনের একমাত্র লক্ষ্য; কুচবিহারের বর্ধমান শাসননীতিও সেই মহান আদর্শেই পরিচালিত হইছে। ১৩৫০ সনের ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও গত মহাযুদ্ধের ভয়ানক দুর্দিনে আমার শাসনব্যবস্থা যে আমার প্রিয় প্রজাদের জীবন রক্ষা করিতে পেরেছিল তা আপনাদের সহযোগিতার জন্যই সম্ভবপর হয়েছিল। রাজ্যের উন্নতি ও প্রজাপালন রাজা ও প্রজার সহযোগিতা ও সহায়ত্বের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। আপনারা শিকা, শিল্প, চিকিৎসা,

জনস্বাস্থ্য ও কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে যে সব উন্নতির প্রস্তাব আজ আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন সে সকল বিষয়ে ইতিপূর্বেই আমার মন্তোনতায় আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। যুদ্ধ সবে মাত্র শেষ হয়েছে, দেশের পূর্বের অবস্থা এখনও ফিরে আসে নাই, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে জনহিতকর প্রস্তাবগুলি যাতে কার্য্যে পরিণত করা যায় সে বিষয়ে বিবেচনা করা হবে। পরিশেষে আমি বলতে চাই আপনাদের রাজভক্তি ও ভানবাসাই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, আমার রাজ্যশাসন ও কর্তব্যপালনের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার।”

মহারাজ বাহাদুর স্থানে স্থানে পল্লীর অভ্যন্তরেও গমন করেন এবং জনসাধারণের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করেন। ১৭ই এপ্রিল অপরাহ্নে তিনি কুচবিহার প্রত্যাবর্তন করেন।

হাস্যামাকারী দণ্ডিত টৈনিকগণের পদচ্যুতি

স্থানীয় কলেজ ও কলেজ হাউসে হাস্যামাকারী যে সকল সৈনিক ও সৈনিক কর্মচারী বিশেষ আদালত কর্তৃক মোদী সাব্যস্ত হইয়া দণ্ডিত হইয়াছিল শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরের আদেশে তাহারা সকলেই পদচ্যুত হইয়াছে। বিশেষ আদালতের দণ্ডবিধানে এবং মহারাজ বাহাদুরের পরবর্তী আদেশে কুচবিহারবাসী সকলেই আনন্দিত হইয়াছে।

স্থানীয় কলেজের নূতন ইতিহাসের অধ্যাপক—

স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কীরোনচন্দ্র সান্যাল এম্-এ পদত্যাগ করার তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী এম্-এ ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রবর্তী মহাশয় ইতিপূর্বে ভারত

সরকারের ঐতিহাসিক রেকর্ড বিভাগে সহকারী কার্য
করিতেন।

**কুচবিহার রাজ্যের নূতন পুলিশ
কমিশনার—**

রায় সাহেব শ্রী প্রভাতরঞ্জন বিশ্বাস অবসর গ্রহণ
করার মহারাষ্ট্র ভূপ বাহাদুর রায় বামিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
বাহাদুর আই-পিকে কুচবিহার রাজ্যের পুলিশ কমিশনার

নিযুক্ত করিয়াছেন। রায় বাহাদুর গত ২০শে এপ্রিল
কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

নববিধান ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক উৎসব—

গত ১৮ই এপ্রিল হইতে ২২শে এপ্রিল পর্যন্ত স্থানীয়
নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ৫০ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।
এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দিনে ব্রহ্মসন্ধির উপাসনা, সঙ্গীত,
নাট, বক্তৃতা প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়াছিল।

দেশবিদেশের কথা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক, ইন্টারমিডিয়েট
এবং বি-এ, বি-এস-সি পরীক্ষা সম্প্রতি সমাপ্ত হইয়া
গিয়াছে। পরীক্ষার আরম্ভে নবনিযুক্ত ভাইসচ্যান্সেলার
পরীক্ষার্থীগণের নিকট আবেদন করিয়া জানাইয়াছিলেন যে
তাহারা যেন এ বৎসর পরীক্ষায় কোনরূপ ছুঁতী বা
অসামান্যতা অবলম্বন না করে। বৎসরের পর বৎসর
পরীক্ষাক্ষেত্রে ছুঁতী অবলম্বনকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা
ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে; ইহা ছাত্রসমাজের পক্ষে
কলঙ্কের কথা এবং জাতির দিক হইতে অশুভ লক্ষণ।
ছুঁতীর কথা ভাইস-চ্যান্সেলারের আবেদনে ছাত্রসমাজ
বশোপযুক্ত সাড়া দেয় নাই। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কোন
কোন কেন্দ্রে অবস্থা একরূপ চরমে উঠিয়াছিল যে ১৪৪ ঘণ্টা
জারী করিয়া পুলিশ ডাকিয়া পরীক্ষার বন্দোবস্ত করিতে
হইয়াছিল। বি-এস-সি পরীক্ষার সময় পদার্থ বিজ্ঞানের
দ্বিতীয় পেপারের প্রশ্ন পত্র কঠিন হইবার অজুহাতে

পরীক্ষার্থীগণ সেনেট হল, ছাত্রভাঙ্গা ও আন্তোষ বিল্ডিং
হইতে একযোগে বাহির হইয়া আসে এবং হটগোল করিয়া
হলগুলির ডেস্ক, চেয়ার, আসবাবপত্র প্রভৃতির ক্ষতিসাধন
করে। অথচ কলিকাতার অন্যান্য কেন্দ্রে ও মহকুমার
বিভিন্ন কেন্দ্রে ছাত্রগণ যথাযথ পরীক্ষা দেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট পরীক্ষাধাগণের এই কার্যের
আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে পদার্থবিজ্ঞানের
প্রশ্নপত্র কঠিন হইবার অজুহাত একেবারেই বিচারসহ
নহে। প্রশ্নরচয়িতাগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বিভিন্ন
কলেজের অধ্যাপকগণ মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন
যে, এইবারের প্রশ্নপত্র অন্যান্য বৎসরের মতই হইয়াছিল;
পরীক্ষার্থীগণের বিক্ষোভ প্রদর্শনের কোন সঙ্গত কারণ
ঘটে নাই। পরীক্ষার্থীগণ পরে এক সভা করিয়া
তাহাদিগের আচরণের অন্য দৃষ্টি প্রকাশ করিয়াছে এবং
পদার্থবিজ্ঞানের দ্বিতীয় পেপারের পুনরায় পরীক্ষা লইবার
জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ জানাইয়াছে।

ছাত্রসমাজকে আমরা একটি দিবস বীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে বসিবেছি। তর্কের খাতিরে যদি মানিয়াও লওয়া যায় যে প্রশ্নের কঠিন হইয়াছিল তাহা হইলেও এই তুচ্ছ কারণে তাহাদের পক্ষে পরীক্ষাগৃহ ত্যাগ করা সম্ভব হয় নাই। ভবিষ্যত জীবনে তাহাদিগকে বহু কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে, বহু কঠিন দায়িত্বের গুরুভার স্তম্ভে তুলিয়া লইতে হইবে; তাহারা যদি সামান্য একখানি প্রশ্নের কঠিনতার পিছাইয়া পড়ে তাহা হইলে কিরূপে তাহারা জীবনের কঠিন সমস্যা ও দায়িত্বের সম্মুখীন হইবে।

পণ্ডিতের নিকটে রোমান সহরের চিত্র আবিষ্কার—

পণ্ডিতের এক সংবাদে প্রকাশ যে ভারতের পূর্ব উপকূলে একদা রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিতের নিকটে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর এক রোমান সহরের চিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানকার মূর্তি ও মৃৎপাত্রাদি রোমান সভ্যতার পরিচয় প্রদান করে।

কাশ্মীর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি—

কাশ্মীর হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি স্যার শরৎচন্দ্র ঘোষ কাশ্মীর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। গত ১লা এপ্রিল তিনি তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। বাংলার বাহিরে বাঙ্গালীর এই সম্মানলাভে আমরা আনন্দিত।

প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবল জলোচ্ছ্বাস—

হাওয়াই ও এলিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, আলাস্কা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলভাগ— এই চারি হাজার মাইল বিস্তৃত অঞ্চলের সমুদ্রগর্ভে এক ভীষণ ভূকম্পনের ফলে

গত ১লা এপ্রিল প্রশান্ত মহাসাগরে এক বিশাল জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হয়। এই জলোচ্ছ্বাস গভীর গর্জনে ভূখণ্ডের দিকে অগ্রসর হয়। ইহাতে বহুলোক হতাহত হইয়াছে এবং প্রচুর ধনসম্পত্তির ক্ষতি হইয়াছে।

রুশ-পারস্য তৈলচুক্তি—

পারস্য হইতে রুশিয়ার সৈন্যাসরণ প্রশ্ন সম্বন্ধিত জাতি প্রতিষ্ঠানে (U. N. O.) উঠিয়াছিল; কিন্তু সহস্রা নাটকীয় ভঙ্গীতে এই প্রশ্নের সমাধান হইয়া গিয়াছে। রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ যে রুশিয়া ৫০ বৎসরের জন্য পারস্যের সহিত এক তৈল চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে। পারস্যের ধনিসমৃদ্ধ হইতে তৈল উত্তোলনের জন্য একটি যুক্ত রুশ-পারস্য তৈল কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছে; প্রথম ২৫ বৎসর এই কোম্পানির শতকরা ৫১ অংশ রুশিয়ার ও শতকরা ৪৯ অংশ পারস্যের থাকিবে; দ্বিতীয় ২৫ বৎসর উভয়ের অংশ সমান সমান হইবে। তৈল উৎপাদনের সমস্ত ব্যয় রুশিয়া বহন করিবে; কিন্তু হেড আফিসের ব্যয় পারস্যকে বহন করিতে হইবে।

জেনেভায় জাতিসংঘের শেষ অধিবেশন—

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে যে জাতিসংঘ (League of Nations) স্থাপিত হইয়াছিল সম্প্রতি তাহার অবশান ঘটিল। গত ৮ই এপ্রিল হইতে ১৮ই এপ্রিল পর্যন্ত ইহার শেষ অধিবেশন হয় এবং স্থির হয় যে সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠান ইহার কার্যভার গ্রহণ করিবে। রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতিসংঘ উল্লখযোগ্য কোন কার্য করিতে পারে নাই; প্রবলের লোভ সংবর্ত করিবার কোন অঙ্গই ইহার হাতে ছিল না; সুতরাং ইহার অস্তিত্ব সর্বত্র জাপান মার্কিন ও ইটালি আবিসিনিয়া আক্রমণ করিল এবং অবশেষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতিসংঘ কয়েকটি

উল্লেখযোগ্য কার্য করিয়াছে ; উন্মধ্যে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিসাধন, ঔষধব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্যোন্নয়ন প্রভৃতি প্রধান।

বাংলাদেশে চিনির রেশন হ্রাস—

এই বৎসর চিনির উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় ভারতসরকার বিভিন্ন প্রদেশের চিনির বরাদ্দ কমাইয়া দিয়াছেন। তাহার ফলে বাংলাসরকার গত ৮ই এপ্রিল হইতে রেশনিং এলাকায় চিনির সাপ্তাহিক বরাদ্দ মাথা পিছু এক পোয়া হইতে কমাইয়া তিন ছটাক নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন।

পেনিসিলিন অপেক্ষা শক্তিশালী ঔষধ আবিষ্কার—

সম্প্রতি রুশিয়ায় “অ্যাস্পারগিলিন” (Aspergillin) নামে একটি নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রকাশ যে ইহা পেনিসিলিন অপেক্ষাও শক্তিশালী এবং যক্ষ্মা, আমাশয়, টাইফয়েড ও কলেরা রোগে এই ঔষধটি বিশেষ ফলপ্রসূ হইবে।

কাহারপাড়া মামলার রায়—

গত জাহুয়ারী মাসে চট্টগ্রাম সহরের নিকটবর্তী কাহারপাড়া গ্রামে সিভিল লেবার ইউনিটের একজন সৈন্য গ্রামবাসীদিগের উপর যে অত্যাচার করিয়াছিল তাহার ক্ষিার সম্প্রতি চট্টগ্রামের জেলা ও দাররা জজের আদালতে হইয়া গিয়াছে। অভিযুক্ত ৫০ জন সৈনিকের ১০ জনকে মুক্তি দিয়া বিচারক বাকী ৪০ জনকে ৬ মাস হইতে ৫ বৎসর পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

শোক সংবাদ—(ক) শ্রার জর্জ র্যাঙ্কিন—

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূপূর্ণ প্রধান বিচারপতি শ্রার জর্জ র্যাঙ্কিন গত ৮ই এপ্রিল এডিনবারা সহরে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৮

বৎসর হইয়াছিল। শ্রার জর্জ ১৯১৮ সালে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হইয়া আসেন এবং ১৯২৬ হইতে ১৯৩৩ পর্যন্ত ইহার প্রধান বিচারপতির পদ অগ্ৰহৃত করেন।

(খ) কুমার শরৎকুমার রায়—

দ্বিষাণাতিয়র কুমার শরৎকুমার রায় সম্প্রতি পরিণত বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্র ও রমাপ্রসাদ চন্দ্রের সহযোগিতায় রাঙ্গমহীতে “বরে-অমূল্যকান-সমিতি” প্রতিষ্ঠিত করেন এবং আত্মদেহ এই সমিতির কার্যে অত্যাশ্রয় করেন। কুমার শরৎকুমার বিদ্যান ও বিনোদসাহী ছিলেন এবং মঙ্গল অনাধার জীবন যাপন করিতেন।

(গ) রাইট অনারেবল শ্রীনিবাস শাস্ত্রী—

গত ১০ই এপ্রিল রাইট অনারেবল শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মায়লাপুরে তাঁহার নিজ আবাসে পরলোক গমন করেন। কিছুদিন যাবৎ তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল বাইতেনি না; কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার মৃত্যু অপ্রত্যাশিত ছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় বিখ্যাত বাগ্মী ও রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। সাধারণ স্কুলমাষ্টার-রূপে জীবন অরম্ভ করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় পরে গোথলে প্রতিষ্ঠিত ভারত-ভূত-সমিতির (Servants of India Society) প্রেসিডেন্ট হন। দেশে ও বিদেশে তিনি বহু কমিটি ও কনফারেন্সে বিশিষ্ট সদস্যরূপে যোগদান করেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতসরকারের প্রথম বেসরকারী এজেন্ট ছিলেন। ১৯৩৫ হইতে ১৯৪০ পর্যন্ত তিনি আশ্রমলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন। তিনি একবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের “কমলা-বক্তৃতা” দিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মৃত্যুতে ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

সাময়িক প্রসঙ্গ

নববর্ষ—

কুচবিহার দর্পণ বর্তমান ১৩৫৩ সালে নবম বর্ষে পদার্পণ করিল। গত বৎসর এই পত্রিকার 'মাসিকে' রূপান্তরিত হইয়াছে এবং ইগকে একটি সাহিত্যিক রূপ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যে সকল খ্যাতিমান লেখক আমাদের কাগজে লিখিয়া আমাদের উৎসাহিত করিয়াছেন এবং আমাদের এই নব প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করিতে সাহায্য করিয়াছেন সর্বাপেক্ষা আমরা তাঁহাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। পাঠক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা সকলেই আমাদের সহিত সহযোগিতা করিয়াছেন এবং আমাদের পত্রিকার উন্নতিকল্পে সাহায্য করিয়াছেন; তাঁহাদের সকলকেই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমরা জ্ঞানার্জন করি ভবিষ্যতেও লেখক এবং পাঠকগণ, গ্রাহক এবং বিজ্ঞাপনদাতৃগণ আমাদের সমভাবে সাহায্য করিবেন।

মফঃস্বল সহর হইতে প্রথম প্রণীত মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করার পথে নানা বাধা; কিন্তু কুচবিহার রাজসরকারের অকুণ্ঠ অর্থব্যয়েই সকল বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হইয়াছে। পত্রিকার বাহা কিছু সাফল্য তাহার মূলে রহিয়াছে রাজসরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থায়ত্ব; নববর্ষের আরম্ভে রাজসরকারের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

ক্যাবিনেট মিশনের আলাপ আলোচনা—

বিলাতের তিনজন মন্ত্রী লইয়া গঠিত ক্যাবিনেট মিশন গত ২৪শে মার্চ ভারতবর্ষে পৌঁছিয়াছেন।

ভারতসচিব লর্ড পেরিক-লেন্স, বারিষ্টারসচিব ম্যার ট্যাকোর্ড ক্রিপ্স এবং নৌসচিব মিঃ এ. ডি. আলেকজান্ডার এই মিশনে আছেন। ভারতবর্ষে পৌঁছিয়াই নবান্নিমীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে বিবৃতি প্রদানে ভারতসচিব বলেন যে, ভারতবর্ষ বাহাতে স্বাধীনতা লাভ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য ক্যাবিনেট মিশন ভারতে আসিয়াছেন; ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে, ব্রিটিশের হস্ত হইবে ভারতবাহীর হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করিতে হইবে—এই বিষয়ে কোন মতবৈধ নাহি; এক্ষণে কিরূপে শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান গঠন করা যায় ও অন্তর্স্বত্বাঙ্গীন ব্যবস্থা করা যায় সেই সম্বন্ধেই মিশন ভারতে আলাপ আলোচনা চালাইবেন। ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেন মিশনের সকল কার্যে যুক্ত থাকিয়া সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবেন।

ক্যাবিনেট মিশন ভারতে আসিয়া এ পর্য্যন্ত প্রাদেশিক গভর্ণরগণ, প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রী ও আইনসভার বিরুদ্ধপক্ষীয় নেতৃগণ, ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃগণ এবং নরেন্দ্র মণ্ডলের চ্যাম্পেয়ার ও অপর কয়েকজন ভারতীয় নৃপতির সহিত আলাপ আলোচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত যে সকল প্রদেশে এখনও মজৌদতা গঠিত হয় নাই সেই সকল প্রদেশের সম্ভাব্য প্রধান মন্ত্রী ও বিরুদ্ধপক্ষীয় নেতৃগণের সহিতও ক্যাবিনেট মিশন আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন।

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সভাপতি আতাদ ও মহাত্মা গান্ধী এবং মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে মিঃ জিন্না ক্যাবিনেট মিশনের সহিত কয়েকবার দেখা করিয়াছেন। কংগ্রেস

ও মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটির কয়েকটি অধিবেশন এবং মুসলিম লীগের একটি কনভেনশন দিল্লীতে হইয়া গিয়াছে। এ পর্যন্ত যতদূর সংবাদ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, কংগ্রেস সমগ্র ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা, তেজ্জে অবিলম্বে সাময়িক গভর্ণমেন্ট গঠন ও সার্বভৌম ক্ষমতাসহ এক শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান গঠনের পক্ষপাতী। মুসলিম লীগ পাকিস্থানের দাবী দৃঢ়ভাবে স্বীকৃতি দিয়া রহিয়াছে; লীগ পাকিস্থান, দুইটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান গঠন এবং দুই অঞ্চল তিনটি সার্বভৌম ক্ষমতাবিশিষ্ট রাষ্ট্রগঠনের পক্ষপাতী। পাকিস্থানের দাবী লইয়াই কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে প্রবল মতানৈক্য দেখা দিয়াছে।

দেশীয় নৃপতিগণ অবিলম্বে ভারতের স্বাধীনতালাভের পক্ষপাতী; স্বাধীন ভারতের সহিত নূতন পাকিস্থানে আবদ্ধ হইয়া ভারতীয় ফেডারেশনেও যোগদান করিতে তাঁহারা প্রস্তুত; তাঁহাদের একমাত্র দাবী এই যে নিজ নিজ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাঁহাদের সার্বভৌম ক্ষমতা থাকিবে।

ইউরোপীয় সমাজের পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় আইনসভার দলপতি মিঃ গ্রিফথস বলেন যে, ইউরোপীয়গণ অবিলম্বে ভারতকে স্বাধীনতা দানের পক্ষপাতী; তাঁহারা ভারতীয়গণের বন্ধু ও সদিচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া ভারতে বণিকরূপেই থাকিতে চাহেন।

ক্যাবিনেট মিশন বিভিন্ন দলের সহিত প্রাথমিক আলোচনা করিয়া কয়েকদিনের জন্য বিশ্রাম-লাভের মানসে কাশ্মীর গমন করিয়াছেন। এক বিবৃতি প্রসঙ্গে মিশন আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইতাবসরে বিভিন্ন রাজনৈতিকদলের নেতৃগণ পরস্পর আলোচনা

আলোচনা দ্বারা নিজেদের মতানৈক্য যতদূর সম্ভব দূর করিতে চেষ্টা করিবেন।

ভারতে প্রাদেশিক নির্বাচন ও মন্ত্রীসভা গঠন—

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আইনসভা সমূহের নির্বাচন শেষ হইয়া গিয়াছে। ১৯৪১ সালের ভারতশাসন আইন অনুসারে এই দ্বিতীয় নির্বাচন হইল। প্রথম নির্বাচন ১৯৩৭ সালে হইয়াছিল; দ্বিতীয় নির্বাচন ১৯৪২ সালে হইবার কথা ছিল, কিন্তু যুদ্ধের জন্য তাহা হইতে পারে নাই। বর্তমান নির্বাচনের ফলে দেখা যায় যে বিভিন্ন প্রাদেশিক আইন সভার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ শক্তিশালী রাজনৈতিক দলরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। বাংলা, সিন্ধ ও পঞ্জাবে মুসলিম লীগ সর্বাধিক আসন দখল করিতে সমর্থ হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রদেশেই অন্তঃসম্মতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে নাই। আসাম, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ এবং উড়িষ্যা কংগ্রেস সর্বাধিক আসন দখল করিয়াছে ও অন্তঃসম্মতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে।

ভারতের এগারোটি প্রদেশের মধ্যে একমাত্র মাদ্রাজ ব্যতীত অন্য সকল প্রদেশেই মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে। আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা, সিন্ধ ও বাংলার মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা এবং পঞ্জাবে কংগ্রেস-ইউনিয়নিষ্ট আকালী কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে। মাদ্রাজে কংগ্রেস দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় সেখানে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাই প্রতিষ্ঠিত হইবে। বাংলার মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠনের চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু তাহা সফল হয় নাই।

১. বাংলার ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেট—

বাংলার ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেট কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে; বাংলার বর্তমানে ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুসারে গভর্ণরের শাসন চলিতেছে বলিয়া এই বাজেট গভর্ণর কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে; নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়া কার্যভার গ্রহণান্তে নূতন বাজেট প্রণয়ন না করা পর্যন্ত এটো বাজেট চলিতে থাকিবে। এই বাজেটে ৪১ কোটি ১৮ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা আয় এবং ৫০ কোটি ৬৫ লক্ষ ১২ হাজার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে; অর্থাৎ ১৯৪৬-৪৭ সালে ৯ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে। ১৯৪৫-৪৬ সালের সংশোধিত বাজেটে ৭ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি ধরা হইয়াছে।

১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটে গঠনমূলক কার্যের জন্য ১১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার এবং ঘর বাড়ী নির্মাণের জন্য ৩ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৬ লক্ষ সরকারের জন্য ৭০ লক্ষ টাকা, উদ্ভূত সামগ্রিক প্রদান ক্রয়ের জন্য ৫১ লক্ষ টাকা এবং সমবায় বিভাগ পুনর্গঠনের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। দ্রুত বাজেট সাড়ে তিন কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। বিভিন্ন ডিকেন্স বিভাগ তুলিয়া দিবার জন্য এক কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বাঁচিয়া যাইবে।

আলোচ্য বাজেটের একটি বিশেষত্ব এই যে ইহাতে কোনও নূতন করদায়ের প্রস্তাব করা হয় নাই; বরং ব্যবসায় কর (tax on professions) তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

চিত্র-পরিচয়

কুচবিহার সহর বহু সুন্দর দীঘি দ্বারা সূশোভিত; ইহার বৃহত্তম দীঘি সাগরদীঘির পাড়ে বিভিন্ন সরকারী আফিসসমূহ অবস্থিত। চিত্রে সাগরদীঘির উত্তর পাড়ে অবস্থিত হাইকোর্ট ও কতিপয় সরকারী আফিস দেখা যাইতেছে।

খেলাধুলা

হকি

ক্রিকেট

কলিকাতার হকি লীগ ও বেটন কাপ প্রতিযোগিতা সমাপ্তি সমাপ্ত হইয়াছে। এই উভয় প্রতিযোগিতায় জয়ী হইয়া পোর্ট কম্বিনেশন দল অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। গত ২২শে এপ্রিল এই দল লীগ খেলার চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন এবং ৩০শে এপ্রিল বেটন কাপ ফাইনালে বি-এন রেল দলকে ২-১ গোলে পরাজিত করিয়া কাপ লাভ করেন। বি-এন রেল দল গত তিন বৎসর পর্যন্ত বেটন কাপ লাভ করিয়া আসিতেছিলেন; এই বৎসর পরাজিত হইলেও খেলার তাঁহারা অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন।

ইতিপূর্বে একমাত্র কাষ্টমস ও রেজার্স ছাড়া অপর কোন দল একই বৎসরে লীগ চ্যাম্পিয়ন ও বেটন কাপ বিজয়ী হইতে পারেন নাই।

২৭শে এপ্রিল তারিখে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক পাতোদির নবাব, এস বানার্জি ও অমরনাথ লণ্ডন পৌঁছিয়াছেন। বাকী খেলোয়াড়গণ ২৮শে এপ্রিল পৌঁছিয়াছেন। ৪ঠা মে হইতে ভারতীয় দলের খেলা আরম্ভ হইবে। ভারতীয় দলের প্রথম খেলা হইবে উরুটোর দলের সহিত। উরুটোর দল ইংল্যান্ডের একটি শক্তিশালী দল। ভারতীয় দল কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবেন বলিয়া সকলেই আশা করেন। পাতোদির নবাব একসময়ে উরুটোর দলের অধিনায়ক ছিলেন।

NOTICE

FOR YOUR SALT AND SUGAR REQUIREMENTS
PLEASE REFER TO

Messrs. Kartic Chandra Das Ltd.
Agents to the Cooch Behar State,
P66/4, Strand Bank Road,
P. O. Beadon Street, CALCUTTA.

অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম-এ কর্তৃক সম্পাদিত ও কৃষ্ণবিহার ষ্টেট প্রেস হইতে
মুদ্রিত কর্তৃক প্রকাশিত।



ভূতপূৰ্ব কুচবিহাৰাধিপতি মহাৰাজ হৰেন্দ্ৰনাৰায়ণ ভূপ বাহাদুৰ ।
(প্ৰাচীন চিত্ৰ হ'ইতে)



কুচবিহার দর্পণ

নবম বর্ষ

জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩ সন, রাজশক ৪৩৭

২য় সংখ্যা

উদয়পুর ও নেপাল

ডক্টর শ্রীমুরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি, বি-লিট (অক্সন).

নেপালের গুর্খারাজগণ বহুদিন হইতেই নেবারে রাজবংশের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। মুসলমান বিজয়ের যুগে বহু রাজ্যভ্রষ্ট রাজকুমার হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। বাহালার সেন রাজগণের বংশধরেরা আজও মণ্ডা, সাক্ত প্রভৃতি ছোট বড় জনপদে রাজত্ব করিতেছেন। কিন্তু নেবারের স্বর্ষ্যবংশীয় নরপতিগণ বহু ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যেও পূর্বপুরুষের সিংহাসনচ্যুত হন নাই। তথাপি রাজবংশের কনিষ্ঠ শাখার উত্তোগী সন্তানেরা নূতন নূতন ক্ষেত্রে ভাগ্যক্ষেপে ব্রতী হইয়া থাকিলে বিশ্বের হেতু নাই। মহারাষ্ট্রের ভোঁসলা নরপতিগণও চিতোরের রাণাদিগের জাতিভ্র দাবী করিতেন। উদয়পুরের মহারাণা মারাঠারাজগণের এই দাবী কখনও স্বীকার করিয়াছেন কিনা জানিনা। কামরূপাখ্যায় কবিরাজ শ্রীমদাস তাঁহার “বীরবিনোদ”

গ্রন্থে নেপালের রাজগণের যে বংশতালিকা প্রদান করিয়াছেন, নেপালে প্রচলিত বংশতালিকার সহিত তাহার সম্পূর্ণ ঐক্য নাই। কিন্তু ১৮৩৮ সালে উদয়পুরের মহারাণা যে নেপালের রাজা রাজেন্দ্র বিক্রম শাহকে নিকট জাতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন তাহার লিখিত প্রমাণ আছে। মহারাণা জওয়ান সিংহের আকস্মিক মৃত্যুর অল্পদিন পূর্বে নেপাল হইতে বহু উপত্যকন লইয়া কয়েকজন কর্মচারী ও মহিলা উদয়পুরে আসিয়াছিলেন। এই দৌত্যের দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম, উদয়পুরের রাজবংশের কুলচারণ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ। দ্বিতীয়, মহারাণার সাহায্যে রাজপুতনার কোন প্রাচীন পরিবার হইতে নেপালের যুবরাজের জন্য একটি বধু নির্বাচন। বোধ হয় রেওয়ার মহারাজ-কুমার লক্ষণসিংহের একটি কন্যার সঙ্গে নেপালের যুবরাজের বিবাহ সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। অন্ততঃ

লক্ষণসিংহের সহিত যে এই বিষয়ে নেপাল রাজদরবারের পত্র ব্যবহার হইয়াছিল তাহার নির্ভরযোগ্য প্রমাণের অভাব নাই। মহারাণা জওয়ানসিংহ একদিকে বঙ্গপক্ষের জ্ঞাতি অপর দিকে কন্ডাপক্ষের নিকট আশ্রয়। তিনি প্রথমবার লক্ষণসিংহের তথ্য ও দ্বিতীয়বার তাঁহার কন্ডার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং নেপালের পক্ষে এই ব্যাপারে তাঁহার সাহায্য গ্রহণের ইচ্ছা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু নেপাল সরকার ও উদয়পুরের দরবারের মধ্যে পত্র বিনিময় ইংরেজ সরকারের সন্ধেহ উদ্বেক করিয়াছিল। প্রথমতঃ কোন অনুগত ভারতীয় নৃগতিরই বাহিরের কোন স্বাধীন রাজ্যের সঙ্গে কোন প্রকার রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার ছিল না। বিশেষতঃ গুর্খা যুদ্ধের পর নেপাল সরকারও ইংরেজের আশ্রিত হিন্দুরাজগণের সংশ্রবে আসিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ এই সময়ে চঠাং নেপাল সরকার লাগোর, হীরাট ও ইরাণে এবং জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর ও রেওয়ার দরবারে দূত পাঠাইতে আরম্ভ করেন। তখন ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় সীমান্তে গৌলবোগের সূত্রপাত হইয়াছিল। নেপালের রাজমন্ত্রী ভৌমসেন খাপার পতনের পর কাঠমণ্ডুর ইংরাজ দূত তদানীন্তন গুর্খা কর্তৃপক্ষের অভিসন্ধি সম্বন্ধে সন্দেহান হইয়াছিলেন, সুতরাং রাজপুত নরপতিগণের সহিত নেপালের প্রকাশ্য পত্রালাপও তাঁহারা একেবারে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। এই জন্যই নেপালের দূত জমাদার বংশরাজকে মহারাণা জওয়ান সিংহের মৃত্যুর অনতিকাল পরে মহারাণা সর্দার সিংহ সৌজন্যের সহিত বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন। জমাদার বংশরাজ উদয়পুর হইতে আসিয়া বেনারসে অকারণে বিলম্ব করিতে থাকেন।

এইখানে হীরাট হইতে প্রত্যাগত নেপালের রাজদূত কাপ্তেন ইন্দুবীর ক্ষত্রি তাঁহার সহিত মিলিত হন। তাঁহাদের আচরণ তখনকার ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট সন্দেহজনক বলিয়া প্রতীক্ষমান হইয়াছিল। তাঁহারা খবর পাইয়াছিলেন যে বংশরাজ ও ইন্দুবীর ইংরাজ সরকারের অজ্ঞাতে হীরাটের শাসনকর্তা কামরান শাহের একজন কর্মচারীকে নেপালে লইয়া বাইবার চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং নেপালের ব্রিটিশ দূত ত্রিয়েঁ। হোটন হগসন বেনারসের কমিশনার টমাসকে বংশরাজ ও তাহার দল লোকদের গতিবিধির উপর নজর রাখিতে অমুরোধ করেন। টমাস অগ্র কারিণে বংশরাজের জিনিসপত্র তদন্ত করিতে বাধ্য হন এবং তাহার বিছানার মধ্যে কতকগুলি পত্র পান। ইহার মধ্যে দুইখানি পত্র নগাদিল্লীর সরকারী মহাফেজ খানায় আছে। চিঠি দুইখানির ভাষা সংস্কৃত, লেখক উদয়পুরের মহারাজাবিরাজ মহারাণা শ্রীসরদার সিংহদেব, লেখা হইয়াছে নেপালের রাজগুরু পণ্ডিত-রাজ শ্রীরত্ননাথ ও নেপালের মহারাজ রাজেন্দ্র বিক্রমশাহ বর্মানকে। বলা বাহুল্য পত্র দুখানি বখাওয়ানে পৌঁছায় নাই, ইংরাজ সরকারের দপ্তরখানায় জমা করা হইয়াছে।

রাজনৈতিক হিসাবে চিঠি দুইখানিতে আপত্তিজনক কিছুই নাই। সাধারণ সৌজন্যের অতিরিক্ত কোন বিষয়ই এই পত্র দুইখানিতে স্থান পায় নাই। দুইখানি চিঠিতেই বলা হইয়াছে যে নেপাল দরবারের প্রেরিত জমাদার বংশরাজ, জমাদার প্রীতম সিংহ, যোধোকৃষ্ণ নারায়ণ মল্ল উপায়ন সহ উদয়পুরে পৌঁছিয়াছেন। নৃপবর জওয়ান সিংহের সম্মুখে সেই উপহার নিবেদন করিয়া তাঁহারা উদয়পুরে অবস্থান করিতেছিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগকে ফিরিয়া বাইতে অমুমতি দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা

নেপালে পৌছিয়া উদয়পুরের বৃত্তান্ত জানাইবেন। হয়ত এই অলিখিত বৃত্তান্তের স্বরূপ অবগত হইতে পারিলে ব্রিটিশ সরকারের সমস্ত শঙ্কা ও সন্দেহের নিরসন হইত। তাঁহারা বরাবরই অহুমান করিতেছিলেন যে লিখিত পত্রে কোন সন্দেহজনক বিষয়ের অবতারণা করা হইবে না, আসল বক্তব্য চরমুখে জানান হইবে। সন্দেহ সমূলক হউক অমূলক হউক তাঁহারা রাগার প্রতি কোনরূপ বিরাগ প্রদর্শন করেন নাই।

দুইখানি পত্রের বিষয় এক হইলেও নেপালের মহারাজার নিকট লিখিত পত্রে একটি অতিরিক্ত বাক্য ছিল--“শ্রীমন্তোহম্মদঃশাঃ সন্তাতোহত্রত্য তত্রত্য ব্যবহার এক এবাবধারণীঃ।” অর্থাৎ মহারাণা সর্দার সিংহ এই পত্রে নেপালধিপতি রাজেন্দ্র বিক্রমসিংহকে স্ববংশীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য এই স্বীকৃতি হইতেই যে নেপালের রাজবংশ চিতোরের রাজকুল হইতে উদ্ভূত

তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় না। ইহা হইতে এই মাত্র প্রমাণ হয় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে নেপালে ও মেওয়ারে এই দুই রাজবংশের জাতিত্বের প্রবাদ প্রচলিত ছিল এবং মেওয়ারের মহারাণা ও তাহার পরিজনবর্গ এই প্রবাদ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। উদয়পুরের গোহিলোটগণ আপনাদের বংশ গৌরব সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন ছিলেন; সুতরাং উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে মহারাণা সর্দার সিংহ ও তাহার জাতিবর্গ নেপালের মহারাণাকে চিতোরের স্বর্গবংশের সম্মান বলিয়া স্বীকার করিতেন না। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীমানদাস স্বায় “বীরবিনোদ” গ্রন্থে নেপালের ইতিহাস সন্নিবেশিত করিয়াছেন, কিন্তু কি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া উদয়পুরের মহারাণা নেপালের দাবী মানিয়া লইয়াছেন তাহা উল্লেখ করেন নাই। এতদিন পরে বোধ হয় তাহা আর জানিবারও উপায় নাই।

সাঁঝের সুরে

শ্রীকরণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

কুহুম্বরের মিঠা জ্বাব দেয় রে উড়ো ‘হরবোলা’র,
সামনে দূরে সবুজ পাহাড় হারিয়ে উজল রঙটা তাহার
নীল-বড়ী-রঙ ওড়না গায়ে দেখায় সুপথ দিগন্তোন্মায়।
সম্মুখে কোন্ মনোহরণ অন্তরে ঘোর দিচ্ছে দোল,
কহুগের আকিঞ্চনে চিনেছি সেই প্রিয়জনে,
এই গোধূলির দো-আলোতে ওরে দোঁহল ঘোমটা খোল।
ব্যাকুল করে বেলা শেষে নেপথ্যে দূর সুরের রেশ,
চলছি একা ঝড়ের রাতি, বাজায় বাঁশি পাখান-সাথী,
মন্ত্র শুনি—“বনং ব্রজেং”,—কত দূরে প্রবাস শেষ?

গহন মাঝে করণাধারায় “বনঃ ব্রজে” প্রতিধ্বনি,
 আকাশে নিঃশব্দ নীলে বাজনা তার বুঝিয়ে দিলে,
 ভেবে দেখ কী পেরেছ, কী দিয়েছে এই ধরনী।
 হঠাৎ বেন উঠল নড়ে’ শৈল-তরুর উচ্চ শির,—
 দেবতাদের সঙ্গে কথা বুঝি ওরা কইছে হোথা,
 বুকের ভাঁজে হৃৎক বাজে, নরন-কোণে জমছে নীর।
 বা শুনি নি, বা দেখি নি, ধরব ধানে চক্ষু বুঁজে,—
 হিমালয়ের নীরব গানে জাগবে বাণী বধির কাণে
 তারার ভাতি হারিয়ে রাতি পালিয়ে বাবে আঁধার খুঁজে’।
 তলিয়েছিল কুপের তলে, পাই নি খবর উপর-কার,
 স্বপ্ন দেখে ক্যাপা কবি আঁকছে অতীন্দ্রিয়ের ছবি,
 অঘোষিত অন্ধকারেও দেখা পাওয়া যায় বাহার।
 পরাণ্ড আঁজ সবার কাছে, তা’তেই আমি রই খুশী,
 করনু বাজে জানের বড়াই সারা জীবন মানের লড়াই
 কাম-রূপে মোর দিলাম পূজা, বন্ধে ভোগী সাপ পুঁথি।
 প্রশ্ন পরে প্রশ্ন কেন? চাইছ মিছে কৈফিয়ৎ,
 এই পৃথিবীর মাটির ঘরে ভরসা করি বাদে ‘পরে’
 তারাই মোরে দেখিয়ে দিল নির্জনে নিঃসঙ্গ পথ।
 যাচে নি মন পেলে যে ধন, কান্না-হাসি রর না আর,
 আরসীতে মোর মরলা যে তাই, স্পষ্ট ছবি দেখছি না তাই,
 ভুলের গোলকধাঁসায় ঘুরে’ হারিয়েছি দ্বার বা’র হ’বার।
 চিত্র-প্রদীপ-শিখায় গৃহ করতে চাই সমুজ্জ্বল,
 সাগর-তটে বিহুকগুলি কুড়িয়ে নিয়ে ভরনু ঝুলি,
 কিন্তু ছোট পাত্রে আমার মিলিল কই যুক্তাকল ?
 শাস্তি তরে বেড়াই ঘুরে’ গীর্জা-দেউল-মসজিদে,
 ভক্ত বেণা ভগবানে ডাকে সলা আর্ন্ত প্রাণে,
 প্রত্যন্তর পায় যেখানে, সুখার ধারা বর হ্রদে।
 বাইরে থেকে যায় না দেখা আছেন চিকের মধ্যে কে,
 আমা-সবে দেখেন তিনি, কেমন করে’ তাঁরে চিনি।
 ডাক দিয়ে যায় অমুক্ত বাক—‘পথের বোকা আর ঝেঁপে’।
 আশ্বাসে মোর হৃৎক দেবে এমন কোন কব্ব নাই,
 এই কথাটি সংগোপনে বুঝব কবে মনে মনে,
 সত্য মেল কি করিলে? হৃৎক হ’তে যুক্তি চাই।

যোগাযোগ

শ্রীমুখাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস

এ উপন্যাসখানি সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যের অত্যন্ত কয়েকটি সর্বশ্রেষ্ঠ রচনার অন্ততম। এ ধরনের বইয়ের বিশেষত্ব এই যে পড়া শেষ হলেও মনে হয় পড়া শেষ হয় নি, এবার এমন কিছু পাওয়া গেল বা আগে পাই নি, পরের বারে নতুন কিছু পাবার সম্ভাবনাও রয়েল। এ রচনার সৌন্দর্য উদ্ঘাটন করে দেখাতে যাওয়ার মতো অপপ্রহাস আর নেই। বিশ্লেষণ, টীকা-টীপনি, ব্যাখ্যা ভাষ্য না হ'লে বারো সৌন্দর্য বোঝে না, তাদের সৌন্দর্য না-বোঝাই হ'ল সব থেকে নিরাপদ। তাই বই যেখানে শেষ হয়েছে আমার এই সামান্য বক্তব্য সেখান হতেই শুরু এ কথাটা সর্বাগ্রে বলতে চাই। বইয়ে বা আছে সেটা সবচেয়ে ভাল উপলব্ধি হবে বইখানি পড়লেই।

উপন্যাস একটি মানচ্ছায়া বিবর্ততার মধ্যে শেষ হয়েছে। সে গোষ্ঠীকে অরণ করার, সে আলো বটে কিন্তু অন্ধকারেরই পূর্বাভাস,—সে বরে ফিরে আসা বটে, কিন্তু ব্যর্থতা আর পরাজয়ের সুদীর্ঘ তিমির-রাত্রি তার সামনে।

বাঙালী মেয়ের অসহায় অবস্থা তার তেজকে, তার নারীত্বকে পদে পদে কেমন করে ধ্বংস করে, তারি লজ্জাকর ইতিবৃত্তের সঙ্গে সব বাঙালীরই মর্মে মর্মে পরিচর। কিন্তু মহাকবি তাঁর অতিশয় অনুভূতির তুলিকাস্পর্শে শুধু যে তারি মর্মস্বন্দ চিত্র এঁকেছেন, আর কিছু নয়,—এটা ভাবলে ভুল করা হবে। এ বইয়ে দুটো সম্পূর্ণ সঙ্গতি পরস্পরের সজ্যাতে অসঙ্গত হয়ে আছে এই তথ্যই হচ্ছে

অপরূপ। কুমু আর মধুসূদন, এরা প্রত্যেকেই এক একটি টাইপ, পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, কোথাও তাদের কিছুমাত্র মিল নেই, অথচ তাদের প্রত্যেককে আলাদা করে দেখলে তারা এক একটি নিখুঁত ছবি, এক একটি অবগু সৃষ্টি বা আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ। প্রত্যেকেই যেন বিভিন্নস্বরের এক একটি তান-লয়-সমৃদ্ধ সঙ্গীত, অথচ যেমনি পরস্পরের সান্নিধ্যে আসা, অমনি আর গান নয়, শুধু কর্কশ কোলাহল। শুধু কর্কশ কোলাহল নয়, চক্‌চকি-ঠোকা আগুন, সে কথা একটু পরেই বলছি।

বাস্তব জগতে খাঁটি মধুসূদনের মতো পুরুষ, খাঁটি কুমুর মতো নারী হয় তো বিরল, তবে এঁটা ঠিক যে প্রায় সব পুরুষের মধ্যে অল্পবিস্তর মধুসূদন আছে, সকল নারীর মধ্যেই অল্পবিস্তর কুমু বাস করে। খাঁটি টাইপটি এমন বিরল বলেই কবি এমন আগ্রহভরে এদের এঁকেছেন। বার বার করে ভেঙেছেন আর গড়েছেন, তিনপুরুষ পর্যন্ত দেখবার অভীপ্সাকে ধ্বংস করে শেষে অকালে ধ্বনিকা টেনে দিয়েছেন, রচনার নামটাও দিয়েছেন বদলে। খাঁটি টাইপের সঙ্গেই তাঁর কারবার, তাই আমি তুমি এরা ওরা তারা, বারো কিছুটা মধুসূদন কিছুটা কুমু,—তাদের সম্বন্ধে অবিশ্বাস বোঝালের আভাস মাত্র দিয়েই কবি ক্ষান্ত হয়েছেন, আর বাক্যব্যয় করেন নি।

মধু আর কুমুর ধাত বিধাতা এমন আলাদা করে গড়েছিলেন যে এদের সান্নিধ্য ঘটলেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দেয়। এই সজ্যার মধ্যে এরা দুজনেই এক তাণ্ডবের

আনন্দ পায়। এরা যেন পরস্পরকে জানাতেই জন্মেছে, যত নৈকট্য, তত আগুন হয়ে উঠছে হৃদয়ে। ততই তাদের আলো ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে। তেল যেমন বাতিকে জ্বালায়, আর বাতি জ্বালায় তেলকে, তেমনি এরা হৃদয়ে। জ্বালায় জানাতেই এরা উদ্ভাসিত, তাই দৈবাৎ-আসা নিমিত্তসম্বর্ষের দিনে আর অগ্নি নেই, আলো নেই, শুধু ভূসা আর কালি। বিরোধের কচিং-অবসানে এদের হৃদয়কে দেখায় ত্রিগুণ। যখন এদের একপক্ষ সজ্বর্ষ সংবরণ করে নতি স্বীকার করে, আর একপক্ষ করে ভালবাসার নিফল প্রয়াস, তখন শুরু হয় হৃৎসহতন ট্রাজেডি। ওদের বিরোধটাই স্বাভাবিক, মিলটা অ-স্বাভাবিক। ওদের বিরোধটা স্বরূপ, মিলটা বিজ্ঞপ।

কুন্তিাসের রামায়ণে রাবণকে রণক্ষেত্রে হঠাৎ শ্রীরামের ভক্তরূপে অবতীর্ণ করানো হয়েছে। এটা একেবারেই হৃৎসহ। রাবণের জীবনলোপের চেয়ে তার হিংসালোপ গভীরতর ট্রাজেডি। রামের দিক থেকেও তাই। সীতাহারাণের সকল দুঃখ, লক্ষ্মণের শক্তিশেলের সকল শোককে সহনীয় করেছিল রণ-উন্মাদনা। কিন্তু সহসা রাবণরাজা যখন ধুকবাণ ছুড়ে ফেলে দিয়ে বিশ হাত ঘোড় করে স্তব করতে বসে যান অথের ওপর, যখন তার কুড়ি চোখ বেয়ে ঝরঝরিয়ে জল গড়াতে থাকে, তখন রামের সে কী অসহনীয় অবস্থা! বিরোধের কোনো মানেই নেই তখন, যুদ্ধাঙ্গোজ্ঞন প্রয়োজনশূন্য, বিরাট বানরকটক একটা হুতীর বাদ্য, অথচ ভক্ত বনিতাপহারকের সঙ্গে সৌন্দর্যের বরনাও মনকে কাঁটার মতো বিধতে থাকে। ঠিক এই অবস্থা ঘটেছে কুমুর। তাদের বিরোধের অবদানটা উপত্যাসের শেষ পাতে এমনি প্রচণ্ড হয়ে দেখা দিয়েছে। কলনার

দেখি, তাদের দৈহিক নৈকট্য এবং স্নেহসম্পর্কের অন্তরালে তাদের দুই মনের ব্যবধান-সমুদ্রের গর্জনধ্বনিটা কিছুতেই মরে না।

ভবিষ্যৎ বংশধরের আগমনের সঙ্কেতে বাধা হয়ে কুমুর স্বামীগৃহে ফিরে যাওয়ার মধুসূদনের জয়োল্লাস যতই উৎকট হবে উঠুক না কেন, ঐখানেই ঘটেছে তার আসল পরাজয়। জয়ের জন্তে লড়াইটাই ক্রমে ক্রমে মধুসূদনের এমনি স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যে জয়ের চেয়ে লড়াইটাই হয়ে উঠেছিল মুখ্য। জলের মাছটাকে ডাঙায় তুললেই তো সব ছুরিয়ে গেল। জেয় ছিল কুমুর মন, লাভ হল শুধু তার দেহ। অনেকটা যেমন রাজারানীর রাজা পেড়েছিলেন তাঁর রাণীকে, তপতীর রাজা পেড়েছিলেন তাঁর রাণীর ধুনায়মান দেহকে। প্রাণগীন পাওয়ার এই অসহ একঘেরেমির বোঝা বইতে বইতে মধুসূদনের কেমন করে দিন কেটেছিল কে জানে! কুমুর দিক থেকে সেটা নিশ্চয় ছিল আরো ধারাপ। স্বামীর ঘরে ফিরে যাওয়া মানে তার সব তেজকে নিভিয়ে দিয়ে যাওয়া, সকল কিছু আদর্শকে ধূলায় ফেলে চলে যাওয়া। এ বেঁচে থাকা নয়, এ মরা; শুধু মরা নয়, এ অধাধি। শুধু না-বাঁচা নয়, মরে একেবারে ভূত হয়ে যাওয়া।

মধুসূদন হল খাঁটি রাজসিক মানুষ, তার উৎসাহ অদম্য, অধাবসার অসাধারণ, তেজে সে ছিন্নিরীক্ষ্য, লোভে সে প্রচণ্ড, কামনা তার কোনো বাধাবিঘ্ন মানে না। কুমু সাত্ত্বিক মেয়ে, তার সব কিছুই সুসংযত, চিন্তা ধীর স্থির, মন অতি উচুসূরে বাধা। এই দুটি ভিন্নপ্রকৃতির নরনারীর মিলন তাই ভয়াবহ হয়ে দেখা দিয়েছে। একজনের গুরুকার আর একজনের আত্মসম্মান, একের দম্ভ অপরের দৃঢ়তা, একের লোভ অপরের

নির্নিপুণতা, একের বল অপরের শক্তি, একের ক্রোধ অপরের
উদাসীনতা, —এদের সম্বন্ধ কোনোকালেই ঘোঁচবার নয়।

মধুসূদন যদি তামসিক লোক হ'ত, কুমুর সঙ্গে
তাহলে তার এমন রূঢ় সম্বন্ধে বড়ট না। উত্তর
আর অধমে মৈত্রী অসম্ভব নয়, বড় বিপদ মধ্যমের।
তাছাড়া, তামসিকতার বাইরের আবরণটার সঙ্গে
সাম্প্রতিকতার কতকটা সাদৃশ্য আছে, তাতে ওদের বাইরে
বাইরে এ-টা বনিবনাও হতে বাধত না। সাম্প্রতিকতা
জ্ঞানে মোন, তামসিকতা অজ্ঞানে বাক্যহীন; সাম্প্রতিকতা
বিচারবলে সমদৃষ্টি, তামসিকতা নির্বুদ্ধিতার দৃষ্টিহীন;
লোভজরী ব'লে সাম্প্রতিকতা ঘৃচ্ছানাভে মস্তক, তামসিকতা
আলসে প্রবাসহীন, তাই বা পার তাই নিব্বৈ হুল
ধাকে;—সে জন্তে এই দুই বিভিন্নধর্মীর সাম্প্রিক্য বটলে
আশুন ঠিকরে উঠত না, অন্তরের মিল না হোক,
বাইরে লোকচক্ষে বেশি গড়মিল দেখাত না।
সাম্প্রিক্য আপন সংঘমে ও অহিংসাবুদ্ধিতে তামসিকতাকে
সহ করত, আর তামসিকতার বিদ্রোহের উৎসাহই
ক' কোথায়?

কিন্তু পূর্ণমাত্রার রাজসিক মধুসূদন ও সাম্প্রিক্য কুমুর
সঙ্গে বাইরের মিল ও অন্তরের মিল দুইই ছিল অসম্ভব।
এখানে তাদের স্বধর্মে নিধনঃ শ্রেয়ঃ পরধর্মে। ভয়াবহঃ।
চলন্ত জিনিষের যে হৃদমণ্ডল বেগ, সেই বেগ হল
মধুসূদনের। সে কেবলি ছুটে চলেছে, তার বাবসা-বাণিজ্য,
তার বরসংসারে, তার কর্মক্ষেত্রে সেই বিপুল বেগটা
আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। কিন্তু এমন জাজ্জল্যমান
কর দেখা না দিলেও কুমুর শাস্ত্র সংযত মনের শক্তি
যে কিছুমাত্র কম তা মোটেই নয়। যে-উচ্চ আপন
অসংযত গতিবেগে উন্মত্তভাবে ধাবমান তাকে দেখে

বিস্ময় লাগে। কিন্তু যে-শক্তি চলন্ত গ্রহউপগ্রহকে
সৌরকেন্দ্রে অটুট ক'রে বেঁধে রেখেছে সে শক্তি চোখে
দেখা যায় না বলেই যে ঐ চোখ ধাঁধানো উচ্চ
উদ্ভাসগতি-শক্তির চেয়ে কম, তা নয়। কুমুর সাম্প্রিক্য
মন এই প্রবলতম শক্তিতে সংযত, মধুসূদনের রাজসিক
মনে অসংযত শক্তির উদ্ভাসলীলা।

তর্ক উঠতে পারে, রাজসিকতার ক্রমোন্নতিতেই
সাম্প্রিক্যের শুরু, সুতরাং মধু-কুমুর জীবনের শেষ অধ্যায়ে
হয়তো আসতে পারে পরিপূর্ণ মিল, কবি তারই আভাস
রেখে গেলেন। আনি বলব, সে অনেক সময়-সাপেক্ষ,
কুমু কেনই বা সেই সুদূর সম্ভাবনার আশায় বসে কাল
গুণবে? এ ক্ষেত্রে বিচ্ছেদই স্বাভাবিক পরিণতি। বিচ্ছেদই
যুক্তিসঙ্গত। তাই এদের বিচ্ছেদ বটিলে যোগাযোগের
রচয়িতা বার্থ সত্য বা তাই দেখিয়েছিলেন। এদের যোগ
মানেই অযোগ, তাই যোগাযোগ-নামটির সার্থকতা ছিল
তখন। এবং সেই জন্তেই এদের পুনর্নির্জনটা যেমন
আকস্মিক তেমনি অস্বাভাবিক। নারীত্বের চরম
অবমাননা যখন মাতৃত্বের রূপ নিল, তখন তাই ব'লে
সমস্ত মর্যাদা, সকল সম্মান বর্জন ক'রে দীননেত্রা
অনন্তোপায়ী কুমু মধুসূদনের ঘরে ফিরে যাচ্ছে এ দৃশ্য
চিত্তকে পীড়া দেয়, যুক্তি বলে এ অসম্ভব হল, অসম্ভব হল।
যাঁরা গল্পের শেষ দৃশ্যে মিলন দেখতে চান তাঁরা হয় তো
খুশি হবেন, কিন্তু যতো অসম্ভবতাই হোক তবু মিলন ঘটাতাই
হবে, এ যুক্তি কি ঠিক? রোম! রোল! তো অগ্ররূপক্ষেত্রে
মিলন ঘটাতো দেন নি, গল্‌সওয়ার্দি তো সোয়ামস্
করসাইটের ভাগো বিবাহ-বিচ্ছেদের দণ্ড দিয়েছেন।
তবে এই যে যোগাযোগের মিলন এই যে গৌজামিলন,
এ কি সনাতনো বাঙ্গালী সংসার বলেই?

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীঅসমগু মুখোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শোভাবাজার বসাক ষ্ট্রীটের উপর বে-ঘরখানার দেওয়ালের গায় 'কামরূপ জ্যোতিষালয়'-লেখা প্রকাণ্ড সাইনবোর্ডখানা ঝুলিতেছিল, সেই ঘরের ভিতর, একদিন সকালে দুইটি ভদ্রলোকের মধ্যে বিবম বচসা চলিতেছিল। একজন—স্বয়ং জ্যোতিষী, পণ্ডিত নবজলধর সাংখ্যাতীর্থ, বেদান্তব্রত; অপরজন—শ্রীমন্ত পশুপতি সরকার, পিতা ৮০রূপাতি সরকার, বয়স আটত্রিশ, পেশা—জমি ছাত্রগার দালানী, নিবাস ৩৬ নং হরমোহন লেন, বাগবাজার।

নবজলধর কহিল,—“গণনার উল্টো কল হোয়েচে, তার জন্ত ত আমি দায়ী হোতে পারি না। গণনা কোরেছিলেন আমার বাবা, তিনি এখন জীবিত নন;—সুতরাং তাঁর গণনার সহজে কিছু বোলতে গেলে, আমাকে না হুমকি দিবে আপনার এখন বাঙা উচিং

‘কোখায় বাঙা উচিং?’

‘ঘরের বাড়ী।’—বলিয়া বিরক্তির সহিত নবজলধর সেদিনকার খবরের কাগজখানা টানিয়া লইল।

পশুপতি একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—‘আপনি যে দেখচি বাঁ তা’ করতে আরম্ভ করলেন। আপনি একটু হ’ল কোরে, এবং ভদ্রভায়ে কথা বলবেন।’

‘বধেই ভদ্রভায়েই এতকণ কথা ক’য়েচি, কিন্তু ক্রমাগত আপনার কক মেজাজ দেখে আর ভদ্র কথা শুনে, ভদ্রতাকে আর রাখতে পারা যাচ্ছে না। রাগটাকে একটু কম কোরে কেনুন।’

পশুপতি তিতর-তিতর রাগে ক্লান্তে লাগিল। কিছুক্ষণ পর্যন্ত ভদ্র বা ভদ্র—কোন কথাই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

পশুপতির বয়স বর্তমানে ৩৮। বত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত সে বিবাহ করে নাই এবং স্থির করিয়াছিল, ভবিষ্যতেও করিবে না; কিন্তু আজ ছয় বৎসর হইল, বাহা সে ইতঃপূর্বে স্থির করিয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে অস্থির হইয়া পড়িল এবং মনে মনে দ্বিতীয়বারের জন্ত স্থির করিল যে বিবাহ করিবে বটে, তবে যেখানে সেখানে বা’ তা’ মেয়েকে বিবাহ করা হইবে না। ভাল জ্যোতিষীর কাছে ছদ্মনের ঠিকুজী দেখাইয়া এবং মিলাইয়া যেখানে ‘রাঙ-বোটক’ হইবে,—সেইখানেই শুভ কার্য সম্পন্ন করবে; অন্তত নহে

তারপর শ্রীমতী পারুলবালার সহিত তাহার ঠিকুজীর বিচারে ‘রাঙবোটক’ বোপ দৃষ্ট হইল এবং উভয়ের বিবাহ হইয়া গেল। ছয় বৎসর পূর্বে তিনি এই বোটক-বিচার করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি নবজলধরের পিতা; বছর দুই-তিন হইল স্বর্গগত হইয়াছেন। আজ ছয় বৎসর পরে, তাহার গণনা যে ভুল এবং বিপরীত বলদায়ক হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাই জানাইবার জন্ত, অতিমাত্রার বিরক্তিতে দ্বিতীয়বার আজ পশুপতি ‘কামরূপ জ্যোতিষালয়ে’ আসিয়াছিল।

নবজলধর কহিল—‘আপনার ঠিকুজীখানা নিশ্চয়ই ঠিক ছিল না; হয় ত জন্ম-গণনা লেখার মধ্যে ভুল ছিল;

নচেৎ আমার বাবার গণনা কখনো ভুল হয় না। আপনি
বৈ-রকম মার-মার কোরে এলেন,.....

চোক দুইটা বুরাইয়া পশুপতি কহিল—‘মার-মার
কোরে আসবার অপরাধটা কি বলুন! চারটি কন্-কনে
টাকা নিয়ে গণনা কোরে বল্লেন যে—‘রাজ-ঘোটক’!
তা এমনি চমৎকার রাজঘোটক যে, বিয়ে হয়েছে ‘আছ
ছ’ বছর, আর এই ছ’ বছর ধরেই জলে পুড়ে মরতে হচ্ছে!

বিশেষ একটু বিরক্ত হইয়া নবজলধর কহিল—‘দেখুন,
তা-ই যদি হয়, তার জন্য দায়ী ত আর আমি নই।
আপনার ব্যাপার দেখে, কথামালার সেই ব্যাপ্ত ও
মেষশাবকের গল্প মনে পড়চে! সকালবেলায় আপনি
এখানে চোঁচামেচি করবেন না, বলে দিচ্ছি; আপনার
কি মাথা খারাপ নাকি?’

মুখখানাকে বিকৃত করিয়া পশুপতি একপ্রকার অদ্ভুত
কণ্ঠে বলিল—‘মাথা খারাপ আমার নয়, মাথা খারাপ
আমনার।’

ক্রমে ব্যাপারটা বেশ পাকিয়া উঠিল। পশুপতি
হিংস্র মত চীৎকার করিয়া উঠিলে, নবজলধর তাহাকে
ঠেলিয়া ঘর হইতে রাস্তায় বাহির করিয়া দিল।
ইতিমধ্যেই ছ’ একজন লোক রাস্তায় দাঁড়াইয়া গিয়াছিল,
একগুণে রীতিমত ভীড় জমিয়া গেল।

সেই ভীড়ের মধ্য হইতে একটি সদাশয় প্রশান্তবদন
ভদ্রলোক আগাইয়া আসিয়া পশুপতির হাত ধরিয়া সরাইয়া
নইয়া গেলেন। তাঁহার গৌরবর্ণ বদনমণ্ডল সুদীর্ঘ
কেশরাজী এবং শ্রুত সমাচ্ছন্ন। চক্ষুদ্বয় আরত এবং
ক্ৰুদ্ধ। প্রীতিপূর্ণ মধুর কণ্ঠে তিনি পশুপতিকে
বলিলেন—‘মানুষের ওপর মানুষের রক্ত করতে আছে
কি? আপনি আমার সঙ্গে আসুন;—এ স্থানে আর
থাকবেন না।’

পশুপতি মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার সঙ্গে চলিল। বাইতে
বাইতে জিজ্ঞাসা করিল—‘আপনার নাম?’

—নাম একটা চিরকালের আছে বটে আপনি আমার
‘সত্যসাধু’ বোলে ডাকবেন, সকলে ওই নামেই ডাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাগবাজার ; ৩ নং হরমোহন লেন।

কিন্তু নব্বয়ের প্লেটখানা ভালো কঙ্গো দেখিলে দেখা
বাইবে যে ৩য়ের পর একটা অঙ্গুষ্ঠ ৬ আছে, বাহা হঠাৎ
নজরে পড়ে না। সুতরাং উহা ৩৬ নং হরমোহন লেন;
সুতরাং উহা পশুপতিরই বাড়ী।

বাড়ীখানা খুবই ছোট। ভিতরে মাত্র দেড়খানা
শয়নঘর; অর্থাৎ একখানা একটু বড়, আর একখানা
একেবারেই ছোট। একরকম একটু কালিরোয়াক,
তাহারই একপ্রান্তে একটা দেয়াল তুলিয়া... রান্নাঘর
করা হইয়াছে। ওদিকে সন্ধ্যা একটুখানি জায়গায়
পাইখানা ও জলের কল-চৌবাচ্চা। কিন্তু পারিবারিক
আবরুকে বজায় রাখিতে, পথের উপর একটা ছোট
বৈঠকখানা ঘরও ছিল এবং তাহাতে ছোট একখানা
তক্তাপোষও পাতা ছিল।

সেই তক্তাপোষের উপর মুখোমুখি বসিয়া—পশুপতি
ও সত্যসাধু।

সত্যসাধুর ডানহাতে পেনসিল, বাঁহাতে একখণ্ড
কাগজ, আর সমুখে একখানা পাতা-খোলা পঞ্জিকা।
তিনি বার-বার পঞ্জিকা দেখিয়া এবং কাগজখানার উপর
পেনসিল দিয়া আঁক-ছোক এবং হিসাব কবিয়া কহিলেন—
‘বড়ই খারাপ যোগা-যোগ! অশান্তি ত হ’বারই কথা।
তবে, একটা সুবিধে এই যে, শনি আর মঙ্গলকে ঠাণ্ডা
করা যেতে পারবে।’

পশুপতির মুখখানা বিমর্ষ হইয়া গেল; কহিল—
‘বোগাযোগ খুবই খারাপ তা হোলে।’

কাগজখানার উপর দৃষ্টি বুলাইতে বুলাইতে সত্যসাধু
কহিলেন—“হ্যাঁ খুবই খারাপ; হু জনেরই ‘প’ বর্গ হোয়ে
ভারি খারাপ হয়েছে।’

‘কিসের প-বর্গ বোলছেন?’

‘এই—ক-চ-ট-ত-প। মুখবোধঃ ব্যাকরণম্
পরোপকৃত্যে মরা।’

পশুপতি হাঁ করিয়া সত্যসাধুর মুখের দিকে চাহিয়া
রহিল।

‘পেশাদার গণ্যকারদের কাছে আর যাবেন না।
ওরা এসব বিষয়ে কি-ইবা জানবে, আর কি-ইবা বলবে।
এ সব দৈব ব্যাপার; দেবতার সাধক ছাড়া এ সবার
সাধনা আর কারো দ্বারা হবে না। সেদিন আপনাকে
দেখেই আপনার ওপর কেমন একটা ভালবাসা পড়লো;
তাই.....’

পশুপতি অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল; বলিল—‘প-বর্গ কি
বোলছিলেন?’

‘আপনার নামের ব্যাপারে। ‘পশুপতি’ আর
‘পাকস’—হুই হোল গিয়ে প-বর্গ; এবং শুধুই প-বর্গ নয়,
প-বর্গের আধ্যাক্ষর।’

‘পবর্গ হোলে বুঝি.....’

‘হোলে, কিছুতেই শান্তি হবে না। অপবর্গ হওয়া
চাই।’

‘অপবর্গ? অপবর্গ মানে?’

‘তাকের ওপর ওটা অভিধান না? বলে, মানেটা
দেখুন দিকি।’

পশুপতি অভিধানখানা খুলিয়া দেখিল; কহিল—
‘মুক্তি, মোক্ষ, সিদ্ধিলাভ.....’

‘তবেই বুঝুন, অপবর্গ না হোলে সংসারে সিদ্ধিলাভ
হবে কোথেকে? পবর্গ বোলেই ও যত অসিদ্ধি আরও
অশান্তি। এসব কথা জ্যোতিষীরা কোথেকে জানবেন।
যাক; এর উপায় আছে। আবার না হয় একটু
খাটুনি হবে; আপনার মঙ্গলের জন্যে আমি তা কোরে
দোবো। আপনি কিছু ভাববেন না।’

পশুপতির নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল;
উৎফুল্লভাবে কহিল—‘আমার তা হোলে অপামার্গ
‘অপামার্গ নয়—অপবর্গ।’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ; আমার তা হোলে অপবর্গ হোতে
পারবে ত?’

‘হোইয়ে দিতে হবে। সাধনার দ্বারা কি না হয়?
গীতার স্বয়ং ভগবান অর্জুনকে বোলছেন—অষ্টকুলাচল
সপ্তসমুদ্রা ব্রহ্মপুত্রন্দর দিনকরকন্দ্রা।—অর্থাৎ, আমাকে
অর্চনার দ্বারা প্রীত করলে, আমি ভক্ত সাধকের জন্য
সপ্ত সমুদ্রের জলও শোষণ করতে প্রস্তুত।’

প্রায় বঁটাখানেক ঘরিগা উভয়ের মধ্যে কথা-বার্তা
চলিল। তাহার পর সত্যসাধু উঠিয়া দাঁড়াইলেন;
কহিলেন—‘কিছু ভাববেন না, সব আমি ঠিক কোরে
দিচ্ছি; সংসারে শান্তি এনে দোবোই। বগড়া-খাটি
সব বন্ধ হোয়ে, মালম্ভী আমার আপনার পায়ের তলায়
পড়ে থাকবেন’—বলিয়া সেদিনেরই মত মধুর হাসি
হাসিলেন।

পশুপতিও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল; চাপা গলায়
কহিল—‘চিরকাল মতে পায়ের তলায় পড়ে থাকে,
সেইটে দয়া কোরে করবেন। দেড়শো টাকা বা খরচার
জন্তে মিলুগ, যদি আরো দু’দশ টাকা বেশী খরচা হয়,
ত তাও আমি.....’

রাস্তার নামিরা পড়িয়া সত্যসাবু কহিলেন—‘সম্ভবতঃ
‘ওইতেই হোয়ে যাবে। হোমের আড়াইসের খাঁটি গাওয়া ঘি
কিনতেই হয় ত ২৫ টাকা বাবে এখন। আচ্ছা; যদি
এতে না কুলোয়,—ত আবার কিছু নিরে গেলেই হবে।
জিনিষপত্রের দাম যে আগুন! নৈনে, কুড়িটাকাতেই—
‘অষ্টোত্তরী ক্রিয়া’র—সব কিছুই খরচ হোয়ে বেত
আগে।.....কানই তা হোলে বর্জমান যাচ্ছেন ত?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ। কান সেখানে জমিটা রেজেষ্ট্রী হবে।
আর রেজেষ্ট্রী হোলেই আমি প্রায় শ’ পাঁচেক টাকা
দুলালী পাব।... ..নমস্কার।’

সত্যসাবু চলিতে চলিতে তাঁহার ট্যাকের কবি টিপিয়া
দেখিলেন যে দেড়শো টাকার নোটের তাড়াটা ঠিকমত
আছে—কি না।

* *

এটিও ৩৬ নম্বর বাড়ী; তবে হরমোহন লেন নয়,
রামতনু নন্দী রোড।

বহুকালের একটা পুরাতন বাড়ীর মধ্যে একখানা
এঁদো ঘর। যেমন ভাঙ্গা-চোরা ঘর, তেমনি তার
আসবাবপত্র,—একখানা নড়-বড়ে পুরাণো প্যাটার্নের
খাট, তাহার উপরের বিছানাও তদ্রূপ; একটা অভদ্র
কাঠের আলনা, গোটা দুই-চার কাঠের ও টিনের
বাক্স, তিন পায়া অবশিষ্ট একখানা বেঞ্চি, একটা রং-
চটা টোল-খাওয়া তোরঙ্গ, খান-দুই জল চৌকী, চাল
রাখিবার একটা বেটে জালা, আর একটা মোটা স্ত্রী।

পূর্বোক্ত ৩৬ নম্বর হইতে এই ৩৬ নম্বরে
সত্যসাবু ফিরিয়া আসিলে মোটা স্ত্রীটি কহিল—“কি
হোল?”

সত্যসাবু ট্যাকের পাক খুলিতে খুলিতে বলিলেন—
“কিছু হোল; শ’দেড়েক। জা ছাড়া, ভবিষ্যতের কিছু

আশাও থাকলো। কান কিছু তোমাকে একবার চু
মেরে আসতে হবে, ও-তরফ থেকে যদি কিছু বার
করতে পার। কান কত বাড়ী আসবেন না।.....
... ..একটু চা হবে?”

“দেড়শো টাকা উপায় কবে আনলে, চা একটু
ত হোতেই হবে”—বলিয়া শৈবলিনা চাবের কেট্‌লিটা
লইয়া বাহির হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাত দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

কিছু আগে বর্জমান হইতে ফিরিয়া, কাপড়-চোপড়
ছাড়িয়া পশুপতি খাইতে বসিয়াছে। তাতে ডাল
মাখিয়া এবং এক গ্রাস মুখে তুলিয়া, মাথা তাতুলিয়া
খালার একপাশে পশুপতি ঠেলিয়া রাখিল। বাজিতে
যে তরকারীটা ছিল, তাহাও একটু মুখে দিয়া, বাটিটা
ঠেলিয়া সরাইয়া রাখিল। পাখর বাটির অঙ্গুলটা স্পর্শও
করিল না। শুধু দুখ দিয়া একমুঠা ভাত খাইয়া
উঠিয়া পড়িল—এবং মুখহাত ধুইয়া,— ঘরের মধ্যকার
কুলুঙ্গী হইতে ছোট একটা হাঁড়ি নামাইয়া, তাহা
সামনে রাখিয়া বসিল। তন্মধ্যে ছিল—বর্জমানের কিছু
সীতাতোপ ও মিহিনানা। পশুপতি বর্জমান হইতে
আনিয়াছে।

একটি, দুইটি, তিনটি, চারটি—পশুপতি খাইয়া
বাইতে লাগিল। পাঁচটি, ছয়টি, সাতটি, আটটি, নয়টি,—
তারপর গণিয়া দেখিল, হাড়ীতে রহিল আর সাতটি।
সুতরাং উহা পাকলের জন্ত রাখিয়া পশুপতি জল খাইয়া
উঠিয়া পড়িল। কিছু উঠিয়াও আবার বসিল এবং
আবার হাঁড়ির সরাখানা সরাইয়া দুইটা মিহিনানা
বেশ ‘মোটা’রকম ভাবে মুখের মধ্যে ঠাঙ্গিয়া দিল।
সুতরাং রহিল—পাঁচটি; যোগটির মধ্যে।

পাকুল কহিল—“ভাত খেতে যদি অনিচ্ছে ছিলো, সেটা সোজা কোরে বল্লেই ত হোত; তা হোলে আর ভাত দিতুম না।”

খুব গম্ভীরভাবে পশুপতি কহিল—“অনিচ্ছে ত ছিলই না, বরং ইচ্ছেটাই ছিল, কিন্তু দেখনুম, খাবার উপায় নেই; ডালে টক তরকারীতে টক, আর অম্বন ত পুরোপুরিই টক, সুতরাং.....

পশুপতি ভালবাসিত কাল ও মিষ্ট; পাকুল ভালবাসিত টক ও তিক্ত। পশুপতি বলিয়া দিত, তরকারীতে একটু বেশী পরিমাণে মিষ্ট দিতে, কিন্তু পাকুল সে কথা শুনিত না। ডাল-তরকারীতে সে, হয় তেঁতুল, না হয় টমেটো, না হয় অন্য কোনরূপ টক মিশাইয়া রাখিত এবং উচ্ছেমুক্ত, নিমবোল, পলতা, হেলকা, গিমেশাক প্রভৃতির একান্তই সে ভক্ত ছিল। এই নইয়া ছড়নের মধ্যে বহু কথা কাটাকাটি বহু তর্ক, বহু কলহ, বহু মনোমালিন্য ঘটিয়া গিয়াছে; কিন্তু কল—‘যথা পূর্ব তথা পরং।’

অত্যন্ত অসন্তোষিত, রাগে গর্-গর্ করিতে করিতে পশুপতি শব্দ্য গিয়া শুইয়া পড়িল। শুইবার আগে সে ঘরের খোলা জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিল। খানিক পরে পাকুলও খাইয়া ঘরে আসিল—এক প্রথমেই বন্ধ জানালাগুলি খুলিয়া দিল। পাকুল ঠাণ্ডা সহ করিতে পারে, কিন্তু সামান্য গরম তাহার সহ হয় না। পশুপতির কিন্তু ঠিক বিপরীত; সে গরম সহ করিতে পারে, কিন্তু সামান্য ঠাণ্ডাতে তাহার অস্বস্তি বোধ হয়। সুতরাং জানালাগুলি খুলিয়া দেওয়াতে পশুপতি রাগে হুলিতে লাগিল।

পশুপতি পিত্তপ্রধান; একটুতেই রাগিয়া অস্থির হয় এবং সামান্য ঠাণ্ডাতেই তাহার মদি লাগে ও

ধক্ ধক্ করিয়া কাসে। তাহার দেহ শীর্ণ এবং শুষ্ক। বেখানে একটা কথা বলিলেই চলে, সেখানে অনর্গল বকা তাহার স্বভাব। পাকুল—কফপ্রধান; তাহার চেহারা স্থূল, কথা কম বলে এবং অল্পেতে রাগে না। সে বৃষ্টিতে পারিল যে, জানালা খোলাতে পশুপতি খুবই রাগিয়াছে, তত্ৰাচ সে তাহা গ্রাহ্য না করিয়া এবং কোন কথা না বলিয়া আলো নিভাইয়া দিল ও শুইয়া পড়িল।

পশুপতি আবার উঠিল এবং খোলা জানালা করটা পুনরায় বন্ধ করিয়া দিল।

পাকুল বলিল,—“একে গরমে আধমরা হোয়ে বাচ্চি, তার ওপর জানালা বন্ধ কোরলে একেবারেই মরে যেতে হবে।”

“সেই জন্তেই ত বন্ধ করনুম; কেন না, আধমরা হোয়ে থাকার চেয়ে যন্ত্রণা আর নেই। তার চেয়ে, একেবারে মরা শতগুণে ভাল।”

“উঃ! কি মুস্থিলেই পড়েছি!”

“শীগগীরই মুস্থিলের আসান্ যাতে হয়, তার জন্তেই বিশেষ চেষ্টা করচি। গড়ের মাঠে, খোলা হাওয়ায় তোমার একখানা ঘর তৈরীর জন্তে গভর্ণমেন্টের কাছে দরখাস্ত পেশ করেচি।”

একটুখানি বিবাক্ত হাসি হাসিয়া পাকুল বলিল—“বটে! তাই না কি? তা, গভর্ণমেন্ট কি উত্তর দিলে?”

গভর্ণমেন্ট উত্তর দিয়েছে, একেবারে মন্থমেন্টের ওপর, মুশিদাবাদের “হাজার হাজারী” ঘরের মত একখানা ঘর শীগগীরই তোমার জন্তে তৈরী কোরে দেবে; সত্যসাপ্ত বোলে একজন বড় কন্ট্রাক্টরের ওপর ঘর তৈরীর জন্তে পড়েছে।”

“বা: —বা:, খুব শুভসংবাদ তা হোলে। তা হোলে, এক কাজ করি, যে কদিন আমার হাওয়া-খানা না তৈরী হয়, সে ক’দিন ছোট ঘরখানাতে গিয়ে শুই। তুমি আবার আজ শুধু দুধ দিয়ে একমুঠো ভাত খেয়েছ; ঠাণ্ডা লেগে দুধটুকু কচিবুকে আবার জমে যাবে।” —বলিয়া পাকুল পাশের ছোট ঘরখানায় গিয়া শুইল। এ-ঘরের ভিতর দিয়াই তাহার দরজা ছিল।

শুইয়া শুইয়া পাকুল ভাবিতে লাগিল—‘বহা জ্বালাতনেই পড়া গেছে! আমি যে-পথে চলবো, ঠিক তার উলটো পথে যাবে! যে মেরেলোকটি আজ দুপুরবেলা এসেছিলেন, তাঁর নিশ্চয়ই কোন কন্যতা আছে। সব ঠিক ঠিক বোলে দিলেন, মার গুঁর আর আমার নামটা পর্য্যন্ত! চেহারাটা দেখলেই কেমন একটা ভক্তি হয়। দেখি, তাঁর দর্যাতে যদি এর কোনও উপায় হয়। বলে ত গেলেন, আমার মনের দুঃখু তিনি দূর কোরে দেবেন। কালোবাটের কাঁলীবাড়ীতে ছুটে আমাবস্তায় একুশটি কোরে কুমারী ভোজন করাতে হবে। তিনি নিজেই সে তার নিলেন। তার জন্তে পঞ্চাশটা টাকা দিলুম, কিছুতেই তা নিতে চান না; শেষে জোর কোরে দিতে তবে তা নিলেন। খাঁটি লোক না হোলে এমনটা কখনো হয় না। আজ ছ’বছর পরে ডগবান এইবার যদি একটু সুখ ভুলে চান, ত গুঁরই দর্যাতে তা হবে।’

ও-ঘরে এই সময়ে পশুপতি ভাবিতেছিল—‘কি মুন্সিলেই পড়া গেছে, একদিনের জন্তেও শাস্তি নেই! আজ ‘রাজঘোটক’ গুণে দিয়েছিল রে বাবা! ‘রাজঘোটকে’র ঠেনার অস্থির। ঐ সত্যসাপু বা

বল্লেন, কথাটা খাঁট কথা বটে। ‘অপার্মার’ হওয়ার দরকার, নইলে কিছুতেই শাস্তির আশা নেই। দেখি, এতদিন পরে যদি শাস্তি পাই, সে তা হোলে গুঁরই কৃপাতে পাব।’

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পশুপতির ছোট বাড়ীতে আজ বড় রকমের একটা সাদা পড়িয়া গিয়াছে। রানীকৃত তরিতরকারী, দই, সন্দেশ, রসগোল্লাতে ছোট ঘরখানা ঐ ঐ করিতেছে। দালানের একধারে একটা সের-আড়াই কই নাছ পড়িয়া রহিয়াছে; আর একধারে পশুপতি ঠোত জালিয়া চা তৈরীর কাজে ব্যস্ত। রান্নাঘরে পাকুল দুইটা উনান ধরাইয়া একটাতে ভাতের হাড়ি ও আর একটাতে মাংস চাপাইয়া দিয়াছে।

পাকুলের মেজ কাকা দশবৎসর নিরুদ্দেশের পর, অনেক সন্ধান করিয়া কাল পশুপতির বাড়ী আসিয়াছেন; সঙ্গে তাঁর স্ত্রী। দশবৎসর আগে, পাকুলের যখন বিবাহ হয় নাই—তখন সুবোধবাবু ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সম্মুখ বাড়ী হইতে চলিয়া বান। তারপর হইতে তাহার আর কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যায় নাই। হঠাৎ হুপ্তাখানেক হইল তিনি কলিকাতায় ফিরিয়াছেন এবং ঘেরপভাবে এককাপড়ে কপর্দক-শূন্য অবস্থায় গৃহ হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন, সেরূপভাবে ফিরেন নাই। বিলাসপুরে কনট্রাকটরী কাজ করিয়া প্রায় লাখ-দুই টাকার মালিক হইয়া ফিরিয়াছেন।

কলিকাতায় ফিরিয়া সুবোধবাবু গৃহে বান নাই, কোন একটা বড় হোটেলে থাকিয়া পাকুলের সন্ধান করেন এবং সন্ধান মিলিবামাত্র তাহার বাড়ীতে আসেন। পাকুলকে তিনি ভয়ানক ভালবাসিতেন।

চা করিতে করিতে পশুপতি পারুলের উদ্দেশে হাসিয়া বলিল—“মাংসে যেন টমেটো বা কোনরকম টক দিও না; একটু ঝাল মিষ্টি দিও।”

কথাটা পারুল ভালো করিয়াই শুনিল এবং পরক্ষণেই ডিসের উপর আধখানা করিয়া কাটা যে টমেটোগুলি ছিল, সেগুলি মাংসের হাড়িতে ঢালিয়া দিল।

দুইচারিদিন পরে একদিন দুপুর-বেলা আহাঙ্গাদির পর পারুলের কাকীমা পারুলের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহে কহিলেন—“তোমার কি চেহারা ছিল পারুল, আর এখন কো হোয়ে গেছিস! যখন আমরা কোলকাতা ছেড়ে চলে যাই,—তখন তুমি কি সুন্দর দেখতে ছিলি। এখন তোমার আর সে রং-ও নেই, সে লালিত্যও নেই।”

“কি-কোরে থাকবে কাকীমা। সংসারে শাস্তি বোলে কিছু নেই। আমি বাই এপথে, ত তোমার জামাই বাবে ও পথে। আর তা ছাড়া—সংসারে নিত্য অভাব, নিত্য টানাটানি। একটা বাধা-ধরা চাকরী ত নেই, জমি জায়গার দালালী কোরে কি আর । ও-বছর কী অসুখটা হোল কাকীমা! তিন মাস ধরে ঠার ভুগি; সেই থেকেই ত শরীরটা গেল একেবারে ভেঙ্গে।”

স্নেহভরা কণ্ঠে কাকীমা কহিলেন—“শোন মা পারুল; মাস-খানেক কি মাস দুই কোনও ভালো জায়গায় গিয়ে একটু হাওয়া বদলে আর। কতই আর খরচ লাগবে। শ'-পাঁচকই লাগুক, সে টাকা আমরা দোবো এখন। তুমি কোথায় বেতে চাস বল।”

অপরাত্নে বৈঠকখানা ঘরে ঘুম হইতে উঠিয়া চক্ষু চাহিতেই সুবোধবাবু দেখিলেন, পারুলের কাছে বসিয়া

পশুপতি। উঠিয়া বসিয়া কহিলেন—“খুব ঘুমিয়েছি আজ; বোধ হয় ঘটা তিনেক হবে। দিনের বেলা তুমি বুঝি ঘুমোও না?”

“আমার ঘুম হয় না, কাকাবাবু। দিনেও হয় না, রাতেও হয় না।”

মাথাটা অল্প নাড়িতে নাড়িতে সুবোধবাবু কহিলেন—“তোমার স্বাস্থ্যটা মোটেই ভালো নয়, বাবা।”

“ভালো ত নয়ই কাকাবাবু; ডিসপেনসারি; চাপা অশ্বল। দালালী কাজ করি, নাইবার খাবার একটা বাধা টাইম ত নেই।”

“তা ত ঠিক, কিন্তু তা করলে ত চলবে না; শরীরটাকে সর্বাগ্রে ঠিক রাখা চাই, বাবা।”

“ও মাসে বড়-অসুখটা হোল; একেবারে বাসিন্দারি ডিসেনট্রী; তাইতেই দেহটাকে একেবারে কাবু কোরে দিলে।”

সমবেদনার স্বরে সুবোধবাবু কহিলেন—“কাবু কোরে দিলে ত চলবে না বাবাজী। এক কাজ কর; শ'হুন্টার টাকা আমি না হয় দোবো এখন, পারুলকে নিয়ে তুমি কোথায়ও দিনকতক চেষ্টা যাও।” তাহার পর মিনিটখানেক কি ভাবিয়া কহিলেন—“হাঁ, তাই যাও। আমরা মাসদুয়ের জন্য কেটনগরে বাব, সেখানে একটু বিশেষ কাজ আছে। তোমরা এই দুটো মাস কোন ভালো জায়গায় গিয়ে থেকে এসো। বা খরচপত্র হয়, সব আমি দোবো এখন।”

সব ঠিক হইয়া গেল। অর্থাৎ শীঘ্রই কোন বৈষয়িক ব্যাপারে সুবোধবাবুকে মাস দুয়ের জন্য কেটনগরে গিয়া থাকিতে হইবে। কেটনগরে সুবোধবাবুর স্বস্তরবাড়ী। সেই দুইমাস পশুপতি ও পারুল কোন ভাল হানে যেরূপে জন্ম গিয়া থাকিবে।

কিছু সোজা ব্যাপারটার গোল বাধিয়া উঠিল।
পশুপতি বলিতে লাগিল—“আমি যাব পুরী। দিকি
সমুদ্র দেখবো আর সমুদ্রের হাওয়া খাবো। না গরম,
না ঠাণ্ডা; চমৎকার থাকা হাবে।” এদিকে পারুল
পশুপতিকে শোনাইয়া শোনাইয়া বধন-তখন বলিতে
লাগিল—“পুরী! মরে গেলেও যাব না; শেষকালে
পা পিছনে সমুদ্রের জলে ডুবে মরি আর কি!
পুরী কিছুতেই যাওয়া হবে না। যাব—মধুপুর।
দিকি পাহাড় দেখবো, আর শালবনের হাওয়া খাব।
ওখানে এসময় মোটেই গরম নেই, বেশ ঠাণ্ডা; চমৎকার
থাকা যাবে!”

দিন দু'টার পরে কাকীমা পারুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—
“কোথায় যাওয়া তোরা ঠিক করলি না?”

“মধুপুর যাব, কাকীমা।”

স্ববোধবাবু পশুপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“বাবাভী,
কোথায় যাবে কিছু ঠিক করলে কি?”

“করিচি কাকাবাবু; পুরী।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

‘মধুপুর ছাড়া আমি আর কোথাও যাবো না।’

‘তার মানে?’—অদ্ভুত গোছের বাক্য মুখভঙ্গীতে
প্রশ্ন করিয়া পশুপতি পারুলের মুখের দিকে একদৃষ্টে
তাকাইয়া রহিল। পারুলও মুখখানা ভীমরুলের মত
করিয়া জবাব দিল—‘তার মানে, পুরী-টুরি যমের বাড়ী
আমি যাব না। আমি মধুপুর যাব।’

একটা তীব্র উপহাসের ভাবে পশুপতি কহিল—
‘মধুপুরে বুঝি তোমার মধু আছে, তাই খেতে যাবে
সেখানে!’

‘হ্যাঁ, তাই ত যাবো; মধুটা আমার পেটে খুব ময়;
পুরী, নুচি ময় না—অহল হয়, চোঁট-চেকুর ওঠে।’

কট্‌মট্‌ করিয়া পারুলের মুখের পানে শানিকক্ষণ
চাহিয়া থাকিবার পর পশুপতি অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে
কহিল—‘মধুপুরই যাবে?’

‘হ্যাঁ, যাবো।’

‘পুরী যাবে না?’

‘না যাবো না।’

সহসা পশুপতির চীৎকারে ঘরের কড়িকাঠ ভাঙ্গিয়া
পড়িবার উপক্রম হইল—‘আলুৎ বেতে হবে।’—
বাতাসের ঘনচাপে, কড়ি তিতর তিতর ভাঙ্গিলেও পড়িয়া
যাইতে পারিল না। নিজেই তিতরকার কম্পনে
পশুপতি বয় হইতে ছিটকাইয়া বাহিরে গিয়া পড়িল;
হকার দিয়া বলিল—‘তোমার বাড়ি যাবে!’—নিতর
ঘরের বাতাসটুকুর মধ্যে ‘রে-রে-রে-রে’ করিয়া প্রতিধ্বনি
বুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কাকা-কাকী আর দুপুরবেলা বাড়ী ছিলেন না,
কি-একটা দরকারে কোথাও গিয়াছিলেন। বৈকালে
বাসায় ফিরিয়া দেখিলেন, ঘরের মেঝের উপর পারুল
আঁচলখানা বিছাইয়া শুইয়া আছে; পশুপতি বাড়ী নাই;
ঘরের দ্রব্যাদি ইতস্ততঃ এলো-মেলো ছড়ানো; পাথের
ডাবর আর তার ছোট বাটিগুলো ছত্রাকারে মেঝের
চারিদিকে গড়া-গড়ি যাইতেছে; রোয়াকের দড়িতে
পারুলের নতুন শাড়ীখানা হুকালি হইয়া অর্ধেকটা তার
ধুলার লুটাইতেছে। কয়দিন এ বাড়ীতে বাস করিয়াই
তাহারা পারুল ও পশুপতির হাবভাব অনেকটা জানিতে
পারিয়াছিলেন; সুতরাং বুঝিলেন, উভয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই
বগড়া হইয়াছে।

সন্ধ্যার পর ছোট ঘরখানার মধ্যে বসিয়া স্ববোধবাবু
ও তাঁর স্ত্রী মুহূর্তে ইহাদের সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা
করিতেছিলেন। পারুলের কাকীমা কহিলেন—‘হু’জনে

একেবারেই মিল নেই! আমার মনে হয়, শুভদৃষ্টির সময়ে কেউ কোন 'দোষ' করেছে। নিশ্চয়। নইলে এরকম কণ্ঠখনো হয় না।'

সুবোধ বাবু কহিলেন—'তোমাদের ঐ সব কুসংস্কার। আসল কথা কি জান? টাকা পয়সা। সংসারে অভাব-অনটন থাকলেই ঝগড়া-ঝাটি লেগেই থাকে। কোথায় পাঁচশো টাকা দালানী পাবার কথা ছিল, তার দশটা টাকা দিলে, তিনশো টাকা ওকে ফাঁকি দিলে; সুতরাং ওর মাথা গরম হোয়েই আছে। তার-র, সময়ে নাওয়া নেই খাওয়া নেই, মেজাজ তিরিচ্ছে হোয়েই আছে। মাসে মাসে একটা বাধা-আর হোক দেখি, কেমন আর ঝগড়া-ঝাটি হয়!'

'তা হোলো, আমার মনে হয়, বিয়ের সময় কোন ধারণা লোক কোন 'দোষ' করেছে।' তারপর হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'ওরা না হয় নতুন কোরে আর একবার 'মালা-বদল' করুক।'

হাসিতে হাসিতে সুবোধ বাবু কহিলেন—'তার মানে, শুভদৃষ্টির দ্বিতীয় সংস্করণ?—কে রে, পাক নাকি?'—ভেজানো দরজার ওধারে কার পায়ের শব্দ হইল। কিন্তু পাকুল নহে। পাকুল রান্নাঘরে কাকাবাবুর অস্ত্র হালুয়া ও চা তৈরী করিতেছিল; আর ভাবিতেছিল যে, সেই মেয়ে লোকটি জলজ্যান্ত ফাঁকি দিয়া তাহার কাছ হইতে পঞ্চাশটি টাকা লইয়া গিয়াছে। উঃ! কী সাংঘাতিক! মেয়ে-লোকও এ রকম জোচ্চোর হয়!'

পায়ের শব্দ—পশুপতির। পশুপতি অন্ধকারে দালানে দাঁড়াইয়া খুড়-খুড় ও খুড়-খাশুরী কথামূলি শুনিতেছিল। সুবোধ বাবুর গলার আওয়াজ পাইয়া টিপি-টিপি চলিয়া আসিয়া বৈঠকখানা যবে প্রবেশ করিল

এবং চৌকিখানার উপর শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল—'সত্যসামুটা মনে হচ্ছে—একটা পাকা-চোর! অপামার্গ-টপামার্গ কিছুই করে দিলে না, অথচ ফাঁকি দিয়ে কতকগুলো টাকা ধোলায় নিয়ে গেল!—উঃ!'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দিন পনের পরে।

সুবোধবাবুর কেঠনগর যাওয়া হয় নাই। হঠাৎ বৌবাজারের দিকে একখানা বাড়ী বিক্রয়ের সংবাদ পাইয়া এ কয়দিন তিনি তাহারি পিছনে ব্যস্ত ছিলেন। আজ সেই বাড়ীখানা তিনি তেরো হাজার টাকায় কিনিয়া লইলেন। কিন্তু নিজের নামে বা স্ত্রীর নামে কিনেন নাই; দলৌল রেজেষ্ট্রি হইয়াছে—পশুপতি ও পাকুলের নামে।

সন্ধ্যার পর তিনি ও তাঁর স্ত্রী বড় ঘরখানার মধ্যে বসিয়াছিলেন; সামনে একটু তফাতে বসিয়াছিল—পশুপতি; আর কাকীমার গা বেঁসিয়া, ঘোমটা দিয়া বসিয়াছিল পাকুল। মূল দলিলের খসড়াখানা সুবোধ বাবু পাকুলের হাতে দিয়া কহিলেন—'তোমার বিয়েতে তোদের আমি কিছু বোতুক দিতে পারি নি—সেটা আজ দিনুম! বাড়ীখানায় এখন মাসে ১১৫ টাকা ভাড়া আদায় হয়; একটু ভাল কোরে মেরামত করলে, শ'দেড়েক হাতে পারে এবং হিসাব কোরে চললে, তাইতেই তোদের দু'জনের সংসার বেশ-একরকম চলে যেতে পারবে।'

পশুপতি পুলকের আতিশয্যে দাঁড়াইয়া উঠিল এবং টিপ্-টিপ্ করিয়া সুবোধবাবু ও কাকীমার পারে প্রণাম করিল। পাকুলও সেইখানে বসিয়া উজ্জয়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল।

কাকীমা কহিলেন—'কিন্তু বাবা, একটা কথা বলে রাখি; পাক, তোকেও বলচি মা। এর পর তোদের দু'জনের মধ্যে যদি কখনো ঝগড়া-ঝাটি হয়, তাহলে

বে আগে ঝগড়া করবে, বাড়ীর ওপর তার আর কোন দাবী থাকবে না—। এ কথাটা তোমরা দু'জনে মনে করে রাখবে।’

স্ববোধবাবু কহিলেন—‘দলিলের মধ্যে এ কথাটা খুব ভাল করেই লেখা আছে, তোমরা পড়ে দেখো। আর পরশু আমরা কেঠেনগর যাব। তোমরাও এ দুটো মাস একটু ঘুরে এস। মধুপুরই যাও; এ সময়টা মধুপুর খুবই ভাল; কি বল পশুপতি?’

পশুপতি কহিল—‘আজ্ঞে, মধুপুরেই ত যাব। কী সুন্দর জায়গা! চারদিকে ছোট ছোট পাহাড় আর তার গা ঘেঁসে ছোট ছোট পাহাড়ী কণা বেন বুক-ভরা রূপোর দানা নিয়ে স্থির হোয়ে রয়েছে! শালবনের হাওয়া একবার গায়ে লাগলে

কথাটা শেষ হবার আগেই, পারুলের দিকে চাহিয়া স্ববোধ বাবু কহিলেন—‘পুরী যাবার ইচ্ছে হয়, তা’ও যেতে পার। কোথা যেতে চাস বল, পারুল। পুরীও খুব ভালো জায়গা; তাই বাবি নাকি?’

‘হাঁ কাকাবাবু, যাবো, কেমন সমুদ্র দেখবো— সমুদ্রের ধারে বেড়াবো,—সূর্যোদয় দেখবো। চমৎকার জায়গা!’

স্ববোধ বাবুর মুখে একটা গোপন হাসির রেখা ফুটিয়া সরিয়া গেল, তাহা কাহারও লক্ষ্যে আসিল না।

* * *

পুরী।

অপরাত্নের সমুদ্র-সৈকত।

তাহারি কোন জনশূন্য অংশে পাশা-পাশি বসিয়া—
পশুপতি ও পারুল।

পশুপতি কহিল—‘আমার দিকে চাও; ভালো কোরে চাও।’

পারুলের পুলকভরা দুই চোখের দৃষ্টি পশুপতির মুখের উপর আসিয়া স্থির হইল। সেই অবসরে, পশুপতি তাহার পকেট হইতে একছড়া ফুলের মালা বাহির করিল এবং পারুলের গলায় পরাইয়া দিতে দিতে হাসিয়া কহিল—‘কাকীমার আদেশ এবং ইচ্ছা। অর্থাৎ, দ্বিতীয় সংস্করণ শুভদৃষ্টি আর মালাবদল।’

পারুলও হাসিতে হাসিতে নিজের গলা থেকে মালা ছড়াটা খুলিয়া তাহা পশুপতির গলায় পরাইয়া দিল।

বাক্সালার আশুতোষ *

অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম-এ, বি-এল

যে মাসের শেষভাগে মাত্র কয়েকটি দিনের জন্য যখন আমাদের জিলায় জিলাসম্মেলনে যোগদানের নিমিত্ত কনিকাতা পরিত্যাগ করি, তখন কে জানিত যে ইহারই মধ্যে বাক্সালার মস্তকে এমন অশনিপাত হইবে? বাক্সালার বুকের ধন আশুতোষকে পাটগৌপ্ত্রে হারাইতে হইবে? সৌম্যসুন্দর আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের মহাপ্রয়াণের দুইদিন পরেই যখন বাক্সালার সার্থকনামা পুরুষশার্দ্দূল আশুতোষ যুথোপাধ্যায়ের অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত মৃত্যু-সংবাদ প্রবণ করিলাম, বাস্তবিক মনে হইল দেশের উপর বিধাতার কি অভিযোগ! এই বিরাট পুরুষ, যিনি তাঁহার সরকারী কর্মজীবনের বিবিধ গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্যের মধ্যেও দেশের কল্যাণের জন্য এত চিন্তা করিয়াছিলেন, এত চেষ্টা করিয়াছিলেন, এত শক্তি ব্যয় করিয়াছিলেন, যিনি এই কর্মজীবন হইতে কতক পরিমাণে অবসর গ্রহণ করিবার সময়ে সমস্ত শক্তি এখন দেশের সেবার নিয়োগ করিতে পারিবেন বলিয়া কত উৎকুল হইয়াছিলেন, কত নূতন কর্মপ্রচেষ্টার করনা করিয়াছিলেন, যাহাঁকে ভারতবর্ষের এই সন্ধিক্ষণে রাজনৈতিক সমরক্ষেত্রে একজন মহারথারূপে পাইতে আশা করিয়া দেশবাসী কত তরঙ্গা অনুভব করিতেছিলেন—ঠিক এই সময়েই এই বিরাট শক্তিকে বিধাতা তাঁহার কর্মক্ষেত্রে হইতে অপমৃত করিলেন। ভারতে যেন একটা ইন্দ্রপাত হইল; বাক্সাল যেন নিসহায় নিসঙ্কল হইল। আমরা বম্বদৃষ্টি ;

বিধাতার নিগূঢ় রহস্য আমরা ভেদ করিতে পারি না; হয়ত ইহার মধ্যেও কোন মহান মঙ্গলের বীজ নিহিত থাকিতে পারে; কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে আমাদের মনে হয় যে, এই যে নিদারুণ বিপৎপাত ইহা সহজে পূরণ হইবার নহে। আশুতোষের মত মনীষী, আশুতোষের মত কৈশী, আশুতোষের মত তেজস্বী পুরুষ কোন দেশে শতাব্দীতে এক জন জন্মার কিনা সন্দেহ; বিশেষতঃ আমাদের মত ক্ষীণজীবী নিরীহ গতানুগতিকের দেশে আশুতোষের মত পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব একটা phenomenon বলিলেই হয়। তাঁহার আকস্মিক তিরোথানে দেশের যে কী সর্বনাশ হইল তাহার ইয়ত্তা করা দুক্ল।

আশুতাবুর জীবন কাহিনী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করার এবং জাতীয় জীবনে আশুতাবুর স্থান নির্দেশ করিবার সময় এখনও আসে নাই; এবং তাহা করিবার স্থানও ইহা নহে; এবং সে চেষ্টা করিবার অধিকারীও আমি নহি। এখানে শুধু তাঁহার জীবনের ও চরিত্রের মোটা মোটা কয়েকটা কথা যাহা স্বতঃই মনে উদ্ভিত হয় তাহারই বৎসামাত্র আলোচনা করিব।

আশুতোষ ব্রাহ্মণ; বংশে ব্রাহ্মণ, জীবনেও আশুতোষের ব্রাহ্মণ্যগুণের কোনো অভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। ব্রাহ্মণের সহজ অনাড়ম্বর জীবনযাপন, ব্রাহ্মণের গভীর মনোবা, ব্রাহ্মণের চির অতৃপ্ত জিজ্ঞাসা—এই সবই তাঁহাতে ছিল। কিন্তু যাহা আশুতোষকে ব্রাহ্মণসাধারণ হইতে

বিশেষতঃ প্রদান করিয়াছিল, যাহা কর্মক্ষেত্রে আশুতোষকে
 • প্রচণ্ড শক্তিতে পরিণত করিয়াছিল, তাহা ছিল অপর
 একটি গুণ—তাহা আশুতোষের ক্রিয়াক্ষমতা। এই ক্ষমতা তেজস্বী
 আশুতোষকে এই নির্জীব নিশ্চেষ্ট দাসতাবাপন্ন বিপন্ন
 আত্মপ্রত্যাহীন দেশে অবিসংবাদিত নেতৃত্বে উন্নীত
 করিয়াছিল। ইহার বলেই তাঁহার দেশবাসী স্বতঃই
 তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন, বিপদে সংকটে
 নিকৃপায় হইয়া তাঁহাকেই যেন এক পরম আশ্রয় পরম
 • মহীয় বলিয়া মনে করিতেন। ব্রততী যেনন মহীকহকে
 আশ্রয় করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে সেই রকম একান্ত
 ভাবেই দেশবাসী তাঁহাকে আঁকড়াইয়া থাকিতেন। এই
 ক্রিয়াক্ষমতার প্রভাবেই তিনি শুধু তাঁহার মিত্রের
 ভক্তিভাজন ছিলেন না, তাঁহার শত্রুর, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর
 ভয় ও শ্রদ্ধার ভাজন ছিলেন। আমাদের মত ভদ্রলোকের
 দেশে মিষ্টত্ব কমনীয়ত্ব ও মাধুর্য্য অনেকেরই থাকে।
 আশুতোষেরও যে তাহা ছিল না তাহা নহে—বাঁহারা
 তাঁহার নিকট সম্পর্কে আসিয়াছেন তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ
 করিয়াছেন—কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার যে তিক্তত্ব,
 রুঢ়ত্ব ও গাভীঘোর সমাবেশ ছিল তাহাই তাঁহাকে
 কর্মক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা করিয়াছিল। রঘুবংশে
 অমরকবি কালিদাস রাজর্ষি দিলীপের বর্ণনা করিতে গিয়া
 যে চিত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, বাস্তবিকই অক্ষরে অক্ষরে
 সে বর্ণনা বঙ্গালার আশুতোষের সঙ্গে মিলিয়া যায় :

ব্যটোরকো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংস্তর্মহাভুজঃ ।

আত্মকর্মক্ষমং দেহং ক্ষাত্রো ধর্ম ইবাশ্রিতঃ ॥

• সর্বাতিরিক্তন্যারেণ সর্বতেজোহতিভাবিনা ।

স্থিতঃ সর্বোন্নতেনোর্ব্বাং ক্রাস্তা মেরুরিবাস্তনা ॥

আকারসদৃশপ্রজঃ প্রজরা সদৃশাঙ্গকঃ ।

আগমৈঃ সদৃশারম্ভ আরম্ভসদৃশোদয়ঃ ॥

ভীমকট্টৈস্ত নৃপগুণৈঃ স বভূবোপজীবিনাম্ ।

অধুগ্যাশ্চাভিগম্যন্ত বামোরৈত্তুরিবার্ণবঃ ৷

কালিদাসের তেজোময়ী তুলকা অপূর্ণ আলোখ্যের
 অবতারণা করিয়া সূর্ত্তিমান ক্ষাত্র তেজকে ফুটাইয়া
 তুলিয়াছে, বঙ্গালার প্রকৃতই গৌরবের ও শ্রাধার বিষয়
 যে রেখার রেখার সেই আলোখ্য বঙ্গালার আশুতোষের
 চিত্রই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই বিরাট্ শক্তিমান দেহ,
 সেই তীক্ষ্ণ সুগভীর মনোবা, সেই অক্লান্ত অশ্রান্ত কঠোরতা,
 সেই আশ্রিতগণের অভিগম্যতা, সেই প্রচণ্ড অধ্যাত্মতা,
 সেই অটুট আত্মপ্রত্যাহ—সকলই আশুতোষের ছিল।
 ইহার বলে তিনিও তাহার স্বদেশে মেরুর স্থায়ী সগৌরবে
 অবস্থিতি করিতেন। আশুতোষের চরিত্রের এতদপেক্ষা
 সত্যতর বাস্তবতর বিশ্লেষণ হইতে পারে কিনা সন্দেহ।

আমার মনে হয় ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্র গুণের এই অপূর্ণ
 সমাবেশই আশুতোষের চরিত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার
 বিষয়; কিন্তু আর একদিক দিয়াও তাঁহার চরিত্রের
 বিশ্লেষণ কতকটা পরিমাণে করা যাইতে পারে। সেটি
 হইতেছে তাঁহার জীবনে ও চরিত্রে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের
 অদ্ভুত সংমেলন। তিনি জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু
 পর্যন্ত খাটি প্রাচ্য ছিলেন, খাটি বঙ্গালী ছিলেন।
 চিরকাল লোকমুখে ‘আশুতাবু’ বলিয়া সম্ভাবিত হইতে
 গৌরব বোধ করিতেন। কখনও তিনি ‘মুখার্জী সাহেব’
 বলিয়া পরিচিত হন নাই। অথচ কর্মজীবনে বঙ্গালী
 উচ্চতম যে যে পদ কামনা করিতে পারে, সেই সমস্ত
 পদ প্রতিষ্ঠা তাঁহার হইয়াছিল; পাশ্চাত্য গভর্নমেন্টের
 অধীনে কার্য্য করিয়া জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করিয়া-
 ছিলেন; বড় বড় সাহেব-স্ববার সঙ্গে, লাট-বেলাটের সঙ্গে
 মিশিবার ও তাঁহাদের সঙ্গে একাসনে বসিবার যে সুযোগ
 তাঁহার হইয়াছিল, তাহা অধিকাংশ ভারতবাসীরই হয়

না। তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন, প্রধান বিচারপতি হইয়াছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন, শেষকালে সেই পদে অধিষ্ঠিত না থাকিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কর্ণধার ছিলেন; তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন; তিনি কলিকাতার গণিতসভার সভাপতি ছিলেন; তিনি কাউন্সিলের মেম্বর হইয়াছিলেন; তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের মেম্বর হইয়াছিলেন; আর যে কত অগণিত সরকারী ও বেসরকারী অঙ্কঠান ও প্রতিষ্ঠান সভা ও সমিতির সহিত বিশিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই—যে পদগৌরবের শতাংশের একাংশ পাইলে বাঙ্গালী সাহেব বনিয়া যায় সেই সমস্ত পদগৌরবের অধিকারী হইয়াও তিনি ‘আশুবাবুই’ চিরকাল রহিয়া গেলেন। আর সরকারী কাজের কয়েক ঘণ্টা সময় ব্যতীত তাঁহার সেই চিরন্তন লম্বা কোট মোটা চাদর সাদাধুতি ও কিতাহীন জুতাও কোনদিন ফুরাইল না। একথা সকলেই জানেন তিনি সাক্ষাৎভাবে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিতে সন্মত পান নাই; কিন্তু নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা নিজের বেশভূষায় আচারে ব্যবহারে পাশ্চাত্য হাবভাব ও বিলাস উপকরণ বর্জন করিয়া তিনি যে উদাহরণ দেশবাসীকে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালার জাতীয় সম্মানজ্ঞান কম উজ্জ্বল হয় নাই। এই স্বদেশভক্তি, স্বদেশের গৌরবে নিজের গৌরববোধ, বিদেশীর কাছে নিজেকে তখনও খাটো ও হীন ও অপমানিত না করার এই ভাব আশুবাবুর প্রত্যেক কর্মপ্রচেষ্টারও ভিতর লক্ষ্য করা যায়।

আশুবাবুর জীবনের প্রধান বাহা দান—দেশে শিক্ষার অপরিসীম বিস্তার—তাঁহারও ভিতরের কথা এই দেশপ্রাণতা। সমস্তদিকে কার্য্য করিবার তাঁহার সন্মত

ঘটিয়া উঠে নাই সত্য, কিন্তু যে দিকটায় হস্তক্ষেপ করিবার তিনি অবকাশ পাইয়াছিলেন—শিক্ষার দিক—সেদিকটাই তাঁহার আপ্রাণ প্রচেষ্টাই এই ছিল যে তিনি বাঙ্গালার ঘরে ঘরে শিক্ষার আলোক বিকিরণ করিবেন। লর্ড কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় আইনের মূলনীতির বিরুদ্ধে সেই আইনই অবলম্বন করিয়া আশুবাবু যেরূপে তাঁহার আদর্শ কার্য্য পরিণত করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার অদ্বুত কর্ম্মনৈপুণ্য ও অকপট স্বদেশভক্তিরই পরিচয় দিয়াছে। শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাপ্রদানের প্রণালী লইয়া তাঁহাকে উচ্চতর রাজকর্ম্মচারাদিগের সহিত কত যে লড়াই করিতে হইয়াছে তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। আশুবাবুর মুখে শুনিয়াছি যখন লর্ড হার্ডিং প্রথম বড়লাট হইয়া কলিকাতা আসেন তখন একদিন তাঁহার সহিত আশুবাবুর শিক্ষাবিষয়ে আলোচনা হয়। হার্ডিং বলেন যে শিক্ষাপদ্ধতিকে সংস্কার করিতে হইবে; standard নীচু হইয়া গিয়াছে, better education দিতে হইবে। তখন আশুবাবু নির্ভীকভাবে বড়লাটকে বলেন, ‘I like your better education, but if by better education you mean less education I shall have none of it.’ আশুবাবুর এই স্পষ্ট বাক্যে বড়লাট হার্ডিং বেশ একটু ধমকিয়া গেলেন। তারপর যখন কলিকাতার বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠাকরে আশুবাবুর অদম্য অধ্যবসায় ও প্ররোচনার ফলে স্যার তারকনাথ পালিত তাঁহার বহুমূল্য সম্পত্তি দান করেন, তখন আশুবাবুই জোর করিয়া বলেন যে, দেশের লোকের অর্থে প্রতিষ্ঠিত এই বিজ্ঞান কলেজে দেশীয় অধ্যাপকই শুধু নিযুক্ত করিতে হইবে—Tom, Dick ও Harryর মত সাহেবদের জন্ত ত সরকারী কলেজই রহিয়াছে। তারকনাথ একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। তখন

আন্তাবু তাঁহাকে বাহা বলিয়াছিলেন, আন্তাবুর নিজের
 মুখে শোনা সেই কথা, এখনও আমার কাণে বাজিতেছে—
 ‘পালিত সাহেব, কালোচামড়া হয়ে একথা আপনি
 বলতে পারবেন না যে, কালোচামড়া ছাড়া আমার চেয়ারে
 কেউ বসতে পারবে না?’ স্বজ্ঞাপ্রীতি, জাতীয়
 আত্মসম্মানবোধ এতই তাঁহার বক্তৃতা ছিল। তাঁহার
 হিন্দু যে খুব গোড়া ছিল তাহা নহে, তিনি সামাজিক
 সংস্কারের খুবই পক্ষপাতী ছিলেন, প্রবল আন্দোলন
 সঙ্গেও বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু
 বিন্দুলী সন্মুখে তিনি তাঁহার হিন্দু, তাঁহার orthodoxy
 সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া চলিতেন; কোনদিন গভর্ণমেন্ট হাউসে
 dinner খান নাই, নিমন্ত্রিত হইলে বলিতেন যে তিনি
 orthodox হিন্দু, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে না পারিয়া
 হুঁশিত আছেন। এই আত্মসম্মানবোধ ও অসাধারণ
 ব্যক্তিত্বের বলেই বিদেশীয়গণও তাঁহাকে ভয় করিয়া
 চলিত, তাঁহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না এবং
 তাঁহার সন্মুখে খাটো হইয়া থাকিত। সত্য কথা
 বলিতে কি, সাহেব এক করিয়া রাখিবার এই বাঙ্গালী-
 জাত অসাধারণ শক্তির জন্য তাঁহার স্বদেশীয়গণ মনে
 মনে অত্যন্ত গর্ব অনুভব করিত। এই প্রসঙ্গে
 আন্তাবুর নিকট শ্রুত একটি গল্প বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক
 হইবে না। ১৯১৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে Post-Graduate
 Department প্রতিষ্ঠা বিষয়ে নির্ধারণ করিবার নিমিত্ত
 ভারত গভর্ণমেন্টের নির্দেশানুসারে একটি কমিটি গঠিত
 হয়। কমিটিতে সাহেবও অনেক ছিল বাঙ্গালীও
 অনেক ছিল। আন্তাবু ছিলেন সভাপতি। সকলেই জানিত
 এই ব্যাপার লইয়া একটি তুফল বুদ্ধ কমিটিতে হইবে;
 কারণ ভারত গভর্ণমেন্ট আন্তাবুর করিত এই Post-
 Graduate Departmentকে বড় স্নেহের চক্ষে

দেখিতেন না। স্মরণ্য সকলেই আশঙ্কা করিয়াছিল
 যে সাহেবের বিরোধী হইবে। এডার্সন সাহেব ছিলেন
 সেক্রেটারী। কার্যকাণ্ডে দেখা গেল যে কমিটিতে
 কোন মতানৈক্য নাই, তাঁহার unanimous report
 দিয়া আন্তাবুর মতই সমর্থন করিয়াছেন। সেই সময়
 স্বনামধন্য Sharp সাহেব ছিলেন ভারত গভর্ণমেন্টের
 শিক্ষাবিভাগে। তিনি ত এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে
 চটিয়াই আসেন, তিনি এডার্সন সাহেবকে কড়া চিঠি
 লিখিলেন, তোমরা সব কী করিয়াছ? তোমরা কি
 সব ঘুমাইতেছিলে? তোমরা সব সাহেব থাকিতে,
 আন্তাবু কী করিয়া unanimous report বাহির
 করিতে পারিলেন? ইহার কিছুদিন পরে Sharp সাহেব
 কলিকাতায় আসিলেন এবং এক ডিনারে তাঁহার সহিত
 এডার্সনের দেখা হইলে পুনরায় অমুযোগ করিলেন।
 তখন এডার্সন যে জবাব দিলেন তাহা বাস্তবিকই
 উপভোগ্য! তিনি বলিলেন, Well, Mr. Sharp, it
 is all very easy to write sharp letters from
 Simla: but when you have to meet that
 man face to face, it is quite another question.

এই স্বদেশিকতা, অনেক হয়তো বলিবেন উৎকট
 স্বদেশিকতা, থাকিলেও তিনি প্রতীচাকে ঘৃণা করিতেন
 না; প্রতীচ্যের বিজ্ঞানসাধনা, প্রতীচ্যের অদ্ব্য কর্মশক্তি,
 প্রতীচ্যের অক্লান্ত উত্তম তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা
 করিতেন, এবং শুধু তাহাই নহে, নিজের জীবনে
 প্রতীচ্যের সদৃশগুণলী তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন।
 আন্তাবুর কর্মপ্রিয়তা প্রবাদে পরিণত হইয়াছে—
 আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান ও কর্মবিমুখ দেশে সত্যি
 তাঁহার কর্মপ্রিয়তা ও কর্ম করিবার শক্তি অতি অপূর্ণ
 ছিল—এমন কি পাশ্চাত্যেরাও তাহাতে বিস্মিত হইতেন

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে আন্তবাবুর স্বত্বসভার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি Sir Lancelot Sanderson সাহেব বলিয়াছেন, 'আমি আশ্চর্য্য হইয়া যাইতাম যে আন্তবাবু কেমন করিয়া হাইকোর্টে সারা দুপুর তত শান্তিকর কাজ করিয়া আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে আনিয়া রাত্রি নয়টা দশটা অবধি খাটিতেন। আমার তো এক বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের তাইস-চান্সেলারী করিয়াই আর স্বাস্থ্য কুলাইল না।' Sanderson সাহেব তাঁহার মনের কথাই বলিয়াছেন। এর আগেই বলিয়াছি যে হাইকোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও যে তাহার আর কত কাজ ছিল সংখ্যা করা যায় না। আমাদের আশ্চর্য্য মনে হইত, ঐ মোটা দেহ লইয়া কিরকমে তিনি এত কাজ পারিয়া উঠেন, আর এত কাজের চাপেও নিজে কোনদিন বিরক্ত হইতেন না, অথবা কাজ ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিতেন না। একদিনের একটি ঘটনার উল্লেখ করি। কি কার্যব্যপদেশে ঠিক আমার শ্রবণ নাই সন্ধ্যার পরে আন্তবাবুর বাসায় গিয়াছি; তখনই তিনি তখনও আসেন নাই; হাইকোর্টের পর কোথায় কোন মিটিং ছিল, খবর নষ্টবতঃ Asiatic Societyতে, সেইখানে তিনি সভাপতি, তথায় গিয়াছেন; আমি তাঁহার বৈঠকখানায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময়

দেশপূজ্য পণ্ডিত মহনমোহন মালবীর তথায় উপস্থিত; তিনিও আন্তবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। কতকগুলি পরে আন্তবাবু আসিলেন; বাড়ীর মধ্যে গিয়া কাপড় ছাড়িয়াই সংবাদ পাইলেন যে পণ্ডিত মালবীর আসিয়াছেন; তৎক্ষণাত্ বৈঠকখানায় ঢালিয়া আসিলেন। দেখিয়াই তাঁহাকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত মনে হইলে। আন্তবাবুও বলিলেন যে মিটিং সারিয়া আসিতে তাঁহার দেহী হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিতজী বলিলেন, 'তাঁহা হইলে আপনি একটু বিশ্রাম করুন, পরে আপনার সহিত কথাবার্তা হইবে।' আন্তবাবু উত্তর করিলেন, 'Punditji, Rest! Rest is not for me.' সত্যি তাঁহার সমস্ত জীবনই খাটুনির মধ্য দিয়া গিয়াছে; আর সেই জন্যই বৃদ্ধি বধন কর্তৃক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া একটু বিশ্রামের সময় আসিয়াছিল, তখনই প্রকৃতি দেবী তাঁহাকে কাড়িয়া লইলেন। হাইকোর্টের জজিয়তী, তারপর ডুমরাও কেসের খাটুনি; আর সেই খাটুনি যেই শেষ হইয়া আসিল, অমনি মহাপ্রয়াণ। সত্যি আন্তবাবু বলিয়াছিলেন, Punditji, rest is not for me! ইংরাজীতে যাহাকে বলে dying in harness আন্তবাবুর ভাগ্যে তাহাই হইল; বোধহয় ইহাই তাঁহার কামনা ছিল।

আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত।

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের শ্যামাসঙ্গীত

অধ্যাপক শ্রীদেবীপ্রসাদ সেন এম্-এ

কুচবিহারের ইতিহাসে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের নাম প্রাতিঃস্মরণীয়। একাধারে সুশাসক, সুকবি ও সাধকপ্রবর এই নরপতির তুলনা বাস্তবিকই বিরল। তাঁহাকে কুচবিহারের রাজর্ষি জনক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা ও কবিত্ব শক্তির কথা একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নহে। আমরা আজ তাঁহার রচিত শ্যামাসঙ্গীতের আলোচনাচ্ছলে তাঁহার সাধনজীবন এবং কবিপ্রতিভার সামান্য কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। তাঁহার অস্ফুট রচনা সম্বন্ধে পরে ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

হরেন্দ্রনারায়ণের শ্যামাসঙ্গীত তাঁহার গীতাবলী পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত। এই পুস্তক কুচবিহার সরকারের মহাক্ষেত্রখানার প্রথম পুঁথির আকারে আবিষ্কৃত হয়। পরে কুচবিহার সাহিত্যসভার উদ্যোগে ঐ পুঁথি পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। পরলোকগত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় এই পুস্তকের সম্পাদনাপ্রসঙ্গে এই আশা ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে বাঙ্গলার সাহিত্যিকগণ হরেন্দ্রনারায়ণের গীতগুলির সম্যক আলোচনা ও বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার উপযুক্ত স্থান নির্দেশ করিবেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত বাঙ্গলাসাহিত্যে তাহার যথোচিত আলোচনা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের পূর্বে অনেকেরই বাঙ্গলা সাহিত্যে শাক্ত পদাবলী রচনা করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে সাধক-কুল-চূড়ামণি রামপ্রসাদের নামই সর্বোচ্চে উল্লেখযোগ্য। তাহা ছাড়া নাটোরের

মহারাজ রামকৃষ্ণ, কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, মহারাজ নন্দকুমার প্রভৃতি এই বিষয়ে হরেন্দ্রনারায়ণের পূর্বগামী। হরেন্দ্রনারায়ণের রচনার তত্ত্বকবি রামপ্রসাদের প্রভাব স্পষ্টই লক্ষিত হয়। তাঁহার অধিকাংশ শ্যামাসঙ্গীত রামপ্রসাদী সুরে রচিত। ভাবের দিক দিয়াও অনেক গানে রামপ্রসাদী গানের ছাপ পড়িয়াছে। কোনও কোনও স্থলে ভাবারও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এ দেশে রামপ্রসাদই ছিলেন শ্যামাসঙ্গীতের জনক এবং অভূতনীর শিল্পী। তাঁহার সঙ্গীতগুলি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই লোকমুখে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আর কাহারও গান ঐরূপ জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারে নাই। সুতরাং শক্তিসাধক কুচবিহারের অধীশ্বর মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ যে রামপ্রসাদের ভাবে বিশেষ করিয়া অনুপ্রাণিত হইবেন ইহা খুবই স্বাভাবিক। রামপ্রসাদ ছাড়া আর কোনও সাধক কবির গানে তিনি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন কি না তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

হরেন্দ্রনারায়ণের গীতাবলী মূলতঃ তাঁহার গৃহ সাধন-জীবনের ফলপুষ্প। ইহাতে আমরা তাঁহার সাধকতাবের দিব্য পরিচয় লাভ করি। তিনি বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। আলোচ্য গীতাবলী ছাড়া তিনি যে আরও নানাপ্রকার সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, সমসাময়িক লেখক কখনোই মনে করিত 'রাজোপাখ্যান' গ্রন্থে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ পুস্তকের প্রত্যক্ষদর্শী অরোদন অচ্যুতের গ্রন্থকাল নির্দিষ্ট হইলে, মহারাজ 'নানাপ্রকার গানসকল, তাঁল মান

রাগ রাগিণী প্রভৃতি সৃষ্টি করিতেন।' তাহা হইলেও কেবলমাত্র সঙ্গীত রচনার জন্যই তিনি এই সাধনবিষয়ক গানগুলি রচনা করেন নাই। গীতাবলীর সঙ্গীতগুলি তাঁহার সাধকতাবের স্বতঃকৃত উচ্ছ্বাস, তাঁহার সাধক-জীবনের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ইহার মর্ম্ম অনুধাবন করিতে হইলে তাঁহার সাধন-জীবনের রহস্য কিছু কিছু অবগত হওয়া প্রয়োজন।

হরেন্দ্রনারায়ণ প্রধানতঃ শক্তির উপাসক ছিলেন। তিনি গুরুকরণ করিয়া বিধিমত শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছিলেন।(১) প্রাসাদমধ্যে মনোহর মন্দির নির্মাণ করিয়া সেখানে তিনি ইষ্টদেবতার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রাজ্যোপাধ্যানে লিখিত আছে— 'সন ১২২৮ সন বাংলার শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর মনোহর প্রাসাদেতে বাড়ী নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে আশ্বমনোরথমত ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডাদরী বিজ্ঞানদীপকরী আশ্রাশক্তি প্রকাশ করিয়া শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালী নাম রাখিলেন।' এই কালীমন্দিরে মহারাজের দিবসের বহু সময় অতিবাহিত হইত। কালীনাম স্মরণ করিতে করিতে তিনি তদগত চিত্ত হইয়া যাইতেন, কখনও আনন্দাশ্রুবিগলিত নয়নে মায়ের আনন্দময়ী মূর্তি অবলোকন করিয়া বিস্তার হইয়া গাহিতেন :—

অপরূপ এ বিহারে তারা বিহরে।

কালীর খাঁস তানুক কিঙ্ক মহাকাল অধিকারে।

(১) ধর্ম্ম কর্ম্ম নির্তা দেড় এই চাক্ষুরে ঘোরা কর
শ্রীশ্রী সারথি তার নাক্ষিক চিত্তা কোন মতে।

(গীতাবলী—পৃঃ ৫০)।

আনুত জনের সদা চতুর্দর্শ ফলপ্রসাদ

বৈরাহিলেন শ্রীশ্রী আমারে, ইত্যাদি (ঐ, পৃঃ ৫৪)

তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার পুত্রবধূ মহারাজী বৃন্দেখরী আইদেবতী স্মরণিত বেহারোদয় পুস্তক লিখিয়াছেন :—

কলিকাল মধ্যে রাজা অতি পুণ্যবান।

কাত্যায়নী প্রতি ভক্তি রাখণ সমান॥

কতখানে কত মত রাখিলেন কীর্তি।

স্থানে স্থানে স্থাপন করেন শক্তিমূর্তি॥

এই মত মহারাজা আনন্দিত মনে।

সর্ব্বক্ষণ রূহে তার দেবীর অর্চনে॥

নানাপ্রকার জটিল রাজকাৰ্য্যে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি যে সাধনমার্গে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহার গীতাবলীই তাহার সাক্ষ্য দান করে। ধ্যান করিতে করিতে তাবাবহার মায়ের নানা অপরূপ রূপ তাঁহার প্রত্যক্ষ হইত। কখনও দেখিতেন করুণাময়ী তাঁহার বিশ্ববিমোহন রূপের ছটায় দিগ্দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজিতা, কখনও দেখিতেন মহাকালের বক্ষে রণরঙ্গিনী শ্রামা প্রলয়নৃত্যে আত্মহারা। বিভিন্ন সঙ্গীত মায়ের বিভিন্ন রূপের সরল চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পাঠকের হৃদয় মুগ্ধ করে। শ্রামা মায়ের ভুবন-আলো-করা অপূর্ণ রূপের বর্ণনার কবি গাহিয়াছেন—

(১) তোমার কালরূপ অতি ভালো আলো কর্যাছে
ও রূপ হেয়া আমার নয়ন ভুল্যাছে।

(১২৯ নং গীতি)

(২) কোটী শরঙ্গিনী নিমি শ্রীমুখ পৌতা
অতসী কুসুম নাম শ্রীঅজ আভা
গুরুপ চাক্ষুরে হেয়া আমার ছই আধি
বেন হৈল চকোর পাখি রূপ ছদপয়ে রাখি।

(৫ নং)

আবার নানা ছন্দে মায়ের রূপরসিনী বেশের মহিমা
কৌৰ্ভন করিয়া কবি গাহিয়াছেন—

(১) কে মৃতাসনে সমর অধনে
অনন্মোহিনী অঙ্গনা।

নৌল নৌরধর জিনি কলেবর
বিবম সমর রঞ্জন।

(২) রণ রশ রঙ্গে কে ত্রিভঙ্গে নাচে রমণী।

অঙ্গন ঘন গঙ্গন মনরঞ্জন রূপ অমণী।

(৩) ভুবন ভূলাইলে কার কামিনী ঐ রমণী

বামার করে করাল শোভিছে ভাল
করবাল যেন দামিনী।

মায়ের প্রলয়করী রূপরসিনী মূর্তি দেখিয়া সাধক আবার
পর মুহূর্তেই অভিভূত হইয়া পড়িতেছেন। গীতার বিশ্বরূপ
দর্শনের পর ভীতিবিহ্বল অর্জুন যেমন শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়া-
ছিলেন, হরেন্দ্রনারায়ণও সেইরূপ বিশ্বজননীর ঐ রূপের
দর্শন আর সহ্য করিতে না পারিয়া অতি কাতর ভাবে
বলিতেছেন—“মা! বসন পরিধান কর, আমব পান
পরিচোপ কর, সমাগরা পৃথিবীর যেন প্রলয়কাল উপস্থিত,
মা এখন প্রশান্তমূর্তি ধারণ করিয়া শরণাগতকে কৃপা
কর।” গাহিয়াছেন—

হরেন্দ্রে ভাসে ভাসে রবি শশী প্রকাশে না।

সম্বর এ রূপ কর অমরে নরে শাস্তনা ॥ (২৮ নং গীত)

কিন্তু শক্তিরূপা বিশ্বমাতা যখন ঘেরপেই থাকুন না কেন
সাধক হরেন্দ্রনারায়ণের দৃঢ় বিশ্বাস যে যেজন একবার
ঐ অপরূপ রূপের দর্শন পাইয়াছে, সে নিশ্চয়ই অভয়পদে
হৃদয় লাভ করিয়াছে। তাই কবি গাহিয়াছেন—

জুড়াইল মোর যুগল নয়ন রূপ দর্শনে।

সভয় ছিলাম অভয় হৈলাম শমন হণে ॥

(২৭ নং গীত)

সাধক যেমত মায়ের নানারূপের ধ্যানে অপূর্ণ আনন্দ-
রস আশ্বাদন করেন, তেমনি আবার নিরন্তর তাঁহার নাম-
রূপও বিভোর হইয়া থাকেন। তিনি বুঝিয়াছেন এই
অনিত্য সংসারে একমাত্র কালী নামই সার সত্য। যে
নিরন্তর কালী নাম জপ করে সে অনায়াসে ভবসংসার
অতিক্রম করে। যখনই কোনও কারণে মন বিচলিত হয়,
ইন্দ্রিয়গুলি তাহাকে বিপথে চালিত করিতে চায়, তখনই
সাধক নৃপবর দৃঢ়ভাবে কাগাঙ্কু তারা নামের আশ্রয়
গ্রহণ করেন।

কালে কি করিতে পারে জপ কর কালী নাম।

নির্ভয় আনন্দে থাক মন আমার আশ্রয়াম ॥

কলিকালে অন্য তপস্যার প্রয়োজন নাই। ইষ্টের নাম
জপই সাধকের একমাত্র তপস্যা।

বল মুখে তারা মুখে জপ হুদে কালী নাম।

এহি সে পরম তপ অন্য তপে কিবা কাম ॥

কালীনাম এই ভবার্ণবে পারের তরী। ইহাকে আশ্রয়
করিয়া সাধক পরমমুখে ভবসিন্ধু পার হইয়া যাইবেন।

চলরে মন কালী বৈল্যা স্নাতাসে বাদাম তুল্যা।

পড়িলে তুফানে তরী তৈরে জাবে অবহেলে ॥

সাধনজীবনে অগ্রসর হইতে হইতে কখনও কখনও
সাধকের মন নানারূপ গৃঢ় অন্তর্দ্বন্দ্বে বিচলিত হইয়া পড়ে।
মন ও ইন্দ্রিয়গ্রাম স্বভাবতঃ বহিমুখী। এই বহিমুখী
ইন্দ্রিয় সমূহকে বিষয়সংসর্গ হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিয়া
ইষ্টপদে স্থাপন করা বড়ই দুষ্কর। তাই সাধনার প্রথম
স্তরে আশার সহিত নৈরাশ্যের, নীচ প্রবৃত্তির সহিত উচ্চ
ভাবে, অতীত সংস্কারের সহিত বর্তমান সদিচ্ছার অন্ত-
র্দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। স্বামী রামপ্রসাদ মাঝে মাঝে এইরূপ

হৃদয়ের আঘাতে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। আপন মনের উপর অভিমান করিয়া তিনি গাহিয়াছেন—

ভাল নাহি মোর কোন কালে,

ভালই যদি থাকবে আমার মন কেন কুপথে চলে ?
সাধক হরেন্দ্রনারায়ণের চিন্তাকালো মাঝে মাঝে এইরূপ নৈরাশ্রের মেঘ ঘনাইয়া আসিত। তাঁহার ইন্দ্রিয় মন-বুদ্ধি সকলই বিষয়ের কুবাভাসে পাল তুলিয়া দিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িত। তখন তিনি সংসারাকুল চিন্তে কাতরভাবে তাঁহার ইষ্টদেবতাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন—

আমি দেখিতেছি অতি বিসম এই ভাবার্ণব।

তোমার তনয় হইয়া কি মা নিরয়গামি হব ?

কখনও বা গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহকারে আপন মনের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া অকপটে তাহা মায়ের নিকট নিবেদন করিতেন—

(১) ষড়রিপু-বধ হইয়া নিম্ন কর্মকল লৈয়া

ত্রিহরেন্দ্রে কহে ডুবিতেছি দিনে দিনে ॥

(৫৭ নং গীত)

(২) ভাব্যা সুকর্ম দহে মর্ম্ম গুন মহামায়া

বিশ্বয় মদেতে অরু হৈয়াছি ভজনহারা।

ভব জলধি অতি দেখিতেছি সুহৃৎতরা ॥ (৭ নং গীত)

এইখানেই তাঁহার নৈরাশ্রের শেষ হয় নাই। ভক্তসাধক রামপ্রসাদের মত হরেন্দ্রনারায়ণেরও বিশেষ গর্ভ ছিল যে তিনি বিশ্বমায়ের অমুরক্ত ভক্ত সন্তান। তাই আপন মনের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে বধন তিনি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন তখন রামপ্রসাদের মত তাঁহারও হৃদয় মায়ের উপর দুর্জয় অভিমানে ফুলিয়া উঠিত। তিনিও রামপ্রসাদের মত গাহিতেন—

মম সম নরাধম না হবে না হৈয়াছে।

শুকৃত দুষ্কৃত দাহে মোর মন দহিছে ॥

তাহে নাহি দুখি দুখ এবড় আমার।

তার কি এমন হয়, না বার তারিনী ॥

আমরা দেখিতে পাই বীর সাধক হরেন্দ্রনারায়ণের হৃদয়ে এই নৈরাশ্র ক্ষণস্থায়ী মাত্র। পর মুহূর্ত্তেই আবার সাধক মাতৃনাম স্মরণ করিয়া হৃদয়ে অপূর্ব বললাভ করিতেন,—আপনাকে আপনি সম্বোধন করিয়া বলিতেন—
“ভবতারিণী মহামায়া বাহার মা তাহার আবার ভাবার্ণবে ভয় কি! মন তুমি একবার অন্ত সব চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া শ্রামা মায়ের অভয় চরণ স্মরণ কর, মুক্তকেশীর রূপায় এই দেহেই তুমি মুক্তির আশ্রয় লাভ করিতে পারিবে।

দুখে শুভে মুখে ডাক্য বল তারা তারা

হবে পূর্ণকাম পরিণাম না হইবে হারা।

(৫৮ নং গীত)

রামপ্রসাদেরই মত তাঁহার করুণাময়ী ইষ্টজননীর অহেতুক রূপার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় নূতন আশা ও উদ্বোধনায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। নির্ভীক কণ্ঠে তিনি গাহিতেন—

আমি তারিণীতনয় ত্রিভুবনে গিছে রটা

কামাদি ছয় রিপুয়ে ভালরূপে দেও মা ভাটা।

চরণ ধর্যাছি আটা, ভবপাষে জাব কাটা—

ইত্যাদি।

রামপ্রসাদের সঙ্গীতে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অভিমানের লীলা আরও তীব্রভাবে প্রকট হইয়াছে। রামপ্রসাদ মা'কে আপনার হইতেও আপনার করিয়া পাইয়াছিলেন। তাই কখনও মায়ের নাম নিতে নিতে বিগুলিত প্রেমাক্ষরার সিক্ত হইয়াছেন; কখনও বা তাঁহার অভয়পদে আপনাকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া অভয় হইয়াছেন; আবার কখনও বা লক্ষ্যপথে চলিতে চলিতে

বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইয়া দুর্জয় অভিমানে তাঁহাকে শাস্ত্রমুগ্ধ করিয়াছেন। সাধকের সম্ভানভাবে যে বৈচিত্র্য রামপ্রসাদের কল্পকল্প নানাভাবে নানারসে রূপায়িত হইয়াছে, হরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গীতে তাহা তেমন গভীর ভাবে প্রকট হইয়া নাই। হরেন্দ্রনারায়ণের শ্রামাসঙ্গীতে প্রবর্তক সাধকের তত্ত্ব পদসঙ্খ্যার লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু সিন্ধু সাধকের অসমসাহসিকতার পরিচয় তাহাতে নিলে না।

তিনিও কবির ইষ্টদেবতা ছাড়া অপর কেহ নহেন; কবি বলিতেছেন—

ইনি কালী ব্রহ্মময়ী বিরাজিছে রূপান্তরে।

(৫১ নং গীত)

ভাবা ও রচনাশৈলীর দিক দিয়া হরেন্দ্রনারায়ণের গীতাবলী যারপর নাই সরল, প্রাঙ্গল ও অনাড়ম্বর। সরলতাই ইহার প্রাণ, সরলতাই ইহার অলঙ্কার। ইহাতে কবি কৃত্রিম শব্দবিশ্রাস বা অনাবশ্যক অলঙ্কার প্রয়োগের দিকে আদৌ আকৃষ্ট হন নাই। রূপক অমুপ্রাসাদি যে সমস্ত অলঙ্কার আসিয়া পড়িয়াছে তাহা ভাবের আবেগে স্বতঃই আসিয়াছে। কাব্যসম্পদে এই সঙ্গীতগুলি আমাদের সঙ্গীতসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। রসের বিচারে ইহা বৈষ্ণবপদাবলী ও প্রসাদী শ্রামাসঙ্গীতের পরেই আসন দাবী করিতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাংলা কাব্যসাহিত্যে যখন ভারতচন্দ্রের অলঙ্কারবহুল রীতির পূর্ণ প্রভাব বিস্তৃত ছিল, সেই সময়ে বাংলার একজন দেশীয় নৃপতির লেখনীমুখে যে এইরূপ মধুর সঙ্গীতসুখা বসিত হইয়াছিল ইহা কম বিশ্বাসের বিষয় নহে। অবশ্য হরেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার সমস্ত রচনাতেই দেশজ শব্দ ও দেশীয় ক্রিয়াপদ নির্বিচারে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক বাংলাভাষার মান অনুসারে তাঁহার রচনার প্রাদেশিকতা দোষের বশেষ্টে প্রাক্তর্ভাব দেখা যাইবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একথাও আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, যে তাঁহার সময়ে বাংলা রচনার কোনও সুনির্দিষ্ট সাধারণ মান গড়িয়া উঠে নাই। দেশের বিভিন্ন অংশের লেখকদের রচনার ভাষা ও রীতির পার্থক্য বহুল পরিমাণে বিস্তৃত থাকিত। অতএব মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রচনার উক্ত দোষ দোষের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না।

দার্শনিক তত্ত্বের দিক দিয়া হরেন্দ্রনারায়ণ শাক্ত সাধক হইয়াও অদ্বৈতবাদী। তিনি তাঁহার ইষ্টদেবতাকে চিচ্ছক্তিধরূপিনী ব্রহ্মময়ীরূপে জানিয়াছেন। জগতে বস্তু কিছু তত্ত্ব আছে সবই তাঁহার কালো মায়ের বৈচিত্র্য-বিলাস। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ প্রভৃতি দশ অবতার, কালীতার। প্রভৃতি দশ মহাবিহা, পৃথিবী, আকাশ, শূন্য, অনল, অনিল প্রভৃতি তত্ত্ব, স্বাবরজ্জন্ম, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি ভূতনিত্য সবই এই ব্রহ্মময়ীর বিভাব। তিনি এক হইয়াও অনন্ত। তিনিই প্রকৃতি পুরুষ হইয়া যুগে যুগে অচিন্ত্য অনন্তরূপে লীলা করিতেছেন। তিনিই কালী। তিনিই কৃষ্ণ। কবির অনবস্ত ভাষায়—

(১) ছাপরের শেষে নটবর বেশে বৃন্দাবনে আস্তা গোপাল
হৈয়া

কালী কৈল গোচারণ গোপাদনামন

মোহিলে মোহন বাঁশী বাজাইয়া

(৪৪ নং গীত)

(২) বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে ধারণ করিলে বাঁশী

এবে শিবে শ্রামা অমুপমা বামে অশী।

(৪৬ নং গীত)

(৩) নিকুঞ্জ কুটীরে বংশীধারী শ্রামা হৈল শ্রাম মুরারী।

(৭৫ নং গীত)

আবার শুভ জ্যোৎস্নালোকিত সুন্দর কোজাগরী পূর্ণিমা
নিশায় অমলকমলদলে কমলারূপে যাহার আবির্ভাব

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

হিমাদ্রি থাক হিমাদ্রি চির অভ্রংলিহ শির
মহাভারতের প্রতীক এবং গৌরব পৃথিবীর।
কে চায় সে হোক পাকুড় পাহাড় ?
সাক্ষি চিহ্ন বিহীন বাহার ?
ভাবিতে সে কথা বক্ষেত ব্যথা চক্ষেতে আসে নীর।

(২)

কে চায় হউক, পদে পদে ভরা কাশ্মীরী ডাল
'কালান্তরের' পঙ্কিল বিল খয়রা মাছের খাল ?
তাজমহলেরে মিশারে ধূল্য
কুলীর ছাউন কে দেখিতে চায় ?
ভরতপুরের দুর্জয় গড় বন্দা হাসপাতাল ?

(৩)

দেব ও নরের মিলন ক্ষেত্র বুদ্ধিষ্টির পাট
ইন্দ্রপ্রস্থ কে চায় হউক 'তেপান্তরের' মাঠ ?
মচ্ছি ভবন নরনাভিরাম
কে চায় হউক তিসির শুদাম
'শালিমার বাগে' বসুক আসিয়া 'হিরণপুরের হাট' ?

(৪)

মানুষের হিয়া নোখিতে চায় না চায়নাকো কোন মতে
বৃহৎ মহৎ জ্যোষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ধূল্য লুটাক পথে।
এই জগতের জগৎশেঠেরা
হা' ধরে হউক লয়ে ঘোড়া ভেড়া,
ধাক দিক্কা গুইকার মিশে নাগাদের পংক্তিতে।

(৫)

বড়র যে আছে সূর্য্য দাবী অতি বড় প্রয়োজন
শুধু অণু আর নীহারিকা লয়ে চলে নাকো এ ভূবন।
চন্দ্র সূর্য্য চাই গ্রহ তারা
শান্তি শোভার গ্রহরী বাহার
যারা রূপ রস রশ্মি রক্ষী সত্যই মহাজন।

উপনদী

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য

কদিন ধরিয়া স্নেহের ব্যস্ততার আর সীমা নাই।
এতদিন শুধু ক্রান্তির হের টানিয়া তাহার জীবন চলিত।
এখন সে কর্মের সন্ধান পাইয়াছে। বিপুল কর্মের
শ্রোতে জীবন তাহার প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে।

অশোকের যে কদিন ধরিয়া কোন খবর নাই—
নিয়মিত সে আর এখানে আসে না—স্নেহে সে কথা
ভাবিবারও অবকাশ পায় না।

সুস্থ হইতে কিরিয়া প্রতিদিনই সে মিটিং লইয়া মাতরা
ধাকে। এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরিয়া কিরিয়া চাষাভূষাদের
মাঝে সাম্যবাদ প্রচার করা, নৈশ-বিদ্যালয়ে শিক্ষিত্রীর
কাজ করা, গৃহশিল্প, কুটিরশিল্পের নানা কেন্দ্র সংস্থাপন
—স্নেহের কাজের আর অন্ত নাই।

পার্টির কাজে স্নেহের উৎসাহ দেখিয়া প্রদোষদা
আরও কিছু দিন থাকিয়া গেলেন। দীর্ঘরাত্রি পর্যন্ত
স্নেহের ঘরে পার্টির বৈঠক বসে। কর্মপদ্ধতি লইয়া
নানা আলোচনা চলে।

প্রদোষদা ঘটা করিয়া লোকচার মেন—সমস্ত বিশ্ব
জুড়িয়া যে ভাবধারা আজ প্রাধান্য লাভ করিতেছে—
ভারতবর্ষ সে আদর্শ হইতে কখনও বিচ্যুত হইতে পারে
না। গণশক্তির প্রতিষ্ঠা মানেই জনগণের সুবিধা।
কংগ্রেস এই জনগণকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে
জনগণের সুখস্বচ্ছ অপেক্ষা শ্রেণীবিশেষের সুবিধাই
কংগ্রেসের কাম্য। অশোক শুনল লেখাদি প্রদোষ
বাবুর সহিত গ্রামে গ্রামে শ্রমিক এবং কৃষকের মাঝে

এ কথা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে। বন বন মিটিং
আর বহুচার উচ্চারণ গ্রামের কৃষকসম্প্রদায়ের রাগনোতির
নামে মাতিয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেস কি তাহারা তাহা
জানিত না বটে, তবে মহাত্মা, দেশবন্ধু এবং নেতাজীর
নামে তাহাদের অকৃতজ্ঞি। তাহাদের বিশ্বাস দেশবন্ধু
গত হইয়াছেন বটে তবে এখনও মহাত্মা গান্ধী আছেন।
ভারতের স্বাধীনতা যে দিন আসিবে সেদিন তাহাদের
হৃৎস্পর্শে নিশ্চয়ই ঘুটিবে। তাহা না হইলে দেশের
এত লোক চুরিডাকাতি না করিয়াও এতদিন এবং
এতদূর করিয়া জেল খাটিতেছে কেন? ..

কিন্তু প্রদোষবাবুর কথায় এইবার তাহারা নতুন
আশাকে উপলব্ধি করিতেছে বটে। কথাগুলি শুনিতে
বড় ভালো লাগে। তাহারা সমাজের উচ্চস্তরে, বহু
বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাহারা আজ তাহাদিগকে
মর্যাদা দিতেছে, তাহাদের কণার অবিশ্বাস করিবার কিছু
নাই। সুতরাং পার্টির কাজে গ্রামের কৃষকসম্প্রদায়ের
প্রচুর সহযোগিতা পাওয়া যাইতে লাগিল। অশোক
দেখিল, এ গ্রামে কংগ্রেসের পক্ষে প্রচার কার্য চালাইবার
তেমন উপযুক্ত লোক নাই। এখানকার যিনি নেতা ছিলেন—
দশটা গ্রামের লোক বাহাকে শ্রদ্ধা করিত, তিনি দীর্ঘদিন
কারাবদ্ধ। তাঁহার সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই আজ
কালোবাজারে রাতারাতি বড়লোক হইয়া উঠিয়াছে।
কংগ্রেসের নাম লইয়া এখন তাহারা চোরাবাজার
ধুলিয়াছে। আর গ্রামের শিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত

যুবকদের মধ্যে অনেকেই প্রদোষ ও স্থলেক্ষার আহ্বানে সাড়া দিয়াছে।

তাহাদের জন্য অশোকের কোন দুর্ভাবনা নাই; কিন্তু অশিক্ষিত চাষা এবং শ্রমিকদের এমন করিয়া বাহারা টানিয়া লইয়া যাইতেছে লাভের পথে—তাহার জন্য অশোক চিন্তিত হইয়া উঠিল। অশোক অনুভব করিল—এখানে তাহার কর্তব্য অত্যন্ত গুরুতর। কিন্তু সে কর্তব্য সম্পাদন করিবার যোগ্যতা এবং সামর্থ্য তাহার কতটুকু?

গ্রাম্য ইউনিয়ন বোর্ডের ডাক্তার সে—জীবনে স্বাধীনতা এবং দেশপ্রেমিকতার জন্য কতখানি নিষ্ঠাভর ভোগ করিবার মতন মনোবল তাহার আছে?

স্বভাবতঃই সে একটু তীক্ষ্ণ এবং ভাবপ্রবণ। চিন্তার জগতে স্বদেশ, সমাজ এবং রাষ্ট্রনীতিতে সে প্রগতিশীল হইলেও বাস্তবতার তাহাকে রূপদান করার নতন কর্মশক্তি এবং নির্ভীকতা তাহার কোথায়? সংসারে তাহার কোন বন্ধন নাই—আর্থিক প্রয়োজনও এমন কিছু অধিক নয়। সামান্য বেতনে যে চাকরি সে করিতেছে তাহা তাহার মতন শিক্ষিত ডাক্তারের কাছে কিছুমাত্র প্রলোভনের নয়। বরঞ্চ বলা যাইতে পারে এ তাহার এক ‘হবি’—সুতরাং দৃঢ়সঙ্কল্প এবং জাগ্রত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া সে দেশের জন্য তাহার জীবন উৎসর্গ করিতে পারে—কিন্তু সে দৃঢ়তা তাহার চক্ষিতে নাই।

তবুও লেখাদির উগ্র রাজনৈতিক জীবনকে হঠাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া অশোকও দৃঢ়তা অবলম্বন করিল। প্রদোষের আধিপত্যকে খর্ব সে করিবেই! প্রদোষের মতবাদকে মুক্তির দৃঢ়তার ঋণিত করিয়া নিজেই সে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার প্রতিষ্ঠিত করিবে।

গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অশোক ডাক্তারী করে। ঔষধ হইতে পথ্য পর্যন্ত জোগায় দরিদ্র গ্রামবাসীদের। তাহাদের বলে—কেন তাহাদের এ দুর্দশা! তাহারা সম্ভবতঃ হইয়া দৃঢ়তার সহিত যদি নিজেদের অধিকার দাবী করে তবেই অসুখ হইলে ভালো ডাক্তার দেখাইবার সামর্থ্য তাহাদের আসিবে। কিন্তু কেমন করিয়া তাহারা সম্ভবতঃ হইবে? মোড়নের ঘরে চালের অভাব নাই—জমির জোতদার সমস্ত দিন খাটাইয়া ক্রায়া পাওনা গড়া দেখ না—অবস্থার ছবিপাকে পড়িয়া ধার করিতে হইলে হালজোন, লালল পর্যন্ত বেহাত হইয়া যায়। খাজনার দায়ে বাস্তবিক আদানতের পাইক আসিয়া নিলামের ডাক ডাকে—তাহারা সকলেই তো স্বজাতি এবং স্বদেশের লোক। নিজেদের মধ্যে যেখানে এত ভেদাভেদ, হীনতা, অমানুষিকতা সেখানে তাহারা কেমন করিয়া ঐক্যবদ্ধ হইবে?

অশোক ডাক্তার বলে—এই বৈষম্যকে দূর করিবার জন্যই চাই স্বাধীনতা! আর সেই স্বাধীনতার জন্য অক্লান্তভাবে সংগ্রাম করিতেছে ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান।

অশোক ডাক্তার এ কথা সভা ডাকিয়া প্রচার করে না। রোগী দেখিতে যাইয়া তাহাদের সহিত আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া দেয় দেশের বর্তমান অবস্থা এবং বর্তমান সমস্যা।

বিপিনডাক্তার মহা আক্রোশে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আত্মজীবন যে গ্রামে প্রবল আধিপত্যের মাঝে সে কর্তৃত্ব করিয়াছে সেখানে এক চ্যাঙড়া ছোকরা ডাক্তার বিদেশ হইতে আসিয়া তুড়িলাক খাইয়া বেড়াইবে—এ অসহ্য।

সনাতন বিশ্বাস—জাতিতে নমঃশূদ্র। চিরদিন সমাজে তাহার মাথা হেঁট করিয়া বেড়াইবার কথা। বিপিন ডাক্তার তাহার বংশবর্বাদায় সনাতনের ছায়াকে পর্ষাক্ত মাড়ায় না—সেই সনাতন কিনা বাড়ি ঢুকিয়া তাহাকে অপমান করিয়া যায়?

শুধু তাহাই নয়, তাহার ছেলের অস্থখে কেন বিপিন ডাক্তার তাহার বাড়ি গিয়া চিকিৎসা করে নাই—তাঁহার কৈফিয়ৎ তলব করে। বিপিন ডাক্তারের ইচ্ছা করিতেছিল—সনাতনকে বাধিয়া কবিতা চাবুক লাগায়। কিন্তু সনাতনের শক্তি আজ শুধু সমাজের নিম্নশ্রেণীর পতিত মর্দিত হীন কৃষকের অসহায়তা নয়—সনাতনের পশ্চাতে রহিয়াছে শহরের অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে শিক্ষিত যুবক অশোক ডাক্তারের দৃঢ় সমর্থন। সুতরাং চাবকাইয়া কণ্ঠকক্ষ করিবার সহজ উপায় বিপিন ডাক্তারের আজ আর করা যন্ত নয়।

বিপিন ডাক্তার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের নিকট আর্জি পেশ করিল। সনাতনের বিরুদ্ধে নালিশ তাক্সার—বাড়ি বহিয়া উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ডাক্তারকে অপমান করিয়াছে সে। গ্রামে ইহা লইয়া হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সংরক্ষণশীল প্রবোণের দল ছেপিয়া উঠিয়াছে—স্পর্ধার একটা সীমা থাকা উচিত। সনাতন ঘাবড়াইয়া গিয়া ভয়ে কাঁদিয়া কেলিল। পুত্র তাহার মরিয়া গেছে, সে ক্ষতি অপেক্ষাও বড় ক্ষতি হইবে এইবার তাহার। ধনে প্রাণে এইবার সে মরিয়া বাইবে। অশোক তাহার ভীকতার প্রচণ্ড ঝমক দিল—অজ্ঞানকে মানিয়া নেওয়া মানেই অজ্ঞানকে প্রশংসা দেওয়া। এমনি করিয়াই সমাজে তাহার। হীন হইয়া মৃত্যুর মাঝে বাঁচিয়া আছে। অশোক বুঝাইল—ইহাতে ভয় পাইবার কিছুই নাই। যে ডাক্তারের অবহেলায় তাহার

প্রাণপ্রিয় পুত্রের মৃত্যু ঘটয়াছে স্বাধীন এবং সভাবেশ হইলে ইহার অন্য কৈফিয়ৎ দিতে হইত। এসেণেও ইহা লইয়া কেশ করা চলে। প্রয়োজন বোধ করিলে সনাতনের হইয়া অশোক তাহার। করিবে।

অশোকের কথায় সনাতন আশ্বস্ত হইল। সনাতনের প্রতিবেশী পরাণ মণ্ডল, মাণ্ড মরকার সকলেই ছেপিয়া উঠিল। এতদিন ধরিয়া অকৃত্যাবে যে নির্ধাতন বিপিন ডাক্তারদের মতন লোকেদের কাছ হইতে তাহার। সহ্য করিয়াছে—আর তাহার। তাহা সহ্য করিবে না। অবস্থার প্রতিকূলতা তাহাদের অসহায় করিয়াছে সন্দেহ নাই—কিন্তু নির্বোধ তাহার। নয়। বাঁচিবার দাবী যদি দৃঢ়কণ্ঠে তাহার। করিতে পারে—তবে মৃত্যু তাহাদের কাছ হইতে কিছুটা দূরে থাকিবে নিশ্চয়ই।

কৈবর্তপাড়ার সেদিন পঞ্চাঙ্গের ডাকা হইল। অশোক আদিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিল—এই বিরোধ, এ শুধু সনাতনকে কেন্দ্র করিয়া নয়। সনাতনের অবস্থার সকল গ্রামবাসীর ভাগ্য ইহার কণাকলের উপর নির্ভর করিতেছে।

নমঃশূদ্র চাষীর দল সকলেই হকার দিয়া উঠিল—সনাতনকে মারে কোন শালা?

অশোক সেদিন সনাতনের বাড়ি আহাৰ করিয়া নবময়ে জীবনকে দীক্ষিত করিল।

সে রাতে সনাতনদের গ্রাম হইতে অশোকের আর ফেরা হইল না। দুর্ঘোণের আশঙ্কা পূর্বাঙ্কেই অশোক করিয়াছিল—কিন্তু তাহা যে এত শীঘ্রই তাহার অদৃষ্টাকাশে ঘনাইয়া আসিবে—তাহা সে ভাবিতে



পারে নাই; পঞ্চায়েতের মিটিং শেষ করিয়া সনাতনের গৃহে আহারাদি সারিয়া যখন সে বাহির হইতেছিল এমন সময় কয়েকজন পুলিশ সঙ্গে লইয়া হাবড়া থানার দারোগাবাবু আসিয়া তাহার পথরোধ করিল।

সনাতন এবং অশোক ডাক্তারের নামে ওয়ারেন্ট আছে। সনাতনের বাড়ী থানাতল্লাসী করা হইল—অশ্রুশস্ত্র কিছু লুকানো আছে কিনা।

অশোককে বলা হইল তাহাদের দুইজনকে এই রাত্রেই থানায় হাজিরা দিতে হইবে—তাহারা নাকি অশ্রুশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বিপিন ডাক্তারের বাড়ি নুতগাছের তোড়জোড়ের অভিযোগে অভিযুক্ত।

সনাতন ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল প্রথমে কিন্তু অশোকের দৃঢ়তাব্যবহক যুগ্মে অভিযুক্তিতে সে প্রচুর বল পাইল। অশোক হাসিয়া বলিল—অত্যন্ত উইক্‌ কেস দারোগা বাবু। এই অভিযোগে আপনার করিয়াদা তো আমাদের বিরুদ্ধে কৌজদারী মামলা চালাতে পারবে না?

দারোগা কহিল, কিন্তু অভিযোগটা তো সত্যি?
অশোক উত্তর দিল, একেবারে গট-আপ।

—তা হলেও একটা জবানবন্দী দিবে আনতে হবে থানায়—আপনাদের দুজনের নামে থানার ডাইরি হয়েছে। দারোগার কথার উত্তরে অশোক কহিল—কিন্তু আমার সময়ের মূল্য নিশ্চয়ই আপনি জানেন।
I am a Doctor by profession; মানুষের জীবন-মৃত্যু নিয়ে আমার কাজ।

দারোগা কহিল, কৌজদারী মামলার ডাইরিকে তো আপান উপেক্ষা করতে পারেন না, আর এর ক্ষেত্রে পূর্বাহ্নে হাকিমের কাছে দরবারও করা হয়েছে। ওয়ারেন্টও বেরিয়েছে আপনাদের দুজনের নামে।

অশোক আর কোন বাক্যব্যয় না করিয়া থানায় চলিল—সনাতনও তাহাকে অনুসরণ করিল।

গ্রামের চাষাভুষার দল এ ব্যাপারে ক্ষেপিয়া উঠিল। দারোগাবাবুর সামনেই তাহারা শপথ করিয়া বসিল—বিপিন ডাক্তারের জীবন বিপন্ন করিয়া তাহারা ছাড়িবে।

ডাক্তারবাবুর মতন লোককে যে থানায় পাঠায় তাহার রক্ত দর্শন না করিয়া তাহারা জলগ্রহণ করিবে না, তাহার জন্ত যদি ফাঁসী কাঠেও কুলিতে হয় তাহাও ভালো।

অশোক তাহাদের নিরস্ত করিল অতি সামান্য ব্যাপার। ইহা লইয়া এত উত্তেজনা প্রকাশ করিবার কোনই কারণ নাই। কাল সকালেই সে সনাতনকে লইয়া আবার ফিরিয়া আসিবে।

দারোগার সহিত গাড়িতে উঠিয়া অশোক এক অপূর্ব উন্মাদনা উপলব্ধি করিতে লাগিল—দেশের মাটির তিলক যেন তাহার ললাট স্পর্শ করিয়াছে।

ক্রমশঃ

পঁচিশে বৈশাখ

(চর-কবিতা)

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

আবার আহ্বান ?
 বত কিছু ছিল কাল সাজ ত হ'য়েছে আজ
 দীর্ঘ দিনমান !
 জাগারে মাধবীবন চ'লে গেছে বহুক্ষণ
 প্রভাত নবীন,
 প্রথর পিপাসা হানি' পুষ্পের শিশির টানি'
 গেছে মধ্যদিন।
 নদীপারে স্নান ছবি দিনান্তের ক্লাস্ত রবি
 সুস্থিতি-শয়ান।
 তবু আঁধি ছলছলি' 'পঁচিশে বৈশাখ' বলি'
 আবার আহ্বান ?
 এঁষে আনিয়াছ আজি বসন্তকুমরাজি
 দিতে উপহার।
 নীরবে আকুল চোখে ফেলিতেছ বৃথা শোকে
 নবনাক্ষর।
 ছিলে বারা উদাসীন বৃথা আজিকার দিন
 করিছ স্বরণ,
 অসীম নিস্তর দেশে চিররাজি পেয়েছে সে,
 ডাক' অকারণ।
 আর পরিচিত মুখে তোমাদের দুখে মুখে
 আসিবে না কিরে।
 আর তুলিবে না তান অবিশ্রান্ত কলগান
 তোমাদের তীরে।

বসিয়া আপন ঘারে ভালো বন যল তারে
 বাহা ইচ্ছা তাই,—
 অনন্ত অজানা যাবে গিয়াছে সে নিশি । রে,
 সে আর সে নাই।
 তবু, আজি একবার খুলিয়া দক্ষিণ দ্বার
 , কিসে বাতায়নে,
 সুদূর দিগন্তে চাহি বন্দীর অবগাহি'
 হেরি মুগ্ধ মনে, —
 নবীন কান্তন দিন সকল বকনশীন
 উন্নত অধীর,
 উড়ারে চঞ্চল পাখা পুষ্পরেণুগন্ধাখা
 দক্ষিণ সমীর,
 সহসা আসিয়া ঘরা রাঙারে দিরাছে ধরা
 যৌবনের রাগে
 সেখানে উতলা প্রাণে হৃদয় মগন গানে
 কবি এক জাগে !
 বত তারে প্রেম করি' বত তার পারে ধরি,
 রহে নিরন্তর।
 কেঁদে কহি হার কবি, ছবি, তুমি শুধু ছবি
 পটের উপর ?
 তুমিই ত এ নিখিলে দিকে দিকে লিখে দিলে
 রসের স্মৃতি।

তোমারই চকল সুরে হিরতার অঙ্কপুরে

বাণী স্মৃতিমতী ।

সহসা নিমেষহত আপন সৃষ্টির মত

হ'লে কি শাশ্বত ?

জীবন নির্বাহে মরণ-কিঙ্কণী বাজে,

তুমি অনাহত ?

চলেছে ফুলের ধল, চলেছে নদীর জল,

খেমে গেছে কবি ;—

দাঁড়াবে কালের তটে স্রোতময় স্মৃতিপটে

ছবি, শুধু ছবি ।

উঠিছে কিঙ্কর গান তরুর মর্ম্মর তান

নদী-কলস্বর ।

প্রভের আনাগোনা বেন দ্বারে বার শোনা

আকাশের 'পর' ।

উঠিছে চরাচরে অনাদি অনন্তস্বরে

সঙ্গীত উদার ;

সে নিত্য গানের সনে মিশাইয়া লহ মনে

জীবন তাহার ।

দেখ তার বর্ণে বর্ণে প্রভাত সহস্রপর্ণে

প্রকৃট আলোকে ।

পরিচয় লহ তার মহামৌন তমিস্রার

নক্ষত্র-পুলকে ।

পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে ভাগ করি ধণ্ডে ধণ্ডে

মোপানা তাহাকে ।

খুঁজিও না বারে বারে পাঞ্জির পাতার তারে

পাঁচশে বৈশাখে ।

অবিচ্ছিন্ন রবিকারা বাইশে শ্রাবণ ধারা

নিত্য হল সেই ।

তারি স্রোতে অক্সমান পাঁচশে বৈশাখী গান

অঙলিয়া দেই ।

দুগ্ধ

শ্রী সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায় বি-এ

খাদ্য হিসাবে দুগ্ধ সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে । খাদ্যে যে সমস্ত উপাদান থাকিলে শরীরের সুউন্নয়ন হয় দুগ্ধের মধ্যে সেই সমস্ত উপাদান পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান । ভারতবর্ষের চল্লিশকোটি অধিবাসীর এক বৃহৎ গোষ্ঠী নিরাধিকৃতোত্তী । কামেই এই দেশে দুগ্ধের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী ।

দুগ্ধকে 'পূর্ণ' খাদ্য বলা হয় । বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রমাণিত হইয়াছে যে মানুষের স্বাস্থ্য বজায় রাখিতে দুগ্ধের তুল্য আর কোন খাদ্য নাই । শিশু ও বৃদ্ধের পক্ষে দুগ্ধই প্রধান খাদ্য । শিশুদিগের দ্বারা দুগ্ধের পরিমাণ বাড়াইয়া দিলে তাহাদের শরীরে পুষ্টিও বৃদ্ধি পায় ।

ছত্রের প্রধান উপাদান প্রোটিন, অ্যালুমিনি, কেসিন, কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহজাতীয় পদার্থ। এই উপাদান সমূহের প্রত্যেকটি শিশু এবং বয়স্কদের শরীরের পুষ্টিসাধন এবং তাপরক্ষার বিশেষ সহায়ক। কার্বোহাইড্রেট ছত্রের মধ্যে দ্রব অবস্থায় থাকে। ইহাকে 'ল্যাকটোজ' বলা হয় এবং এই ল্যাকটোজ অন্ত কোন বাতাবিক পাশ্বে নাই। অতি সহজেই এই বস্তু হজম হয়। দুগ্ধ হইতে স্নেহ পদার্থ তুলিয়া মাখন ও দী প্রস্তুত করা হয়। যত প্রকার তৈলজাতীয় খাদ্য আছে, মাখন এবং দী তাহাদের মধ্যে সর্বাধিক সহজপাচ্য এবং পুষ্টিকর। ছত্রের মধ্যে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট প্রভৃতি এক্রপ পরিমাণে বিস্তৃত যে শুধু দুগ্ধ পান করিয়া স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখা চলে।

নানা প্রকার ছত্রের মধ্যে গোছুগ্ধ লবণ জাতীয় পদার্থ যথা ক্যালসিয়াম ও ফসফেট অধিক মাত্রায় থাকে। শিশুদের শরীরের অস্থিগঠনে এই লবণ নিত্য প্রয়োজন। শরীরের প্রত্যেক কোষের উপাদানও এই পদার্থ। কাজেই শরীর প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম চাহে। পাঁচ ঘণ্টার চল্লিশটি ক্যালসিয়াম ট্যাবলেটে যতখানি ক্যালসিয়াম আছে আড়াইসের দুগ্ধে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। সুতরাং দুগ্ধের পরিবর্তে

ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খাওয়ার অধিকতর উপকার সাধিত হয় না। তাহা ছাড়া, ক্যালসিয়াম ট্যাবলেটের ক্যালসিয়াম অপেক্ষা দুগ্ধের ক্যালসিয়াম শরীর সহজে গ্রহণ করে।

ভিটামিন রোগ হইতে শরীর রক্ষা করে এবং ভিটামিনের অভাবে শরীর নানারূপ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। গাভীকে যে খাদ্য দেওয়া হয় সেই খাদ্য অনুযায়ী দুগ্ধের উপাদানসমূহ—বিশেষ করিয়া ভিটামিন—কম বেশী হয়। গোছুগ্ধ হইতে ভিটামিন পাঠিতে হইলে গাভীকে সূর্যালোকে উত্তীর্ণ স্থানে চরিতে দিতে হয় এবং প্রচুর কাঁচা ঘাস ও শাকসবজী খাওয়াইতে হয়। পূর্বে আমাদের দেশে গ্রাম প্রতি গ্রামেই গোচারূপ কুঁড়ম থাকিত। এই সমস্ত অধি এখন শতক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ইহার কারণ শতের মূল্যবৃদ্ধি। ফলে দুগ্ধের অভাব ঘটয়াছে। দুগ্ধে ভিটামিন 'সি' এবং ভিটামিন 'ডি' উভয় প্রকার ভিটামিন পাওয়া যায়। আল দিলে ভিটামিন 'সি' নষ্ট হয়। সেট বস্তু কাঁচাদুগ্ধ অধিক উপকারী—অবশ্য দুগ্ধ বীজাণুমুক্ত হওয়া চাই।

নিম্নে বিভিন্ন প্রকার দুগ্ধের উপাদানসমূহ প্রদত্ত হইল।

দুগ্ধ

দুগ্ধের উপাদান (শতকরা হিসাব)

	জল	স্নেহপদার্থ	চিনি (ল্যাকটোজ)	কেসিন ও অ্যালুমিনি	প্রোটিন
গোছুগ্ধ (ভারতবর্ষের)	৮৬.৭	৪.২৫	৪.৬৫	৩.৬৫	৭.৫
গোছুগ্ধ (ইংলণ্ডের)	৮৭.৩৫	৩.৭৫	৪.৭৫	৩.৪	৭.৫

	জল	স্নেহপদার্থ	চিনি (ল্যাকটোজ)	কেসিন ও গ্লোবুলিন	প্রোটিন
ছাগদুগ্ধ	৮৬.৮৮	৪.০৭	৪.৬৪	৩.৭৬	৮.৫
মহিষদুগ্ধ	৮২.৮২	৭.৬৫	৪.৮২	৪.৩৭	১২.৪
মাতৃদুগ্ধ	৮৭.৫৪	৩.৭৪	৬.৩৭	২.০১	৩

মহিষদুগ্ধে স্নেহপদার্থ বেশী থাকায় ইহা হজম করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। মাতৃদুগ্ধে ল্যাকটোজের পরিমাণ খুব বেশী। সেই জন্য নবজাত শিশুর পক্ষে এরূপ সহজপাচ্য, পুষ্টিকর এবং সর্বাঙ্গসুন্দর খাদ্য নাই।

“প্রতিটি সন্তানের জন্য জননীর একটি করিয়া দাঁত কম হয়”—এই বাক্যটি বিশেষভাবে সত্য। মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে সন্তানের অস্থিগঠনে প্রচুর ক্যালসিয়াম আবশ্যক। এই ক্যালসিয়াম মাতার শরীর হইতে সন্তান গ্রহণ করে। সুতরাং গর্ভাবস্থায় প্রচুর দুগ্ধ পান করাইয়া ক্যালসিয়ামের অভাব পূরণ করিতে হয়। হিসাবে জানা যায় যে সাধারণ অবস্থায় যে পরিমাণে ক্যালসিয়াম শরীরের পক্ষে দরকার গর্ভবতী নারীর দ্বািত্য অটুট রাখিতে হইলে তাহার দ্বিগুণ ক্যালসিয়াম প্রয়োজন। আবার সন্তান ভূষিষ্ট হইলে তাহার জন্য প্রচুর মাতৃদুগ্ধ না হইলে চলে না। সন্তানবতী জননী অধিক দুগ্ধ পান করিলে শিশুও

অধিক মাতৃদুগ্ধ পাইবে। কাজেই উভয় অবস্থায় জননীকে অধিক পরিমাণে দুগ্ধ পান করাইতে হইবে।

দুগ্ধের বিষয় আমাদের দেশে দুগ্ধ দুশ্রীপা এবং দুর্খল্যা। গরীবদের পক্ষে তা দূরের কথা, মধ্যবিত্ত লোকেরই দুগ্ধ জোটে না। ইহার ফলে ভারতবর্ষে প্রসুতি এবং শিশুমৃত্যুর হার অন্তান্ত সভ্যদেশ অপেক্ষা বেশী। কারণ, দুগ্ধের অভাবে উভয়ের জীবনীশক্তি কৌণ হইয়া যায়। বয়স্কদের জন্যও দুগ্ধের প্রয়োজন। সুতরাং দেশে দুগ্ধের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিতে হইলে গোজাতির উন্নতিবিধান একান্ত কর্তব্য। গোরক্ষা, গোপ্রজনন এবং গোচারণ ভূমি এই তিনটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দেশের জনসাধারণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইলেই দেশের মঙ্গল।*

ভারতসরকারের স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে প্রকাশিত Nutrition Bulletinএর মার্চ, ১৯৪৬, সংখ্যা: হইতে প্রবন্ধের উপাদান গৃহীত।

রাজপরিবারের সংবাদ

শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর কুচবিহারে অবস্থান করিয়া পূর্ববৎ কুচবিহারের পল্লীঅঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া পল্লীবাসীগণের অভাব অভিযোগ স্বয়ং শ্রবণ করিতেছেন। গত মাসে তিনি তুফানগঞ্জের বহু পল্লী পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। বর্তমান মাসে তিনি সিতাই, দেওয়ানহাট, বাগেশ্বর প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। তাঁহার এই ভ্রমণ উপলক্ষে পল্লী অঞ্চলের সর্বত্রই আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়।

মহারাজ বাহাদুর বর্তমান মাসে কতকগুলি বিশেষ অনুষ্ঠানেও যোগদান করেন। তন্মধ্যে সাহিত্যসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন, সদর মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব এবং বয়স্কাউট ট্রেনিং ক্যাম্পের উদ্বোধনের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

গত ১২ই জুন কাশ্মীর গমনের উদ্দেশ্যে মহারাজ কলিকাতায় গমন করিয়াছেন।

মাতৃশ্রী শ্রীশ্রীমহারানী সাহেবা, মহারাজকুমার শ্রীইন্দ্রজিতেন্দ্র নারায়ণ এবং ঈশরানী শ্রীকমলা দেবী রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিতেছেন।

১২ই জুন তারিখে মহারাজকুমারের পুত্রের শুভ অন্তপ্রাশন ও নামকরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহারানী সাহেবা পৌত্রের মুখে প্রথম অন্তদান করেন। রাজকুমারের নাম শ্রীবিরাজেন্দ্র নারায়ণ রাখা হয়।

স্থানীয় সংবাদ

পুণ্যাহ দরবার—

গত ৩রা মে শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে আট ঘটিকার সময় রাজবাড়ীর দরবার হলে পুণ্যাহ দরবার অনুষ্ঠিত হয়। দরবারিগণ ষথানিদ্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নিজ নিজ আসন গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর ঠিক সাড়ে আট ঘটিকার সময় দলবল সহ দরবার কক্ষে প্রবেশ করেন। ঐ সময় রাজকীয় মৈন্যদল সামরিক কাষদায় তাঁহাকে অভিবাদন জ্ঞাপন করে এবং রাজকীয় ব্যাণ্ড কুচবিহার সঙ্গীত বাজাইতে থাকে। তোপধ্বনি দ্বারা মহারাজের দরবার কক্ষে প্রবেশ ঘোষণা করা হয় এবং দরবারিগণ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মহারাজকে অভিবাদন করেন। মহারাজ সিংহাসনে উপবেশন করিলে হাউসহোল্ড মন্ত্রী মহোদয় মহারাজের আদেশক্রমে দরবার আরম্ভ হইল বলিয়া ঘোষণা করেন। দরবারিগণ পদন্যাদা অনুসারে একে একে সিংহাসনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরকে স্বর্ণমুদ্রা নকর প্রদান করেন; মহারাজ উহা স্পর্শ করিয়া প্রত্যর্পণ করেন। তৎপরে মহারাজের আদেশক্রমে রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় পুণ্যাহ কাষা সম্পন্ন করেন। পুণ্যাহ শেষে দরবারিগণকে ওধামত পান ও আতর প্রদান করা হইলে মহারাজ ভূপ বাহাদুরের অনুমতি লইয়া হাউসহোল্ড মন্ত্রী মহোদয় দরবারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। তৎপর মহারাজ ভূপ বাহাদুর দরবার কক্ষ ত্যাগ করিয়া বান।

গেজেটেড রাজকর্মচারীদিগের বেতনের গ্রেড বৃদ্ধি—

গত ১৯৪৪ সালের জন্মতিথি দরবারে মহারাজ ভূপ বাহাদুর ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, সকল রাজকর্মচারীদিগের বেতন সংশোধন করিবার বিষয় তাঁহার বিবেচনাধীন

রহিয়াছে। ঐ ঘোষণা সূত্রে ১৯৪৪ সালেই নন-গেজেটেড কর্মচারীদিগের জন্য নূতন গ্রেড প্রবর্তিত হয়। বর্তমান বৎসরে মহারাজের আদেশক্রমে গত ১লা মার্চ হইতে গেজেটেড কর্মচারীদিগের বেতনও সংশোধিত হইয়া নূতন গ্রেড প্রবর্তিত হইয়াছে। মহারাজের এই আদেশের জন্য রাজকর্মচারীমাত্রেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

কুচবিহার রাজ্যের চীফ মেডিক্যাল অফিসার—

মহারাজ ভূপ বাহাদুরের আদেশক্রমে ডাঃ এম্. সি, চাটার্জি এম্.ডি, এম্-আর-সি-সি, ডি-পি-এইচ মহাশয় কুচবিহার রাজ্যের চীফ মেডিক্যাল অফিসার এবং চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। ডাক্তার চাটার্জি পূর্বে সি-এ, জি-আই-পি ও ই-আই রেলওয়ের চীফ মেডিক্যাল ও হেলথ অফিসার ছিলেন। ডাক্তার চাটার্জি গত ৬ষ্ঠা মে কার্যে যোগ দিয়াছেন।

কুচবিহার রাজ্যের চীফ ইঞ্জিনিয়ার—

শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর মিষ্টার এম্. ষ্টার্ন ডিপ-ইঞ্জ (বার্লিন) কে কুচবিহার রাজ্যের চীফ ইঞ্জিনিয়ার এবং পূর্ভ ও বৈজ্ঞাতিক বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়াছেন। মিষ্টার ষ্টার্ন মহারাজের দার্কজিলাং সম্পত্তির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর কার্যও করিবেন। মিষ্টার ষ্টার্ন গত ১লা মে কুচবিহারে পৌছিয়া নূতন কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

কুচবিহারের উদ্বৃত্ত ধান্য ও চাউল বাৎলা, সরকারকে বিক্রয়—

সারা ভারতে খাদ্যশস্যের অভাব দেখা দিলেও কুচবিহার রাজ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধান্য জন্মিয়াছে।

কুচবিহার দরবার উদ্ভূত ধান্য ও চাউল বাংলা সরকারকে বিক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কুচবিহার দরবারের এই কার্যের ফলে ভারতের তৃতীয়া লাববের কথকিং সহায়তা হইবে।

কুচবিহার দরবারের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকল্পনা—

কুচবিহার দরবার রাজ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। কুচবিহার রাজ্যে বর্তমানে ৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, দরবার এই বিদ্যালয়গুলিকে ক্রমশঃ সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রতি বৎসর ৫০টি করিয়া পাঁচ বৎসরে ২৫০ টি এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরও ২৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত হইবে। এই সকল বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হইবে। কুচবিহারের আয়তন ও লোকসংখ্যা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে প্রত্যেক আড়াই বর্গ মাইল স্থান ও ১২৮০ জন অধিবাসীর জন্য একটি করিয়া সরকারী বিদ্যালয়ের বন্দোবস্ত থাকিবে। বর্তমান ১৯৪৬-৪৭ সালে ৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত করা হইবে; বর্তমান বৎসরের বাজেটে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ১ লক্ষ ৮ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। আরও স্থির হইয়াছে যে বর্তমান বৎসরে রাজ্যের সকল মধ্য ইংরাজী ও মধ্য বাংলা বিদ্যালয়—ইহাদের সংখ্যা ৬৯—সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত করা হইবে।

রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে প্রতি বৎসর ২০টি করিয়া গ্রাম

হাসপাতাল স্থাপিত হইবে এবং পাঁচ বৎসরে মোট ১০০টি হাসপাতাল স্থাপিত হইবে। ইহার ফলে প্রতি তের বর্গ মাইলে একটি করিয়া হাসপাতাল থাকিবে এবং ইহা ৬৪০০ অধিবাসীর চিকিৎসার ভার লইবে। বর্তমান ১৯৪৬-৪৭ সালে ২০টি হাসপাতাল স্থাপিত হইবে।

জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে কুচবিহার দরবার একটি পূর্ণাঙ্গ জনস্বাস্থ্য পরীক্ষাগার (Public Health Laboratory) স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজ্য হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য কুচবিহার দরবার একটি অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তৎক্ষণাত বর্তমান বৎসরের বাজেটে প্রায় ৩০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। রাজ্য হইতে সংক্রামক ব্যাধি দূর করিবার জন্যও একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং তৎক্ষণাত বাজেটে প্রায় ৩৭ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

কুচবিহারের সাহিত্য সম্মেলন—

কুচবিহার সাহিত্যসভার উদ্যোগে গত ১০ই ও ১১ই মে স্থানীয় ল্যান্ডাউন হলে একটি সাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। ইহাতে বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিরূপে এবং সুসাহিত্যিক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত এম্-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি প্রধান অতিথিরূপে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমহাশয় ডুপ বাহাদুর সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়া ইহার সাফল্য কামনা করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়া বৃহত্তর বঙ্গের সহিত কুচবিহারের যোগ আরও নিবিড় হইবে। সভাপতি মহাশয় প্রথম দিনে সাহিত্যে বাস্তবতা এবং দ্বিতীয় দিনে কথাসাহিত্য ও গণসাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

উক্ত দাশগুপ্ত সাহিত্যের আদর্শ কি এবং আধুনিক সাহিত্য যে প্রাচীন সাহিত্যকেই ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠে তাহা বৈ, বাম্বিকি, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া দেন।

উক্ত দিনই সভায় কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠিত হয় ; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত অমল্যরতন গুপ্তের “কুচবিহারে সাহিত্য সাধনা ও জ্ঞানচর্চা,” শ্রীযুক্ত অক্ষয়ান দাশগুপ্তের “কথা সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা,” শ্রীযুক্ত তারাশ্রম চট্টোপাধ্যায়ের “আণবিক শক্তি” এবং শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকারের “চরিত্রহীনের চারিটি নারীচরিত্র” প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সম্মেলনের প্রথম দিনে মাতৃশ্রী শ্রীশ্রীমহারাজী সাহেবা, ঈশ্বরানী কমলা দেবী, শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর ও মহারাজকুমার শ্রীইন্দ্ৰজিতেন্দ্রনারায়ণ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় দিন মহারাজ ভূপ বাহাদুর ও মহারাজকুমার উপস্থিত হইয়াছিলেন। উভয় দিনই সহরের গণ্যমাণ্য ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের সমাগমে সম্মেলনগৃহ পূর্ণ হইয়াছিল। সম্মেলনশেষে সাহিত্যসভার সভাপতি মহারাজকুমার শ্রীইন্দ্ৰজিতেন্দ্রনারায়ণ সাহিত্যসভার পক্ষ হইতে শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরকে, সম্মানিত অতিথিদেরকে এবং সমবেত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উভয় দিনই সম্মেলনে কয়েকটি সুন্দর সঙ্গীতের আয়োজন করা হইয়াছিল এবং সকল দিক দিরাই এই সম্মেলনটি সফলতা লাভ করিয়া ছিল। কুচবিহারে এই ধরনের সাহিত্যসম্মেলন এই প্রথম ; আমরা উদ্যোক্তা সাহিত্যসভাকে এই সুন্দর ও সফল আয়োজনের জন্য আশাধার কৃত্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

রবীন্দ্র জন্মোৎসব—

গত ২৫শে বৈশাখ স্থানীয় চলন্তিকা পাঠাগারের উদ্যোগে ল্যান্ডাউন হলে শ্রীযুক্ত অক্ষয়ান দাশগুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে রবীন্দ্র জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি এবং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতা হয়। সভাপতি মহাশয় একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার বিশ্লেষণ করেন।

গোসানিমারীতে ধর্মসভা—

গত ১৬ই বৈশাখ গোসানিমারীতে গোসানি ষ্টেবীর মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে একটি ধর্মসভার অনুষ্ঠান হয়। সারস্বত সমাজের স্বামী শক্তিচৈতন্য এই সভায় পৌরোহিত্য করেন।

প্রধানমন্ত্রীর সাময়িকভাবে নরেন্দ্র—

মণ্ডলে যোগদান—

নরেন্দ্রমণ্ডলের চ্যান্সেলার ভূপালের নবাব বাহাদুরের অনুরোধে শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর কুচবিহার রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী সর্দার ডি, কে, সেন মহোদয়কে এক মাসের জন্য সাময়িকভাবে নরেন্দ্রমণ্ডলের কার্যে যোগ দিতে অনুমতি দিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের অনুপস্থিতি-কালে মহারাজ ভূপ বাহাদুর স্বয়ং রাজকার্য পরিচালনা করিতেছেন।

স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেজের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেজের ফল অতীব সন্তোষজনক হইয়াছে। আই-এ পরীক্ষায় ৫৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩১ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে ; পাশের হার শতকরা ৫৫ জন। বিশ্ববিদ্যালয়ের

পাশের হার শতকরা ৪১ জন। আই-এস-সি পরীক্ষায় ৫৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩২ জন পাশ করিয়াছে; পাশের হার শতকরা ৫৬ জন; বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের হার শতকরা ৫০ জন। আই-এ পরীক্ষায় শ্রীমান ঞ্চনারায়ণ ঘোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার

করিয়াছে; শ্রীমান্ নাটক পরীক্ষাতেও বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। শ্রীমান্ স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর ঘোষ মহাশয়ের পুত্র; আমরা পিতা-পুত্র উভয়কে অভিনন্দিত করিতেছি।

দেশবিদেশের কথা

বাংলায় ৯৩ ধারার অবসান ও নূতন মন্ত্রী-সভা গঠন

নূতন নির্বাচনের ফলে বাংলার মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে এবং ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুযায়ী গভর্ণরের শাসনের অবসান ঘটিয়াছে। নূতন মন্ত্রীসভা সাতজন মুসলমান ও একজন তপশীলী হিন্দু লইয়া গঠিত হইয়াছে। মুসলমান মন্ত্রীগণ সকলেই মুসলিম লীগের সদস্য। মিঃ এইচ, এন্স, সুল্লাবাদি প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় পাটকল সমিতির দান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি পাট-গবেষণাগার স্থাপনের জন্য ভারতীয় পাটকল সমিতি সকল ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হইয়াছেন। বিজ্ঞান কলেজের নিকট একটি ত্রিতল সোঁথে এই গবেষণাগার স্থাপিত হইবে; প্রতি বৎসর পঁচিশজন করিয়া বিজ্ঞানের ছাত্রকে এখানে শিক্ষা দেওয়া হইবে; শিক্ষার কাল চারি বৎসর হইবে, শিক্ষাকালে ছাত্রগণ বৃত্তি পাইবে। জমিক্রয়, গৃহনিৰ্মাণ ও আসবাব পত্রের জন্য এককালীন

সাড়ে সাত লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে এবং প্রতি-ষ্ঠানটি চানু রাখিতে বৎসরে দেড় লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে; এই সমস্ত টাকাই পাটকল সমিতি দিবেন।

ডক্টর রাধাবিনোদ পালের সম্মান লাভ

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূত-পূর্ব বিচারপতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর রাধাবিনোদ পাল একজন বিশিষ্ট আইন বিশারদ। জাপানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য টোকিওতে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের যে টাইবুনাল গঠিত হইয়াছে ডক্টর পাল তাহার অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। ডক্টর পাল টোকিও রওগান হইয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীর এই আন্তর্জাতিক সম্মানলাভে আমরা আনন্দিত।

কলেজ অধ্যক্ষগণের সম্মেলন—

গত যে মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজসমূহের অধ্যক্ষগণের এক সম্মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার মিঃ পি, এন্স, ব্যানার্জির সভাপতিত্বে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে কলেজসমূহের বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা করা হয়। ছাত্রদের মধ্যে নিয়মাবলি ও শৃঙ্খলা রক্ষার

উপায় সম্বন্ধে নানারূপ অগোচনা হয় এবং স্থির হয় যে এখন হইতে ছাত্রগণের ক্লাসে উপস্থিতি সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলী কঠোরভাবে পালন করিতে হইবে এবং টিউটোরিয়াল ক্লাসগুলির উপর অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হইবে।

নয়াদিল্লীতে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাসম্মেলন—

গত ২০শে ও ২১শে মে ভারতসরকারের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সমন্বিত স্তার আকবর হায়দারীর সভাপতিত্বে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের যুক্তোত্তর পরিকল্পনা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশে বড় রকমের যুক্তোত্তর পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার পূর্বে অন্তর্বর্তীকালে কি কি কাজ করা বাইতে পারে এই সম্মেলনে তৎসম্বন্ধে আলোচনা হয়। আলোচনাস্থে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার মোট ৮৪ কোটির মত টাকা অন্তর্বর্তী পরিকল্পনার ব্যয় করিবার সিদ্ধান্ত করেন; এই টাকার অধিকাংশ ভারত সরকার প্রদান করিবেন। এই পরিকল্পনার দেখা যায় যে সেচ ও রাস্তাঘাট নির্মাণেই সর্বাপেক্ষা অধিক টাকা ব্যয় করা হইবে। যুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজ বিদ্যায় উৎপাদনের জন্য এক বোম্বাই বন্দরোপণ ও ভূমিসংরক্ষণের জন্য মোটা টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

পরলোকক ডক্টর টমসন—

ইংরাজ কবি ও ঔপন্যাসিক ডক্টর এডওয়ার্ড টমসন গত ২৮শে এপ্রিল ইংলণ্ডে নিজ বাসভবনে ৬০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। ডক্টর টমসন প্রথম জীবনে মিশনরী রূপে ভারতবর্ষে আসেন এবং কয়েক বৎসর বাঁকড়া কলেজের অধ্যক্ষের কাজ করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসাহিত্যের অমুরাগী ছিলেন। দেশে ফিরিয়া তিনি অক্সফোর্ডে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও নাট্য সম্বন্ধে ইংরাজীতে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখিয়া বশব্দী হন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারত একজন অকৃত্রিম বন্ধু হারাইল।

পরলোকক ভূলাভাই দেশাই—

বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট ব্যবহারজীব, কেন্দ্রীয় ব্যবসায় পরিষদের ভূতপূর্ব কংগ্রেস মনপতি মিঃ ভূলাভাই দেশাই গত ৫ই মে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৯ বৎসর হইয়াছিল। আইনজীবী, রাজনৈতিক নেতা, মনোবী ও বাগ্মীরূপে মিঃ দেশাই ভারতের সর্বত্র সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতমাতা একজন বিশিষ্ট সন্তান হারাইলেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব—

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ঐক্য সাধনের জন্য মন্ত্রীমিশন সিমলায় এক বৈঠকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু এই বৈঠকে উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য কোন শাসন তান্ত্রিক পরিকল্পনা সম্ভব না হওয়ায় সিমলা বৈঠক ভাঙ্গিয়া যায়। তৎপরে গত ১৬ই মে তারিখে মন্ত্রীমিশন ও বড়নাট ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা প্রচার করেন। এই ঘোষণার প্রারম্ভেই মুসলিম লীগের পাকিস্থান দাবীর অধৌনিকতা প্রদর্শন করিয়া মন্ত্রীমিশন ভারতের অখণ্ডতা ও সর্ব-ভারতীয় ঐক্যের উপর জোর দেন এবং ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধানকল্পে নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলি বিবৃত করেন—

(১) ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহ লইয়া একটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র (Union of India) গঠিত হইবে। বৈদেশিক সম্পর্ক, দেশরক্ষা ও যানবাহন বিষয়ে সর্ববিধ কর্তৃত্ব এই যুক্তরাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত থাকিবে; এই সকল বিষয়ে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ করার ক্ষমতাও যুক্তরাষ্ট্রের থাকিবে।

(২) এই যুক্তরাষ্ট্রের একটি শাসনপরিষদ ও একটি আইনপরিষদ থাকিবে; এই উভয় পরিষদ ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইবে। আইনপরিষদে কোন গুরুতর সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তাহা উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের এবং প্রধান দুই সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের অধিকাংশ ভোটের দ্বারা সীমাংসিত হইবে।

(৩) যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত বিষয়সমূহ ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিবে। ‘অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ’ (residuary powers) প্রদেশসমূহের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(৪) যুক্ত রাষ্ট্রের হস্তে সম্পত্তি বিষয়সমূহ ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ে দেশীয় রাজ্যসমূহের ক্ষমতা অব্যাহত থাকিবে।

(৫) প্রদেশসমূহের মণ্ডলীবদ্ধ (groups) হইবার এবং প্রত্যেক মণ্ডলীর আলাদা শাসন ও আইন পরিষদ গঠনের স্বাধীনতা থাকিবে; প্রত্যেক মণ্ডলী নিজেদের সাধারণ প্রাদেশিক বিষয়সমূহ (Common Provincial Subjects) নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৬) যুক্তরাষ্ট্র ও প্রাদেশিক মণ্ডলীবদ্ধ সরকারের শাসনতন্ত্রে এইরূপ বিধান থাকিবে যে ওতি দশ বৎসর অন্তর আইনপরিষদের অধিকাংশ ভোটের দ্বারা শাসনতন্ত্রের পুনর্নির্বাচন হইতে পারিবে।

উপরোক্ত মূলনীতিগুলিকে ভিত্তি করিয়া অবিলম্বে একটি শাসনতন্ত্রগঠনকারী প্রতিষ্ঠান (Constituent Assembly) আহ্বানের প্রস্তাব মন্ত্রীমিশন করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারিলে সর্বোৎকৃষ্ট হইত; কিন্তু বর্তমানে তাহা সম্ভব নয় বলিয়া মন্ত্রীমিশন প্রস্তাব করিয়াছেন যে, সদ্যনির্বাচিত প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদসমূহ হইতে সদস্য নির্বাচন করিয়া শাসনতন্ত্রগঠনকারী প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে। এই প্রতিষ্ঠানে ব্রিটিশ ভারতের ২০২ জন এবং দেশীয় রাজ্যের সর্বোচ্চ ১৩ জন—মোট

৩৮৫ জন সদস্য থাকিবেন; মোটামুটি প্রতি দশ লক্ষ অধিবাসীতে একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই প্রতিনিধিগণ সাধারণ, মুসলিম ও শিখ এই তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইবেন; সাধারণ সদস্য সংখ্যা হইবে ২১০; মুসলিম সংখ্যা ৭৮ এবং শিখ সংখ্যা ৪।

ভারতীয় প্রদেশসমূহকে মন্ত্রীমিশন তিনটি বিভাগে (Sections) বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম (ক) বিভাগে মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যাকে ধরা হইয়াছে; দ্বিতীয় (খ) বিভাগে পাঞ্জাব, উত্তরপশ্চিমসীমান্ত প্রদেশ এবং সিন্ধুদেশকে ধরা হইয়াছে; তৃতীয় (গ) বিভাগে বাংলা ও আসামকে ধরা হইয়াছে। শাসনতন্ত্র গঠনের প্রণালী সম্বন্ধে মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব এই যে, নির্ধারিত প্রতিনিধিগণ বধামতের সম্ভব দিল্লীতে সম্মেলিত হইবেন এবং প্রারম্ভিক সভার কার্যসূচী স্থির করিবেন ও সভাপতি, কর্মকর্তা প্রভৃতি নির্বাচন করিবেন। তৎপরে প্রতিনিধিগণ উপরোক্ত ক, খ, ও গ বিভাগে বণিত তিনটি দলে বিভক্ত হইয়া নিজ নিজ বিভাগের প্রদেশসমূহের শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন এবং প্রদেশসমূহ লইয়া কোনও মণ্ডলী (Group) প্রতিষ্ঠিত হইবে কিনা এবং হইলে তাহার শাসনতন্ত্র কিরূপ হইবে স্থির করিবেন। নিজ নিজ বিভাগের শাসনতন্ত্র গঠিত হইলে তিন বিভাগের নির্ধারিত প্রতিনিধিগণ ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ পুনরায় মিলিত হইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন।

ইহাই মোটামুটি মন্ত্রীমিশনের ভাব। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। পাকিস্তান স্বীকৃত হয় নাই বলিয়া মুসলিম লীগ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে; প্রদেশগুলিকে

তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মণ্ডলী গঠন করিতে বাধ্য করায় উত্তরপশ্চিমসীমান্ত প্রদেশ ও আসাম হইতে আপ্যুত উত্থাপিত হইয়াছে; তিন স্তরে শাসনতন্ত্রগঠনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধেও সমালোচনা হইয়াছে। অনেক মনে করেন যে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টকে আরও শক্তিশালী করা সম্ভব; সর্বভারতীয় শিল্প-পরিবহন, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন, খাদ্যনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত হওয়া উচিত; মুদ্রা, শুল্ক ও বাণিজ্যনীতি নিয়ন্ত্রণের ভারও কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া উচিত।

বাহা হউক, দোষত্রুটি সত্ত্বেও মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবে ভারতের ঐক্যতা ও স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে; উপযুক্ত মনোযোগ লইয়া কার্য করিলে শাসনতন্ত্রগঠনকারী প্রতিষ্ঠানের সদস্তগণ ইহার দোষত্রুটি দূর করিতে পারিবেন।

দেশীয় রাজ্যসমূহের সার্বভৌমত্ব—

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিলে দেশীয় নৃপতিগণের সহিত ভারত সরকারের সম্পর্ক কিরূপ হইবে তৎসম্বন্ধে মন্ত্রীমিশন তাঁহাদের প্রস্তাবে আলোচনা করিয়াছেন। মিশন বলিয়াছেন যে, ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতীয় নৃপতিগণের সহিত ইংলণ্ডের যে সম্পর্ক এতাবৎকাল বর্তমান আছে, তাহা থাকা সম্ভবপর হইবে না। তখন ইংলণ্ডের তাঁহার সার্বভৌমত্ব (paramountcy) রাখিতেও পারেন না, অথবা স্নাতন ভারত সরকারের হাতেও তাহা সমর্পণ করিতে পারেন না। দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণও ইহা সম্পূর্ণ স্বীকার করেন এবং ভারতের নবজাগরণ ও অগ্রগতির সঙ্গে জড়িত থাকিতে

ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এমতাবস্থায় মন্ত্রীমিশন ও রাজ-
প্রতিনিধি নবরত্নমণ্ডলের চ্যান্সেলারের নিকট এক স্মারক-
লিপিতে জানাইয়াছেন যে, নূতন শাসনতন্ত্র প্রণীত হইলে
ইংলণ্ডের দেশীয় নৃপতিগণের উপর আর সার্বভৌম ক্ষমতা
প্রয়োগ করিবেন না ; ভারত স্বাধীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে
দেশীয় রাজ্যসমূহও স্বাধীনতা লাভ করিবে এবং সার্বভৌম
ক্ষমতা দেশীয় নৃপতিগণের হস্তেই ফিরিয়া আসিবে। তখন

দেশীয় নৃপতিগণকে হয় নূতন ভারত সরকারের সহিত
রক্তরাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে, নতুনা নূতন
কোনরূপ রাজনৈতিক ব্যবস্থা করিতে হইবে।
ভারতীয় নৃপতিগণ ভারতের স্বাধীনতাকামী ; তাঁহারা
আনন্দের সহিত স্বাধীন ভারতের সহিত নূতন
সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ
করিয়াছেন।

খেলাধুলা

ক্রিকেট :—

ভারতীয় ক্রিকেট দল খেলার জন্য ইংলণ্ড গমন
করিয়াছেন। প্রথমেই উরটোর দলের সহিত তাহাদের
খেলা হয় ; এই খেলায় ভারতীয় দল ১৬ রাণে পরাজয়
বরণ করে। ইহার পরে অক্সফোর্ড দলের সহিত খেলা
অসমাপ্তিভাৱে শেষ হয়। এই দুই খেলায় ভারতীয়
দল বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। কিন্তু পরবর্তী
খেলাগুলিতে ভারতীয় দল ক্রমশঃই অধিকতর কৃতিত্ব
দেখাইয়া সকলকে চমৎকৃত করিতেছে। তৃতীয় খেলায়
ভারতীয় দল সারের স্তায় একটি শক্তিশালী দলকে ২
উইকেটে পরাজিত করিয়াছে ; এবং এস, ব্যানার্জি ও
সি, টি, সারভাতে শেষ উইকেটে ২৪২ রাণ করিয়া সকল
পূর্ব রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছেন। চতুর্থ খেলায় ভারতীয়

দল কেম্ব্রিজদলকে এক ইনিংস ও ১৯ রাণে পরাজিত করে।
লিটোর দলের সহিত পঞ্চম খেলা অসমাপ্তিভাৱে শেষ
হয়। ষষ্ঠ খেলা হয় স্কটল্যাণ্ড দলের সহিত ; এই খেলায়
ভারতীয় দল এক ইনিংস ও ৫৬ রাণে জয়ী হয়। ইহার
পর ইংলণ্ডের এসিক্স এন্, সি, সি দলের সহিত লর্ডস মাঠে
ভারতীয় দলের নিৰ্দিষ্ট ব্যাপো খেলা হয় ; এই খেলায়
এন্, সি, সি দল এক ইনিংস ও ১২৩ রাণে পরাজিত হয়।
ভারতীয় দলের এই জয় গৌরবজনক ; এন্, সি, সি দল
ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট দল ; ইহাকে এইরূপ শোচনীয়
ভাবে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য করা অতিশয় কৃতিত্বের
কথা। ২২শে জুন টেষ্ট খেলা আৰম্ভ হইবে। আমরা
আশা করি ভারতীয় দল ইহাতেও অসুন্দর কৃতিত্ব প্রদর্শন
করিতে সক্ষম হইবে।

ফুটবল :—

কলিকাতায় ফুটবল লীগ খেলা চলিতেছে। এ পর্যন্ত বতগুলি খেলা হইয়াছে তাহাতে মোহনবাগান ও ইষ্ট বেঙ্গল দল প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মোহন বাগান ১২টি খেলার ৯টিতে জয়ী ও তিনটিতে ড্র হইয়া ২১ পয়েন্ট লাভ করিয়াছে; ইষ্ট বেঙ্গল ১২টি খেলার ৯টিতে জয়ী, দুইটিতে ড্র এবং একটিতে পরাজিত হইয়া ২০ পয়েন্ট লাভ করিয়াছে।

স্থানীয় খেলাধুলা :—

গত ৫ই মে মহারাজ ভূপ বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজবাড়ীর মাঠে মহারাজার দলের সহিত কলিকাতার কালীঘাট দলের একটি প্রদর্শনী ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

উভয় পক্ষ একটি করিয়া গোল দেওয়ার খেলাটি অসম্যাসিতভাবে শেষ হয়। কুচবিহার দলে স্বয়ং মহারাজ এবং এম্‌ রায়, পটনা, ঝাটু, মেঘা ও কাস্তি খেলিয়া ছিলেন।

গত ২৩শ মে হইতে ৪ঠা জুন পর্যন্ত কুচবিহার এসোসিয়েশন ফুটবল কাপ টুর্নামেন্ট খেলা হয়। এই খেলার উত্তর বঙ্গ, আসাম ও কলিকাতার বিভিন্ন টিম যোগ দিয়াছিল। খেলার মানও বেশ উচ্চস্তরের হইয়াছিল। বগুড়া ও বঙ্গপুর টাউন ক্লাব টিম কাইনালে উন্নীত হয় এবং ৪ঠা জুন কাইনাল খেলায় বগুড়া বঙ্গপুরকে ২-১ গোলে পরাজিত করে। বগুড়া ক্লাব পর পর তিন বৎসর কাপ বিজয়ী হইয়া চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করিয়াছে।

চিত্র-পরিচয়।

কুচবিহারের মহারাজ হরেন্দ্রনাথরায় একজন প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। তিনি ১৭৮৯ হইতে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি একাধারে কবি, শিল্পী এবং সাধক ছিলেন। তাঁহার রচিত শ্রীমদ্ভাগবত বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন পাইবার যোগ্য। তাঁহার সময় কুচবিহারে বহু জনহিতকর পুঁর্নকর্ষ অনুষ্ঠিত হয়। বিখ্যাত “সাগরদোষি” তাঁহারই রাজত্বকালে খনিত হয়।

বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানান বাইতেছে যে, ভারতীয় সৈন্যদল এবং নৌ ও বিমানবাহিনীতে অফিসার সংগ্রহের নিমিত্ত মেজর শর্মা ও ফ্লাইট-লেক্টেণ্ট বসু শীঘ্রই কুচবিহারে আসিতেছেন। তাঁহারা ২৩শে জুন কুচবিহারে পৌঁছিবেন এবং ২৫শে পর্যন্ত স্থানীয় মার্কেট হাউসে থাকিবেন। অফিসার সংগ্রহের নিমিত্ত তাঁহারা রাজকর্মচারী, সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষগণ এবং সৈন্যদলে যোগদানেচ্ছু যুবকগণের অভিভাবকদিগের সহিত আলাপ আলোচনা করিবেন। তাঁহারা বিভিন্ন সৈন্যদলে কর্মচারীরূপে (*Officer*) যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা মার্কেট হাউসে উপরোক্ত দিবসসমূহে মেজর শর্মা ও ফ্লাইট-লেক্টেণ্ট বসুর সহিত দেখা করিবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি

কুচবিহার-দর্পণ কুচবিহার রাজ্য হইতে প্রকাশিত একমাত্র পত্রিকা। মহারাজা ও রাজ পরিবারবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া রাজকর্মচারী, জমিদার, ব্যবসায়ী, উকীল, ডাক্তার, শিক্ষক, ছাত্র প্রভৃতি সকল শ্রেণীর পাঠকবর্গ এই পত্রিকা নিয়মিতভাবে আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। কুচবিহার রাজ্যে কোনও দ্রব্যের প্রচলন করিতে হইলে কিম্বা প্রচলিত দ্রব্যের কাঁচিতি বাড়াইতে হইলে এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। ষ্টেট প্রেস, কুচবিহার—এই ঠিকানায় কুচবিহার দর্পণের ম্যানেজারের সহিত পত্রালাপ করিলে বিজ্ঞাপনের হার জানা যাইবে।

ম্যানেজার কুচবিহার দর্পণ।



সালকার।

বিবাহের সালকার অপরিহার্য। ইহা কমনীয় দেখে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে, পরন্তু 'স্ত্রী ধন' হিসাবে ইহাই হয় মেয়েদের একান্ত নিজস্ব সম্পদ।

বিশিষ্ট শিল্পির নিপুণ স্পর্শে সালকারের—তথা দেহের শ্রী বর্দ্ধিত হয়; আর সুনির্বাচিত স্থানে নির্মিত হইলেই প্রকৃত মূল্য (intrinsic value) ঘটিতে হয় না বলিয়া সালকার হয় যথার্থ সম্পদ।

নিবেদক—

জগবন্ধু জুয়েলার্স।

প্রাঃ—শ্রীমতী লক্ষ্মী বণিক।

নৃপেন্দ্রনারায়ণ রোড, কুচবিহার।

JOSHI & COMPANY.

Coal Merchants and Colliery Agents.

33, Canning Street, Post Box No. 321,

CALCUTTA.

Phone No. 4264

Telegrams :— TALAJIA.

Branch :— KERMANI BUILDINGS, Hornby Road, Fort, BOMBAY.

Suppliers of Coal and Hard coke

at

reasonable rates.

কোচবিহার দর্পণের নিয়মাবলী ।

১। কোচবিহার দর্পণের প্রতি সংখ্যার মূল্য চারি আনা ও বার্ষিক মডাক তিন টাকা; বার্ষিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

২। পত্রিকা প্রকাশের জন্য লেখা কাগজের একপৃষ্ঠায় স্পষ্টরূপে লিখিয়া সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে। উৎকৃষ্ট লেখার জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

৩। অননোনীত লেখা ফেরৎ লইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকেট সহ ঠিকানা লেখা খাম পাঠাইতে হয়; অননোনীত কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয় না। অননোনয়নের কারণ দর্শাইতে সম্পাদক অক্ষম।

৪। মনোনীত লেখা কখন প্রকাশিত হইবে সে সম্বন্ধে সম্পাদক কোনরূপ নিশ্চয়তা দিতে পারেন না।

৫। কোচবিহার দর্পণে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা ১০০ টাকা; অর্ধ পৃষ্ঠা ৫০ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠা ৩০ টাকা। কভারে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হার দ্বিগুণ।

৬। টাকাকড়ি সম্পর্কিত চিঠিপত্র ম্যানেজারের নিকট লিখিতে হইবে।

ম্যানেজার কোচবিহার দর্পণ
ষ্টেট প্রেস, কোচবিহার।

কোচবিহার রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকভাৱ—

১৯১৩ সালে স্থাপিত

কোচবিহারের প্রধান ইয়েন্ট ষ্টক ব্যাংক।

দি

কোচবিহার ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন

লিমিটেড।

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্যের জন্য বিখ্যাত

ব্যবসায়ীগণকে মূল বন্ধু, ওভারড্রাফটে ও শ্রাব্য
সিকিউরিটিতে এবং হ্যাওনোটে টাক কর্জ দেওয়া হয়।

সেভিংস হিসাবে ২% টাকা ও কারেন্ট একাউন্টে

১০% আনা এবং দ্বিবার্ষিক, বার্ষিক ও অর্ধবার্ষিক স্থায়ী

আমানতে যথাক্রমে ৪%, ৩% ও ২৫% টাকা হিসাবে সুদ

দেওয়া হয়। সেভিংসে চেকে টাকা তোলা যায়।

শ্রীমনোমোহন চৌধুরী,

ম্যানেজার।

গ্রীষ্মে ও বর্ষায় আরাগ প্রদ
—শীতে আনন্দদায়ক—

পাবনার

কেসলার

হোসিয়ারীর

নানা প্রকার হাল কাসানের গোষ্ঠী আপনাদের
ভূষি দিবে।

আজাদ স্ট্র টেয়ার্স কুচবিহার

ও

হাজি মোবারক আলী মহম্মদ আলী,

দিনহাটা।

মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকতে চায়—কিন্তু তা কি হয়—হয় না—কালের চাকার
তলে চাপা পড়ে যায়—

চির সুন্দর মরণ এসে তার সকল সঙ্কট মুছে দেয় !!

ভবুও—

কালির আঁচর আর ছাপার হরফ মানুষকে সত্যই অমর ক'রে তোলে নাকি ?

ইলা মেসিন প্রেস

আপনাদের একান্ত আপনার প্রতিষ্ঠান—!!

রাজকুমারী ইলা আচ্চ নেই কিন্তু তাঁর আত্মা অমর হ'য়ে থাকবে আপনাদের
সহায়ত্ব পুঁই—তাঁর ত্রিপাদপায়ে উৎসর্গিত এই দেনীয় প্রতিষ্ঠানট।
এরা আপনাদের দয়া সর্বতোভাবে কামনা করে ।

অর্ডার সাপ্লায়াস ও কমিশন এজেন্ট—

হরেন্দ্রলাল পাল এণ্ড সন্স

কুচবিহার।

জেনারেল মার্চেন্ট, সর্বজন বিদিত ।

আমরা যাবতীয় ষ্টেশনারী আর্টিকেলস্ ও বেনেতী ময় মসলা পাইকারী ও
ধুচুরা দরে বিক্রয়ার্থে মজুত রাখি ।

—আমুন—

বিশুদ্ধ ভাষাকে প্রস্তুত

স্বাদে ও গন্ধে অভুলনীয়

আপনাদের চির পরিচিত ও আদরনীয়

* ছাতা বিড়ি *

পান করুন ।

এজেন্টঃ—গঙ্গাজল হীরলাল সোয়ানী ।

কুচবিহার ।



ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ

ଜନ୍ମ

୧୨୫ ଯାଦ, ୧୨୧୦

ମୃତ୍ୟୁ

୧୫୫ ଆଷାଢ଼, ୧୨୮୦

কুচবিহার দর্পণ

নবম বর্ষ

আষাঢ় ১৩৫৩ সন, রাজশক ৪৩৭

৩য় সংখ্যা

মধুসূদন

ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম-এ, পি-এইচ-ডি, ডি-লিট, সি-আই-ই

মহাবাত্যা-পরিস্কৃত শালদ্রুম সম
হে ভ্রাতা, তোমার ঘরে, ক্ষীণা বঙ্গভাষা
শস্যিরা কম্পিত হ'ল নবীন আশ্বাসে
নবীন বোধের ভেরী, নবীন হৃদুতি
নির্বোধে করিল ব্যাপ্ত কাব্যের অম্বর
সুগম্ভীর ; জাহ্নবী-পিনক-জটা যেন
মহেশ্বর নির্মোচিত জটার কলোলে
বেহিত-সঙ্গিলধারে নৃত্য করে' ফেরে ;
সমুদ্রমগ্নে যেন শস্যরাশি হ'তে
অনন্ত কৌস্তভমণি মুক্ত হয়ে পড়ে
হলধর-হলাকীর্ণ বঙ্গভাষা ক্ষেত্রে ।
মূর্কজ-গ্রথিত ভব মহামালা হ'তে
বস্ত্রের শলাকা সম বিদেশের কত
মহাভাব কি ইঙ্গিতে উচ্ছলিয়া ওঠে !
ছুঁদামের ছন্দ ওঠে বস্ত্রের নিঃশ্বনে ।

তব নব জন্মের হকারে হকারে
রক্তমণি মাণিক্যের নবীন ফসল
চমকিয়া ওঠে যেন অপূর্ব বিশ্বরে ;
সেই তব নব শিল্প, নব শস্যভূমি
চিরদিন মগোরবে রহিবে অক্ষয় ।
তবু তার পুষ্প নাহি, বীজ তা'র নাহি,
নবীন নবীন পথে জন্মমৃত্যুস্রোতে
সে করে না আপনারে নব আবিষ্কারে ।
সে যে স্বর্গভূমি, চিরকাল মৃত্যুহীন,
তাই তার মৃত্যু নাই, তাই সে যে দীন,
অতি দীন, নবপ্রকাশের স্রোতঃপথ
বন্ধ করি' আপনাতে পূর্ণ সে যে রহে ।
কণ্ঠের মৌক্তিকমালা সম বঙ্গমাতা
চিরদিন কণ্ঠে তারে ধরিয়া রহিবে ;
বন্ধঃস্রোত তা'র ভেসে যাবে অন্যদিকে ।
হে ভ্রাতা, সাধনা তব কোন্ অভিলাষে
মাটির না লভি' ছাত হ'ল স্বর্গভূমে ।

সাহিত্য বাস্তবতা

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যে দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা একটি বড় জিনিষ। একই ঘটনা লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে বা পাঠকের মনে বিভিন্ন প্রকার রঙ্গের সৃষ্টি করে। এই দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতার নিমিত্ত যে জিনিষটি বেশী প্রয়োজনীয় সেটি হচ্ছে ভ্রমোদর্শন। জীবনের নানা বিচিত্র দিকের সঙ্গে পরিচয় যত নিবিড় হ'য়ে উঠবে, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি তত স্বচ্ছ হবে। তারুণ্যের স্পর্শের একদিন যে বিশেষ মতবাদকে নিন্দা ক'রে এসেছি, প্রৌঢ় মনের অভিজ্ঞতার আলোকে সে মতবাদকে শ্রদ্ধা ক'রতে শিখবো। সাধারণ বুদ্ধির পিছনে বুদ্ধির অতীত আর একটি চৈতন্য বিস্তার। সাধকের সপ্তম ভূমির মত এই চৈতন্যও হস্তাপ্য ও দুরধিগম্য। তপস্শা দ্বারা একে লাভ করতে হয়। তেমনি একে বুঝতে হ'লেও তপস্শার প্রয়োজন। মহা-প্রতিভাশালী বহু লেখকের অনেক রচনা সেজন্তে সাধারণে বুঝতে পারেন না। কেমন ক'রে পারবেন? তিনি যে লোকের সংবাদ কথায় বা চিত্রে বা সুরে আমাদের কাছে পরিবেশন করিতে চাইবেন, সে লোক হয়ত তাঁর কাছেও সত্ত্ব পরিচয়ের রহস্য-কুহেলিকার তখনও আবৃত। সে গভীর লোকের ধবর ভাবার বন্ধনে বন্দী ক'রে প্রচলিত উপমা-সাহায্যে প্রকাশ করা তাঁর কাছেও তখন একটি কঠিন সমস্যা। হঠাৎ বন্ধনের মধ্যে ধরা দিতে চায় না সে অনুভূতি। অনেক অনুভূতি আবার এত অল্পক্ষণ স্থায়ী যে, তার

স্থায়িত্বকালে তাকে প্রকাশ করার সময় হয় না। স্মৃতির সাহায্যে হাধানো মুহূর্তটির আনন্দের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হয়ত তার অধঃতা বজায় থাকে না। হয়তো সেই হারিয়ে ফেলার দক্ষা কিছু ভুলচুকও হয়। তবুও প্রতিভাশালী লেখকেরাই তা' প্রকাশ করতে সমর্থ তাঁদের প্রকাশ নিপুণতা দ্বারা, তাঁদের ভাবের ঐশ্বর্য দ্বারা, তাঁদের সহজাত স্থাপন-ক্ষমতাদ্বারা। অক্ষম লেখকের লেখনী সে জিনিষের নাগান পায় না। ক্ষমতাবান লেখককেও অবুঝের গালাগাল সহ্য করতে হয়। বহু প্রতিভাশালী লেখকের ভাগ্যেই এ ঘটনা ঘটেছে। ষাঁরাই আজ সাহিত্যরঙ্গতের ধবর রাখছেন, তাঁরা এটি ভানেন।

আজ রবীন্দ্রনাথের কথা তাই বিশেষ মনে পড়ে।

বাংলার রবীন্দ্রনাথ, বাঙ্গালীর রবীন্দ্রনাথ যে কত বড় সম্পদ ছিলেন, বাঙ্গালী আমরা এখনো তাঁকে বুঝতে পারিনি। তাঁর যে বিরাট আদর্শ আমাদের সামনে হিমালয়ের সমান উঁচু হ'য়ে অবস্থান করছে এর পাশে মেকী সাহিত্যের ও ধার-করা বিদেশী আদর্শের কল্পনাকে বসাতে আমরা যেন লজ্জা বোধ করি; পারিপার্শ্বিককে অগ্রাহ্য ক'রে, আমাদের বাস্তব সমস্যাতে উপেক্ষা করে সোভিয়েট রাশিয়া থেকে সাহিত্যের আদর্শ আমদানী করতে যেন ইতস্ততঃ করি। উই-কেন্দ্রিক বস্তুনিষ্ঠতাই যে সাহিত্যের একমাত্র উপাদান নয়, রবীন্দ্রনাথের পরেও কি বাঙ্গালীকে তা মনে

করিয়ে দিতে হবে? রবীন্দ্রনাথকে আমরা আগাদের স্বভাব-সুলভ হৃদয়-প্রিয়তার কেন্দ্র না করে তুলে প্রকৃতপক্ষে যে সংস্কৃতির ও বেউদার মস্তকের তিনি ঋষি ছিলেন—কি আর্টে, কি জীবনে, কি ধর্ম্মে—আমরা যেন সেই মস্তকের সাধনা শুরু করি। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালী জাতির নয় মেরুদণ্ডের সৃষ্টিকর্তা; আমরা হৃদয় করে বেড়াই বটে, সেই মেরুদণ্ডের সন্ধান এখনও পেয়েছি কি?

সাহিত্য সমাজের মাপকাঠি। সমাজের বাস্তবপটভূমিতে যে রস-শিল্প রচিত হয়, শিল্পী মানসের প্রকাশ-ভূমি বাহা, তাইই সাহিত্য। রাজনীতি আজকাল পৃথিবীর সর্বত্র সব চেয়ে বড় স্থান অধিকার করে রয়েছে। সমাজের বেশীর ভাগ লোক সকালে উঠে পড়েন দৈনিক খবরের কাগজ। তাতে যে আশ্বাস পান, সাহিত্যের মধ্যেও কি তাকেই খুঁজতে হবে? আধুনিক দিনের সমস্যা নিয়ে সাহিত্য রচিত হ'তে পারে এবং হচ্ছেও। 'রেইন-বো'র মত বড় উপন্যাসও তৈরি হ'য়েছে যুদ্ধের আবহাওয়ায়। প্যারিসে জার্মান অধিকারের দুঃস্বপ্ন নুই ব্রমকিন্ডকে প্রলুব্ধ করেছে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসখানি লিখতে।

কিন্তু পাশ্চাত্যজাতির সমস্যা অন্যরূপ। তারা যত ভীষণ দুঃখ অনাচার অত্যাচার সহ করেছে বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে, আমরা ততটা দুঃখের অভিজ্ঞতা লাভ করিনি। আগষ্ট আন্দোলনের ব্যাপক সত্তা ছিল না। যে দুটি জিনিষ খুব বেশী দোলা দিচ্ছে আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবনকে—ব্ল্যাকমার্কেট ও মদ্যস্তর—সে হ'লি বহু লেখকের উপজীব্য স্বরূপে একই করুণ রাগিনীর একঘেয়ে আলাপের মত বিশ্বাস হ'য়ে পড়েছে ক্রমশঃ। তবুও স্বীকার করতে হ'বে তারানকরের 'মদ্যস্তর', প্রবোধ সান্যালের 'অন্ধার', মনোজ বসুর বাপের 'মাদুঘ' প্রভৃতি এ সময়ের শ্রেষ্ঠ

রচনা। শাস্ত্রত সাহিত্যের পথে এ রচনাগুলি পা' বাড়িয়ে রয়েছে।

এ কথা নিঃসন্দোহে বুঝা যায় যে লেখা আসে কবি-মানসের অন্তর্নিহিত তাগিদ থেকে। কবি-মানসের বিভিন্নমুখী গতি থেকে বিভিন্ন ধরনের লেখার সৃষ্টি। বেদিন বাংলার লেখকেরা দেশের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে অবহিত হবেন, সেদিন সেই প্রসারিত চেতনা তাদের বাধ্য করবে ব্যাপক রাষ্ট্রীয় সমস্যা ও সমাজ সমস্যাকে আশ্রয় করে গল্প ও উপন্যাস লিখতে। এই ব্যাপক চেতনার লক্ষণ বহু লেখকের সাম্প্রতিক রচনার সুস্পষ্টরূপে ছুটে উঠেছে। একটি জীবন্ত সাহিত্য বিভিন্ন আঙ্গিক ও মাধ্যমে দেশের সমস্যাগুলিকে ইতিহাসের পাতার অক্ষর করে রেখে দিচ্ছে। বহু লেখার আবশ্যিক কি? একখানি সার্থক রচনার এক এক যুগকে অমর করে রাখে। 'বেমন সোভিয়েট রাশিয়ার দুঃখহৃদয়' চিত্র ছুটে উঠেছে ওয়েলেন্স্কির বিখ্যাত উপন্যাসখানিতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে ভারতব্যাপী বিরাট রাষ্ট্র-আন্দোলনের চিত্রকে অমর করে রেখে গেলেন। এঁদের প্রতিভা এ সব রচনাকে অপূর্ণ আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে যুগ প্রয়োজনের উর্দ্ধে উন্নীত করে দিয়েছে। চেতনা যে কি ভাবে অমর সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে, তার খোঁজ নিতে গেলে ওগুলির সঙ্গে সম্যক পরিচয় হওয়া প্রয়োজন।

সাহিত্যের মাপকাঠি হচ্ছে তার রসোত্তীর্ণতা। যুগের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে জীর্ণ পুঁথির পাতার মত অবহেলিত হয় যে রচনা, মানব মনের প্রয়োজন-সাম্য বা বজায় রাখতে পারে না, তার দুর্গতির কারণ হচ্ছে রসোত্তীর্ণতার অভাব। এখানে একটা বড় কথা এই যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলে সেই বিষয়টি রসোত্তীর্ণ করা বড় কঠিন হ'য়ে পড়ে। নিজের ব্যাবোধ ও

নিপীড়িত চেতনা কবি-মানসকে যে রচনার উৎস করে তার প্রতি ছত্রে ফুটে উঠে অনুভূতির অগ্নিস্থলিঙ্গ। একটা যুগ চলে যাচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে—এ খুব সত্যি কথা। এযুগে স্বভাবতই কবি বা শিল্পী-মানস কিছু অব্যবহিত। নতুন সময়ের আতাসে প্রকৃতিই হ'য়ে উঠেছে, এমন মন এখন হয়ত বিরল। হয়ত অত্যন্ত নিকট থেকে দেখছি বলে অনেক নতুন রচনাকে, অনেক ঐতিহাসিক ঐক্যপরিমেন্টকে আমরা বাজে আধুনিকতা বলে ভুল করছি। রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণ-কুন্তী' সংবাদ বধন রচিত হয়েছিল, তখন সেকালের অনেক বিজ্ঞ সমালোচক বলেছিলেন, "মহাভারতের কথা নিয়ে এ আবার কিরকম কাব্য?" আমরা আবার যেন প্রশ্ন-কর্তাদের দলে না পড়ি। কবি-মানস কোন দিন হজুকের বশীভূত হবেন না। হুঁদিনের হাততালিকে অবজ্ঞা করলেও তাঁর চলবে। অনর্থক কালাপাহাড়ি বেখানে সেখানে তাঁর সত্য শুভ ও কল্যাণদৃষ্টি কখনো যায় দেবে না। শিল্পীর সকল রচনার মধ্যে থাকবে একটি চারিত্র। রচনার ওপর এই চারিত্রের দৃঢ় ছাপই পাঠকের মনে এনে দেবে নিঃশংসর নির্ভরশীলতা।

এ আমরা যেন আদৌ ভুলিনে যে কোন রচনার আধুনিক যুগের সমস্তা আছে কিনা, রাজনীতির ক্ষেত্রে লেখকের দৃষ্টি স্বচ্ছ না ঘোলাটে, হৃদয়ের কথা ঠিক করে বলা হল কিনা—এ সব দেখে সাহিত্য বিচার হয় না। আজকাল নানা কারণে আমাদের দৃষ্টি কাপসা হ'য়ে এসেছে, মন হ'য়ে এসেছে নিস্তেজ। সমালোচনার আদর্শ অল্প রকম হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। জীবনের শাস্ত্রত্ব সত্যকে আমরা এখন অস্বীকার ক'রে চলেছি। যে দেশে গীতার মত সাহিত্য রচিত হয়েছিল, যা আজ দেড় হাজার বৎসর ধরে স্বকীয় আলোয় উদ্ভাসিত, কৃতশত মনীষীর ভাষ্য-টীকা-টিপ্পনীর অর্ধাশ্রয় বা এই দীর্ঘ

দিন ধরে সজ্জিত হ'য়ে এসেছে—আজ আমাদের হুঁজুগ সেই দেশের সাহিত্যের আদর্শ আমাদের আমদানি করতে হয় সমুদ্রপারের দেশ থেকে। সাংবাদিকতা ও সাহিত্য যে এক জিনিষ না এ কথা আমরা ভুলতে বসেছি। সেদিনও আমাদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ; যে শুধু নির্মল পরিবেশ ও উদার শুভবুদ্ধি শিল্পী-মানসের একমাত্র একান্ত প্রয়োজনীয়, তিনি তার আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার মধ্য দিয়ে; তাঁর তপস্বীস্বরূপ, মৌনমুখর মুহূর্তগুলির মধ্য দিয়ে দিনশেষের কল্যাণরাগিণী কেমন নানাভাবে অরূপের ও রূপের ঐশ্বর্য বিস্তার করেছে তাঁর লেখনীর লীলা-বিলাসের ছন্দে। আমরা সাহিত্যকে পলিটিক্‌সের দিন-মজুরীতে নিরোগ করার পূর্বে একথা যেন একবার ভেবে দেখি।

এত কথা বলবার কারণ যে সম্পূর্ণরূপে বটেছে সাহিত্যক্ষেত্রে এমন উক্তি আমি :করছি না। বাংলা সাহিত্য আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, একথা নিঃসন্দোহে বলা যায় যে ভারতীয় অন্তান্ত প্রাদেশিক সাহিত্যের ভুলনার সেটি একটি বিশিষ্ট স্থান। অন্তান্ত প্রদেশের সাহিত্য-রসিকগণ বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কোতুহলী হ'য়ে উঠছেন এবং মূল বা অনুবাদের সাহায্যে তারা রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে নিজেদের পরিচয় স্থাপন করতে ব্যগ্র এ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-মূলক তত্ত্ব। সেজন্যই আমাদের অবহিত হ'তে হবে যে আমরা সাময়িক উত্তেজনার মোহে পথভ্রান্ত হ'য়ে না পড়ি। ভারতীয় আদর্শ অজ্ঞান রাখবার দায়িত্ব আমাদেরই হাতে—এ কথা যেন না ভুলি। নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে যেন পথদেখে নিয়ে চলি সত্য ও স্মরণের পেছনে, সাময়িক হজুগ থেকে নিজেদের যেন যথাসম্ভব দূরে রেখে চালাই।

দেশপ্রেমের এ আর একদিকের বিকাশ। স্পষ্ট করে
এ কথা প্রচার করতে যেন লজ্জিত না হই।

অবার রবীন্দ্রনাথের কথা তুলতে হয়। সাহিত্য
কতবড় আদর্শ তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরে রেখে
গেলেন। আজ আমরা রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বক্ষা করছি
ঘরে ঘরে, কিন্তু রসক্ষেত্রে বা শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর পূজা
ওভাবে হবে না। হবে বখন আমরা রবীন্দ্রসাহিত্যের
আলোক-বর্ডিকা হস্তে প্রেমের পথে দৃঢ়পদে অগ্রসর হব।

সে যে কতবড় সম্পদ, সে যে কতবড় আদর্শ তার সম্যক
মাপকাঠি এখনো আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠে নি;
তাকেও অনেকটা আমরা হুঙ্কের পর্যায়ে এনে
কেনেছি।

লেখক ও কবির মধ্যে একটি সহজাত নিঃসঙ্গতা
আছে। দৈনন্দিন জীবনোত্তীর্ণ বৃত্তে আনন্দলোকের
আবাহন তাঁদের লক্ষ্য; যার জন্যে লেখকের প্রয়োজন
আপনার ভাবজগতের মধ্যে ডুবে থাকা, গভীরতম
রূপে বাস করা। গভীর আনন্দ বা ছুঁধের মধ্য
দিয়েই সৃষ্টি। আপনাকে প্রতি মুহূর্তে পূর্ণ করে ও প্রতি
মুহূর্তে অতিক্রম করে তিনি অগ্রসর হন। চারিপাশের মানব
হৃদয়ের অন্তরতম স্পন্দনটিকে তিনি একান্তভাবে অনুভবের
চেষ্টা করেন বলেই তো শ্রেষ্ঠ প্রেরণার ক্ষণে বখন
কথা বলেন তখন তাঁর মধ্যে বিশ্বমানবের কণ্ঠস্বর বেজে
ওঠে জীবনের মূলতম রহস্যের আবেশ একান্তভাবে সঞ্চারিত
হয়। বাস্তবকে বুঝতে হোলেও দূর থেকে তাকে দেখতে
হয়; লোকলোচনের অতি স্পষ্ট পাদপ্রদীপের সামনে
থেকে তা সম্ভব হয় না। একান্ত চাই নির্জনতা, ঝট্টের
চম্পিত দিনের নিঃসঙ্গ অবকাশ, বুকবার ও বোকাবার প্রয়াসে
তপস্তা। সৃষ্টির আনন্দ আসে যে অনুভূতি থেকে,
বাক্যে বলা হয়েছে 'আনন্দ', সে আনন্দ সহজ-প্রাপ্য নয়,

সে আনন্দ তপস্তা। ভিন্ন চির অপরিচিতই থেকে যায়।
এক শীতের নির্জন অপরাহ্নে ছন্নছাড়া সরাইখানা ও
সরাইওয়ালীর দুঃখের জীবন আলফাস দোবের মনে যে
কল্পণ অনুভূতি, যে 'বাণা ও বেদনা জাগিয়েছিল,
আমাদের মনেও সেই জীবনের ছবিটি রেখাপাত করে
গেল। কারণ লেখকের অনুভূতি তাঁর তপস্তাভূমি সেই
সরাইখানার প্রাঙ্গণে একটি শীতের দিনে জাগ্রত হয়ে
উঠেছিল।

গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের গর্ব
করবার জিনিষ রয়েছে। নবতর বাহিনীর অশঙ্করোখিত
ধূলি দিকচক্রবালে দেখা দিয়েছে। সেই আশার বাগ্মিটি
উচ্চারণ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো। অত্যন্ত
আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি বঙ্গবাণীর বেদীমূলে কয়েকজন
শক্তিশ্বর নবীন লেখকের আবির্ভাব। এতে এই প্রমাণ
হ'ল যে বাংলার প্রাণশক্তির উৎস আজও তেমনি সজীব,
যেমন ছিল মুহূর্তরামের চণ্ডীকাব্যের যুগে, যেমন ছিল
ভারতচন্দ্রের যুগে, যেমন ছিল 'নব বাবু বিলাসের'
ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগে, যেমন সেদিনও
দেখেছি বঙ্কিম-শরৎ-রবীন্দ্রনাথের যুগে। এঁরা নব্য-বাংলার
প্রাথমিক স্তরে পেরেছেন। সে স্বর বেজে উঠেছে
এঁদের লেখায়। যে মাটিতে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন
সে মাটি অজর অমর। ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাব্যতাকে
তা নিজেদের মধ্যে বহন করছে।

আর একটি কথা সকলের শেষে বলি।

সাহিত্য আমাদের মনকে অমৃতরস দ্বারা বলবান
করছে। তা' যে কোন আঙ্গিকের মধ্য দিয়েই হোক না
কেন। নিগূঢ় বিশ্ব-রহস্যের অন্তরতম বস্তুটির সন্ধানে যে
আনন্দ, যে আনন্দ তার আবিষ্কারে—উপনিষদের ঋষির
অতঃসূক্ত আনন্দের মতো তার রূপ আমরা দেখেছি। স্মৃতরাং

এও সাহিত্যের যে একটা বড় দিক তা আমাদের মনে রাখা উচিত। সাহিত্য আমাদের পরিচিত করবে জীবনের চরমতম প্রসঙ্গগুলির সঙ্গে। দেবে আমাদের উদার, মৃত্যুঞ্জয় দৃষ্টি; সকল সুখ-দুঃখের উর্দ্ধে যে অসীম অবকাশ ও তৃপ্তি আমাদের পরিচিত করবে সেই অবকাশ ও তৃপ্তির সঙ্গে।

“ভেজো বস্ত্রে রূপং কল্যাণতমং তন্ত্রে পশ্যামি।”

যে জ্যোতির মধ্যে বিশ্বদেবের কল্যাণতম মূর্তি অধিষ্ঠিত, আমরা যেন দেবতার সেই জ্যোতিকে—দৈনন্দিন জীবনোত্তীর্ণ বৃহত্তর অশ্রুভূতি ও ভাবকে—সাহিত্যের মধ্য দিয়ে দর্শন করি। সাহিত্য শুধু রসবিলাস নয়। জীবনের দুঃখ, পরাজয় ও বার্ষিকতার দিনে যে সাহিত্যরসিক পাঠক অচঞ্চল থাকেন, দারিদ্র্যের মধ্যেও যিনি নিজেকে হেরে জ্ঞান না করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস রাখেন, সাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া তাঁর সার্থক। জীবনসমস্যাগুলির সমাধানের গূঢ় প্রেরণা যে সাহিত্যে তার মধ্যে আমরা পাবো কল্যাণতম মূর্তিটির সন্ধান।

আর্টের পুরোগো রস-ক্ষেত্রে যদি আমরা এখনও ঘুরপাক খেয়ে মরি, তবে রবীন্দ্রনাথের মত বড় আদর্শের উপযুক্ত মূল্য আমরা দিতে পারবো না। বস্তুনিষ্ঠতার নামে বা হৃদ্যবেশে যাঁরা সাহিত্যের আদর্শকে ইদানীং বিভ্রান্ত করে তুলছেন, আমাদের দেশের সত্যিকার সমস্যাকে ও পারিপার্শ্বিকতাকে উপেক্ষা করে যাঁরা সোভিয়েট রাশিয়া নিয়ে মত্ত হ’য়ে আছেন তাঁরা যেন এসব কথা একবার ভেবে দেখেন। যে সাহিত্যের শিকড় এ দেশের মাটি থেকে রস সংগ্রহ করতে না, সমাজের বা দেশের মনে এ ধরনের সাহিত্যের কোন ফল-প্রসূত আবেদন থাকতে পারে না। এরূপ উৎকেন্দ্রিক বস্তুনিষ্ঠতার স্বৈরাচার থেকে বঙ্গ-ভারতীকে তারা যেন মুক্তি দেন, এই আমার একান্ত কামনা।*

*কুচবিহার সাহিত্যসম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।

অন্তরে ও বাহিরে

শ্রীঅরুণকুমার দাশগুপ্ত

তুমি চুপি চুপি রও,
মোর অন্তর সঞ্চিত স্বপনে।
চোখে চোখে কথা কও,
যবে মন্দির ঝঙ্কত চরণে।
তাইতো প্রভাতে মাটির দেবতা গড়ি,
ফুল চন্দনে তাই রাখিছ আবারি—
মন্দির বেদীতলে।
আর নিতাইয়া দীপ সন্ধ্যা বেলায়
আমি তোমাতে ডুবাই হাসি মুখে হার—
ভরা সাগরের জলে।

বাহিরে যখন তোমার বিসর্জন,
মোর সকল প্রগতি লুটায় তখন—
অন্তরে তব কাছে।
জানি মোর মালা তুমি পরেছ গলায়,
জানি প্রাণের বাসনা অর্ঘ্য সাজায়—
বিশ্ব মরুর মাঝে।
তাই দলে দলে রাখি—
লক্ষ কুসুম বন্ধিত চরণে।
মোর একা মনে বহে
পূত সৌরভ পূর্ণিত ভুবনে।*

* কুচবিহার সাহিত্যসম্মেলনে পঠিত।

বিনয়

(ভাস্কর)

নলিনী ডাক্তার। এ পাড়ায় বেশ নাম করিয়াছেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময়ে তাহার বাসার বাহিরের ঘরে বসিয়া একখানি বিলাতী ডাক্তারি মাসিকপত্র পড়িতেছেন, এমন সময়ে এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকিয়া নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি নলিনীবাবু?

হাঁ। বহন।

মোহিনীবাবু বসিলেন। বলিলেন, আপনি আমাকে চিন্তে পারেন নি, নিশ্চয়ই।

ঠিক মনে করতে পারছি নে।

তা, না পারবারই কথা। সে তো আর আজকের কথা নয়। বোধ হয় তের কি চৌদ্দ বছর হবে। আমরা পটুয়াটোলার সেই নেসে থাকতাম। সেই বে দক্ষিণদিকের ছোট ঘরটার। আপনি তখন মেডিক্যাল কলেজের থার্ড ইয়ারে, আমি রিপনে ফোর্থ ইয়ারে পড়ি তখন।

ও, হ্যাঁ, এখন মনে পড়েছে। তা বেশ! এতদিন পরে হঠাৎ কি মনে করে? এখন কি করা হয়? কোথায়—

আর করা হয়, থাকা হয়, কেন? করি কটু ঠিকি, থাকি শ্রামবাজারে। তা তোমার খবর কি? ডাক্তারি কেময় চলেছে?

চলে যাচ্ছে একরকম। আচ্ছা বোস, আমি আসছি।

নলিনী বাড়ীর ভিতরে গিয়া গৃহিনীকে পুরাতন বন্ধুসমাগমের সংবাদ দিয়া কিছু খাবার টাবার শুছাইয়া পাঠাইয়া দিতে বলিয়া বাহিরে ফিরিয়া আসিলেন। নলিনীবাবুর বাড়ীর ভিতরে বাইবার অর্থ অনুমান করিয়া মোহিনীবাবু বলিলেন, দেখ, খাবার টাবারের ব্যবস্থা করো না যেন।

না, না। ব্যবস্থা আর কি? এতদিন পরে হঠাৎ দেখা। একটু চা-টা খাবে বৈ কি!

চা! সর্বনাশ! ওটা আমার একেবারেই সহ হয় না।

সকালে বা সন্ধ্যায় একটু পান্ডা চা খেলে কিছু হবে না।

না, না। আমাকে আর লোভ দেখিও না। কথায় আছে—লোভে পাপ, পাপে—

অত ভয় পাবার কিছু নেই। সেকথা বাক। তারপর আর খবর টবর কি? হঠাৎ আমাকে মনে পড়ল যে? কারও অসুখ বিস্ময় নয় তো!

ওই তোমাদের এক কথা। যেন বিনা কাজে কারো বাড়ীতে কারো আসতে নেই। অবশ্য আমার ছোট মেয়েটা অনেকদিন থেকে পেটের অসুখে ভুগছে। ভেবেছিলাম, একবার তোমায় নিয়ে গিয়ে দেখাব। কিন্তু তার জন্ত তো কোন তাড়া নেই—সে একদিন তোমায় সুবিধেমেত গেলেই পারবে।

বেশ ভাল, যাব একদিন।

ইতিমধ্যে বাড়ীর ভিতর হইতে একটি ট্রে আসিল। তাহার উপর এক কাপ চা, একখানি রেকাবে দুইখানি জ্যাম-মাখানো টোষ্ট এবং চারখানা বিস্কুট। আর একখানি রেকাবে একটি ডিমের ওমলেট।

ট্রেখানি সামনে একটি টিপরের উপর রাখিবামাত্র মোহিনীবাবু প্রাণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কি সর্বনাশ! করেছ কি! তুমি তো জানো না আমার অবস্থা! চা পেটে পড়া মাংসই ভীষণ অম্ল হয়। আর জ্যাম-মাখানো টোষ্ট—নানে, বিস্কুটখানো ছুরি। আমাকে নিশ্চয়ই খুন করতে তুমি চাও না! তাই যদি তোমার মনে থাকে তবে এমন করে দশ্বে না মেয়ে, তোমার বস্ত্রের বাক্স থেকে একখানা সার্জিক্যাল ছুরি বের করে সোজা বসিয়ে দাও এই বুকে।

কি বা তা বলছ? নাও, ধেরে ফেল। অমুখ হ'লে আমি তার জন্ত দায়ী। আমার কাছে অনেক ওষুধ আছে। একটু চা খেলে আবার কারো অমুখ করে!

তুমি তো জান না ভাই, আমি কি খাই। সকালে কি খাই জান? আধ চামচে ওট-মিল একপোয়া জলে পনের মিনিট সিদ্ধ করে, তাতে তিনফোঁটা লেবুর রস আর আর দুফোঁটা আদার রস মিশিয়ে একটু একটু করে খেয়ে ফেলি। বাস্, সারাদিন আর এক ফোঁটা জলও না। রাত্রেও তাই, সঙ্গে এক চামচে কমলালেবুর রস।

এই খেয়ে তুমি কণ্টাক্তিরি করছ! মারা পড়বে শেষে?

কি করব ভাই, আমার কিছুই সহ হয় না।

আচ্ছা, চা-টা খেয়ে নাও তো দেখি, সহ হয় কি না।

নাঃ, তুমি দেখছি একেবারে নাছোড়বান্দা। শেষে একটা কাণ্ড কারখানা না করে ছাড়বে না। দেখি, একটু কাগজের টুকরো!

কি করবে?

আমরা স্ত্রীর ঠিকানাটা তোমার দ্বিগুণে রাখি। শেষ পর্যন্ত যদি—

কি বে বল ছাই—। নাও চা-টা ওদিকে বুঝি ঠাণ্ডা হয়ে গেল। একটু গরম করে এনে দেবে? ওরে—না, না। কিছু দরকার নেই। তুমি নেহাতই যখন ছাড়বে না।

মোহিনীবাবু চা খাইতেছেন। মুখ দেখিয়া মনে হয় যেন কুইনাইন মিক্চার খাইতেছেন, অতি ভরে ভরে, একটু একটু করিয়া। সঙ্গে টোষ্ট দুখানি মুচ মুচ শব্দ করিতে করিতে ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া গেল। বিস্কুটগুলি অম্লহিত হইবার পর যখন ওমলেটের পাল্লা, তখন নলিনী বাবুর ছোট মেয়ে একখানি বড় গোছের খালা আনিয়া আর একখানি টিপর টানিয়া কাছে আনিয়া তাহার উপরে রাখিয়া বলিল, মা পাঠিয়ে দিলেন।

ওমলেট-খানি মুখে পুড়িয়া মোহিনীবাবু চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিলেন এবং গাল ফুলিয়া থাকা সঙ্গেও চীৎকার করিয়া উঠিলেন এ কি করছ তুমি? তোমরা স্বামী-স্ত্রীতে ষড়বস্ত্র করে আমার আজ খুন করবে স্থির করেছ। কি দোষ করেছি আমি তোমাদের কাছে। কি দোষ করেছেন আমার স্ত্রী?

কি বলছ বা তা। নাও, আলাটা এগিয়ে নাও। লিচুকটা খেয়ে ফেল তো।

লিচু! ওবে ভীষণ গুরুপাক!

কে বলেছে? লিচুর শাঁস, একেবারে ভাইটামিনে ঠাসা।

লিচু শেষ হইলে, নলিনীবাবু বলিলেন, দেখ তালশাস-
গুলো কেমন, বেশ শক্ত হয়ে যায় নি তো?

না, এগুলো তো বেশ কচিই আছে। কিন্তু ও
আনগুলো কিন্তু চলবে না।

খুব চলবে। ওই তো মোটে চারটে আন—ছোটো
বোম্বাই আর ছোটো কিষণভোগ। নাও খেয়ে ফেল।
আন্তিনটা বরফ একটু গুটিয়ে নাও। হাঁ, মুখটা একটু
নীচু করে। ওরে, একটু জল আর একখানা তোয়ালে
নিরে আয় তো।

আম খাইয়া হাত ধুইয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির
করিয়া মোহিনীবাবু বলিলেন, যথেষ্ট হয়েছে। এবার
ওঠা বাক্।

কি যে বল! শসা ছফালি খেয়ে ফেল। হ্যাঁ, তারপর
ওই কলাটা। বেশ কলা কিন্তু।

নাও, এইবার হ'ল তো। এইবার পালাটা সরিয়ে
ফেল এখান থেকে। ছোটো সুখহঃখের কথা বলা বাক্।

বেশ তো। সুখহঃখ তো আর হুরিয়ে যাচ্ছে না।
নাও, ওই তরমুজটুকু খেয়ে ফেল তো—দেখো বেন বীচি
গিলে ফেলো না।

আচ্ছা, এবার হয়েছে তো। লোকে বলে, উপরোধে
চেকি গেলে, তুমি আমায় পাহাড় গিলিয়ে ছাড়লে।

কি যে বল, তার ঠিক নেই। কি আর খেয়েছ।
নাও, এইবার একটু মিষ্টিমুখ কর। সন্দেশ ছোটো ভুল
নাও দেখি।

সন্দেশ!

হ্যাঁ, ও সন্দেশ এপাড়ার সবাই চেনে। বেশ করেছে।
খেয়েই দেখ।

কিন্তু সন্দেশ যে আমার একেবারেই সহ হয় না।
হবে, হবে। খেয়েই ফেল না।

সন্দেশ শেষ হইবার পর দুইটি ডবল আকারের
রান্নাভোগ, তারপর দুখানি খাতা গজা খাওয়া শেষ হইলে
মোহিনীবাবু বলিলেন, এবার মাপ কর, আর না।

কি যে বল। পান্থরা ছোটো কিছুতেই কেন্দ্রে
পাবে না!

আর কিছু খাওয়া আনার পক্ষে অসম্ভব।

মোটাই অসম্ভব নয়। তাই, খেয়ে ফেল ওহুটো।

খাওয়া শেষ হইল। মোহিনীবাবু বলিলেন, একটু জল।

জল কেন, সরবৎ দিচ্ছে। ওরে কে আহিস্, এদিকে
একবার আয় তো।

সরবৎ আসিল। মোহিনীবাবু সরবৎ পান করিয়া
বলিলেন, আচ্ছা। আজ তাহলে উঠি।

কি যে বল, মিষ্টি খেয়ে একটু নোন্তা না খেলে
আমার একেবারেই ভাল লাগে না। নাও, ওই রাধা-
বল্লভীখানা খেয়ে ফেল আলুর দম দিয়ে।

পাঙ্গল হয়েছে। আমার আর কিছুই খাওয়ার জো
নেই। আজ দেখছি, বাড়ী ফেরা আমার আর ভাগ্যে
নেই।

ওসব বাজে কথা থাক্। নাও, খেয়ে ফেল দেখি
লক্ষী ছেলের মত।

রাধাবল্লভী শেষ হইল। তার পর দুইখানি শিঙাড়া,
তিনখানি নিমকি ও চারখানি খাতা কচুরি খাওয়া হইয়া
গেলে, কোন কথা না বলিয়া মোহিনীবাবু চেয়ার ছাড়িয়া
উঠিয়া পড়িলেন।

এদিকে খুকো আর একখানি খানা আনিয়া উপস্থিত
করিল। পূর্বের খানাখানি সরাইয়া লইয়া হাতের
খানাখানি টিপঘের উপর রাখিয়া বসিল, মা পাঠিয়ে
দিলেন।

খুকী চলিয়া গেল। মোহিনীবাবু হতাশ হইয়া পুনরায় চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

নলিনীবাবু বলিলেন, নাও দুখানা গরম লুচি খেয়ে ফেল ওই মাংসের কোলটুকু দিয়ে।

তোমার মতলবটা কি শুনি? আমাকে এমন করে বেধে মারবার মানে কি? কি শক্ততা করেছি আমি তোমার?

কি বা-তা বকছ। নাও, লুচিগুলোকে ঠাণ্ডা করো না।

আটখানা লুচি এবং এক বাটি মাংস শেষ করিয়া মোহিনীবাবু বলিলেন, তোমার এ ব্যবহারের মানে আমি এখনও বুঝতে পারছি নে। আমাকে অনুগ্রহ করে আমার চিকিৎসা করবার লোভ নয় তো।

আবার বাজে কথা। নাও চপ্ কখানা আর কলে রেখো না। কুই নাছের চপ্, নেহাত মন্দ হয় নি। আর ওই সঙ্গে কাটলেট দুখানা।

কি সর্বনাশ। এবে দেখছি রীতিমত বড়বয়স! এমন জানলে কখনো তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসতুম না।

বাও, বাও। আর বক্তৃতা করতে হবে না।

মোহিনীবাবু বক্তৃতা করিলেন না। খালাখানি শূন্য করিয়া বলিলেন, এবার রেহাই দাও।

খুকী পান দিয়া গেল। পান খাইতে খাইতে মোহিনীবাবু সত্যই উঠিলেন। বলিলেন, আজ আসি ভাই। যদি বাঁচি, তবে আবার দেখা হবে। নইলে এই শেষ দেখা।

কি বে কল। এস আর একদিন। গরমসর করা বাবে।

আসব, যদি বাঁচি।

মোহিনীবাবু নলিনীবাবুর বাসা হইতে বাহির হইয়া আরো দুই এক জায়গায় তাঁহার ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিলেন প্রায় সাড়ে নয়টার সময়ে। একটু বিশ্রাম করিবার পরই সংবাদ আসিল, ভাত দেওয়া হইয়াছে। যুক্ত-ঠিকানারোচিত চর্বাচোষ্য-লেহপেয়-সমমিত আহার সমাধা করিবার পর গৃহিণী বলিলেন, একটা কথা বলবো?

কি?

না, তুমি আবার রাগ করবে।

কি কথা, বলই না।

তোমার খাওয়া শেষ হয়ে গেল, বসতে ভুলে গিয়েছিলাম। আজ সন্ধ্যা করে ছেলেমেয়েদের জন্য পাটি-সাপটা পিঠে তৈরি করেছিলাম। দেবো এখন? দেখবে খেয়ে?

এই কথাগুলি বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই একখানি রেকাবীতে আটখানা পিঠে আনিয়া মোহিনীবাবুর সামনে ধরিলেন।

মোহিনীবাবু রেকাবখানি শূন্য করিয়া এক টোক-জল খাইয়া পান হাতে করিয়া হাঁকিলেন ওরে কে আছিস, তামাকটা দিয়ে বা।

পরদিন বৈকালে আনহাষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়ে নলিনীবাবুর সঙ্গে দেখা। নলিনীবাবু বলিলেন, এই যে মোহিনী, আজ কেমন, অনুগ্রহ টানুগ্রহ করোনি তো।

আর বলো না। কাল তোমার ওখান থেকে বাবার পর থেকে এ পর্যন্ত এক ফোটা জলও যদি মুখে দিয়ে থাকি। আজ আমার ওট-মিলের পথ্যটুকু পর্যন্ত বাবার সাহস নেই। এই চব্বিশ ঘণ্টা কি করে যে বেঁচে আছি, তাই আশ্চর্য!

কুচবিহারে সাহিত্যসাধনা ও জ্ঞানচর্চা

শ্রীঅমল্যরতন গুপ্ত এম্‌এ

দেশীয় রাজ্য কুচবিহার বাংলাদেশের উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত। এক সময়ে সমগ্র উত্তর বঙ্গ ও পূর্ব আসাম এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কালক্রমে নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া এই রাজ্যের সীমানা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। আরও এই রাজ্য বাংলা বা আসামের একটি জেলার সমান হইবে; কিন্তু দেশীয় রাজ্য বলিয়া প্রাচীন ভাবধারণা ও সংস্কৃতি এই রাজ্যে বৈরাগ্য অব্যাহত রহিয়াছে হতাবতঃই বাংলা কিংবা আসামের কোনও জেলাবিশেষে তাহা থাকিতে পারে নাই। কুচবিহারের রাজগণ একদিকে যেমন শৌর্যবীৰ্য প্রভৃতি ক্ষাত্র-গুণের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, অপরদিকে তেমনি গুণগ্রাহিতা ও বিদ্যোৎসাহিতার জন্য বশস্বী হইয়াছিলেন। কুচবিহার রাজবংশ এই উত্তর গুণের সমাবেশ প্রাচীনকাল হইতে অল্প পর্যন্ত অব্যাহত রহিয়াছে। তাহারই ফলে কুচবিহার রাজসভা চিরদিনই জ্ঞানী ও গুণীজনের আশ্রয় ও প্রেরণার উৎস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। কত কবি রাজসভায় ও নিতৃত পল্লীঅঞ্চলে কাব্যসাধনা, কত পণ্ডিত জ্ঞানচর্চা ও কত ভক্ত ধর্মসাধনা করিয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাদের অনেকেরই সাধনার কথা কালগর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে; বাহাদের কথা, আজিও আমরা জানিতে পারি তাহাও বহুলাংশ কীটমষ্টি প্রাচীন পুঁথিপত্রের মধ্যে লুকায়িত থাকায় বহির্জগতে লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রকাশের সুযোগ লাভ করে নাই। যে সকল মনীষী কুচবিহারে সাহিত্যসাধনা

ও জ্ঞানচর্চা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের অনেকের অদান বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে স্থায়ী আসন পাইবার যোগ্য; ইহাদেরই কয়েকজনের কথা সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

কুচবিহারের ইতিহাসে মহারাজ নরনারায়ণের রাজত্বকাল (১৫৩৫-১৫৮৭) নানাকারণে বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার যুদ্ধজয় ও রাজ্যশাসন পদ্ধতি বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসের দিক দিয়া কয়েকটি কারণে মহারাজ নরনারায়ণের রাজত্বকাল চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্য। প্রথমতঃ, এ পর্যন্ত প্রাচীন বাংলা গল্পের যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে মহারাজ নরনারায়ণ কর্তৃক আহমরাজ স্বর্গদেবকে লিখিত একখানি চিঠিই প্রাচীনতম। এই চিঠিখানির ভাষা সরল ও প্রাথমিক; কান্নি বা সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য চোখে পড়ে নাই; কিছু কিছু প্রাদেশিক শব্দ ইহাতে থাকিলেও পত্রখানি সুধপাঠ্য। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে এই পত্রখানি লিখিত হইয়াছিল; প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে এইরূপ ভাষায় একখানি চিঠি কিরূপে লিখিত হইল ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, মহারাজ নরনারায়ণের সভাপণ্ডিত পুরুষোত্তম বিজ্ঞাবাগীশ ভট্টাচার্য মহারাজের আদেশে “প্রয়োগরত্নমালা” নামক সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন। এই ব্যাকরণ আজিও কুচবিহার, উত্তরবঙ্গ ও আসামের চতুঃপাঠীসমূহে সংস্কৃত শিক্ষার্থী ছাত্রগণ পাঠ করিয়া থাকেন। পূর্ববঙ্গে যেসকল কলাপ, পশ্চিমবঙ্গে বৈরাগ্য, উত্তরবঙ্গে

ও আসামে সেইরূপ প্রয়োগরত্নমালার প্রচলন রহিয়াছে। তৃতীয়তঃ, মহারাজ নরনারায়ণের রাজসভার অপর এক পণ্ডিত পীতাম্বর দিকান্তবাগীশ বাংলা পদ্যচ্ছন্দে মার্কণ্ডেয় পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। মহারাজ নরনারায়ণ পুরুষোত্তম বিজ্ঞাবাগীশ ও পীতাম্বর দিকান্তবাগীশ পণ্ডিত-দ্বয়কে গোড়ের রাজসভা হইতে স্বায় রাজ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন। চতুর্থতঃ, আসামের প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারক ও অসমিয়া সাহিত্যের জনক মহাপুরুষ শঙ্করদেব নিজ রাজ্যে নিগৃহীত হইয়া কুচবিহারে আসিলে মহারাজ নরনারায়ণ ও রাজভ্রাতা সেনাপতি শুক্লধ্বজ শঙ্করদেবকে আশ্রয় দান করেন। শঙ্করদেব মধুপুর নামক স্থানে প্রসিদ্ধ 'বৈষ্ণবধাম' স্থাপন করিয়া মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেখানে বাস করেন। শঙ্করদেবের বহু পুস্তক কুচবিহারেই রচিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে 'সীতা স্বয়ংবর' নাটকের নাম করা যাইতে পারে। এই নাটকখানি রাজভ্রাতা শুক্লধ্বজের আদেশে রচিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বহু কবি রাজার আদেশে কাব্য রচনা এবং বহুপণ্ডিত স্মৃতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বাহ্যভায়ে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিলাম না।

মহারাজ নরনারায়ণের পরে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ (১৫৮৭-১৬২৭) কুচবিহার সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার স্থায় তিনিও বিদ্যোৎসাহী ও উদারমতাবলম্বী ছিলেন। তিনি আসামের বৈষ্ণব ধর্ম-সংস্কারক মাধবদেব ও দামোদরদেবকে আশ্রয় প্রদান করেন। মহারাজের উৎসাহে ও সাহায্যে মাধবদেব ও দামোদরদেব অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। মাধবদেবের বিরচিত 'নামমালিকা', 'ভক্তিরত্নাবলী', 'শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংবহু', 'মহাভারত, আদিকাণ্ড' প্রভৃতি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। এই সময় গোবিন্দ মিশ্র নামক কবি বাংলা পদ্যে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' রচনা করেন।

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের পৌত্র মহারাজ প্রাণনারায়ণের রাজত্বকাল (১৬৩২-১৬৭৫) কুচবিহার সাহিত্যের ইতিহাসের এক গৌরবময় যুগ। মহারাজ স্বয়ং সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ ও স্থিতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং কবিতা-রচনা ও নৃত্যগীতে পারদর্শী ছিলেন; তিনি নৃত্যগীত সম্বন্ধে এতখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা অধিদ্রব হইয়া নষ্ট হয়। পাঁচ জন বড় পণ্ডিত মইয়া তিনি 'শঙ্করত্ন সভা' স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রাণনারায়ণ নামাঙ্কিত 'ক্রিয়াযোগসার' বাংলা পুঁথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় আছে; সম্ভবতঃ এই প্রাণনারায়ণ মহারাজ প্রাণনারায়ণই হইবেন। মহারাজের সভাকবি ছিলেন শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ; তিনি প্রথম শ্রেণীর কবি ছিলেন; তিনি সংস্কৃতে 'বিশ্বসিংহ চরিতম্' এবং বাংলা পদ্যে মহাভারতের 'আদিপর্ব' ও 'দ্রোণপর্বের' অনুবাদ করেন; কিন্তু ঠোঁট আক্ষরিক অনুবাদ নহে; কৃষ্ণবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের স্থায় ইহা স্বাধীন রচনা। শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ কাশীরাম দাসের সমসাময়িক ছিলেন; কবিত্বশক্তিতে তিনি কাশীরাম দাসের তুলনায় খুব হীন ছিলেন না। শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ দ্রোণপর্বের অনুবাদ শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর দ্বিজ কবিরাজ এই অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন। দ্বিজ কবিরাজ মহারাজ প্রাণনারায়ণের পুত্র মোদনারায়ণের সভাকবি ছিলেন। সাহিত্যসভার সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ সেন কুচবিহার দর্পণ পত্রিকায় শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ ও দ্বিজ কবিরাজ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন (কুচবিহার দর্পণ, পৌষ ও কাশ্বিন, ১৩৫২)। মহারাজ প্রাণনারায়ণের সময় আরও কয়েকজন কবি বর্তমান ছিলেন; তাঁহাদিগের মধ্যে দ্বিজ রামেশ্বর,

কৃষ্ণ মিশ্র, বিশারদ এবং রাম রায়ের নাম করা যাইতে পারে। দ্বিজ রামেশ্বর মহাভারতের পদ, কৃষ্ণমিশ্র প্রহ্লাদ চরিত, বিশারদ বিরাট পর্ক ও কর্ণপর্কের অনুবাদ এবং রাম রায় বৈষ্ণবসাধু দামোদরের জীবনী অবলম্বনে ‘গুরুনীলা’ রচনা করেন।

মহারাজ প্রাণনারায়ণের মৃত্যুর পর এক শতাব্দীর অধিককাল কুচবিহার রাজ্য নানা অন্তর্বিগ্রহ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়াছিল। দেশে শান্তির অবস্থাও না থাকিলে সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি সম্যক সফুর্তিলাভ করিতে পারেন না; কুচবিহারেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তাই ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজ প্রাণনারায়ণের মৃত্যুকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সিংহাসন প্রাপ্তিকাল পর্যন্ত কুচবিহার রাজ্যে প্রথম শ্রেণীর কোনও সাহিত্য রচিত হইতে পারে নাই। সামান্য বাহা কিছু রচিত হইয়াছে তাহার উল্লেখমাত্র কাঁচেনেই যথেষ্ট হইবে। পূর্বেই আমরা দামোদরনারায়ণের (১৬৬৫—১৬৮০) সভাকবি দ্বিজ কবিরাজের কথা বলিয়াছি। মহীন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে (১৬৮২—১৬৯৩) রাজ্যের আদেশে দ্বিজ রাম কবিরাজ মহাভারতের “ভীষ্ম পর্কের” অনুবাদ করেন। মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে (১৭১৪—১৭৬৩) কামতা নগরের অধিবাসী ত্রীনাথ ব্রাহ্মণ—ইনি প্রাণনারায়ণের সভাকবি ত্রীনাথ ব্রাহ্মণ নহেন—মহাভারতের “বিরাট পর্কের” এবং রাজভ্রাতা কুমার খড়্গনারায়ণের আদেশে নারায়ণ দ্বিজ “নারদীয় পুরাণের” পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে (১৭৬৩—৬৫) জনৈক অজ্ঞাতনামা কবি সম্পূর্ণ রামায়ণের অনুবাদ এবং মহারাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে (১৭৬৫—১৭৮৩) দ্বিজ রুদ্রদেব নামক কবি রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের অনুবাদ করেন।

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কুচবিহারের কোন রাজা এত দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন নাই। তাঁহার রাজত্বের প্রথম দিকে রাজ্যে কিছু কিছু অন্তর্বিগ্রহ থাকিলেও ক্রমশঃ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত কুচবিহারের মিত্রতা স্থাপিত হয়। শান্তির আবহাওয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে কুচবিহারে পুনরায় সাহিত্য এবং শিল্পকলার অত্যাশ্রয় হয়। কুচবিহার সাহিত্যের ইতিহাসে হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে নরনারায়ণ এবং প্রাণনারায়ণের রাজত্বকালের ন্যায় একটি গৌরবময় যুগ গিয়াছে। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ স্বয়ং একাধারে সংস্কৃত, বাংলা ও কাসিতে সুপাণ্ডিত এবং শক্তিশালী কবি ছিলেন। চিত্রবিদ্যা ও সঙ্গীতেও তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। তিনি সংস্কৃত পদ্মপুরাণের অন্তর্গত “ক্রিয়াযোগসার,” রামায়ণের “সুন্দরকাণ্ড,” মহাভারতের “শল্য পর্ক” এবং অন্যান্য পুরাণের পদ্যে অনুবাদ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু শ্যামাসঙ্গীত ও অন্যান্য গীত রচনা করেন; ভাবের গভীরতায়, ভক্তির ব্যাকুলতায় ও ছন্দের মাধুর্য্যে এই গীতগুলি বাংলা সাহিত্যের শাক্ত পদাবলীর মধ্যে উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য। কুচবিহার সাহিত্যসভা মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গীতাবলী ও কয়েকখানি অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী ব্যক্তিদেরই কৃতজ্ঞতাজ্ঞান হইয়াছেন। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, দেওয়ান রঘুনাথ প্রভৃতির সহিত স্থায়ী আসন পাইবার যোগ্য; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার রচিত গ্রন্থাদির বিস্তৃত আলোচনা আজিও হয় নাই।

হরেন্দ্রনারায়ণ কেবল নিজে পাণ্ডিত ও কবি ছিলেন তাহা নহে; তাঁহার উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কুচবিহারে

বহু কবি, পণ্ডিত ও জ্ঞানীজনের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহাদের রাজত্বকালে বাংলা গদ্যে কুচবিহারের এক ইতিহাস রচিত হয়; এই ইতিহাস “রাজোপাখ্যান” নামে খ্যাত এবং ইহার রচয়িতার নাম জয়নাথ মুন্সী। ঐতিহাসিক মূল্য ব্যতীত এই গ্রন্থখানির বহু সাহিত্যিক মূল্যও আছে। যে সময় ফোর্ট উইলিয়ামের পণ্ডিতগণ দ্রুহ সংস্কৃতসারী ভাষায় নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন সেই সময় অতি সৎল গদ্যে মুন্সী মহাশয় তাঁহার ইতিহাস রচনা করেন। হরেন্দ্রনারায়ণের রাজসভায় দ্বিজ রঘুরাম, রিপুঞ্জয়, কীর্তিচন্দ্র প্রভৃতি নামধের কয়েকজন কবি ছিলেন; ইহাদের রচিত কিছু কিছু পুঁতি পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার রাজত্বকালে রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী নামে এক কবি বাংলার মঙ্গলকাব্যের অনুকরণে “গোসানীন্দ্রল” কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; এই কাব্যে গোসানী দেবীর অনুগ্রহে কান্তেশ্বরের রাণাপ্রাপ্তির কাহিনী ববৃত হইয়াছে।

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র শিবেন্দ্রনারায়ণ (রাজত্বকাল ১৮৩৯—৫৭) সুকবি ছিলেন। পিতার ন্যায় ইনিও বহু শ্রামাসম্মিত রচনা করিয়া ছিলেন। কুচবিহার সাহিত্যসভা মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গীতসংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। শিবেন্দ্রনারায়ণের পত্নী মহারানী বৃন্দেশ্বরীও কবিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন; তিনি “বেহারোদন্ত” নামে পদ্যে কুচবিহার রাজবংশের এক ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন; ইহাও কুচবিহার সাহিত্যসভা কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের রাজসভায় বহু পণ্ডিত ও কবি ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে মহীনাথ শর্মা, মাধবচন্দ্র দ্বিজ, দ্বিজ বৈদ্যানাথ, দ্বিজ কৃষ্ণদেব ও দ্বিজ ধর্মেশ্বরের নাম করা যাইতে পারে। ইহাদের রচিত “মার্কণ্ডেয় চণ্ডী,”

“চণ্ডিকার ব্রতকথা”, মহাভারতের “অশ্বমেধ” ও “আদিপর্ব”, “শিবপুরাণ” প্রভৃতি কাব্যের পুঁতি কুচবিহার ষ্টেট লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।

মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের পৌত্র মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে কুচবিহার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার শাসনকালে কুচবিহার নানা দিক দিয়া দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। তিনি যে উদার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া রাজ্যশাসন আরম্ভ করেন পুত্র মহারাজ রাধাকৃষ্ণ নারায়ণ ও মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণ এবং পৌত্র বর্তমান কুচবিহারাধিপতি মহারাজ জগদীপেন্দ্র নারায়ণের শাসনকাল পর্যন্ত তাহাই অব্যাহত রহিয়াছে। ইহাদের শাসনকাল কুচবিহারের ইতিহাসে নবযুগ আনয়ন করিয়াছে। এই নবযুগে কুচবিহারের সাহিত্য সাধনা ও জ্ঞানচর্চা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ও মহারানী সুনীতি দেবী ইংরেজী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন; মহারাজের শিকারকাহিনী ও মহারানীর আত্মচরিত রসোত্তীর্ণ হইয়া সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণ ইংরেজী কবিতা রচনার সিদ্ধহস্ত ছিলেন; কবিতার মধ্য দ্বিগী তাঁহার স্বভাববাস্তবতা ও স্বদেশপ্রেমীতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ও গবেষণার জন্য মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতায় ও মহারাজকুমার ভিক্টর নারায়ণের সভাপতিত্বে কুচবিহার সাহিত্যসভা প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং নিরুপমা দেবী পরিচালিকা পত্রিকা সম্পাদনে ও বাংলা কবিতা রচনার খ্যাতি অর্জন করেন।

কুচবিহারের এই নবযুগে পণ্ডিতাগ্রগণ্য যে মহামনীষী কুচবিহারে বসিয়া জ্ঞান সাধনা দ্বারা ভারতীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের বহু ওখা লোকলোচনের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া গিয়াছেন তাঁহার নাম শুধু ভারত নয় জগদবিখ্যাত; আমি আচার্য

ব্রজেননাথ শীলের কথা বলিতেছি; তাঁহার প্রতিভার দীপ্তিতে কুচবিহার একদা উদ্ভাসিত ছিল ইহা আমাদের গোপবের কথা। পণ্ডিত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী কুচবিহারে বসিয়াই “উপনিষদের উপদেশ” রচনা করিয়াছিলেন এবং যে বেদান্ত চর্চা করিয়া ও “অদ্বৈতবাদ” গ্রন্থ লিখিয়া তিনি উত্তরজীবনে বশরতী হইয়াছিলেন তাহারও লিপি প্রাপন এই কুচবিহারেই হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মসংস্কৃতগ্রন্থ “বনোষধি দর্পণ” প্রণেতা বিরজাচরণ গুপ্ত কুচবিহারেই রাক্ষসবৈদ্যা ছিলেন এবং কুচবিহার হইতেই তাঁহার গ্রন্থের মূলমণি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শরচ্চন্দ্র ঘোষাল কুচবিহারে বসিয়াই বেদান্ত ও জৈন দর্শনের আনন্দোদ্যম-মূলক গ্রন্থাদি এবং নানা সাহিত্যিক প্রবন্ধ, গল্প প্রভৃতি লিখিয়াছিলেন। “গোড়ায় বৈষ্ণবধর্ম” প্রণেতা উৎকলনারায়ণ সিংহ এবং “মেঘদূত,” “হৃদয়গাথা” প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ ও বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচয়িতা অখিলচন্দ্র পালিত কুচবিহারের এই নবযুগেই বর্তমান ছিলেন। বিমলচন্দ্র চক্রবর্তী এইখানেই তাঁহার সাহিত্যিক জীবন অরম্ভ ও শেষ করেন; তাঁহার “বরাটে” “গল্পের আরম্ভ” প্রভৃতি বাংলা কথা সাহিত্যে বিশিষ্ট আসন লাভ করিয়াছে। ছাখের বিষয় এই সকল পণ্ডিত ও সাহিত্যিক আজ লোকান্তরিত; পরম শ্রদ্ধার সহিত আমরা তাঁহাদের নাম স্মরণ করিতেছি।

কিন্তু আমাদের আনন্দের কথা এই যে এখনও বহু বর্ষোত্তর পণ্ডিত ও সাহিত্যিক আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন। প্রথমেই কুচবিহারের ইতিহাস রচয়িতা শ্রী চৌধুরী আমানত উল্লাহ আহমদের নাম করিতে হইবে। তাঁহার কুচবিহারের ইতিহাস একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ; আমরা আশা করি তিনি শীঘ্রই এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিয়া আধুনিক কাল পর্য্যন্তের ইতিহাস আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করিবেন।

শ্রীজ্ঞানকৌবল্লভ বিশ্বাস মহাশয় একদা উপন্যাস লিখিয়া বশরতী হইয়াছিলেন; আমাদের প্রথম জীবনে তাঁহার রচিত “শোভা”, “ঐশ্বর্য”, “মনের বিষ” প্রভৃতি উপন্যাস আমাদের আনন্দ দিয়াছিল। বাংলার শ্রেষ্ঠ মহিলা কবিগণের অন্ততম রাধারাগী দেবীর বালাকাল কুচবিহারেই কাটিয়াছিল; এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও অনুকূল পরিবেশে তাঁহার কবিত্ব শক্তির বিকাশ হইয়াছিল। বিশেষভাবে আর কাহারও নাম উল্লেখ না করিয়া বলা যাইতে পারে যে কুচবিহারে পণ্ডিত ও সাহিত্যিকগণের মধ্যে সাহিত্যসাধনা ও জ্ঞানচর্চা আজও সমভাবে চলিতেছে।

এতদ্ব্যতীত, নীরস তালিকা দিয়া প্রোতুগণের কর্ণপীড়া ও ধৈর্যচ্যুতি খটাইয়াছি বলিয়া আশঙ্কা হয়। তাই আর অধিক কিছু বলিতে চাই না। আমি কুচবিহারে সাহিত্যসাধনার ইতিহাসের একটি অসম্পূর্ণ কাল সুখোজনের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম; কুচবিহার সাহিত্যসভার উৎসাহী কর্মীদের উত্তোকে যদি এই কালকে রূপ দিয়া একখানি পূর্ণ সাহিত্যের ইতিহাস রচিত হয় তাহা হইলে আনন্দিত হইব। আমি এই বিষয়ে সাহিত্যসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পরিশেষে আমি কুচবিহারের লোকসাহিত্য সম্বন্ধে দু'য়েকটি কথা বলিতে চাই। দেশের আধিকাংশ লোকই নিরক্ষর; পণ্ডিত সাহিত্য, পুস্তকনিহিত বিদ্যা তাহাদের নিকট নিষিদ্ধ ফলতুলা; অথচ তাহাদের মধ্যে প্রকৃত রসগ্রাহিতা অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। লোকসাহিত্যের মধ্য দিয়াই তাহাদের এই রসগ্রাহিতা প্রকাশের পথ পায়। কুচবিহারের ভাওয়ালিয়া ও বিশ্বরিগান এখানকার নিজস্ব লোকসাহিত্য। সুরশিল্পী আব্বাসউদ্দিন ও সুরেন বহ্নীয়ার প্রচেষ্টায় ভাওয়ালিয়া গান গ্রামোফোন রেকর্ডের



ও বেড়িও সদ্যোত্তের মধ্য দিয়া সারা বাংলার প্রাণ স্পর্শ
করিয়াছে। এই হলে একখানি কুচবিহারী ভাওয়াইয়াগান
উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি—

তোরবা নদীর ধারে দিদি, নানসাই নদীর পারে—
সোনার বঁধু গান গেয়ে যায়—যায় সে অভিসারে—।
তোর পানে ও চায় কি দিদি, মোর পানে ও চায়?—
কান পেতে শোন, সোনার বঁধু গান গেয়ে ঐ বায়।
বড় বহিন ঢেঁকি পাড়ায়, ছোট বহিন ঝাড়ে,
গাওঁ গড়িছে মেজো বহিন ঢই নয়নের ধারে—

চোখের জলের ধারা দিয়ে গাওঁ যে গড়ি হায়,
তোর পানে ও চায় কি দিদি, মোর পানে ও চায়।
যায় চলে আর পিছন পানে তাকায় থাকি থাকি,
ও দিদি, ও বায় যে চলে, কেমন করে ডাকি?
যায় ছড়িয়ে তুষের আগুন মনের আঙিনায়।
তোব পানে ও চায় কি দিদি, মোর পানে ও চায়।*

* কুচবিহার সাহিত্যসম্মেলনে পঠিত।

পদাবলী

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

বনের ফাঁকে ফাঁকে ছায়া ও আলোকের
মধুর লীলা চূপে চূপে,
প্রসাদিকাল হ'তে সবার অগোচরে
চলে।

উক্তচনমনো- বৃন্দাবনমাঝে
তেমনি শাখত রূপে
কুমারধিকার প্রণয়নীলা পলে
পলে ॥

ছায়া ও আলোকের নিত্যলীলা নিয়ে
এঁকেছে কত শত ছবি,
রেখা ও রঙে রূপে শিল্পী কত দেশে
দেশে।

কুমারধিকার নিত্যলীলা রসে
বন্দী করে শত কবি।
আমরা তাই পাউ মধুর পদাবলী-
বেশে ॥

উপনদী

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরদিন সকালে সারা গ্রাম রাষ্ট্র হইয়া গেল—গুণ্ডামী এবং অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে অশোক ডাক্তার এবং চাষীপাড়ার সনাতনকে পুলিশে থানায় ধরিয়া লইয়া গেছে।

শুধু জবানবন্দী দিয়া অশোক এবং সনাতন মুক্তি লাভ করিতে পারিল না। পুলিশ তদন্তে প্রকাশ পাইয়াছে অশোক এবং সনাতন বিপিন ডাক্তারের বাড়ী চড়াও হইয়া মারখোর করিয়াছে—জিনিসপত্র তখনই করায় অনেক ক্ষতি সাধিত হইয়াছে এবং এমন কী কয়েকটি মূল্যবান সামগ্রীও অপহৃত হইয়াছে।

অশোক ডাক্তারের গৃহ তল্লাসী করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দেশ লইয়া কেস না হওয়া পর্যন্ত হাঙ্গতবাসের ব্যবস্থা করা হইল।

অশোক থানায় গিয়া নির্বিবাদে বসিয়া রহিল। এমন কী জামিন পঞ্চস্ত সে গ্রহণ করিবে না। নৈতিক ভিত্তিতে অহিংস উপায়ে সে শুধু আত্মপক্ষ সমর্থন করিবে। ন্যায়ের নিকট অন্যায়কে একদিন না একদিন মণ্ডক অবনত করিতেই হইবে।

শুধু সনাতনের জন্য অশোক ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সংসারে তাহার আর কেহই নাই; তার অনর্থক সে কেন

অন্যায়ভাবে কারাবরণী ভোগ করিবে? পরাণ মণ্ডক আশু সরকার, বহু বিশ্বাস, রমজান আলি—চাষীদের মধ্যে সবাই আসিয়াছে মোক্তার সঙ্গে লইয়া—দাবতা, জামি তোমারে লিতেই হবে। অশোক তাহাদের নিরস্ত করিল—চিন্তার কোন কারণ নাই, আইনে তাহার কোন দণ্ডই হইবে না। সনাতনকে জামিন গ্রহণ করার জন্য অশোক পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল—সনাতন সে কথা কিছুতেই শুনিবে না।

তাহার দৃঢ়তার অশোক অবাক হইয়া গেল—তা হবে না কর্তা। তুমি থাকবে এখানে এই গারদ ঘরে আর আমি জামিন নিয়ে মামলা চালাবো? তা কিছুতেই হবে না। জেল খাটতি ভয়ডা কিসের? চুরিও করিনি—ডাকাতিও করিনি। তবুও তো সগঙ্গো থেকে ছেলেরা বুঝবে বাপ তার প্রতিশোধ নিয়েছে। ছদ্ম্বাডা শুধু এই যে ওই বিপনে বেটার মাথাডা তো কাটানো গেল না!

অশোক কহিল—কিন্তু তোমার সংসারের কী ব্যবস্থা হবে সনাতন?

—সে অন্য আপনি ভাববেন না দাবতা। পরাণ আছে, আশু আছে—তেনারা তো আত্ম আর আমার পর নয়। তুমিই তো শিখিয়েছ—আমরা সবাই স্বাধাতি—আমরা সবাই ভাই।

চাষীর দল ফিরিয়া গেল। মাথায় তাহাদের আঙন জলিতেছে। ডাক্তারবাবু তাহাদের কাছে আজ দেবতার আসন লাভ করিয়াছে। সেই ডাক্তারবাবুর প্রতি যে এমন ব্যবহার করিয়াছে—তাহাকে সমুচিত শাস্তি না দিয়া তাহারা কেহই জলস্পর্শ করিবে না।

বহুদিন পরে সুলেখা আসিয়া আবার নদীর ধারেই বসিল। সেই পুরাতন দিনের বন্ধু তাহার।

নদী তাহাকে এখন আর বলা চলে না। উপনদীর উপকূলে আরও খানিকটা চড়া পড়িয়াছে। প্রথমে বৈশাখের ধর প্রদীপ্ততার জল আরও শুকাইয়া আসিয়াছে।

ভালো লাগিতেছেনা—কিছুই ভালো লাগিতেছেনা সুলেখার। প্রবল উদ্বেজনার মাঝে সময় অতিবাহিত করিয়া সর্বক্ষণ কাজের ব্যস্ততার জড়িত থাকিয়াও শান্তিকে সে খুঁজিয়া পাইল না। পার্টির কাজে আর তাহার উৎসাহ নাই। কাজ অপেক্ষা ওখানে কথাই বেশি। দেশ সেবা অপেক্ষা দলগত সংকীর্ণতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাই ওদের মাঝে বিস্তার লাভ করিয়াছে। আর অশোককে বাদ দিয়া সুলেখার ব্যক্তিত্ব আজ খর্ব হইয়া পড়িয়াছে।

শীর্ণ জলধারায় সূর্যাস্তের জ্ঞান রক্তিম। সুলেখার অন্তরকে গভীর শূন্যতার ভরাইয়া তুলিল। আপন অজ্ঞাতে হুইটস্কে বহিয়া আজ তাহার অশ্রুধারা গড়াইয়া আসে কেন? এতদিন তাহার কেমন করিয়া কাটিয়াছে—সেখা সুলেখা আজ ভাবিয়াই পার না। এই নদীর ধারে এমনি কত অপরাহ্ন তাহার নিঃসঙ্গতার মাঝে পরিপূর্ণতা

লাভ করিয়াছে। জীবনের সেই নিঃস্বচ্ছিন্ন একক দিনগুলি কেমন করিয়া জীবন-পথ হইতে তাহার নিঃশব্দে সরিয়া গেল?

প্রদোষদার নিকট আজ সে চিঠি লিখিয়াছে— পার্টির প্রতি তাহার আস্থা নাই। আর কাজেও সে উৎসাহ পাইতেছে না। শরীরও তাহার সামর্থ্য-হীন। অতএব তাহার পক্ষে এই গুরু দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকা অতঃপর দুঃসাধ্য। তিনি যেন তাহাকে মুক্তি দেন!

সে চিঠি পাইয়া প্রদোষদা নিশ্চয়ই ছুটিয়া আসিবেন। তাহাকে অনেক ভৎসনা করিবেন; অবশেষে মিনতিও জানাইবেন। কিন্তু না, সুলেখা কিছুতেই টলিবে না। অন্তরের সঙ্গে যেখানে কোন সংযোগ নাই—দেশসেবার নাম করিয়া এত বড় প্রবন্ধনার কাজ সে কিছুতেই করিতে পারিবে না।

কিন্তু সুলেখা কী লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে? নারী বাহা লইয়া চিরদিন বাঁচিয়া থাকে—সুলেখা সেই জীবনকেই বরণ করিয়া নেয় যদি? সে আদর্শ ধরণী হইয়া নারী-জীবনের পরিপূর্ণ আশ্বাস গ্রহণ করে তবে পৃথিবীর তাহাতে কতটুকু ক্ষতি হইতে পারে? জীবনের চির সত্য বাহা—নারীজীবনের চির কাম্য বাহা—দীর্ঘ পরিশ্রম বছরের পর আজ যদি প্রত্যক্ষ আলোকে তাহা প্রতিভাত হইয়া থাকে তবে কেন সে তাহার গতিপথে স্বেচ্ছায় বাধা সৃষ্টি করিতেছে?

অশোককে সে ভালবাসে। হাঁ, অশোককে সে অন্তরের সমস্ত ঐশ্বর্য্য দিয়া বরণ করিয়া লইতে চাহে। সংস্কারের গভী দিয়া ভালবাসার পথকে এমনি করিয়া কেন সে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতেছে?

এ ভালবাসার মধ্যে কোন প্রবন্ধনা নাই—মিথ্যার
অভিলাষ নাই—সন্দেহের আবরণ নাই।

অশোককে লইয়া সে নতুন করিয়া ঘর বাধিবে—
তাহার ব্যর্থ নারী জীবনকে সার্থক করিয়া গড়িয়া তুলিবে।
সুলেখা উঠিয়া পড়িল।

সন্ধ্যার আকাশে নবীন মেঘের সঞ্চার হইয়াছে।
ঈশান্তের গাঢ় রঙ সেই মেঘকে বর্ণোজ্জ্বল করিয়া
তুলিয়াছে।

ভাল লাগিতেছে—অত্যন্ত ভাল লাগিতেছে সুলেখার
এই পৃথিবীকে। পৃথিবীতে এত সুখ, এত আনন্দ, এত
রোমাঞ্চ ইতিপূর্বে আর কোন দিন এমন করিয়া সে
আর অনুভব করে নাই। সুন্দর ধরণীর মাঝে প্রাণ
প্রাচুর্যের ঘন স্পন্দনকে আজ সে শিরায় উপশিরায় অনুভব
করিতে লাগিল।

কিন্তু অশোক এখন কোথায়? আশ্চর্য! অশোকের
কোন খবরই সে জানে না। বহুদিন সে অশোককে
দেখে নাই।

বাড়ি ফিরিয়া একুণি সে অশোকের বাড়ি যাইবে।

বাড়ি ফিরিয়া সুলেখা আশ্চর্য হইয়া গেল। যুহলা তাহার
ঘরে বসিয়া আছে। চোখে মুখে তাহার দারুণ
উৎকণ্ঠার ভাব। রুগ্ন চেহারায় এখনও তাহার রোগ-
ক্লান্তির স্ফূর্ততা। কিন্তু কী আশ্চর্য! সন্ধ্যাবেলা যুহলা
একা আসিয়াছে তাহার গৃহে।

সুলেখাকে দেখিয়া যুহলা আবেগের বস্ত্র ভাঙিয়া
পড়িল—লেখাদি, অশোককে কাল রাত্রে পুলিশে ধরে

নিরে গেছে। সুলেখার বিশ্বাস আরও বাড়িয়া গেল।
তাহার মনের আকাশে যে রঙিন মেঘগুলি ভাসিয়া
বেড়াইতেছিল সেখানে কালবৈশাখীর ঝটিকা বিক্ষোভে
গর্জন করিয়া উঠিল।

—অশোককে পুলিশে ধরে নিরে গেছে। আর সেই
খবর নিয়ে তর সন্ধ্যেকো একসা তুমি অস্থূল শরীরে
ছুটে এসেছো?

যুহলা কঁাদ কঁাদ করে কহিল—অশোকদার যে আর
কেউ নেই লেখাদি?

কথাটি সুলেখার মর্মস্থানে আঘাত হানিল।
অশোকের আর কেহই নাই—তাই অসহায়ের সহায়
লেখাদির আশ্রয় ভিক্ষা করিতে রুগ্না যুহলা সকল
কিছু ত্যাগ করিয়া তাহার নিকট ছুটিয়া
আসিয়াছে!

নারী সুলেখা যুহলার উৎকণ্ঠিত মুখচোখের প্রতি
তাকাইয়া শুরু হইয়া রহিল কিছুক্ষণ।

নিজেকে যথেষ্ট দৃঢ় করিয়া লইয়া সুলেখা কহিল—পুলিশে
হঠাৎ অশোককে এ্যারেস্ট করলো কেন?

—বিপিন ডাক্তারের প্ররোচনার। অশোকদা আর
সনাতন নামে একজন চাষী নাকি বিপিন ডাক্তারের
বাড়ী লুণ্ঠ করে তাকে মারধোর করেছে।

—কারণ?

—সব মিথ্যে কথা লেখাদি। সনাতনের ছেলে
কলেরায় মারা যায়। বিপিন ডাক্তারকে চিকিৎসার
বনো ডাকতে এসেছিল সনাতন। গরীবের বাড়ি
ভিজিটের টাকা দিতে পারবে না বলে বিপিন ডাক্তার

যায় নি। অশোকদা গিয়ে দেখলেন—ছেলেটা বিনা চিকিৎসায় মরে গেছে। সনাতন বিপিন ডাক্তারকে এই নিয়ে খুব অপমান করে একদিন। গাঁয়ের মাতব্বর লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিপিন ডাক্তার মিথ্যে মিথ্যে কেস করেছে অশোকদা আর সনাতনের নামে। মিথ্যে সাক্ষী বোগাড় করেছে—পুলিশের দারোগাকে ঘুষ দিয়েছে।

শুলেখা জিজ্ঞাসা করিল—তুমি এখন কোথেকে পেলো?

—ওমা, মারা গিয়ে এই নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গেছে যে! আপনি বুঝি কিছু জানেন না?

শুলেখা সে কথার প্রত্যুত্তর না দিয়া কহিল—তা, তোমার বাবা কিছু করছেন না অশোকের জন্যে?

—মা খুব কান্নাকাটি করছেন এর জন্যে। গাঁয়ের মাতব্বর লোকের বিরুদ্ধে বাবা যেতে সাহস পাচ্ছেন না। আর বাবাকেও ওরা সাক্ষী মেনেছে অশোকদার বিরুদ্ধে।

শুলেখা গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—তিনি সাক্ষী দেবেন?

মৃদুলা কাদিয়া ফেলিল—হ্যাঁ! তিনি বলবেন, অশোকদা তাঁর সামনে বিপিন ডাক্তারকে শাসিয়েছিল।

—সনাতনের বাড়ি কোথায়?

—চারঘাটের চাষীপাড়ায়। চারঘাটের সব চাষীরা এই নিয়ে ভীষণ ক্ষেপে গেছে। তারা অশোকদাকে দেবতার মতন ভক্তি করে। বিপিন ডাক্তারের বাড়ি পুলিশে চোকি দিচ্ছে। চাষীরা সব বলেছে বিপিন ডাক্তারকে তারা মারবে।

শুলেখা গাম্ভীর্যের সহিত কহিল—আচ্ছা, তুমি বাড়ি যাও মৃদুলা। এমনি করে অশুভ শব্দে আর

কোনদিন একলা রাস্তায় বেরিয়ে না। আমি দামিনীকে তোমার সঙ্গে দিচ্ছি। বাবা বকলে বলো তুমি আমার কাছে এসেছিলে।

মৃদুলা দৃঢ়স্বরে কহিল—বাবার বকুনিকে আমি ভয় করি না। এতবড় অন্যায় তিনি যখন করত পাবেন তখন তাঁর প্রতি আমার আর কোন শ্রদ্ধা নেই।

শুলেখা শাসনের স্বরে কহিল—চুপ করো মৃদুলা। বাবা গুরুজন। তাঁর সম্বন্ধে অমন কথা কক্ষণো মুখে এনো না।

মৃদুলা প্রতিবাদ জানাইল—হ্যাঁ, তিনি গুরুজন, আমার শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু এত বড় অন্যায়কে এবং মিথ্যাকে যদি তিনি প্রশ্রয় দেন—তা হলে আমি তাঁর মেয়ে হয়েও তার প্রতিবাদ নিশ্চয়ই জানাবো। অশোকদার জন্যেই আমি বেঁচে উঠছি—এ কথা তো অস্বীকার করতে পারি নে লেখা দি।

উত্তেজনার আধিক্যে তাহার সর্বশরীর কাঁপিতেছিল, শুলেখা তাহার সেই ভাবভঙ্গি দেখিয়া নির্বাক হইয়া রহিল।

দামিনীর সহিত মৃদুলা চলিয়া গেল। শুলেখা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। সকল সন্দেহের অবসান ঘটয়াছে আজ। প্রত্যক্ষ সত্যের আলোকে অশোকের প্রতি মৃদুলায় ভালবাসা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মৃদুলায় তাহাতে কোন সন্দোহ নাই। যে অশোকদা তাহাকে মৃত্যুর পথ হইতে জীবনের আলোকিত পথে লইয়া আসিয়াছে—তাহার প্রতি পরিপূর্ণ কিশোরী মৃদুলায় অনুরাগ থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

মৃদুলা রুখা হইলেনও জীবনস্বর্ষ তাহার অন্তগামী কিছু সে কথা ভাবিবার অবকাশ এখন আর
 নয়। বসন্তের প্রথম হিল্লোলে জীবনতরুর নব কিশলয়ে স্নেহের নাই। অশোকের সংবাদে সে অত্যন্ত বিচলিত
 তাহার নতুন স্পন্দন জাগিয়াছে। স্নেহের নারীও হইয়া পড়িল। কী করিবে সে এখন ?
 যৌবন-বিহীন। মৃদুলা সহিত সে এখন আর
 প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

গান

শ্রীশৈলেন্দ্রলাল রায়

গানখানি মোরা রেখে যাব এই ড্রাক্সা কুণ্ডবনে
 যৌবনজাগা মন্দির স্বপ্ন 'থণে ;
 নিঙারি হিয়ার দলিত ড্রাক্সা ফল
 প্রাণের পেয়ালা পান করি যাব চল
 ভালবাসা সে যে সোনার হরিণ
 ধরা দেয় যৌবনে
 গানখানি মোরা রেখে যাব এই ড্রাক্সা কুণ্ডবনে ।

গানখানি মোরা রেখে যাব ঐ ভ্রমর গুঞ্জরণে
 করবীর বুকে বিহগীর মুখে নবচম্পক সনে ;
 ছড়াব হৃদয় ভাবনাবিহীন পথে
 আনু ক মিলন অকস্মাতের রথে
 ভালবাসা সে যে সোনার হরিণ
 ধরা দেয় যৌবনে
 গানখানি মোরা রেখে যাব ঐ ভ্রমর গুঞ্জরণে ।

গান খানি মোরা রেখে যাব ঐ নির্বর নিঃশ্বনে,
 মেঘের কাঞ্চলে ভূপের স্তামলে
 কেতকীর মনে মনে ;
 আকাশে উজার হৃদয়ের পারাবতে
 স্বপনে গলিব শিশিরের মরকতে
 ভালবাসা সে যে সোনার হরিণ
 ধরা দেয়—যৌবনে
 গানখানি মোরা রেখে যাব ঐ নির্বর নিঃশ্বনে ।

বাঙ্গালার আশুতোষ

অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম-এ, বি-এল

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

পূর্বে আশুতোষের যে অদম্য কর্মশক্তির কথা বলা হইয়াছে তাঁহার সম্ভবই হইত না যদি তাঁহার মধ্যে কার্ণাখলাগুণ খুব বেশী পরিমাণে না থাকিত। এই গুণও তাঁহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। তাঁহার কাজ করিবার পদ্ধতির regularity অতি অসাধারণ। তাঁহাকে একদিন তাঁহার বোনের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, 'আমার নিজেরও মনে হয় যে এই regularity আমাকে অনেক বিষয় সাহায্য করিয়াছে।' জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি করটার সময় উঠেন?' তিনি বলিলেন, 'ভোর চারিটার সময়।' আমি বলিলাম, 'কতদিন ধরিয়া?' তিনি বলিলেন, 'শৈশব হইতে; আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরিয়া ঐ সময় উঠিতেছি। এখনও মনে পড়ে ছেলে বেলা যখন বাল্যশিক্ষা পড়িতাম, সকালবেলা মাষ্টার মহাশয় পড়াইতে আসিতেন, আমি ভোর চারিটার সময় উঠিয়া পিলস্‌ফের বাতির নিকট গিয়া একটি চৌকিতে বসিয়া পড়া মুখস্থ করিয়া রাখিতাম। বাড়ীর অন্তরালে চেলেরা দেবীতে উঠিয়া পড়া করিয়া উঠিতে পারিত না, মাষ্টার মহাশয়ের বকুনি খাইত, আমার খুব মজা লাগিত।' সকলেই জানেন আশুবাবু চৌরঙ্গীর পাশে গড়ের মাঠের রাস্তা ধরিয়া প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিতেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি সকালবেলা গড়ের মাঠে কতদিন ধরিয়া বেড়াইতেছেন?' তিনি বলিলেন, 'চল্লিশ বৎসর ধরিয়া।' তাঁহার সব বিষয়েই regularity এই রকম অদ্ভুত।

আমাদের দেশে সচরাচর এই সব পাশ্চাত্যদেশস্থলত গুণের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার কর্মশক্তি, এই প্রকার নিয়মানুবর্তিতা, এই প্রকার উৎসাহ ছিল বলিয়াই এত বিবিধ ক্ষেত্রে তিনি সফলকাম হইতে পারিয়াছিলেন। শারীরিক শ্রমশীলতাও ছিল তাঁহার অসাধারণ। শরীরের প্রতি দৃষ্টি, ব্যায়াম, এই সকল আমরা সাধারণতঃ গ্রাহ্যই করি না। আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যেও এ গুণ বড় কমই দৃষ্ট হয়। বোধ হয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছাড়া এ বিষয়ে আদর্শস্থানীয় বাঙ্গালী বড় কমই আছেন। এই ক্ষমতা লোকে কত আশা করিয়াছিল যে আরও অন্ততঃ কুড়ি বৎসর কাল আশুবাবুকে আমরা পাইব; তাঁহার যে শারীরিক শক্তি ছিল তাহাতে কিছুমাত্র হ্রাস ছিল না। এই ক্ষমতাই তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যু লোকের মনে বড় লাগিয়াছে।

পাশ্চাত্যজাতিস্থলত এই সব গুণ থাকা সত্ত্বেও আমাদের প্রাচীন সমাজের যেসব ভালো ভালো গুণ তাহাও তাঁহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। প্রথমেই মনে পড়ে তাঁহার সামাজিকতা। আলাপে ব্যবহারে নিমন্ত্রণে আপ্যায়নে তিনি তাঁহার ব্রাহ্মণ প্রাচ্য ধারা সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়াছিলেন। সব শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন; অত বড় একটা লোক কিন্তু কোনো আভিজাত্য বা exclusiveness ছিল না; তাঁহার বৈঠকখানা আবালযুবকবৃদ্ধের সমাবেশক্ষেত্র ছিল; ছাত্রবৃন্দের তিনি পরমবন্ধু, আশুবাবুর কাছে তাহাদের

তো মাত খুন মাপ ; পড়াশুনা হইয়া কাহারও কোন গোলমাল বা অহুবিধা হইলে, ধর গিরা আস্তাবাবুকে ; চাকরীর অল্প চেষ্টা করিতে হইবে, ধর গিরা তাঁহাকে ; আর তিনি অবিচলিত ধৈর্যের সহিত দিনের পর দিন এই সমস্ত লোকের কথা শুনিবেন। তাহাদের উপকার করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন, কত দুঃস্থ ছাত্রকে বই কিনিয়া দিয়া বা অল্পপ্রকারে অর্থসাহায্য করিতেন ; দেখা না পাইয়া তাঁহার ঘর হইতে কাহাকেও কিরিয়া বাহিতে হইত না। অনেক প্রসিদ্ধলোক নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন, কদাপি মরলোকের চক্ষুগোচর হন না, আস্তাবাবুর প্রসিদ্ধি সেই রকম হয় নাই। অসংখ্য লোকের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল ; এবং এই পরিচয় রক্ষা করিতে সাহায্য করিয়াছিল তাঁহার অদ্বুত স্মরণশক্তি ; যাঁহাকে একবার দেখিতেন তাঁহাকে ভুলিতেন না। এবং এই পরিচয় শুধু লৌকিক ছুটি কথাতেই পর্যাবসিত হইত না ; তিনি গুণের সমানর করিতে জানিতেন, এবং গুণীকে উৎসাহ দিতে জানিতেন। এই সামাজিকতা, লৌকিকতা ও অবাধ পরিচয়ের ফলে আস্তাবাবুর মৃত্যুকে যতলোক personal loss বলিয়া মনে করিয়াছেন ও মন্বাহত হইয়াছেন, ততটা অল্প বড়লোকের মৃত্যুতে হয় না। হিন্দু গৃহস্থের সব সদ-গুণই তাঁহার ছিল। তিনি মাতৃবৎসল পুত্র, প্রেমিক স্বামী ও স্নেহপ্রবণ পিতা ছিলেন। তাঁহার প্রথমা কন্যার দুর্ভাগ্যে তিনি যে মনে কত বড় দাগা পাইয়াছিলেন, ও কন্যার মৃত্যুতে যে কী পরিমাণে শোকাভিভূত হইয়াছিলেন, তাহা বাঁহারা তাঁহার পারিবারিক জীবনের খোঁজ রাখেন তাঁহা হইতে অবগত আছেন। শেষের সে শোক তিনি জীবন থাকিতে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই ; অনেকের ধারণা যে তাঁহার নিজের শরীর ভঙ্গের

কারণও অনেকটা ইহাই। পাটনার মৃত্যুশয্যা হইয়া তাঁহার সেই উক্তি, ‘কমলা ! মা, তুমি আমার ডাকছো।’ স্মরণ করিলে আমাদেরও অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। অতি সাধারণ বাল্মীকি গৃহস্থের জীবনযাত্রা যে প্রণালীতে চলে, আস্তাবাবুর গৃহের ব্যবস্থাপদ্ধতিও ঠিক সেই প্রণালীতেই চলিত। তাঁহার আভিধেয়তাও ছিল চমৎকার ; লোক ধাওয়াইতে তাঁহার কি উৎসাহ ; এবং যেমন ধাওয়াতে তেমনি বাহিতেও তাঁহার উৎসাহ বড় কম ছিল না। অন্যবিষয়ে তিনি যেমনই ইউন না কেন, ভোজনবিষয়ে যে তাঁহার বিপ্রভ বোলআনা বজায় ছিল তাহা তাঁহার অতি বড় শত্রুও অধীকার করিতে পারিবে না। আস্তাবাবুর ভীমনাগের সন্দেশ-প্রীতি তো প্রায় ইতিহাসবিখ্যাত হইয়া গিয়াছে। আর শুধু সন্দেশ নয় সর্ববিধ ভোজ্য দ্রব্যেই তাঁহার বিচারপত্তি-মূলভ অপক্ষপাতই ছিল। বাঁহারা দেখিয়াছেন তাহাদের মুখে শুনিয়াছি যে রাসবিহারী বাবু ও আস্তাবাবু এই দুই জনের এক বৈঠকে বসিয়া খাইবার দৃশ্য একটি দেখিবার জিনিষ ছিল। আমি নিজেও কতদিন Mathematical Societyতে দেখিয়াছি এবং স্বীকার করিতে হয় যে কতকটা স্বেচ্ছাসহিত দেখিয়াছি — যে সভাপতি আস্তাবাবুর জনগোণের জন্য অল্প কমলালেবু, সুপীকৃত সন্দেশ ও রানীকৃত ডাব আনা হইয়াছে, আর তিনি খাটি সন্দেশেরই ন্যায় অবলীলাক্রমে সেইগুলিকে সংহার করিতেছেন। এই dyspeptic যুগে বাল্মীকির এ দৃশ্য দেখিয়াও মুগ্ধ। রাজা রামমোহন রায়ের খাওয়ার কথা বইতে পড়িয়াছি, আস্তাবাবুর খাওয়া দেখিয়াছি। আর এক কারণে তিনি খুব জনপ্রিয় হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার হাস্যপরিহাসপ্রিয়তা, তাঁহার রসিকতা, তাঁহার

আমোদা স্বভাব। আমাদের ভিতর অনেকে আছেন যাঁহারা তাঁহাদের পদগোরবে অত্যন্ত গুরুত্বাক্রান্ত হইয়া পড়েন ও গান্ধীঘাটাও স্বভাবসিদ্ধ করিয়া ফেলেন, এবং চটুলতা ও ছেলেমিকে অশোভন মনে করেন। কিন্তু আশুবাবুর এই অবিচলিত ও অটুট গান্ধীধা ছিল না। আবশ্যক হইলে, গান্ধীর তিনি হইতে পারিতেন না এমন নহে—প্রায়ের মেঘের মত এই রকম গান্ধীধাও তাঁহার বদনমণ্ডলে দেখিয়াছি। কিন্তু সুস্থ সহজ সাধারণ অবস্থায় তাঁহার চটুল গল্পপ্রিয়তা ও চকিত কটাক্ষ, লঘু পরিহাস ও প্রাণখোলা অট্টহাস্য তাঁহার সান্নিধ্যকে ভাষণ না করিয়া মনোহর ও উপভোগ্য করিয়া তুলিত। গল্প করিতে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন; আর anecdoteও তাঁহার জিহ্বাগ্রে ছিল; এক কথার Conversationalist হিসাবে তিনি খুব brilliant ও চিত্তাকর্ষক ছিলেন। তাঁহার মত লোকের বালমূলভ চপলতা বড়ই প্রীতিকর লাগিত। একদিনের আমার নিজের সম্বন্ধে একটি কথা মনে পড়ে; এখন আমার মনে হইতেছে সেই তাঁহার সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ; তাই সেই পরিহাসের আনন্দের সঙ্গে আমার বিবাদ মিশ্রিত হইয়া আছে। বাঙালী ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচনে আমি বখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে Candidate দাঁড়াইয়া শেষে অকৃতকার্য হই, তাহার কিছু পরে একদিন আমি কি কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া রেজিষ্ট্রারের কামরার প্রবেশ করিয়াছি; চুکیয়াই দেখি যে আশুবাবু জোগা চাপকান পরিয়াই হাইকোর্ট হইতে তথায় আসিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। আমি তাঁহাকে নমস্কার করিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন ‘জ্যা! হেয়ো! হেয়ো! চিরটা কাল ফাষ্ট হোয়ে এখন হেরে গেলি?’ আমি হাসিতে লাগিলাম। আর একদিন—সে অনেক বৎসরের কথা—

তখন সবেমাত্র এম্-এ পাশ করিয়াছি। আমার প্রক্কের বন্ধু অধ্যাপক মধুসূদন সরকার মহাশয়ও সেবার এম্-এ পাশ করিয়াছেন, এবং পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। আমরা দুই জনেই আশুবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি। অন্যান্য কথাবার্তা অনেকগুলি ধরিয়া হইবার পর কে একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক আসিলেন। তিনি আসিলেই, আশুবাবু আমাদের দুই জনকে দেখাইয়া বলিলেন, ‘দেখছেন মশাই, এ দু জনকে? এক চড় দিলে কিন্তু পড়ে যায়। কিন্তু এরাই অশ্বিনীবাবুর দলের গুণ্ডা, গভর্ণমেন্ট বলে anarchist; do they look like it?’ আর হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। আর একদিন আমি বসিয়া আছি, এমন সময় সরকারী চাকুরী-প্রার্থী এক যুবক আশুবাবুর নিকট আসিয়া জানাইলেন যে তিনি তাঁহার নিকট একখানি সার্টফিকেট পাইলে বড় উপকৃত হন। আশুবাবু বলিলেন, ‘দেখ বাপু! তুমি ভুল করছ। you have come to the wrong shop; আমি সার্টফিকেট দিলে তোমার সরকারী চাকুরী এমনি যদিও বা হত তাও খসে যাবে। ওরা আমার মনে করে কি জান, ওরা ঠিক করে বসে আছে, আমি বোমাওয়ালার সঙ্গী। তবে ওরা আমার কিছু বলে না, কারণ আমার ভয় করে—they are afraid of me!’ আর অট্টহাস্যে কক্ষ মুখরিত হইয়া উঠিল। আশুবাবুর এই Homeric laughter বিখ্যাত হইয়া গিয়াছে।

চরিত্রে এই সব আপাতবিরোধীজ্ঞের সমাবেশ, ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্রধর্মের, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু অপূর্ণ সামঞ্জস্যে আশুতোষ এত বড় হইয়াছিলেন। কিন্তু এ সমস্ত অভিক্রম করিয়া, এ সমস্ত ছাপাইয়া যে শক্তিতে

তিনি অদ্বিতীয় কর্মী ও নেতা হইয়াছিলেন, সে শক্তি
 তাঁহার অদম্য আত্মবিশ্বাস ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব।
 মনীষার তিনি বড়, কিন্তু তদপেক্ষা বড় মনীষীও হয়ত
 এ দেশে আছেন; কর্মপরায়ণতার তিনি বড়, কিন্তু
 তদ্রূপ কর্মঠ লোকও হয়ত আছেন; সামাজিকতার
 তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়, কিন্তু সেরকম সামাজিক
 প্রকৃতির লোকও এদেশে আছেন; কিন্তু এ সকলের
 সমবায়ই শুধু যথেষ্ট হইত না—যাহা তাঁহাকে বাক্সালার
 এই লোকারণ্যে বিশাল বনস্পতিরূপে পরিণত করিয়াছিল
 সর্বসহ দেশ-নাথরূপে পরিণত করিয়াছিল, তাহা
 তাঁহার মেরুদণ্ড এবং তাহার magnetism. শক্তি
 সংক্রামক, বিশ্বাসও সংক্রামক। নিজের শক্তিতে,
 নিজের আদর্শে দৃঢ় বিশ্বাস অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসী করে,
 দুর্বলের বল দেয়; এবং সেই চৌম্বক শক্তিতে কাঁচা
 লোহাকে চুম্বকে পরিণত করে। যে আত্মবিশ্বাসের
 বলে যৌবনে যখন তদানীন্তন শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর
 Sir Alfred Croft তাঁহাকে একটি অধ্যাপকতা
 দিতে চাহিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, ‘দেখ আশু,
 তুমি যে Bar join করিতে চাও, Bar তো ভয়ানক
 over-crowded,’ তখন তিনি বলিয়াছিলেন, ‘Bar over-
 crowded! I know. But it is over-crowded
 with rubbish!’—সেই আত্মবিশ্বাস উত্তরকালে
 আরও গভীরতর আরও ব্যাপকতর হইয়া, এবং স্বজাতির
 প্রতি বিশ্বাস ও স্বদেশের প্রতি বিশ্বাস তৎসঙ্গে বৃদ্ধি
 হইয়া, তাঁহাকে সমস্ত কর্মে সমস্ত উদ্যমে জরযুক্ত
 করিয়াছিল। এই বিশ্বাসের বলেই তিনি আত্মকাল
 নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। বাল্যকালে চাদরনিবারণী
 সতার মোড়লী করা হইতে আরম্ভ করিয়া, যৌবনে
 দেশনাথক সুরেন্দ্রনাথ যখন contempt of court

অপরাধে দণ্ডিত হইলেন তখন ছাত্রসংজ্ঞের দলপতি
 হইয়া হাইকোর্টের লোহার গেট: ভাঙ্গিবার উদ্যম হইতে
 আরম্ভ করিয়া, কর্মজীবনে সর্বত্র—হাইকোর্টে বিশ্ব-
 বিদ্যালয়ে—নেতৃত্বই করিয়া গিয়াছেন। এই বিশ্বাস,
 এই সাহস, এই নেতৃত্ব, এই গুণেরই আমাদের বড়
 অভাব। আমরা হয়ত আত্মবিশ্বাস হইয়া বেশ ভাল কাজ
 করিতে পারি; কিন্তু নেতা হইয়া সংঘ গঠন করিয়া দৃঢ়ভাবে
 কর্মপ্রচেষ্টা পরিচালিত করিতে পারি না। আমাদের
 দেশে অতি অল্প লোকেরই এই গুণ আছে। সম্ভবতঃ
 বহুবর্ষের পরাধীনতারই ইহা বিষময় ফল। Initiative
 ও সাহস উঠিয়া গিয়াছে। মানুষের সর্বাপেক্ষা মহৎ গুণ
 সাহস; এবং সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও নীচতার নিকৃষ্টতম ভীকৃত্য।
 ভয়ের সহিত, সাহসের সহিত, কেহ যদি একটা অন্যায়
 অত্যাচারও করে, তাহার অন্য কোন ভয় নাই, তাহার
 conversion হইলে সে বাস্তবিকই মহৎ লোক হইতে
 পারে; কিন্তু ভীকৃত্য পরিভ্রাণ নাই। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের
 অন্যতম নেতা দাঁতৌ বলিয়াছেন, “L’andace,
 encore l’andace, toujours l’andace”—চাই
 সাহস, আরও সাহস, সর্বদা সাহস। বাক্সালার আশুতোষ
 এই কথাই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, ‘Boldness always
 appeals to me, timidity never does’.
 তেজস্বী আশুতোষই বলিয়াছেন, ‘Freedom first,
 freedom second, freedom always’

এই সাহস ও বীরত্বেরই আর একটা প্রকাশ
 আশুতোষের বিরাট করনা শক্তিতে এবং বিরাটভাবে সেই
 করনাকে কার্যে পরিণত করিবার শক্তিতে ও উদ্যমে।
 বর্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ তাঁহার সেই
 করনাশক্তি ও কার্যে পরিণত করিবার শক্তির প্রধান
 নিদর্শন। বৃহৎভাবে এইরূপ একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া

তুলিবার শক্তি আন্ততোষের ছিল, এবং তাহাই তাঁহার প্রধান বিশেষত্ব। He could build like a Titan. তাই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। তাই লর্ড লীটন মতাসত্যই আন্ততোষের স্মৃতিসভার বলিয়াছেন, ‘আন্ততোষ যথার্থই গর্ব করিতে পারিতেন, যে আন্ততোষই বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ই আন্ততোষ।’ দোষত্রুটি সব কাজেরই আছে, তাঁহার কাজেরও ছিল; কিন্তু সে দোষত্রুটি সর্বাগ্রে আমাদের চোখে পড়িলেও, তাহাই প্রধান নহে, প্রধান হইতেছে সেই বিপুল প্রাসাদ যাহা তাহার শিল্পীর কল্পনা ও কর্তৃশক্তির জীবন্ত সাক্ষ্য দান করিতেছে। ইংরাজীতে একটি কথা আছে ‘We cannot see the wood for the trees’; সেই পরিমাণজ্ঞানহীনতা, সেই sense of proportionএর অভাব আমাদের অনেকেরই আছে; তাই বিচার তাড়াতাড়ি করিতে গিয়া ভুল করিয়া ফেলি। এই বিপুল প্রাসাদের সঙ্গে সঙ্গে আবার অত্যন্ত খুঁটিনাটির প্রতি মনোযোগ দিবার মত ইচ্ছা ও ক্ষমতা আন্ততোষের ছিল। এই বিষয়ে তাঁহার প্রতিভা বাস্তবিকই Napoleonic. লোকে তাই পরিহাস করিয়া বলিত, বড়নাটের সঙ্গে ঝগড়া হইতে আরম্ভ করিয়া হার্ডিং হোষ্টেলের পিড়ির মাংস পর্য্যন্ত আন্তবাবু না হইলে হয় না। অবশ্য এই প্রকার বিরাট ব্যাপকতার দোষ আছে; ইহাতে উপযুক্ত লোক তৈয়ারী হয় না; বিশাল বনস্পতির আওতায় পড়িয়া ছোট গাছ আর বড় হইতে পারে না। কিন্তু ছোট গাছের পক্ষে ইহা বড়ই ক্ষতিকর হউক না কেন বনস্পতির ইহাতে বিশালতাই প্রকটিত হয়।

ব্যক্তিত্বের এই বিপুলতার জন্যই আন্ততোষ চিরস্মরণীয় থাকিবেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে, আমাদের দেশের এই যে পনের আনা লোক ঘাসের চাপড়ার মত ধরণীর বক্ষে লাগিয়া রহিয়াছে, কোন মতে কাগজের কাতর ক্লিষ্টভাবে জীবনটাকে করুণরূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কথঞ্চিৎ টিকিয়া রহিয়াছে এবং তাহাতেই জীবন সফল হইল বলিয়া মনে করিতেছে, এই উদ্যমহীন, উৎসাহহীন বৈচিত্র্যহীন তৃণাস্তৃত সমাজের মধ্যে হঠাৎ যে একটা সবল, সতেজ, সপ্রাণ মহান্ মহীকুহ গজাইয়া উঠিল, ইহাকে কি বলিব? ইহা কি ভারতীয় প্রকৃতির একটা ব্যতিক্রম—একটা exception, একটা freak? যদি তাই হয়, তবে সেই ব্যতিক্রমকে চিরস্মেহে চিরআদরে চিরগৌরবে ভারতজননী মণ্ডিত করিয়া রাখিবেন। তবে ইহাও কি আমরা আশা করিতে পারি না, যে এই নবজাগরণের দিনে, নবশক্তির উন্মেষে, এই নবীন ভারতে এই ব্যতিক্রম আর অতি-প্রাকৃত থাকিবে না; তাহাই নিয়ম হইবে, তাহাই সাধারণ হইবে—বাকালার শাঙ্গিলের জলন্ত জীবনপ্রভাবে বাকালার ঘরে ঘরে পুরুষশাঙ্গিলের উদ্ভব হইবে? কবির প্রার্থনাই নিয়ত মনে ধ্বনিত হয়—

অবনত ভারত চাহে তোমারে

এস সুদর্শনধারী যুরারী।

সম্মান শৌর্যে পৌরুষে বীর্যে

কর পুত্রিত নিপীড়িত ভারত তোমারি।

এই প্রার্থনা সফল হউক।

ঝড়ের অন্ধকারে

শ্রীমুখোবোধকুমার চক্রবর্তী বি-এ

এটিকে যদি আমার দানের একটি গল্প বলি, বন্ধু তিস্তিড়ি হয়তো মুখ খিঁচিয়ে বলবে : তোমাকে তো জীবনে একটবার মাত্র দান করতে দেখেছি। এই নতুন চাকরিটার আচমকা লিকট পাবার খবরটা পেয়ে এক ভিথিরিকে একটি ছুটি নয় পাঁচপাঁচটি করকরে চক্চকে ফুটো পরসা, তাও মা-কালীর কাছে মানৎ করা।

কথাটা একবারে মিথ্যা নয়। ‘দান’ ক্রিয়াপদটির কর্তা কর্ণ-কার্ণেগীকেই মানায় ভাল। আমাদের বেলায় ও-শব্দটির প্রয়োগ আইনত দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করা উচিত। অবশ্য কোন দুর্বল মুহূর্তে দেবার সমিচ্ছা যে জাগেনা তা নয়, কিন্তু উপায় নেই। স্থায়ী অসচ্ছলতার কথা শ্রবণ হলেই বার-করা হাতের পরসাটা পকেটে আবার কিরে আসে।

কাছেই ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম। আমাদের মতো যাদের দুশো-আড়াইশো টাকার সংসার, দুতিনটে ছেলেকে, জীবনযাত্রার প্রয়োজন বেড়েছে যতো উপার্জন ততো বাড়েনি, কাছেই মেরের বিয়ের জন্যে ইনসিওরেন্স কোম্পানীকে প্রিমিয়াম দিতে হ’লে যাদের সিনেমা দেখা চলে না, বিলিতি দোকানে আইসক্রীমের তৃষ্ণা মেটাতে হ’লে খাখাটাকে সাঃ দিন বন্ধ রাখতে হয়, দান তাদের একটা বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু তবু এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হ’তে দেখা গেছে, যখন আমাদের মতো লোককেও দুএকটা টাকা অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই বার করতে হয়েছে। রাজসম্মানের গোভে লোক যে ব্যয় করে তাকে যেমন ‘দান’ বলেনা,

পরিচিতের দাবী নিয়ে কেউ যখন জোর ক’রে কিছু আদায় করে, সেই দেয়াকেও নিশ্চয়ই ‘দান’ বলা চলে না। তিস্তিড়ির কথার সত্যতা এইখানেই।

আমার গল্পের নায়ক অনাথ ঘোষ। বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে কিম্বা পেরয়নি। একটু অস্বাভাবিক গলা শীর্ণ দেহখানা সামনের দিকে ঝানকটা ঝুঁকেছে। কানের ওপরকার ছোট ছোট চুলগুলোতে পাক ধরতে শুরু করেছে। ভদ্রলোক কথা বলেন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি, কাছেই ভদ্রতার খাতিরে তার সব কথা শোনবার চেষ্টা করলে ক্ষতি স্বীকার করতেই হবে।

অনাথ বাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় বছর চারপাঁচ আগে মানিকতলার একখানা ছোট ভাড়াটে বাড়িতে। ভদ্রলোক একতলার দুখানা অন্ধকার ঘরে সংসার পেতেছিলেন আমরা এখানে আসবার বহু আগেই। ওপরে ঠানানামা করবার সময় তাঁদের প্রায়ই লক্ষ্য করতাম। বড়খুকি, ছোটখোকা প্রভৃতি তার সন্তান সন্ততির সংখ্যা পাঁচ সাতটির কম নয়। সারাক্ষণ গৃহকর্মে রত স্ত্রীটি স্বল্পভাষী, দূর থেকে একটু ক্রমা বলে মনে হয় হয়তো এটা অল্প সময়ে বহু সন্তানের জননী হ’তে হয়েছে বলে।

ভদ্রলোক নিজেই তাঁর ছেলেকের বেশি হবার কৈফিয়ৎ দেখান। বলেন : আমাদের গরীবদের কাছে নিজের সংসারটাই হচ্ছে সব রকম আনন্দের কেন্দ্র। দশটা-পাঁচটা কলম পেষাকেই জীবনের ব্রত করেছি বটে, আনন্দ পাবার বাসনাকে কিন্তু বিসর্জন দিতে পারিনি।

আপনাদের আছে সমাজ, আছে বান্ধব, আছে সিনেমা, ক্লাব, পিকনিক। আমাদের সে পরিসর কোথায়! একদিন ধিরেটোরে গেলে ছুদিন উপোষ করতে হয়। তাই শ্রী পুত্রই আমাদের সব। তানের ধিরেই আমাদের ছোট ছোট আনন্দের মুহূর্তগুলি গড়ে ওঠে।

আমার কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে বলেন : যদি বিশ্বাস না হয়, একটা স্ট্যাটিষ্টিকস তৈরি করুন। তাতে আমাদের মতো পঞ্চাশ টাকার কেরানীও থাকবে, আপনারা দুশো পাঁচশো টাকার অফিসাররাও থাকবেন, আবার যদিও রোজগার মাসে ছদশ হাজার টাকা তারাও বাদ যাবেন না। দেখবেন, মা, লক্ষ্মী ও মা যত্নে চলেছে চিরকালের বন্দ। বিশেষতঃ মা সরস্বতী আবার যদি মা লক্ষ্মীর সঙ্গে যোগ দেন তা হ'লে তো কথাই নেই। সত্যিই চিন্তাবান, বেশি বিদ্যা বুদ্ধি, এমন কি যে কোন একটা বিষয়ে পারদর্শিতা, বহু সম্ভানের পিতা হবার পথে একটা মণ্ড অন্তরায়।

ভদ্রলোকের বড় ছেলেটির বরষ বছর দশেক। অত্যন্ত অঁট একটা কালো হাকপ্যান্ট পরে সারা বাড়ি দাপাদাপি করে। ভাড়াটেরা কেউ আলসের ওপর আচার শুকতে দিলে চুরি করে ধেরে আসে। তার নাগাল না পেয়ে তার বাপকেই সবাই গালাগালি করে—এত বড় ছেলে স্থলে না দিয়ে ধর্মের নামে ছেড়ে দেবার যে কি মানে থাকতে পারে ইত্যাদি। বড় খুকির বয়েস কিছু বড়। বাপের নিন্দা সে নিঃশব্দে শুনতে রাজি নয়। তাইকে উত্তর দিতে শিখিয়ে দেয়। বলে, বলনা, আপনারা একটা বিনি পরসার স্থল খুলে দিলেই তো পারেন। সারাদিন সেখানেই পড়ে থাকব। ভেঁপো ছেলের কথা শুনে তারা চমকে ওঠেন।

আমসত খাবার লোভটা ছোট খোকা পেয়েছে ভূতো-গিমির কাছ থেকে। মান করে জপে বসবার আগে ছাতে যখন তিনি আমসত পাহারার গ্রহরী নির্মাণে ব্যস্ত, গুটি গুটি পা ফেলে ছোট খোকা টাকের আড়ালে এসে লুকায়। তারপর রসপূর্ণ পাথরের থালাটা এদিক সেদিকের নানা স্থানের স্পর্শ বাঁচিয়ে যথাস্থানে স্থাপন করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তিনি নিচে নেমে আসতেই ছোট খোকা বিছরী বীরের মতো লাক্ষিয়ে বেরিয়ে পড়ে। তারপর চুমুকে ও চেটে সমস্তটা নিঃশেষ করে দেয়। •

এর শাস্তি ভূতোগিমী একদিন কঠিন ভাবেই দিলেন। শোনা গেল, গত সবিসরাতেই দিন সকালবেলা জোর করে তিনি ভূতোবাবুকে কালীঘাটে পাঠিয়ে দিলেন। মানৎ করেছিলেন যে অপত্যাদিসমস্তিবিবাহারে অনাথবাবু যেদিন এ বাড়ি ত্যাগ করবেন, সেদিন তার স্থলদেহটা বেতো পা ছখানির ওপর ভর করে তিনি নিজে গিয়ে মাকে পাঁচসিকের পূজা দিয়ে আসবেন।

এতবড় একটা প্রলোভন মা কালী এড়াতে পারলেন না। অব্যবস্থার আগেই অনাথবাবুকে এ বাড়ি ছাড়তে হ'ল।

ঘটনাটা খুলে বলি।

একদিন সকালে নিচে প্রচুর কোলাহল শুনে অসময়ে ঘুম ভাঙল। সমস্ত চোঁচামেটি ছাপিয়ে উঠছে বড় খোকায় নানারকম ইউরেকাধ্বনি!—‘এই যে এইধেনে সেই দেশলাই এর বাক্সটা।’ ‘সেই টিকিটটা পেয়েছিস? দেখি দেখি কোথায় পেলি।’ ইত্যাদি।

বারান্দায় বেরিয়ে দেখলুম, নিচে অনাথ বাবুদেরই বাঁধাছাঁদার বিরাটপর্ব শুরু হয়েছে। আমাকে দেখতে পেয়েই ভদ্রলোক উঠে এলেন। বললেন : খুব আশ্চর্য হ'বে গেছেন, না? বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ ভোর

বেলা ঘুম ভেঙ্গে দেখেন অনাথবাবুরা বিদায় নিচ্ছে।
—ভদ্রলোক হা হা করে হাসতে লাগলেন।

এইটাই সকল ভাড়াটের অন্তরের প্রার্থনা। বিজ্ঞানসূচী
চোখে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

ভদ্রলোক হঠাৎ গলাটা নামিয়ে বললেন : ভবিষ্যতের
জন্মে তৈরি হচ্ছে। এই যে পোলাণ্ডের সঙ্গে জার্মানীর
যুদ্ধ বাধল, আর ইংলণ্ড ফ্রান্স এল তাকে সাহায্য
করতে, ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না কী দাঁড়াবে?

১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাস। জার্মানীর পোলাণ্ড
আক্রমণের সংবাদ তখন বড় বড় হরফে খবরের কাগজে
ছাপা হচ্ছে। কথা শুনে না হেসে থাকতে পারলুম
না।

ভদ্রলোক আহত হয়ে বললেন : আপনি হাসছেন?
কিছু দেখে নেবেন, এই আক্রমণ কিসের অগ্রদূত!
গত মহাযুদ্ধের মাপকাঠিতে এবারের বিচার চলবে না,
এবারে আমাদেরও জড়তে হবে।

একটু থেমে বললেন : দেশে যে দুর্দিন আসছে,
তাতে হবেনা দুমুঠো খেতে পাওয়াকেই মানুষ দেবতার
আশীর্বাদ বলে মনে করবে।

আমি হাসতে লাগলুম। উৎসাহ হারিয়ে ভদ্রলোক
নেমে গেলেন।

অনাথবাবুর দৃষ্টিকে প্রশংসা করতে হ'ল বছর
তিনেক পরে যখন চল্লিশ টাকা দাম দিয়েও বাজারে
চাল পাওয়া যাচ্ছে না, ময়দা মিলছে তো চিনি নেই,
চিনি পাচ্ছি তো আটা নেই।

ইতিমধ্যে কিছু বেতন বৃদ্ধি হওয়াতে মানিকতলা
ছেড়ে বিবেকানন্দ রোডে এসে উঠেছি। এ বাড়ীটার
আলো হাওয়া কিছু বেশি, ভাড়াও খানিকটা বেড়েছে।

সেদিন অনাথবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল সাকুলার
রোডের মোড়ে। ভদ্রলোকের পরিবর্তনটাই প্রথমে
চোখে পড়ে। সমস্ত শরীরে একটা বিস্তীর্ণকমের
রক্তভাব, মানিকতলার বাড়ীতে যা কখনো চোখে
পড়েনি। তখন নানা অভাব অভিযোগের মধ্যেও
ভদ্রলোকের পারিপাট্য লক্ষ্য করে তাঁর শাস্তিপ্রিয়তাকে
আমি কটাক্ষ করেছি। এখন চোখের নিচে পুরু হ'রে
কালি পড়েছে। বেশবাসের অপরিচ্ছন্নতা একটা বিতৃষ্ণ
বৈরাগ্যের আভাস দিচ্ছে।

দু'একটা কথা হ'ল! ভদ্রলোক আমার ঠিকানা
নিলেন। বললেন : আপনার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে
হ'ত, কিন্তু উপায় ছিল না। পুরনো বাড়ীটার খোঁজ করে
ঠিকানা যোগাড় করতে পারিনি।

বললুম : বেশ তো, এখন থেকে আসবেন।

এইবারে আমার দানের ইতিহাস শুরু হ'ল।

দিন তিনেক পরেই ভদ্রলোক উপস্থিত হলেন।
এবং গতানুগতিক ভাবে যুদ্ধ পরিস্থিতির আলোচনা
দিয়েই আলাপ শুরু হ'ল, শীতের দেশে বেশন আবহাওয়া
নির্ভর গল্প আরম্ভ করার রীতি। তারপর এল নিজেদের
কথা। ছাপার টাকা মাইনের কী করে একটা সংসার
চলতে পারে, এই অগ্নিশূল্যের বাজারে আট টাকা ভাতার
কী এগোর ইত্যাদি। এর পর নামলেন কাজের কথা; বললেন,
মেজ মেয়েটার বড় অসুখ, চিকিৎসার জন্যে
গোটা পাঁচেক টাকা খরচ না দিলেই নয়। মাইনে পেলেই
আপনাকে ফেরৎ দিয়ে যাব।

ভদ্রলোকের সমস্তাদির সংখ্যা মনে হ'তে আর
আপত্তি করতে পারলুম না। ওপর থেকে পাঁচটি টাকা
এনে তাঁর হাতে দিলুম।

দ্বিতীয়বার অনাথবাবু এলেন দিন দশবারো পর।
বললেন, বড় লজ্জা করে চাইতে। কিন্তু নিতান্ত নিরুপায়

হয়েই আসছি। গোটা দুই টাকা যদি আজ ধার দিতেন
তো মাসের বাকী দিনকটা কেনমতে চালিয়ে নিতুম।

নিতান্ত নিকৃপায় না হয়ে ভদ্রলোক ভদ্রলোকের কাছে
টাকা চাইতে আসে না, এই আমার ধারণা। কোন
প্রশ্ন না করে দুটি টাকা দিলুম।

তার প্রথমে ভদ্রলোক এলেন না। অবশ্য
সানাত্ত করেকটা টাকা ফেরৎ পাব আশা করে নিইনি—
দিয়েছি দেব বলে। আমার জ্ঞান টাকা ধার দেওয়াটা
সহ করতে পারেন না। বললেন, ওটাকা আর ফিরে
পেয়েছ!

বললুম, মা পেলেই বা ক্ষতি কি। মাংটা টাকা ফেরৎ
দিতে তাঁকে ততখানি কষ্ট স্বীকার করতে হবে, আমরা
সে টাকায় ততখানি আনন্দ পেতে পারি কি?

স্বী বললেন, তবে ধার বলে নেয়া উচিত না।

ভদ্রলোক এলেন দ্বি-পাঁচেক পর। বললেন, এমাসে
আপনার টাকাটা কিছুতেই ফেরৎ দিতে পারলুম না।
মেয়েটা মারা গেল কি না, তাতে অনেকগুলো টাকা
ধার হয়ে গেল।

—মারা গেল!

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভদ্রলোক বললেন : উপায়
ছিল না। বাঁচাতে হ'লে যে সব ঔষধ ও পথ্যের একান্ত
প্রয়োজন তার মূল্য দেবার সানর্থ্য আমাদের কোথায়।
বরং একটিকে বাঁচাতে গিয়ে বাকি দুটিকে অনাহারে
মরতে হবে।

আরও বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলুম : দুটি! আপনার
আর ছেলেমেয়েরা?

ভদ্রলোক কঠিনভাবে বললেন : হ্যাঁ দুটি। চারটি
গিয়ে এই দুইটিতে ঠেকেছিল।

বজ্রাহতের মতো বললুম : চারটি মারা গেছে?

ঠোঁট ছুটে। বিকৃত ক'রে ভদ্রলোক একটু হাসলেন,
কান্নার মত কঙ্কণ হাসি। বললেন : মারা গেছে দুটি,
আর দুটি বোধহয় বেঁচে আছে। বড় খোকা বাড়ি ছেড়েচে ;
লোকে বলে ব্যারাকপুরে রিক্সা চালাচ্ছে। আর বড়
মেয়েটা সেদিন রাত্রে হঠাৎ বেরিয়ে গেল। শুনতে পাই,
একটা অপদার্থের সঙ্গে নাকি ঘর করছে!

ভদ্রলোকের এমন সহজ উক্তি শুনে সংস্কারে ধাক্কা লাগে।
আর্থিক অসচ্ছন্দতা মানুষের চিন্তাবৃত্তিকে কত কঠোর
ক'রে তুলতে পারে, এই প্রথম দেখলুম। মুখে কথা
এল না।

ভদ্রলোক নিজেই বললেন : এ দুটিকেও বাঁচাতে
পারব না। কী ক'রে বাঁচবে?

তাঁর চোখ দুটো জলতে লাগল। বললেন : সে নোংরা
আবহাওয়ার দ্বারা বাঁচতে পারে তারা মানুষ নয়। তাদের
বুদ্ধি অসংগত ভোগের বুদ্ধি, কল্যাণের বুদ্ধি নয়।
বোতল বোতল মদ খাইয়ে যদি তাদের রাখতে পারি,
হয়তো দুদিন টিকবে। কিন্তু আমি তা চাই না। মুক্কক
তারা, মরবার জন্যেই তো এসেছে। নইলে আমার ঘরে
জন্মাবে কেন?

পরের মুহূর্তগুলো নিঃশব্দে কাটতে লাগল।

এক সময় অনেকক্ষণের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে ভদ্রলোক
বললেন : আজও আপনার কাছে কিছু চাই। বারে বারে
ধার বলে চাইতে লজ্জা করে। তবে শোধ আমি দেব।
আজ না পারি কাল নিশ্চয়ই দেব।

বললুম : কত চাই?

নির্লিপ্তভাবে ভদ্রলোক বললেন : পাঁচশকে ২'লেই
চলবে। সকালে ডাক্তারের কি ছটাকা দিয়েছি। কিন্তু

ওষুট। নিতে পারিনি। হয়তো তৈরি হ'য়ে এতক্ষণ প'ড়ে আছে।

পাঁচশিকের পরিবর্তে ছুটি টাকা দিলুম।

দিনকয়েক পরের কথা। সেদিন অফিস থেকে ফিরে একটি নতুন মুখ দেখলুম। লোকটা বাড়ির সামনে নাকি অনেকক্ষণ ধরে পাগড়ারি করছিল। নোঙরা কালো হাফপেটটার ওপর চড়িয়েছে একটা খাকি বুশসার্ট, তার কাঁধের কাছটা ছিঁড়ে কুলে পড়েছে। সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি ছাপিয়ে শোভা পাচ্ছে নাকের ঠিক নিচেকার গোঁফের ছ' আঙুল অংশ। কুংকুতে বসা চোখ দুটো কুঁচকে ছোট ক'রে একবার হাসির চেষ্টা করলে কিনা বোঝা গেল না। একটা নমস্কার ক'রে বললে : স্যারের সঙ্গে একবার দেখা করতে এসুম।

বাড়ি ঢুকতে গিয়ে দরজার কাছে থমকে দাঁড়াতে হ'ল। লোকটা ভূমিকা না বাড়িয়ে একেবারেই কাঁধের কথার নেমে পড়ল। বললে, আপনি 'দান' করার আর লোক পেলেন না স্যার, শেষে অনাথ মাতালটাকে।

নাথার ভেতর একরাশ খুনে রক্ত ছিটকে ছুটে এসে আছড়ে ছড়িয়ে পড়ল। চীৎকার করে লোকটাকে ধামিয়ে দিলুম। বহুম, সে কৈফিয়ৎ তো তোমাকে নেবার কথা নয়।

লোকটা হাত কয়েক পিছিয়ে গেল। বললে, আপনি রাগ ক'রে উঠলেন স্যার, কিন্তু পরে ভেবে দেখবেন, আমি অন্যায় বলেছি কিনা! আপনার টাকার একটা লোক অধঃপাতে যাচ্ছে, একথা আপনাকে জানানো উচিত নয় কি?

কোন উত্তর না দিয়ে তার মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে দিলুম।

মাথুকের দুর্বলতা এইখানে। পরের মুখে নিজের ক্রটির কথা শুনে আমরা প্রসন্ন হইনা। খেঁড়েও ফেলতে পারি না। কেননা, অন্তরটা এমন অদৃষ্ট স্থান যেখানে ধরা পড়লে সামান্য ক্রটিও মস্ত বড় হ'য়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে, ভেতর থেকে তার সমর্থন মেলে না। এক্ষেত্রেও তাই হ'ল। লোকটাকে তাড়িয়ে দিলুম বটে; কিন্তু অনাথের ওপর মনটা বিধিয়ে গেল।

ভদ্রলোক দুদিন পরেই এলেন। দৃষ্টিস্তার রেখা-গুলো আরও গভীর হয়েছে তাঁর কপালে। আজ আমিই প্রথমে কথা কইলুম। টেনে টেনে বললুম, এবারে কার অশুখ অনাথ বাবু, স্ত্রীর নাকি?

আমার বিজুপের স্মরণ তার কাছে গোপন রইল না। কোন উত্তর না দিয়ে ক্যাল ক্যাল ক'রে শুধু বুকের দিকে চাইলেন।

বহুম, মদের ধরচটা বুঝি চিরকালই আমার ওপরে লাগতে চান?

ভদ্রলোকের চোখ দুটা যেন হঠাৎ হিংস্র পশুর মতো জ্বলে উঠলো। তার পরেই নিবে গেল। কোন কথা না ব'লে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন।

এ ঘটনার পর আর ভদ্রলোকের দেখা পাওয়া গেল না। সবাই বললে : স্বরূপটা হঠাৎ ধরা প'ড়ে গেছে বলে খ'সে পড়েছেন। নইলে ঐ চীনে জেঁক ছাড়ানো মুশ্কিল হ'তো। সেদিনের সেই বেহারা লোকটা একদিন এসে আমার বুদ্ধির প্রশংসা ক'রে ধন্যবাদ জানিয়ে গেল।

কিন্তু আমার স্ত্রী ব্যাপারটা অন্য আলোতে নিলেন। বললেন : ভদ্রলোকের আর্থিক অনটন তোমাকে স্বীকার করতেই হবে। শুধু মদ খেয়ে যদি পেট ভরত, তা হলে কথাটা সহজে বিশ্বাস করতে পারতুম।

কথার ও কাজে, তর্কে ও আলোচনায়, এমন কি
ঝগড়া ও ভালবাসার পর্যন্ত উল্টো পথ ধরাই মেয়েদের
রীতি। তাই সেদিন আমার দানকে বে কোন মতে
সমর্থন করতে পারেনি, আজ তারই মুখে একথা শুনে
বিন্দুমাত্র বিস্মিত হলাম না।

বললাম : আমার আপশোষ হচ্ছে যে ভদ্রলোকের
চেহারা দেখেও আমি কেন এ ব্যাপার আগে সন্দেহ
করিনি। তুমি এর মধ্যে তাঁকে দেখনি, তাই এ কথা
বলছি।

আলোচনা আর বেশি দূর অগ্রসর হবার সুযোগ
পেলেনা। খবর পাওয়া গেল, নিচে এক পাগল ঢুকে
পড়েছে। আমার সঙ্গে দেখা না করে সে কিছুতেই
বেরবে না।

মেথলুম, লোকটা পাগল নয়, আমাদেরই অনাথবাবু।
খুব ভোরে কোঁরে ঘরের মধ্যে পারচারি করছেন, হাতে
একটা নোটবুক ও একটা পেন্সিল। হঠাৎ একবার
থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়ে কড়ি কাঠের দিকে চাইলেন, সমস্ত
মুখখানা সরল হাসিতে ভরে গেল।

আমার পায়ের শব্দ পেয়ে, ভদ্রলোক চমকে উঠলেন।
সামনে নিয়ে তাড়াতাড়ি একখানা চেয়ারের কাছে
এগিয়ে এসে বললেন : বন্ধুন।

নিজেও বসলেন। বসে নোটবুক খুলতে খুলতে
বললেন : কতো টাকা আপনার নিয়েছি, মনে আছে
কি ?

একটা পাতার পৌছে বললেন : এই বে পেয়েছি।—
সতরই যে পাঁচ টাকা, আর দু টাকা আটালে। তারপর
একেবারে ২৩শে জুন দু টাকা। আর আছে কি ? উঁহ
নিশ্চয়ই নেই। তা হ'লে মোট হল ন টাকা।

বললাম : সামান্য টাকারও আবার হিসেব রেখেছেন।

—তারের টাকা শোধ না দিলে পরকালে কৈকির
বেব কি ?

ব'লে পকেট থেকে কতগুলো টাকা বার ক'রে
একখানা দুখানা করে গুণে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন,
বললেন—নিম।

প্রশ্ন করলাম, সে কি ?

রুদ্ধস্বরে ভদ্রলোক উত্তর দিলেন : এই একটা মাস
শুধু আপনাদের জন্যে ধোঁটেছি, এখন ছেলেমানুষি
করবেন না।

যন্ত্রচালিতের মতো হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিলাম।

ভদ্রলোক একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন :
যাক, ঋণমুক্ত হওয়া গেল। নিঃশ্বাসটা শেষ হবার আগেই
ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি ক'রে নোটবুকের আরও খানকয়েক
পাতা উল্টে গেলেন। অম্পট ভাবে কয়েকজন ভদ্রলোকের
নাম শোনা গেল। বইটা বন্ধ করার সময় আর একটা
বড় রকমের নিঃশ্বাসের সঙ্গে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, আঃ।

বললাম : আপনার বাড়ির খবর কি ?

ভদ্রলোক হা হা ক'রে বিকট হেসে উঠলেন।

ব্যস্তভাবে বললাম, কি হ'ল মশাই ?

অট্টহাসির শেষ দিকটার সঙ্গে ভদ্রলোক জুড়লেন :
বাড়ির খবর।

আরেকটা অমূরুপ হাসির উন্মত্ততার বরটা আবার
ভরে উঠল।

হাসির বন্যা শুকিয়ে এলে বললেন : বাড়ি কোথায়
বে বাড়ির খবর।

ভদ্রলোক বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। পেছনে পেছনে গিয়ে

জিজ্ঞেস করলাম : আপনার স্ত্রী ?

খানিকটা দূর থেকে ভদ্রলোকের উত্তর এল :
আপনারা বাঁচতে দিলেন কই।

টাকা কটা হাতে নিয়ে বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।
ভদ্রলোকের রোদিনতরা হাসি তখনও বাতাসে লেপে
আছে।

আমার জন্মভূমি

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

শীর্ণতোরা যমুনার শ্রামতটে তুমি মা আমার
নীরবে নিরন্তর এবে,—বনস্পতি করে হাশাকার।
উদাস নিকুঞ্জবীধি, শুষ্কপত্র ঝরে আঁঠুবারে;
বিহ্বলকাঞ্চনগী দিশাহারা অরণ্যপ্রচ্ছাদে।
মুকুলকষায়কণ্ঠ কোকিলের নিভৃত কুঞ্জন,
পতঙ্গের চঞ্চলতা, ভ্রমরের মধুর গুঞ্জন,
গায়নের কণ্ঠ হতে নব নব পদ মধুরিমা
কোথায় হারালে তুমি! কোথা তব বিগত গরিমা!

তোমার কুটির একি একে একে নিবে গেছে দীপ,
তোমার মন্দিরে মাগো শিবা আছে,—নাহি আর শিব।
জনহীন পথপ্রান্তে সমাহিত তব মর্ম্মকথা,
বটবিষমমাচ্ছন্ন পটভূমে কাঁদে কন্যা লতা।
শৈবালকণ্টকদ্বায়ে সরীসৃপ বাপীবন্ধে জাগে,
ঘাটের সোপানে আজি,—কুন্ত তার করে না গাহন,
জ্বালাইয়া চন্দ্রহার পল্লবধু করে না নাহন।

পূজার প্রসাদীকুল যমুনার ওঠেনা উলসি,
প্রতিমার নিরঞ্জন-মালা নিরা জাগে না উষ্মী।
আনন্দ হিল্লোল নাহি, দীর্ঘশ্বাস নিরন্তর বহে,
শস্ত্রশূন্য প্রান্তরের অকোপরি তৃণপুষ্প রূহে,
যাজ্ঞী নাহি খেয়া ঘাটে, ভাঙ্গাশাটে বিজন বনানা
হৃদ্বিনের ঝটিকায় মৃতপ্রায় তুমি মা কন্যাগী—।
আমার বসন্তদিনে একি রূপে দাঁড়াইলে তুমি
রাজরাজেশ্বরী! আজ সর্ব্বহার্য্য মাতা জন্মভূমি।

মাঝে মাঝে

শ্রীজ্যোতিষ্মত্ গঙ্গোপাধ্যায়

আমার এ কবিমন উড়ে যেতে চায়
মাঝে মাঝে আকাশের গায়।
দূরে ঐ বনানীর ছায়,
পথ যেখা এঁকে বেকে যায়,
আমার এ কবিমন মাঝে মাঝে সেই পথে যায়।
জানি না কো তবু কেন কিরে আসে হায়
ব্যর্থ হয়ে। শুধু বাধা ধায়,
সহরের বেড়াভালে শুধু বাধা পায়,
অকারণে হায়!
মন মোর মানে নাকো মানা, তবু ছুটে যায়,
মাঝে মাঝে আকাশের আর বনানীর, ঐ দূর গায়।
এ কি বড় দায়?

দ্বিগন্তের ওপারেতে অসীমের লাগি
আমার এ মন আজি রয়েছে তো লাগি;
মাঝে মাঝে সাড়া পাই তার স্পন্দনে,
সাড়া পাই মাঝে মাঝে, পাই ক্ষণে ক্ষণে।
বিবাক্ত কুটিল ধোঁরা বেড়াভাল বাঁধে
এ মনের চারপাশে। তাই বুঝি কঁড়ে
এই বাধা মন। একটু আলোর আশায়
মাঝে মাঝে তবু কিরে চায়
মন মোর দূরে ঐ আকাশের গায়।

রাজপরিবারের সংবাদ

শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর বহুদিন রাজধানীতে অবস্থান করিয়া রাজকার্য পরিচালনা করিয়াছেন। এই সময় প্রতিদিন বহু প্রার্থী ও প্রজাবৃন্দ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের অভাবঅভিযোগ নিবেদন করিত ও মহারাজও ধৈর্য্য সহকারে সকলের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া যথাবিহিত ব্যবস্থা করিতেন।

মহারাজ ভূপ বাহাদুর বর্তমানে কাশ্মীরে অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীশ্রীমহারানী সাহেবা কুচবিহারেই আছেন। মহারাজকুমার ও ঈশ্বরানী কমলাদেবী কলিকাতায় আছেন।

স্থানীয় সংবাদ

কুচবিহার সরকারের ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেট—

কুচবিহার সরকারের ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেট প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে চলতি বৎসরে ১ কোটি ১ হাজার ৮০ টাকা আয় এবং ২৮ লক্ষ ৮১ হাজার ১২১ টাকা ব্যয় হইয়া প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা উদ্ধৃত হইবে। কুচবিহার সরকারের আয় গত কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে; ১৯৪৩-৪৪ সালে প্রকৃত আয় হইয়াছিল ৭০ লক্ষ ৭৫ হাজার ২৮৬

টাকা; ১৯৪৪-৪৫ সালে ইহা বাড়িয়া ২৩ লক্ষ ৬৫ হাজার ৬২২ টাকা হয়; ১৯৪৫-৪৬ সালের সংশোধিত বাজেটে ২৭ লক্ষ ৪২ হাজার ৩৩৩ টাকা আয় ধরা হয়। তামাক শুল্ক, রপ্তানী শুল্ক, আবকর, যানবাহন (Road and River Transport), লগ্নী টাকার সুদ (Interest on Loans and Investments)—এই কয়টি খাতেই গত কয়েক বৎসর হইতে সরকারী আয় বাড়িয়া চলিয়াছে। ব্যয়ের দিকে দেখা যায় শিক্ষা, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি স্বাভিগঠনমূলক বিভাগে

ক্রমশঃই অধিকতর ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইতেছে। ১৯৪৫-৪৬ সালে শিক্ষার জন্য ২ লক্ষ ৮৫ হাজার ২৪ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল; চলতি বৎসরে ইহা বাড়াইয়া ৪ লক্ষ ৫ হাজার ২৬৭ টাকা করা হইয়াছে; শিক্ষার জন্য গত তিন বৎসরে গড়ে ব্যয় হইয়াছিল ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ৯৬৪ টাকা। চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের জন্য ১৯৪৫-৪৬ সালে বরাদ্দ ছিল ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৮৯১ টাকা; চলতি বৎসরে ইহা বাড়াইয়া ৪ লক্ষ ৭ হাজার ৯২ টাকা করা হইয়াছে; গত তিন বৎসরে এই বাবদ গড়ে ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৫৮৬ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কৃষিবিভাগে গত তিন বৎসর গড়ে ৩৮ হাজার ১১৭ টাকা ব্যয় হইয়াছিল; কিন্তু চলতি বৎসরে এই জন্য ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৭০৪ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। গ্রামোন্নয়নের জন্য গত তিন বৎসর গড়ে ৪৮ হাজার ৩৯২ টাকা ব্যয় হইয়াছিল; কিন্তু চলতি বৎসর এই জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। জাতিগঠনমূলক বিভাগসমূহের জন্য এইরূপ উদারভাবে ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়াও রাজসরকার চলতি বৎসরে ১০ লক্ষ টাকার উপর রিজার্ভ ফাণ্ডে রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন; এই রিজার্ভ ফাণ্ডের ৪ লক্ষ টাকা যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন এবং ১ লক্ষ টাকা গ্রামোন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে। গত বৎসরের বাজেটেও ১০ লক্ষ টাকার উপর রিজার্ভ ফাণ্ডে রাখা হইয়াছিল এবং তাহার ৫ লক্ষ টাকা যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ও গ্রামোন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল।

বাজেটের উপরোক্ত হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে, কুচবিহার দরবার প্রজার মঙ্গলের জন্য যুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেছেন। বাজেটের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, রাজসরকারের আর বহু পরিমাণে বাড়ি সত্ত্বেও

মহারাজ ভূপ বাহাদুর তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য (Privy Purse) সরকারী তহবিল হইতে পূর্বাপেক্ষা এক কপর্দকও বেশী গ্রহণ করেন নাই। গত কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যয়বরাদ্দ ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকাই নির্দিষ্ট হইয়া আছে।

কুচবিহারে ধান চাউলের দর—

কুচবিহার রাজ্যে কট্টোল ও রেশন ব্যবস্থার ফলে ধান ও চাউলের বাজার দর বাড়িতে পারে নাই কিম্বা কোথায়ও ধান চাউলের অভাবও দেখা দেয় নাই। বাংলা দেশে যেখানে স্থানে স্থানে ৫৫।৪০ টাকা মূল্যে চাউল বিক্রয়ের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, কুচবিহার রাজ্যে সেখানে চাউলের দর সর্ব ও মোটা ভেদে ১০ টাকা হইতে ১২ টাকার মধ্যে ওঠানামা করিতেছে; আতপ চাউল এতদপেক্ষা কিছু অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

কুচবিহারে বস্ত্ররেশনিং—

কুচবিহারে কিছুদিন হইতে বস্ত্ররেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে; ইহার ফলে রাজ্যবাসী সকলে প্রয়োজনমত বস্ত্র পাইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি কুচবিহার সহরে রেশন কার্ডের মালিকদিগকে ক্রয়-ফোল্ডার দেওয়া হইয়াছে। এই ক্রয়-ফোল্ডার দেখাইয়া নির্দিষ্ট দোকান হইতে কাপড় পাওয়া যাইবে।

দাতার সম্মানলাভ—

হানোয় নিরঞ্জনলাল আগরওয়াল কোম্পানী কুচবিহার সদর হাসপাতালের উন্নতিকল্পে রাজসরকারের হস্তে একটি মোটা টাকা দান করিয়াছেন। কোম্পানীর এই বদান্ধতার পুরস্কারস্বরূপ মহারাজ ভূপ বাহাদুর কোম্পানীর অঙ্গীদার বাবু শ্রীমসুন্দর কাছারিয়াকে দরবারে আসন দিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। এই আদেশ কুচবিহার গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

স্থানীয় বিদ্যালয় সমূহে পুরস্কার বিতরণ—

গত মে মাসে কুচবিহার মহরত্ব কতিপয় বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ হইয়া গিয়াছে। ১৬ই মে সুনীতি একাডেমীতে শ্রীশ্রীমহারানী সাহেবার সভানেত্রীত্বে পুরস্কার বিতরণ হয়। ২১শে মে ল্যান্সডাউন হলে মহারানী বাণিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ হয়; এই উৎসবেও শ্রীশ্রীমহারানী সভানেত্রীত্ব করেন ও মহারাজ ভূপ বাহাদুর পুরস্কার বিতরণ করেন। ২৯শে মে ল্যান্সডাউন হলে মহারাজ ভূপ বাহাদুরের সভাপতিত্বে সদর মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ হয় ও মহারাজ স্বয়ং পুরস্কার বিতরণ করেন। তিন বিদ্যালয়েরই ছাত্র ও ছাত্রীগণ সঙ্গীত, আবৃত্তি ও অভিনয় করিয়া শ্রোতৃগণের আনন্দ বিধান করে। শ্রীশ্রীমহারানী সাহেবা ও শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরের উপস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীগণ অত্যন্ত উৎসাহিত হয়।

বস-স্কাউট শিক্ষা-শিবির—

গত ৯ই হইতে ১৪ই জুন পর্যন্ত স্থানীয় গুরু ট্রেনিং বিদ্যালয় গৃহে ও গৃহ-প্রাঙ্গণে কুচবিহার বস-স্কাউট এসোসিয়েশন হইতে কাব-মাষ্টারী শিক্ষা দিবার নিমিত্ত একটি শিক্ষা-শিবির খোলা হয়। কুচবিহার রাজ্যের বিভিন্ন স্থল হইতে ১৩জন শিক্ষক কাব-মাষ্টারী শিক্ষার নিমিত্ত এই শিবিরে সমবেত হইয়াছিলেন। ইষ্টার্ন

ষ্টেট্‌স্‌ এসোসিয়ার ডাউট-এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী মিটার বসু কাব-মাষ্টারী শিক্ষা দিবার নিমিত্ত কুচবিহার আসেন। ৯ই জুন পূর্বাহ্ন সাড়ে এগার ঘটিকার সময় মহারাজ ভূপ বাহাদুর শিক্ষা-শিবিরের উদ্বোধন করেন এবং ১২ই জুন পূর্বাহ্ন দশ ঘটিকার পুনরায় শিক্ষা-শিবির পরিদর্শন করেন। রাজ্যের শিক্ষা-মন্ত্রী মহাশয় প্রায়ই শিবিরে আসিয়া সকলকে উৎসাহিত করেন এবং ১৩ই জুন ক্যাম্প ফারারের সময় একটি চিত্তাকর্ষক উপকথা শুনাইয়া শিবিরস্থ সকলকে আনন্দ দান করেন। ১৪ই জুন শিক্ষাশিবিরের কার্য সমাপ্ত হয়।

কুচবিহারের প্রধান মন্ত্রীর Negotiating Committeeর সদস্য পদ প্রাপ্তি—

মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব অনুসারে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য রাজস্ববর্গের পক্ষ হইতে যে আলোচনা কমিটি (Negotiating Committee) গঠিত হইয়াছে কুচবিহারের প্রধানমন্ত্রী সর্দার ডি, কে, সেন মহোদয় তাহার অন্ততম সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। নরেন্দ্রমণ্ডলের চ্যামেলার ভূপালের নবাব বাহাদুর এই কমিটির সভাপতি। মাত্র ছয়টি রাজ্যের মন্ত্রী এই কমিটির সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন; তন্মধ্যে কুচবিহারের প্রধানমন্ত্রী একজন হওয়া কুচবিহারের পক্ষে আনন্দ ও গৌরবের কথা।

দেশবিদেশের কথা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষা—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জুলাই মাস হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষা দিবস নিমিত্ত ক্লাস খুলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রতি বৎসর এই ক্লাসে ৩০ জন করিয়া ছাত্র লওয়া হইবে এবং প্রতি ছাত্রকে দুই বৎসর করিয়া শিক্ষা লইতে হইবে। কেবল গ্রাজুয়েটগণই এই ক্লাসে ভর্তি হইতে পারিবেন। সাধারণতঃ সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মনোনীত প্রার্থীগণকেই এই ক্লাসে ভর্তি করা হইবে; কিন্তু এই সকল প্রার্থীর সংখ্যা যদি ৩০ জন না হয় তবে বিশ্ববিদ্যালয় জনসাধারণের মধ্য হইতেও ছাত্র লইতে পারিবেন।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্মেলন—

বাংলা সরকার এই প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষা সমস্যার আলোচনার জন্য একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। এই সম্মেলনে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্যতালিকা সংশোধন, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় সমূহের প্রাথমিক শ্রেণীগুলি হইতে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া, বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের বেতনবৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইবে। বিভিন্ন জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানগণ, জেলা স্কুলবোর্ড সমূহের সভাপতিগণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সম্ভের প্রতিনিধিগণকে এই সম্মেলনে যোগদানের নিমিত্ত আহ্বান করা হইয়াছে।

সম্রাটের জন্মদিনে খেতাবপ্রাপ্তি—

গত ১৩ই জুন ভারত সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে ঐহারা খেতাব পাইয়াছেন তাঁহাদের নামের তালিকা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তালিকা দৃষ্টে দেখা যায় যে বড় লাটের বর্তমান শাসনপরিষদের তিন জন সদস্য কে-সি-এস-আই খেতাব লাভ করিয়াছেন; ইঁহার স্যার জে, পি, শ্রীবাস্তব, স্যার যোগেন্দ্র সিং এবং স্যার আজিজুল হক। ঐহারা কে-টি খেতাব পাইয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ খানকর, বাংলার এডভোকেট জেনারেল মিঃ এস, এম বসু, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার মিঃ সি, পি, সিংহ এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কে. এস, কৃষ্ণান এক-আর-এস এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আসামের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী স্যার মহম্মদ সাহুলা কে-সি-আই-ই এবং বাংলার ভূতপূর্ব মন্ত্রী ও উত্তরপাড়ার জমিদার শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায় সি-আই-ই খেতাব পাইয়াছেন। সন্তোষের জমিদার শ্রীবিনয়কেনাথ রায় চৌধুরী “রাজা” উপাধি পাইয়াছেন। বাংলার স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টর মেজর জাফর এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ বোর্ডের সেক্রেটারী মিঃ ডি, কে, সান্যাল ও-বি-ই খেতাব লাভ করিয়াছেন। আমরা এই সকল সম্মান-প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারত গভর্ণ-মেন্টের প্রতিবাদ—

দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেন্ট তাঁহাদের আইনপরিষদে এশিয়াটিক ভূমিস্বত্ব বিল ও ভারতীয় প্রতিনিধিত্বমূলক

বিল উত্থাপন করিয়া আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়গণের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। ভারত গভর্নমেন্ট এই দুইটি বিল স্থগিত রাখিবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্নমেন্টকে পুনঃ পুনঃ অস্বরোধ করিয়াও কোন ফল পান নাই। ইহার প্রতিবাদকরে ভারত গভর্নমেন্ট দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত বাণিজ্য চুক্তি বাতিল করিয়াছেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতীয় হাই কমিশনারকে কিরাইয়া আনার সংকল্প ঘোষণা করিয়াছেন। বিদেশে ভীকৃতের এই অসম্মানের প্রতিবাদ করিয়া ভারতসরকার যুক্তিসূক্ত কাজই করিয়াছেন।

সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানে (U N O) দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের কার্যের প্রতিবাদ করিয়া সার রামস্বামী মুদালিয়ার এক প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছেন।

শোক সংবাদ—

(ক) পরলোকে আশ্রয় লেখক হাউপ্টম্যান—

বিখ্যাত আশ্রয় উপন্যাসিক ও নাট্যকার হাউপ্টম্যান সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৪ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ১৯১২ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিখ্যাত নাটক Weavers এবং বিখ্যাত উপন্যাস The Island of the Great Mother বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

(খ) টেনিভিসনের আবিষ্কার মৃত্যু—

টেনিভিসনের আবিষ্কার জন বের্ড গত ১৬ই জুন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি প্রথম ১৯২৪ সালে টেনিভিসন প্রত্যক্ষ করান এবং বলেন যে এমন দিন আসিবে যে বেতারে ছবি পাঠান যাইবে; তখন অনেকে তাঁহাকে পাগল বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। কিন্তু

তাঁহার স্বপ্ন সফল হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫৮ বৎসর হইয়াছিল।

(গ) পরলোকে খান বাহাদুর মোমিন—

গত ১৮ই জুন সক্রিয় খান বাহাদুর এম্. এ. মোমিন কলিকাতা ট্রেপিক্যাল স্কুলের হাসপাতালে পরলোক গমন করেন; মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল। সাব-ডেপুটি কালেক্টর রূপে কর্মজীবন আরম্ভ করিয়া খান বাহাদুর ক্রমে বিভাগীয় কমিশনারের পদ লাভ করিয়াছিলেন। খান বাহাদুর হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

রেল কর্মচারীদের নোটিশ প্রত্যাহত—

রেল কর্মচারীগণ ২৭শে জুন মধ্য রাত্রি হইতে ভারতীয় সকল রেলপথে ধর্মঘট করিবার সংকল্প জানাইয়া কর্তৃপক্ষের নিকট নোটিশ প্রদান করিয়াছিলেন। রেলওয়ে ষ্ট্যান্ডিং কাইন্যান্স কমিটির পরামর্শ অনুসারে রেলওয়ে বোর্ড রেলকর্মচারীগণের কতকগুলি দাবী মানিয়া লওয়ায় এবং কতকগুলি দাবী সালিশিতে প্রদান করিতে সম্মত হওয়ায় ধর্মঘটের নোটিশ প্রত্যাহত হইয়াছে। বর্তমান খাদ্যসঙ্কটের সময় ব্যাপক ধর্মঘটের ফল উদ্ভাবন হইত; ধর্মঘট প্রত্যাহত হওয়ায় আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

দেশীয় রাজ্যসমূহের আলোচনা কমিটি

(Negotiating Committee) —

মন্ত্রীমণ্ডলের ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, গণপরিষদে ভারতীয় রাজ্যসমূহ হইতে সর্বাধিক ১৩ জন সদস্য নির্বাচিত হইতে পারিবেন। এই সকল সদস্য নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত একটি Negotiating Committee

প্রারম্ভিক কাজকর্ম চালাইবেন। বোম্বাইয়ে রাজন্যবর্গের
চ্যাংগ কমিটির সভায় নিম্নলিখিত রাজন্য ও মন্ত্রীবর্গ
নইয়া Negotiating Committee গঠিত হইয়াছে :—

- (১) ভূপালের নবাব বাহাদুর—সভাপতি
- (২) পাতিয়ালা মহারাজা
- (৩) নবনগরের জাম সাহেব
- (৪) নবাব আলি হুসাইন—নিজাম সরকারের
মন্ত্রী
- (৫) স্যার মনুভাই মেটা—গোয়ালিন্দরের মন্ত্রী
- (৬) স্যার সি, পি, রামস্বামী আয়ার—ত্রিবাঙ্কুরের
দেওয়ান

(৭) স্যার সুলতান আমেদ—নরেন্দ্রমণ্ডলের
চ্যান্সেলারের উপদেষ্টা

(৮) সর্দার ডি, কে, সেন—কুচবিহারের প্রধান
মন্ত্রী

(৯) মি: কে, এম, পালিকার—বিকানীরের
প্রধান মন্ত্রী

(১০) ডুমুরপুরের প্রধান মন্ত্রী।

নরেন্দ্রমণ্ডলের ডিরেক্টর অফ পাবলিক রিলেশনস
মি: মকবুল মামুদ এই কমিটির সেক্রেটারীর কার্য
করিবেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

মন্ত্রীমিশন প্রস্তাব ও ভারতীয় রাজন্যবর্গ—

ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের নিমিত্ত মন্ত্রীমিশন ও
বড়লাট গত ১৬ই মে যে ঘোষণা করেন তাহাতে ভারতের
দেশীয় রাজ্যসমূহ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি রহিয়াছে।

- (১) ভারতে যে যুক্তরাষ্ট্র (Union of India)
গঠিত হইবে তাহা ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহ
নইয়া গঠিত হইবে। (২) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি
শাসন পরিষদ ও একটি আইন সভা থাকিবে—এই দুয়েতেই
ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি থাকিবেন।
- (৩) ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয়
রাজন্যবর্গের সহিত ইংলণ্ডের যে সম্পর্ক এতাবৎকাল

বর্তমান আছে তাহা আর থাকি সম্ভব হইবে না—
ইংলণ্ডের তখন আর তাঁহার মার্কভৌমত্ব রাখিতেও
পারেন না, অথবা নূতন ভারত সরকারের হাতে তাহা
ন্যস্তও করিতে পারেন না। (৪) ভারতের শাসনতন্ত্র
নিরূপণের জন্য যে গণ-পরিষদ (Constituent
Assembly) গঠিত হইবে তাহাতে অনধিক ৯০ জন
দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি থাকিবেন; ইহাদের নির্বাচন
প্রণালী আলোচনাধারা স্থিরীকৃত হইবে; প্রথম দিকে
একটি আলোচনা কমিটি (Negotiating Committee)
দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

ইহার পর গত ২২শে মে মন্ত্রীমিশন ও বড়লাট
নরেন্দ্রমণ্ডলের চ্যান্সেলারের নিউক একটি স্মারকলিপি

প্রেরণ করেন। ইহাতে ইংলণ্ডের সার্কভৌম ক্ষমতা ও তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলা হয় যে, নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারত স্বাধীনতা লাভ করিলে ইংলণ্ডের আর দেশীয় রাজ্যসমূহের উপর সার্কভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পাবেন না, কিম্বা ইহা নূতন ভারতীয় গভর্নমেন্টের হাতেও সমর্পণ করিতে পারেন না। এমতাবস্থায় সার্কভৌম ক্ষমতা দেশীয় নৃপতিগণের হস্তেই ফিরিয়া যাইবে। তখন দেশীয় নৃপতিগণকে হয় ভারতীয় গভর্নমেন্টের সহিত যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে অথবা বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কিন্তু অন্তর্কর্তৃত্বকাল ইংলণ্ডের সার্কভৌম ক্ষমতা কাহারো থাকিবে।

মন্ত্রামণ্ডল ও বড়নাট্যের উপরোক্ত প্রস্তাব ও আরকলিপি সম্বন্ধে বিবেচনা করার নিমিত্ত গত ৭ই হইতে ১০ই জুন পর্যন্ত বোম্বাই সহরে ভারতীয় নৃপতি ও দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রীগণের কংগ্রেসটি সম্মিলিত ও পৃথক পৃথক সভা হয়। প্রথমে দেশীয় নৃপতি ও মন্ত্রীদের যে প্রতিনিধিদল এপ্রিল মাসের প্রথমভাগে মন্ত্রামণ্ডলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ভূপালের নবাব বাহাদুরের সভাপতিত্বে তাঁহাদের এক বৈঠক হয়। তৎপরে নরেন্দ্র মণ্ডলের চ্যাপিং কমিটি ও দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রীগণের চ্যাপিং কমিটি বৈঠক হয়। এই সকল বৈঠকে নিম্নলিখিতরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়।

রাজকুলবর্গ মন্ত্রামণ্ডলের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে গঠনের প্রস্তাব সানন্দে সমর্থন করেন এবং দেশীয় রাজ্যসমূহ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে ইচ্ছুক এইরূপ মত প্রকাশ করেন। প্রারম্ভিক আলাপ আলোচনার জন্য রাজকুলবর্গ একটি আলোচনা কমিটি (Negotiating

Committee) গঠন করিতে সম্মত হন এবং নরেন্দ্র-মণ্ডলের চ্যাপিং ভূপালের নবাব বাহাদুরের সভাপতিত্বে মোট মণ্ডল সদস্য নইয়া একটি আলোচনা কমিটি গঠিত হয়। এই আলোচনা কমিটি অনিশ্চয়ই কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিবে।

ইংলণ্ডের সার্কভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ সম্বন্ধে রাজপ্রতিনিধি ও মন্ত্রামণ্ডলের আরকলিপির প্রস্তাব রাজকুলবর্গ মানিয়া লইয়াছেন; কিন্তু অন্তর্মুখী কালে এই সার্কভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ সম্বন্ধে রাজকুলবর্গ একটি নূতন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, অন্তর্মুখী শাসনপরিষদ কার্য্যভার গ্রহণ করিলে রাজপ্রতিনিধি নিজে সার্কভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ না করিয়া রাজকুলবর্গের নিযুক্ত একটি কমিটির সহিত পরামর্শ করিয়া এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন; অর্থাৎ বর্তমানে ভারতসরকারের রাজনৈতিক বিভাগ যে কার্য্য করিতেছেন রাজকুলবর্গের নিযুক্ত একটি কমিটি এই কার্য্য করিবেন।

অন্তর্মুখী কালের জন্য চ্যাপিং কমিটি চ্যাপিংয়ের নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি অনুমোদন করিয়াছেন—

(ক) অন্তর্মুখী কালে দেশীয় রাজ্য ও ভারত সরকারের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপার সম্পর্কে আলোচনার জন্য দেশীয় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের প্রতিনিধি নইয়া একটি স্পেশাল কমিটি গঠন করিতে হইবে।

(খ) শুধু ও অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারের সীমাংসার ভার সালিশি আদালতের উপর অর্পণ করিতে হইবে।

(গ) রাজকুলবর্গের ব্যক্তিগত ও বংশগত (personal and dynastic) ব্যাপারে একটি অননুযোজিত পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে; সংশ্লিষ্ট রাজ্য হইতে আপত্তি

উত্থাপিত না হইলে রাজপ্রতিনিধি চ্যাম্বেনার ও অপর কয়েকজন নৃপতির সহিত পরামর্শ করিবেন।

(ঘ) রেলপথ, বন্দর, ও বাণিজ্যশুল্ক ব্যবস্থার প্রয়োজনমত সংশোধন করিতে হইবে।

এই সকল বিষয়ে সম্বর সিন্ধাস্তে পৌছাইবার ক্ষমতা প্রাপ্তি কমিটি চ্যাম্বেনারের উপর আলাপ আলোচনা চলাইবার ভার অর্পণ করিয়াছেন।

প্রাপ্তি কমিটি বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনের উপরও জোর দিয়াছেন। প্রতিনিধিগণক প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্য দিয়া বাহাতে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে জনমত প্রতিকলিত হয় তৎপ্রতি রাজন্যবর্গকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য রাখেন এবং চ্যাম্বেনার নবোদয়গলের গত অধিবেশনে দেশীয় রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের যে ঘোষণা করিয়াছিলেন আগামী এক বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক রাজ্যে বাহাতে তদনুসারে কার্য্য হয় তাহার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়াছেন।

রাজন্যবর্গের এই সকল সিদ্ধান্ত হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তাঁহারা ভারতের স্বাধীনতার পক্ষপাতী এবং নিজ নিজ রাজ্যের অবস্থার উন্নতি করিয়া সমগ্র ভারতের উন্নতি কামনা করেন।

কেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত সরকার গঠনের প্রস্তাব—

গণ-পরিষদ কর্তৃক নূতন শাসনতন্ত্র গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃগণকে লইয়া কেন্দ্রে একটি অন্তর্ভুক্ত গভর্নমেন্ট গঠনের কথা মন্ত্রীমণ্ডলের প্রস্তাবে আছে। এই প্রস্তাব অনুসারে বড়নাট কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অনুমোদিত রাজনৈতিক

নেতৃগণকে লইয়া অন্তর্ভুক্ত গভর্নমেন্ট গঠন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রথমে কথা হইয়াছিল যে কংগ্রেস হইতে ৫ জন হিন্দু, মুসলিম লীগ হইতে ৫ জন মুসলমান ও সংখ্যানুবিষ্ট সম্প্রদায় সমূহ হইতে দুই জন প্রতিনিধি লইয়া অন্তর্ভুক্ত গভর্নমেন্ট গঠিত হইবে। কংগ্রেস দুই কারণে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সম্মত হয় নাই। প্রথমতঃ, কংগ্রেস কেবলমাত্র হিন্দুদের লইয়া গঠিত নহে; সুতরাং কংগ্রেস হইতে কেবল হিন্দু সদস্য গ্রহণ করিলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, লীগ কেবল মুসলমানদিগের প্রতিষ্ঠান; ভারতের মুসলমান জনসংখ্যা হিন্দু জনসংখ্যার অনেকও হইবে না; এমতাবস্থায় কংগ্রেস লীগের সহিত সংখ্যানুমান্য মানিয়া লইতে সম্মত হয় নাই।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ঐক্যমত বিধানে অদম্য হওয়ার বড়নাট ১৪ জন সদস্য লইয়া অন্তর্ভুক্ত গভর্নমেন্ট গঠনের প্রস্তাব করেন এবং কংগ্রেসের ৬ জন (৫ জন বর্ণ হিন্দু ও ১ জন তপশিলী হিন্দু), মুসলিম লীগের ৫ জন, ১ জন শিখ, ১ জন পার্শী ও ১ জন ভারতীয় খৃষ্টানকে সদস্য হইবার আমন্ত্রণ প্রেরণ করেন। কংগ্রেস এই তালিকার সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। প্রথমতঃ, কংগ্রেসের মতে নিম্নলিখিত পার্শী ভদ্রলোক স্যার এন্. পি. ইঞ্জিনিয়ার সরকারী চাকুরিয়া বলিয়া সদস্যপদে নিযুক্ত হইতে পারেন না; তাঁহার পরিবারে কোনও পার্শী নেতাকে নিযুক্ত করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেস বর্ণহিন্দু সদস্যদের যে তালিকা দিয়াছিল তাহা হইতে মিঃ শরৎ বসুর বদলে মিঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, কংগ্রেস দাবী করে যে কংগ্রেসের জন্য নির্দিষ্ট সদস্য মধ্যে একজন

জাতীয়তাবাদী মুসলমান নিরুক্ত করিতে হইবে। কংগ্রেসের কোন মুসলমানকে অন্তর্ভুক্তি গভর্ণমেন্টে গ্রহণ করা এই তৃতীয় প্রস্তাব মুসলিম লীগ কিছুতেই গ্রহণ করিতে চলিবে না। রাজী নহে; কেন না, লীগের মতে লীগই মুসলমানদের সর্বশ্রেণে সংবাদে প্রকাশ যে কংগ্রেস অন্তর্ভুক্তি গভর্ণ একমাত্র প্রতিষ্ঠান; লীগের সদস্য নহেন এমন মেটে বোগ দিতে অস্বীকার করিয়াছে।

গ্রন্থ-সমালোচনা

'প্রদীপ ও শিখা'—উপন্যাস; লেখক শ্রীরাসবিহারী বসু, প্রকাশক—বিশ্বাণী। দাম আড়াই টাকা।

রাসবিহারীবাবু বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে সুপরিচিত। আগোচ্য উপন্যাসে তিনি গতানুগতিকের পথ ছাড়িয়া নূতন আদর্শে একটু নূতন ধরণের নারক নাটিকা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তরুণ নারক প্রদীপ ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়াও একনিষ্ঠ সাধকের মত ভজন ও কীর্তনে সর্গগুণ ডুবিয়া থাকে। তাহার অসামান্য রূপ, পবিত্র জীবন, এবং ভগবানে তন্ময়তা সকলেরই হৃদয় আকর্ষণ করে, কিন্তু সব চেয়ে বেশি আকর্ষণ করিল লাবণ্যকে। তরুণী লাবণ্য সাহেবি ভাবাপন্ন ধনাঢ্য জমিদারের একমাত্র কন্যা হইয়াও মনে মনে প্রদীপের পারে আপনাকে নিবেদন করিল। যে লাবণ্য বাবার সাথে বোগ দিয়া মাতা ইন্দ্রাণীর ধর্ম কর্ম লইয়া বিক্রম করিত, এখন সাধুর বেশধারী প্রদীপ ঠাকুর হইল তাহার জীবনের ঞ্জবতারা। লাবণ্য প্রদীপকে তাহার দেহের ~~কিছু~~ ভালবাসে না, ভালবাসে তাহার অপূর্ব আধ্যাত্মিক ভাবের জন্য। প্রদীপের রূপে সে মুগ্ধ, এ রূপ তাহাকে আনন্দ দেয় কিন্তু লালসার উদ্রেক করে না। তাহার মামাত বোন মামতী প্রদীপকে চায় তাহার

লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য। তাই লাবণ্য মামতীকে ঘৃণা করে। অনিন্দ্য সুধাংশুশেখর কস্তার জন্য আই, বি, এস, পাত্র ঠিক করিলেন। লাবণ্য তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। এ দিকে প্রদীপও নিজের অজ্ঞাতনামে লাবণ্যকে ভালবাসিয়া কেলিয়াছে। কিন্তু মিলনের উপায় নাই। প্রদীপ মাড়োয়াবী বদরি মহারাজের মন্দিরের মোহান্ত হইয়া হরিদ্বারে দিন কাটাতে লাগিল। সুধাংশুশেখর যখন জানিলেন লাবণ্য মনেপ্রাণে প্রদীপকেই আত্মনিবেদন করিয়াছে তখন তিনিও সপরিবারে হরিদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিদ্বারের আশ্রমে লাবণ্য প্রদীপকে সেবা করিতে গিয়া তাহাকে পতিরূপে লাভ করিল।

পুস্তকের ভাষা চিত্তাকর্ষক। বর্ণনা সতেজ এবং সাবলীল। ঘটনার সমাবেশে পাঠকের কৌতুহল শেষ পর্যন্ত সন্তোষপূর্ণ হইয়া থাকে। তবে লেখক স্থানে স্থানে বাস্তবতার সৌম্য ছাড়াইয়া দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। নায়কের কলেজ জীবন হইতে সহসা তন্ময় সাধকজনে পরিণতির কোনও ক্রমবিকাশ লেখক দেখান নাই। ইংরাজী শিক্ষিতা প্রগলভা নায়িকার জীবনে একদিনে ঐরূপ অভাবনীধ পরিবর্তন অবাস্তব বলিয়া মনে হয়।

খেলাধুলা

ক্রিকেট—

লণ্ডনের লর্ডস মাঠে ইংলণ্ড এবং ভারতীয় ক্রিকেট দলের মধ্যে প্রথম টেস্ট খেলাটি ২৫শে জুন শেষ হইয়াছে। ভারতীয় দল টেস্টে জিতিয়া প্রথমে ব্যাট করেন এবং ২০০ রানে সকলে আউট হয়। মোদী ৫৭ রান করিয়া নট আউট থাকেন। ইংলণ্ড দল প্রথম ইনিংসে ৪২৮ রান তুলেন। হার্ডগ্ৰাফ্ ২০৫ রান করিয়া নট আউট থাকেন; অমর নাথ ৫টি উইকেট পান। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় দল ২৭৫ রান তুলেন। মানকরের ৬৩ রান উল্লেখযোগ্য। ইংলণ্ড দল কোন উইকেট না হারাইয়া ৫৮ রান তুলিলে ভারতীয় দলের রান সংখ্যা অতিক্রম করেন এবং দশ উইকেটে জয় লাভ করেন। ইংলণ্ড দলের বেডসার বোনিংএ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

নর্দাম্পটন দলের সহিত ভারতীয় দলের খেলাটি অসম্যাসিত ভাবে শেষ হয়। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে ৩০৮ রান তুলেন। মার্চেন্ট ১১২ রান করেন। নর্দাম্পটন দল প্রথম ইনিংসে ৩৬২ রান তুলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় দল ১ উইকেটে ১৭১ রান করিলে সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়।

ল্যাক্সার্সার দলের সহিত ভারতীয় দলের খেলায় ল্যাক্সার্সার দল প্রথম ইনিংসে ১৪০ রান তুলেন। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে মাত্র ১২৬ রানে সকলে আউট হন। ল্যাক্সার্সার দল দ্বিতীয় ইনিংসে ১০৫ রান তুলেন। ভারতীয় দল দুই উইকেটে ২০০ রান তুলিয়া ৮ উইকেটে ল্যাক্সার্সার দলকে পরাজিত করেন। মার্চেন্ট ২৩ এবং পাতৌদির নবাব ৮০ রান করিয়া নট আউট থাকেন।

লীগ ফুটবল খেলা—

কলাঘাট দল ৪—১ গোলে কালিকাটাদলকে পরাজিত করেন।

এরিস্থান্স দল ৪—১ গোলে স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলকে পরাজিত করেন।

ইষ্টবেঙ্গল দল ৩—১ গোলে ভবানীপুর দলকে পরাজিত করেন। ইষ্টবেঙ্গল দলের নাথার একনাট ৩টি গোল নিয়া ছাটটুক করেন। নাথার এ পর্যন্ত লীগের খেলায় ৩৩টি গোল দিয়াছেন।

মোহনবাগান দলের সহিত মহম্মেডান স্পোর্টিং দলের খেলা অসম্যাসিত ভাবে শেষ হয়। কোন পক্ষই গোল দিতে পারেন নাই। মোহনবাগান দলের একটি পয়েন্ট নষ্ট হইবার জন্য ইষ্টবেঙ্গল দলের লীগে শীর্ষস্থান অধিকার করিবার সম্ভাবনা রহিল।

ভবানীপুর দলে সহিত মহম্মেডান স্পোর্টিং দলের খেলায় ভবানীপুর দল ১—০ গোলে জয়লাভ করেন। খেলাটি নির্দিষ্ট সময়ের ৪০ সেকেন্ড পূর্বে শেষ হইয়া যায়। খেলার মাঠের মধ্যে দর্শকেরা প্রবেশ করিয়া রেকর্ডকে এবং ভবানীপুর পক্ষের খেলোয়াড়দের মারপিট করে এবং পরে ভবানীপুর ক্লাবের তাঁবুতে ইটপাটকেল নিক্ষেপ্ত হয়।

মোহনবাগান দল ৩—১ গোলে বি, এ, রেল দলকে পরাজিত করিয়াছেন।

ইষ্টবেঙ্গল দল ২—১ গোলে এরিস্থান্স দলকে পরাজিত করিয়াছেন।

স্থানীয় খেলাধুলা—

গত ১লা জুলাই রাজবাড়ীর মাঠে সুধীর মেমোরিয়াল কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা হয়। এই প্রতিযোগিতার অন্যান্য খেলাগুলি শ্রমশান মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনাল খেলায় আনন্দন ক্লাব ও আদর্শ পাঠাগারের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয় এবং আনন্দন ক্লাব ৬—১ গোলে জয়লাভ করে। খেলা শেষে স্থানীয় পুলিশ কমিশনার রায় বাহাদুর জে, এম, চাটার্জি মহাশয় কাপ প্রদান করেন।

কুচবিহার দর্পণের নিয়মাবলী ।

১। কুচবিহার দর্পণের প্রতি সংখ্যার মূল্য চারি আনা ও বার্ষিক মডাক তিন টাকা। বার্ষিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

২। পত্রিকার প্রকাশের জন্য লেখা কাগজের একপৃষ্ঠার স্পষ্টরূপে লিখিয়া সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে। উৎকৃষ্ট লেখার জন্য প্যারাম্বলিক দেওয়া হয়।

৩। অননোনীত লেখা কেবল লইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকেট সহ ঠিকানা লেখা খাম পাঠাইতে হয়; অননোনীত কবিতা কেবল দেওয়া হয় না। অননোনয়নের কারণ বর্ণাইতে সম্পাদক অক্ষম।

৪। অনোনীত লেখা কখন প্রকাশিত হইবে সে সম্বন্ধে সম্পাদক কোনরূপ নিশ্চয়তা দিতে পারেন না।

৫। কুচবিহার দর্পণে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা ১০৮ টাকা; অর্ধ পৃষ্ঠা ৫৪ টাকা এবং সর্গিক পৃষ্ঠা ৩৬ টাকা। কভারে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হার দ্বিগুণ।

৬। টাকাকড়ি সম্পর্কিত চিঠিপত্র নামভেদে নিকট লিখিতে হইবে।

ম্যানেজার কুচবিহার দর্পণ
ষ্ট্রেটপ্রেস, কুচবিহার।

কোচবিহার বাণিজ্য পরিষদের পু পোষকতায়—

১৯১৩ সালে স্থাপিত

কোচবিহারের প্রথম ওয়েবস্টেট ব্যাঙ্ক।

দি

কোচবিহার ব্যাঙ্কিং করপোরেশন
লিমিটেড।

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্যের জন্য বিখ্যাত

বাসায়গণকে মূল বন্ধকে, ওভারড্রাফটে ও ন্যাশ
সিকিউরিটিতে এবং ছাড়োনেটে টাক কড় দেওয়া হয়।

সেভিংস হিসাবে ২ টাকা ও বার্ষিক একাউন্টে
১০ আনা এবং দ্বিবার্ষিক, বার্ষিক ও অর্ধবার্ষিক স্থায়ী
আয়ান্তে যথাক্রমে ৪, ৩ ও ২.৫ টাকা হিসাবে সুদ
দেওয়া হয়। সেভিংসে চেকে টাকা তোলা যায়।

শ্রীমনোমোহন চৌধুরী,

ম্যানেজার।

গ্রামে ও বর্ষায় আরাম প্রদ
—শীতে আনন্দদায়ক—

পাবনার

কেন্দ্র

হোসিয়ারীর

নানা প্রকার হাল কাসানের গেঞ্জী আপনাদের
ভূষি দিবে।

আজাদ সু স্ট্রোস কুচবিহার

ও

হাজি মোবারক আলী মহম্মদ আলী,
দিনহাটা।



আনন্দ সংবাদ—

আপনাদের চির পরিচিত—ইয়াকুবউদ্দিন এণ্ড ব্র দাস
খুব শীঘ্রই জুতা বিভাগ খুলিতেছে

সর্বসাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

নিবন্ধক :— ইয়াকুবউদ্দিন এণ্ড ব্র দাস, কুচবিহার (বাংলা)।

অর্ডার সাপ্লায়াস ও কমিশন এজেন্ট—

হরেন্দ্রলাল পান এণ্ড সন্স

কুচবিহার।

জেনারেল মার্চেন্ট, সর্বজন বিদিত।

আমরা যাবতীয় ষ্টেশনারী আর্টিকেলস ও বেনেডো ময় মদলা পাইকারী ও

খুচরা দরে বিক্রয়ার্থে মজুত রাখি।

—আমুন—

বিশুদ্ধ তামকি প্রস্তুত

স্বাদে ও গন্ধে অভুলনীয়

আপনাদের চির পরিচিত ও আদরণীয়

*** ছাতা বিড়ি ***

পান ককুন।

এজেন্টঃ—গঙ্গাজল হীরালাল সোয়ানী।

কুচবিহার।



দৈনন্দিন দিবা—কুচবিজ্ঞান

কুচবিহার দর্পণ

নবম বর্ষ

শ্রাবণ ১৩৫৩ সন, রাজশক ৪৩৭

৪র্থ সংখ্যা

গোবিন্দদাস

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ, রাব বাহাদুর

‘গোবিন্দ’ নামে কয়েকজন কবি আছেন। বিখ্যাত কবি গোবিন্দদাস সেই জন্ত গোবিন্দ কবিরাজ নামে অভিহিত হন। ১৪৫২ শকে গোবিন্দ কবিরাজ মাতুলালর শ্রীখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা চিরঞ্জীব সেন মহাপ্রভুর একজন পারিষদ ছিলেন। চিরঞ্জীব প্রতি বৎসর রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্ত নীলাচলে গমন করিতেন। পিতার মৃত্যুর পরে গোবিন্দ ও তাহার অগ্রজ রামচন্দ্র পৈতৃক বাগভূমি কুমারনগরে গমন করেন এবং তথা হইতে তেলিয়াবুধরী নামক গ্রামে (মুর্শিদাবাদ জেলার পদ্মা নদীর নিকটবর্তী ভগবানগোলায় নিকট) বাসস্থাপন করেন। গোবিন্দের মাতামহ দামোদর সেন একজন বড় কাব ছিলেন (খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ)। গোবিন্দের মাতার নাম ছিল সুনন্দা। মাতামহভবনে বাস

করিবার কালে গোবিন্দ শাক্তধর্মে আস্থাবান ছিলেন। কুমারনগরেও তিনি এই ধর্মেই ভক্তিমান ছিলেন।

কুমারনগরে বৈসে অতি শুদ্ধাচার।

ভগবতী বিনা কিছু না জানয়ে আর ॥

গোবিন্দ হরনারায়ণের সম্বন্ধে পদও রচনা করিয়াছিলেন।

আমি কনিষ্ঠর আমি বর্ণিষ্ঠর

হৃদয়ে উজোর হার।

আমি বাঘাঘর আমি পট্টাঘর

পিকুন হুঁ উজিয়ার ॥

ন দেবী কামিনী ন দেব কামক

কেবল প্রেমপরকাশ।

গৌরীশঙ্কর চরণ কিঙ্কর

কহই গোবিন্দ দাস।

গোবিন্দ পরে গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হইয়া শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন; এবং তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গোবিন্দ আসন্ন মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। আচার্য প্রভুর শক্তিতে শক্তিমান হইয়া গোবিন্দদাস অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন কবি হইয়া উঠিলেন।

প্রভুর আজ্ঞার বর্ণে গুণে পশ্চে গীত।

সে সব তনিতে কার না দ্রবরে চিত ॥

গোবিন্দের কাণ্ডে শ্রীআচার্য হর্ষ হৈলা।

গোবিন্দে প্রশংসি 'কবিরাজ' খ্যাতি দিলা ॥

কিন্তু বৃন্দাবনের শ্রীজীবপ্রমুখ গোস্বামিগণ এই কবিরাজ উপাধি দিরাহিলেন বলিয়া জানা যায়। গোস্বামিগণের কবি-প্রশংসা এইরূপ:

শ্রীগোবিন্দ কবীন্দ্র চন্দন-গিরেচক্ষু বসন্তানিলেনানীতঃ

কবিতাবলী-পরিমলঃ কুঞ্জেন্দুসংস্কৃতাক্।

শ্রীমজীব সুরাজ্য-পাশ্র্বেজ্জবে ভূকান্ সমুদাদক্

সর্বস্তাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে কিমন্তংপরম্ ॥

গোবিন্দের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া শ্রীজীব তাঁহার সহিত পত্রব্যবহার করিতেন এবং তাঁহার নূতন কবিতা পাঠাইতে অহুরোধ করিতেন। কথিত আছে, রাস দীনার প্রদোবে মদনমোহন মন্দির প্রাঙ্গণে গোবিন্দ কবিরাজকে সমুপস্থিত দেখিয়া শ্রীজীব তাঁহাকে ভগবানের রাসলীলা গান করিতে অহুরোধ করেন। গোবিন্দও গুললিত কর্তে গান ধরিলেন

শরৎ চন্দ পবন মন্দ

বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ

কুমারি মালতী যুথী

মত্ত মধুপ ভোরুণী। ইত্যাদি

পদটিতে ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ীর শ্লোক অতি সুন্দরভাবে বাংলা কবিতার ছন্দে গ্রথিত হইয়াছে।

১৫৩৪ শকে ৭৫ বৎসর বয়সে গোবিন্দ কবিরাজ দেহত্যাগ করেন। গোবিন্দ কবিরাজের প্রতিভা সর্ববাদিসম্মত। তাঁহার নাম ভক্তমাল (কৃষ্ণদাস বাবাজিকৃত), প্রেমবিলাস (নিত্যানন্দ দাস), ভক্তি-রত্নাকর (নরহরি চক্রবর্তী), নরোত্তমবিলাস (ঐ) এবং শ্রীনিবাসচরিত প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। গোবিন্দের বন্দনাগীতে বৈষ্ণবকবিতা সুখর।

জয় কবিরাজ- রাজ রস সাগর

শ্রীমুত গোবিন্দ দাস।

ঐছন কতিহঁ না হেরিয়ে জিহ্বানে

প্রেম মুরতি পরকাশ :

বাকর গীতে সুধারস বরিষয়ে

কবিগণে চমকয়ে চীত ॥

তনহৈতে গব খর্ব তব হোয়ত

ঐছন রসময়গীত ॥—বৈষ্ণব দাস

বাগ্বেদী বাহার ধারে দাসীভাবে সদা ফিরে

অলৌকিক কবি-শিরোমণি।—বল্লভ দাস

এইরূপ বহু বন্দনা আছে। ইহা হইতে উপলব্ধ হয় যে গোবিন্দ দাস কবিত্বের জন্য বাংলাদেশে ও তাঁহার বাহিরে অসামান্য যশঃ লাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ গোবিন্দ দাসের কবিতার ভাষা ভাবসমৃদ্ধ, অলঙ্কারমণ্ডিত, ছন্দ-মাধুর্য-সম্যাক্ত ও ভক্তধারানিষ্ঠ কবিতা বৈষ্ণব সাহিত্যে দুর্লভ।

গোবিন্দ সাধারণতঃ ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করিতেন। বিজ্ঞাপতির ভাষায় অহুরোধে কে-ব্রজবুলি ভাষায় সৃষ্টি হইল, তাহার পথিকৃৎ গোবিন্দ দাস না হইলেও তিনি যে সেই ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি, সে বিষয়

মতভেদ নাই। সংস্কৃত কবিতা বুঝিতে হইলে যেমন
আর্যাস স্বীকার করিতে হয় গোবিন্দ দাসের ব্রজবুলি কবিতা
বুঝিতে হইলে সেইরূপ আর্যাস স্বীকার করিতে হয়।
ইক্ষুর স্তার চর্চণ করিতে করিতে রসের মিষ্টত্ব অধিক হইতে
অধিকতর মাত্রায় লাভ করা যায়। বৈষ্ণব কবিতা
যে এই ব্রজবুলি ভাষা পছন্দ করিতেন, তাহার কারণও
বোধ হয় এই যে, সংস্কৃত কবিতার মত ইহার অলঙ্কারচ্ছটা
এবং ভাববৈচিত্র্য উপলব্ধির গাঢ়তা অনুসারে উপভোগ্য
হয়।

ও মুখমণ্ডল ত্রিতি শরদ সুধাকর

তরুণচি তরুণ তমাল। ইত্যাদি

শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর মুখশ্রী শারদচন্দ্রকে জয় করিয়াছে, তাঁহার
অলঙ্কারি তরুণ তমালবৃক্ষকে জয় করিয়াছে—ইহা চোটা না
করিলে বা কেহ বুঝাইয়া না দিলে বুঝিতে পারা যায় না।

দরশনে লোর নয়ন যুগ কাঁপ।

করিতে কোর ভুজযুগ কাঁপ ॥

চেতন না রহ চুখন বেরি।

কোজানে কৈছে রভস রসকেলি ॥

সখীরা বলিতেছেন :

হাম সব নিজজন কহসি রাতিদিন

সো সব বুঝলু আজে।

তুমি আমাদের মরমী সখী বলিয়া গণনা কর। কিন্তু
এই কি তাহার পঙ্কির? অর্থাৎ তুমি কৃষ্ণের সহিত যে
প্রেম করিতেছ সে কথা আমাদের কখনও বল না।
কিন্তু আমরা তোমাকে আজ হাতে নাতে ধরিয়া ফেলিয়াছি।

লহ লহ মুচকি হাস চলি আওলি,

পুন পুন হেরসি কেরি

জুহু রতি পতি সঞে যৌলল রতনভূমে

এছন করল পুছেরি।

তুমি মুচকি মুচকি হাসিয়া চলিয়া আসিতেছ আর বারে
বারে পিছনে চাহিতেছ ; মনে হইতেছে রতনভূমে রতি আর
অনন্দের অভিনয় চলিতেছে। সেই ক্ষণ জিজ্ঞাসা করি :
ব্যাপার কি? শ্রীমতী তাঁহারই উত্তরে বলিতেছেন : সখি,
তোমরা আমাকে মিথ্যা দোষ দিতেছ। আমি যখন
তাঁহাকে দর্শন করি, তখন অশ্রু আমার দর্শনে বাধা
জন্মায়, চোখের জল কাঁপিয়া আসে। যদি আলিঙ্গন
করিতে বাই, তাহা হইলে আমার ভুজযুগ কম্পিত হয়।
(মনে হয় আমি এখনই মূচ্ছা প্রাপ্ত হইব)। চুখনের
সময় আমার চেতনা থাকে না। আর রসকেলি যে
কেমন তাহা কে জানে? সুতরাং আমি কেমন করিয়া
তোমাদিগকে সে মিলনের রহস্য বুঝাইব? নিজে বুঝিলে
তো পরকে বুঝানো যায়?

কানুক পরশে বতহ' অনুভাব।

সমুঝই আপে পরক সমুঝাব ॥

ব্রজবুলির আদর্শ যে মৈথিল ভাষা সে সম্বন্ধে সন্দেহ
নাই। গোবিন্দদাসের কাব্য বিদ্যাপতির প্রভাব
সর্বাপেক্ষা বেশী। বিদ্যাপতির ছন্দোবৈচিত্র্য, বিদ্যাপতির
অলঙ্কারপ্রিয়তা, বিদ্যাপতির ভাষা গোবিন্দ দাস
সর্বাপেক্ষা বেশী প্রাথমিক করিয়াছেন। বিদ্যাপতির
পদের ভাবাবলম্বনেও গোবিন্দদাস অনেক কবিতা লিখিয়া-
ছেন। বিদ্যাপতি লিখিলেন :

আধ নরন কএ তহকর আধ।

কত না সহিব মনসিজ অপরাধ ॥

নরনের অর্ধেক করিয়া তাহারও অর্ধেক অর্থাৎ ঈষৎমাত্র
কুককে দেখিলাম। সখি, আমি মদনের অত্যাচার আর
কত সহিব?

গোবিন্দদাস মিথিলেন

আধক আধ আধ মিঠি অঞ্চলে

যবধরি পেখলু কান ।

কতশত কোটি কুসুমশরে ভারল

রহত কি বাত পরাণ ॥

অর্ধেকের অর্ধেক, তারও অর্ধেক নয়নে অর্থাৎ দৃষ্টির
কোণে যে অবধি কৃষ্ণকে দেখিলাম, সেই অবধি কত শত
কোটি কুসুমশরে আমাকে ভর্জরিত করিতেছে—এখন
আমার প্রাণ থাকে কি বার, সংশয় হইয়া পড়িয়াছে ।

সজনি জানলু বিহি মোহে বাম ।

হুঁ গোচন ভরি যো হরি হেরই

তছু পারে মঝ পরণাম ॥

সখি, আমি জানিলাম যে বিধাতা আমার প্রতি প্রতিকূল ।
ঈষৎ অপানদৃষ্টিতে হরিকে দেখিয়া আমার এই বশা,
হৃদয় হ্রস্বন ভরিয়া যে হরিকে দেখিব, সে সৌভাগ্য
আমার ভাগ্যে বিধাতা লেখেন নাই । হ্রস্বন ভরিয়া যে
হরি-দর্শন করিতে পারে, তাহার পারে আমার প্রণাম ।

গোবিন্দদাসের ব্রজবুলি পদ দেখিয়া কেহ কেহ মনে
করিয়াছেন যে, এই পদগুলি মিথিলার কবি গোবিন্দ দাস
কাঁর রচিত । নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই মতবাদ প্রচার
করিয়াছিলেন । কিছুদিন পূর্বে এই ঋ কবির পদ-সংগ্রহ

বারবৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । উহাতে বঙ্গের
অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাসের উৎকৃষ্ট পদগুলি স্থান
পাইয়াছে । কিন্তু গোবিন্দদাস ব্যতীত আরও বহু
বৈষ্ণব কবি ব্রজবুলিতে কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন ;
যথা জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, ঘনশ্যাম দাস প্রভৃতি ।
ইহাদেরও ক্ষুদ্র মিথিলা-প্রবাসের ব্যবস্থা করিতে
হইবে নাকি ? গোবিন্দদাসের ব্রজবুলি পদ গীতি-কাব্য-
সাহিত্যে অতুলনীয় । মিথিলার গোবিন্দদাস বা যে
একজন প্রথম শ্রেণীর কবি ছিলেন, তাহা ত কেহ প্রমাণ
করিতে পারেন নাই । গোবিন্দদাসের যে সকল গৌর-
চন্দ্রিকার পদ আছে, তাহাও ব্রজবুলিতে রচিত । বলা
বাহুলা যে, মিথিলার কোনও কবির এইরূপ গৌরচন্দ্রপ্রীতি
হওয়া সম্ভবপর নহে । গোবিন্দদাসের যে সকল বাংলা
পদ আছে, তাহাও উচ্চ শ্রেণীর । যথা—

এইত মাধবীতলে আমার লাগিয়া পিয়া

যোগী বেন সতত ধোয়ার ।

অথবা, ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি

অবনী বহিয়া যায় ।

এই সকল পদ ও ব্রজবুলিপদ যে একই কবির লেখা,
তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না ।

অতীত ও রবীন্দ্রনাথ

ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত এম্-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ্-ডি

সংসার প্রবাহের ভিতরে 'নতুন কাল'র ঠিক রূপটি
কি—সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,

কোন সে কালের কণ্ঠ হতে এসেছে এই স্বর—
“এপার গঙ্গা, ও পার গঙ্গা, মধ্যখানে চর।”

(নতুন কাল, স্ফুটি)

একদিকে অতীতের গঙ্গা—অন্যদিকে ভবিষ্যতের গঙ্গা—
আর মাঝখানে জাগিয়াছে বর্তমানের চর। জলের
উপরিভাগে এ-চরের যে পরিধিটুকু একবারে চোখে
পড়িতেছে—তাহাই চরের সবটুকু কথা নহে,—অতীতের
গঙ্গা—ভবিষ্যতের সম্ভাবনার গঙ্গা—ইহাদের জলের
ভিতরে নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে তাহার ভিত।

কোনো যুগই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নহে ; সে যদি
আত্মসম্পূর্ণ হইত তবে তাহার একটা স্পষ্ট অবসানও
ঘটিতে পারিত ; কিন্তু মানুষের সাধনা কালের সমগ্রতা
জুড়িয়া ; এক যুগের সাধনার অপূর্ণতা অপেক্ষা করে
পরবর্তী যুগের সাধনাকে—এইখানেই একের সহিত অপরের
নিরবচ্ছিন্ন যোগ—এইখানেই বিশ্ব-জীবনের অখণ্ডতা।
তাই অতীত কাল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

সেই ভালো প্রতি যুগ আনে না আপন অবসান,
সম্পূর্ণ করে না তার গান ;

অতৃপ্তির দীর্ঘ-শ্বাস রেখে দিয়ে যার সে বাতাসে।

তাই যবে পরযুগে বাশির উচ্চাশে

বেজে ওঠে গানখানি

তা'র মাঝে সুদূরের বাণী

কোথার নুকারে থাকে, কি বলে সে বুঝিতে কে পারে।

(অতীত কাল, পূর্ববর্তী)

এই যে দেশকালকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বজীবনের
সহিত অখণ্ডযোগ—রবীন্দ্রনাথ সে সত্যটিকে জীবনের
সর্বক্ষেত্রে এত গভীরভাবে অনুভব করিয়াছেন যে, তাহার
ব্যক্তি-সত্তাকেও তিনি একটা বর্তমানের 'আমি-সত্তা'র
ভিতরে সোমাবদ্ধ করিয়া দেখিতে পারেন নাই। এই
'আমি'র জীবন-ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে বহু পূর্বে—সেই
সুদূর অতীতের অন্ধকারের ভিতরে পুঞ্জীভূত হইয়া
রহিয়াছে তাহার অগ্রসরণের অভিসার কাহিনী। আমরা
ভাবি, এই জীবনের বত কলা—বত চলা—বত কলা—
তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে শুধু একটি এ-জীবনের আমি—
যে আনির ইতিহাস রচনা করিয়াছে আমার জন্ম—অবসান
যটাইবে আমার মৃত্যু।

আমি ভাবি মনে মনে তাহারে কি জানি

যাহার বলার মোর বাণী,

যাহার চলার মোর চলা,

আমার ছবিতে যার কলা,

যার সুর বেজে ওঠে মোর গানে গানে,

সুখে দুখে দিনে দিনে বিচিত্র যে আমার পরাণে।

ভেবেছিলাম আমাতে সে বাঁধা,

এ প্রাণের বত হাসা কাঁদা

গভীরে দিয়ে মোর মাঝে

ঘিরেছে তাহারে মোর সকল খেলার সব কাজে।

ভেবেছিলাম সে আমারি আমি

আমার জনম বেয়ে আমার মরণে যাবে থামি।

কিন্তু পরক্ষণেই আসল সত্যটি কবির নিকটে উন্মোচিত
হইয়াছে—

জানি তাই, সে আমি তো বন্দী নহে আমার সীমার,
পুরাণে বীরের মহিমার
আপনা হারায়ে

তারে পাই আপনাতে দেশকাল নিমেষে পারায়ে।

সে আমি ছায়ায় আবরণে
লুপ্ত হয়ে থাকে মোর কোণে
সাধকের ইতিহাসে তারি জ্যোতিষ'র
পাই পরিচয়।

যুগে যুগে কবির বাণীতে
সেই আমি আপনাতে পেরেছি জানিতে।

... ..

এই আমি যুগে যুগান্তরে
কত মূর্তি ধরে।

কত নামে কত ভ্রম কত মৃত্যু করে পারাপার
কত বারম্বার।

ভূত ভবিষ্যৎ লয়ে বে বিরাট অঞ্চল বিরাজে
সে মানব মাঝে

নিঃসৃত দেখিব আজি এ আশিরে
সর্বত্র গাশীরে।

(আমি, পরিশেষ)

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জুড়িয়া বে বিরাট অঞ্চল
মানব-সত্তা তাহার সহিত ঐক্যাব্যবোধে বড় প্রতিভার—
বড় 'আমি'র লক্ষণ; এই বিরাট অঞ্চল হইতে যে বিচ্ছিন্ন
সেই ছোট। দৈনন্দিন যে আত্মকেন্দ্রিক কর্মস্রষ্টার
তিষ্ঠা। জীবনের এই অঞ্চলতা হইতে বিচ্ছিন্ন
ই একটি বিশেষ ক্ষমতা যাহা অবচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র আমি
ভিতরে নিরন্তর সঞ্চিত হইয়া পড়িতেছি তাহার ভিতর,

দ্বিগুণে আমাদের জীবন হইয়া উঠিতেছে লৌকিক; এই
লৌকিক রাজ্যে প্রতিভার স্থান নাই; যেখানে আমরা
বৃহত্তর সঙ্গে যোগে বড় হইয়া উঠিয়াছি সেইখানেই
আমরা লোকান্তর—সেইটাই প্রতিভার রাজ্য। রবীন্দ্র-
নাথ ছিলেন সেই জাতীয় লোকান্তর প্রতিভা—বিশ্ব-
জীবনের সহিত তাঁহার ব্যক্তি জীবনের যোগও ছিল তাই
নিবিড়তম। অতীত জীবন তাই তাঁহার নিকটে মৃত
নয়—সে নীরব গভীর; বাহিরে সে আজ কথা বলে না,—
আজ 'কলকল ভাষ নীরব তাহার', 'তরঙ্গহীন ভীষণ
মৌন',—কিন্তু তাহার মৌনবাণীর মুখরতা জাগিয়াছে,
অস্তরের গভীরে—

কথা কও, কথা কও।

স্তব্ব অতীত, হে গোপনচারী, অচেতন তুমি নও,

কথা কেন নাহি কও।

তব সঞ্চার শুনেছি আমার মর্মের মাঝখানে,
কত দিবসের কত সঞ্চর রেখে বাও মোর প্রাণে।

হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে

কাজ ক'রে বাও গোপনে গোপনে,

মুখর দিনের চপলতা মাঝে স্থির হ'রে তুমি রও।

হে অতীত, তুমি গোপনে হৃদয়ে কথা কও, কথা কও ॥

(অতীত, কথা)

অতীতের এই অদৃশ্য সক্রিয় রূপটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ
তাঁহার কবিজীবনে বহুবার সচেতন হইয়া উঠিয়াছিলেন;
বহুবার তিনি বহুভাবে অনুভব করিয়াছিলেন তাঁহার
শিল্পমনের নিলীর্ণমান উপচ্ছায়ার অতীতের অদৃশ্য
শক্তিকে। 'গহন-গোপন সঞ্চারিণী' এই অদৃশ্য শক্তি
যে রবীন্দ্রনাথের 'অন্তর্ধামী'র ভিতরে কিতাবে কতটুকু
শক্তি-সঞ্চার করিয়াছে আজ আর সে-কথাও পাই

করিয়া বৃষ্টি ওঠা সহজ নহে। জীবনের সম্মুখ
কবি অমৃতব করিয়াছিলেন, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে
অতীতের শূন্যে অবলুপ্ত হইতেছে সেখানে তাহার
একেবারে হারাইয়া বাইতেছে না—বাহিরের স্থূল রূপ
শুধু মনোময় রূপে পরিণত হইতেছে।

রূপময় বিশ্বধারা অবলুপ্ত প্রায়
গোধূলি ধূসর আবরণে,
অতীতের শূন্য তার সৃষ্টি মেলিতেছে মোর মনে।
এ শূন্য তো মরুমাত্র নয়,
এ যে চিত্তময়
বর্তমান যেতে যেতে এই শূন্যে বায় ত'রে রেখে
আপন অন্তর থেকে
অসংখ্য স্বপন,
অতীত এ শূন্য দিয়ে করিছে বপন
বস্তুহীন সৃষ্টি যত,
নিত্যকাল মাঝে তারি ফল শূন্য ফলিতে নিয়ত।
(অতীতের ছায়া, বীথিকা)

কবির অমৃতভূতিতে অতীত তাই নিরাসক্ত শিল্পী—
অরুণকারের ভিতর দিরাই নূতন কালের আকাশে কত
উজ্জল তারকা ছড়াইয়া দিতেছে ; নূতন কাল তাহার
অনেকগুলিকে সাদরে গ্রহণ করিতেছে—কতগুলিকে
আবার অশাস্ত ফুৎকারে নিভাইয়া দিতেছে।—

হে অতীত,

শাস্ত তুমি নির্বাণ-বাতির
অরুণকারে,
সুখ-দুঃখ-নিকৃতির পারে।
শিল্পী তুমি, আধারের ভূমিকায়
নিভতে রচিছ সৃষ্টি নিরাসক্ত নিম্ন ম কলার,
অরণ্যে ও বিশ্বরণে বিগলিত বর্ণ দিয়া লিখা
বর্ণিতেছে আধ্যাত্মিক ;
পুরাতন ছায়াপথে নূতন তারার মতো
উজ্জলি উঠিছে কত,
কত তার নিভাইছে একেবারে
যুগান্তের অশাস্ত ফুৎকারে।
(অতীতের ছায়া, বীথিকা)

ঠাই

ডাঃ শ্রীনীলাল দে

হীনতার পাকল কলুষ আসনে,
আত্মার নহে সুখ, বিচিত্র বসনে।
অমলিন প্রাণিহীন দীনের ভবনে
হয় তবু সুখ তার, প্রিয় ভ্রমাবনে।

স্বরূপ

ডাঃ শ্রীনীলাল দে

এ নয়ন নহে প্রকৃত নয়ন
অন্তরের অন্তরালে রয়েছে গোপন।
বাহিরের অপরূপ নহে এই মন
স্বরূপ প্রকটে যবে স্বার্থ প্রয়োজন।

অব্যাহতি

শ্রীরমেন মৈত্র

ক্রমাগত তিনদিন ধরিয়া ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছি। অফিসে Sick Report করিতে হইয়াছে। এখন নিশ্চিতে কামাই করা ছাড়া অন্য কোন কাজ নাই। কুইনাইনের পুরিয়া খাও আর পড়িয়া থাক।...বাহিরে অনেকগুলি পায়ের শব্দ হইল।

“এটা কি অধর বড়ালের বাড়ী?”

দেখিলাম আগন্তুক একদল মহিলা। কহিলাম, “আজ্ঞে হ্যাঁ, ভেতর দিকে বান।”

দ্বিতীয় কথা না বলিয়া মহিলারা সোজাসুজি অন্তরমহলে ঢুকিয়া পড়িলেন। সামনের খোলা ইংরাজি পত্রিকাখানার ক্রসওয়ার্ড পাজল্‌এ মন দিলাম।

মাসাধিক কাল ধরিয়া দেখিতেছি ভাগ্য আমার অত্যন্ত অপ্রসন্ন। ক্রসওয়ার্ড করিয়া করিয়া হারান হইয়া পড়িয়াছি, অর্বাগম হয় নাই। অফিসের সহকর্মী তারিণীর পাল্লায় পড়িয়া রেস্ খেলিয়া বার কয়েক হারিয়া গিয়াছি। ম্যালেরিয়ায় অস্থি চর্মসার হইতে চলিয়াছে। পরিচিত ভদ্রলোকের কাছ হইতে কুইনাইনের বড়ি কিনিয়া খাইয়া ঠকিয়াছি। কুইনাইনের বড়ির সহিত আকারগত সাদৃশ্য থাকিলেও আসলে খড়িমাটীকে ক্রবৎ তিক্ত করিয়া কাজে লাগানো হইয়াছে। বিক্রেতার ভাষায় অব্যর্থ কলপ্রদ। রানীগঞ্জের Branchএ বদলি হইবার জন্য উইল্কিন্সন্‌ সায়েবকে এক অনুনয়-পত্র দিয়াছি। তাহার উত্তর এখনও মিলে নাই। আশাশ্রয় উত্তর হয়ত আসিবেও না। এখন টিউসানি দুইটা না গেলেই বন্ধ। কেরানীগিরির

পারিশ্রমিক পরতাল্লিশ টাকা প্লাস শিক্ষকতার দক্ষিণা পঁচিশ ইঞ্চ ইকুয়াল টু সত্তর—মাইনাস ঘবভাড়া পঁচিশ হোটেল পঁচিশ। তাহার উপর কুইনাইন, ডাক্তার, সখ ও সৌধীনতা। ক্রসওয়ার্ডে মন দেওয়া ছাড়া উপায় নাই, উপায় নাই। আর অপেক্ষা ব্যয় বেশী।

—মিঃ বড়াল বাড়ী আছেন?

মুখ তুলিয়া দেখিলাম সারেবী পোষাক-পর্য এক ছোকরা। কহিলাম, “আছেন, ভেতরে।”

অধর বাবু তপুয় বেলায় কোথাও বড় একটা বাহির হন না। এখন তাঁর বাড়ী থাকাই সম্ভব। ছোকরা চলিয়া গেল। সম্ভবতঃ অধরবাবুর কারবারের অংশীদার।

জানালা দিয়া অপৰ্য্যাপ্ত ধূলা আসিতেছে। বাস ও নরীর উৎপাতে ধূলায় প্রত্যহ এইভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া থাকে। জানালা বন্ধ করিবার কোন উপায় নাই। দুইটা জানালার দুইটা পর্দাই আছে মাত্র। ম্যালেরিয়া হইবার কারণ কতকটা আন্দাজ করিতে পারি। বোতল বোতল ঔষধ খাইলে হইবে কি? ধূলায় গতি বোধ করিবে কে?

ভিতর হইতে অধরবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কাকে চাই?

—মিঃ বড়ালকে।

—আমিই। আমিই মিঃ অধর বড়াল। কি চাই বলুন।

—আপনার কাছে এর আগে একদিন এসেছিলাম চাকরীর জন্যে।

—চাকরীর জন্য ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার আজকে আসতে বলেছিলেন।

—হবে।

—আপনার কারখানার ইলেকট্রিক মেশিনের দরকার ছিলো।

—ও, হ্যাঁ। তা সে তো ভর্তি হয়ে গেছে।

—ভর্তি হয়ে গেছে ?

—সে কবে ! আর নাকি ? একখানা Application করে পাঠিয়ে দিও।

—আচ্ছা।

ঘর হইতে অন্তরমহলের প্রতি কথাটি শুনিতে পাই। খানিকক্ষণ নিশ্চিন্তে শুইয়া থাকিব তাহারও উপায় নাই। গোলমাল লাগিয়াই আছে। আগ্রাণ চেষ্টা করিয়াও কলিকাতা সহরের মত কারাগার দ্বিতীয় আশ্রয় সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সার্বোপায় পোষাক-পরা ছোকরা চাকরীর উমেদারী করিতে আসিয়া ক্রমশঃ দিয়া যুগ্ম মুহুরিতে মুহুরিতে বাহির হইয়া গেল।..... ক্রসওয়ার্ডের শব্দ লইয়া হাবুডু বধিতে বধিতে আমি এদিকে প্রাণান্ত।

—ওলো আবাগী কাঠ কয়লা দিবে আঁচড় কাটতে নেই। অন্তরমহলের গৃহকর্তার কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসে।

—হুপুর বেলায় গালমন্দ দিচ্ছ কেন গা বোমা ?

—গৃহকর্তার খাণ্ডারী প্রতিবাদ করিয়া ওঠেন। ছেলে-মেয়েদের কণ্ঠস্বরও শোনা যায়। আরও অনেক কণ্ঠ শুনিতে পাইতেছি। বোধ হয় কিছুপূর্বে যাহারা মধ্যাহ্ন বিহার করিতে আসিয়াছেন, তাহাদের। খাণ্ডারী গরম স্নান করিয়া দেন।

—বড় মেয়ে এখানে কি আর আছে গা। কি যে রোগে ধরলে তাকে উঠে হেঁটে আর বেড়াতেই

পারতো না। ডাক্তাররা সব বললো ‘পাহাড়ে পাঠিয়ে দাও।’ মেয়ের জ্বর ছাড়ে না। শরীরে নেই এক ফোটা রক্ত। কাসলে রক্ত পড়ে। রোজ একশো টাকা খরচ। রোজ একশো টাকা ! তার ওপর গত বছরে বড় ছেলের মেয়েটা মারা-ই গেলো। তাও চিকিৎসা করতে কাড়ি কাড়ি খরচ হ’লো। খরচের কি আর অন্ত আছে গা ? বলি, হ্যাঁ-বোমা, পদ্ম কোথায় ?

—দেখুন ওপরের ঘরে আছে হয়তো।

—পদ্ম কে—?

‘তুই অবাক করলি নন্দরাণী। পদ্মকে মনে নেই। মেজো মেয়ে.....রূপে গুণে একেবারে লক্ষ্মী সরস্বতী। ‘অ’ আমার পোড়া কপাল। নন্দর কথা শোন বোমা।’ বলিয়া একটু থামেন, তারপর আবার বলিয়া চলেন, ‘মেয়েদের মধ্যে ওই-ই বা দেখতে শুনে ভালো। আর হবেই না বা কেন ? বাপের নজরটা কেমন দেখতে হবে তো। বিনিতি স্থলে মেয়েকে পড়ানো থেকে শুরু করে, নাচ, গান, ব্যায়াম, থিয়েটার কিছু কি আর বাদ আছে ? বাড়ীতে মাষ্টার রেখে গান শেখানো। গানের মাষ্টারই মাসে মাসে মাইনে নিচ্ছে পঞ্চাশ টাকা। তার ওপর তোমার গির্মে পড়ার মাষ্টার আছে, ইস্কুল আছে। তারপরে সাড়ী, সেমিজ, ব্লাউজ, হাতের বড়ি, রং-বেরংএর জুতো, রকমারি ছাতা, কলম, ক্যামেরা। পদ্মসা খরচের কি আর শেষ আছে। তাইতো আমি অধরকে বলি যে মেয়েকে বা শিক্ষা দিচ্ছে। কিয়ের পর খণ্ডর-বাড়ী বেতে চাইলে হয়।’

সমবেত মহিলারা হাসিয়া উঠিলেন।

—দুটো পরস দেবে গা বাবা। অপরিচিতা এক ভিক্ষুক রমণী।

—দেবে দুটো পরস?

—এ বাড়ীর মালিক আশ্বিনই। ভেতরে যাও।

দেখিতেছি ইহারা দল বাধিয়া বহুপরিকর হইয়াছে যে বাজে কাজে আমাকে একেবারে মাথা ঘামাইতে দিবে না।

—তিনটে বাজলো বোমা, ওষুট্টা দাও। অশ্বিনের অশ্বখে চোখে কাণে কিছু কি দেখবার উপায় আছে। ভালোমনে দুটো যে মুখে দোব তারও উপায় নেই। বুক পেট সব অশ্বনি দম্‌দম। ওষু তো খাচ্ছি বাপু, মাহলিও নিলুম, কবরেজও দেখালুম। এবে কিছুতেই কিছু হয় না। অশ্বর শেষকালে কোন সাহেব বাড়ী থেকে পর্যটন টুকা খরচ করে বিলিতি ওষু কিনে দিলে। অশ্বের মত পরস খরচ। সামনে আবার শুনি নাতবোঁয়ের বড় ভাইয়ের বে। ওগো বোমা, ওগো পদ্ম, বেঁর জন্তে নতুন কাপড় জামা কি কি কেনা হয়েছে একবার নিয়ে আসনা দেখি। নন্দরাণীও দেখুক। কাল রাত্রে ভালো করে কি কিছু দেখতে পেরেছি ছাই। এ্যাশ্বিন চশমার দরকার হয়নি। এখন আবার চশমা ছাড়া দেখতেই পাই না। তা অশ্বরের সবতাতেই বাড়াবাড়ি! বললুম 'দে বাপু সামাসিদে একটা চশমা', তা নয়, কোথেকে সোনার ক্রেমের এক চশমা নিয়ে এসে হাজির। এই যে বোমা—অশ্বর কাল কি রকম জামা কাপড় কিনে এনেছে জানো তো দেখি একবার। সঙ্গে চশমাটাও এনে।

—এই মাসী ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস!

আমি ভিখরি বাছ।

—ভিখরি না চোর!

সহসা দরজা খোলার শব্দ হইল। চুকিল ঘোঁতা, পদ্মর ছোট ভাই। কহিল 'দিদি এই চিঠিখানা দিলো। বললে আজকে পোষ্ট কোরে দেবেন।'

—আজকেই?

ভিতর হইতে ঘোঁতার দিদির গলার আওয়াজ পাওয়া গেল—'খোকা, বলে দে চিঠিখানা খুব দরকারী আজকেই বেন যায়।'

ইতিপূর্বে খোকা মারফৎ তাহার দিদির অনেক চিঠিই পোষ্ট করিয়া দিবার জন্ত পাইয়াছি। সম্ভবতঃ এতক্ষণ ধরিয়া সে বাহিরে দাঁড়াইয়া একথাটাই বলিবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। সম্ভবপণে জানালা দিয়া একবার উকি দিলাম। ভুল হয় নাই। সত্যই সে দাঁড়াইয়া আছে।

—আজকেই পোষ্ট করে দোব'ধন।

কথা শুনিয়া পদ্ম আর দাঁড়াইল না। হঠাৎ অন্তর্হিতা হইল। ঘোঁতাকে লইয়া পড়িলাম।

কথা কহিবার লোকের দরকার।

—তোমার দিদির পায়ে লাগলো কি করে?

খোকা হাসিয়া উঠিল 'দুর্ লাগবে কেন? দিদি তো খোঁড়া। আমরা কত রাগাই।'

—খোঁড়া বলোকি। সেই জন্তেই বুঝি দিনরাত পাউডার মেখে বসে থাকে বাড়ীতে?

—আমিও পাউডার মাখি। কোটা, ট্যালকম্ এই সব। দেখেছেন কখনও?

পদ্মর চিঠিখানা বিছানার উপর পড়িয়া রহিয়াছে। খামের উপর সেই পরিচিত গোবিন্দ পোদ্দারের নাম ও ঠিকানা লেখা। জরুরী যে তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

—খোকা—মা ডাকছেন, ওপরে চলে এসো।

খোকা উঠিল।

—ঐ দিদি ডাকছে। আমি বাই, চিঠিখানা রইল।

খোঁতা ওরকে খোকা চলিয়া গেল। সেলফ্ হইতে ডিক্সনারি পাড়িয়া ক্রসওয়ার্ডে আবার মন দিলাম। অর্থের অত্যন্ত আবশ্যক। যে ভাবে কামাই করিতেছি সে হিসাবে যদি মাহিনা বাদ যায় তাহা হইলে—

—হ্যাঁ গা বাবা দু'টো পরস দেবেনি গা? আবার সেই ভিক্ষুক রমণী। জাগাতন।

—পরসাওলা-র মেয়ে কি বলে গেলো শুনলে না?

—আমি তো চুরি করতে আসিনি মাণিক।

—বেশ নিরে যাও পরস। একটা উইল্‌স্ সিগারেট নাম দু'পরস। তা জানো?

—কি বন্‌ছে বাবা।

—ভাগো আর দাড়িয়ে না। বাড়ীর কঠা দেখতে গেলে হৈ হৈ করে উঠবে। উল্টে পরস। দিবে যেতে হবে তখন।

উপায় নাই, উপায় নাই। নির্কিয়ে আর্থিকসমস্যার যে সমাধান করিব তাহারও উপায় নাই। কাজ করিতে বসিয়াছি তো সংগে সংগে বাধা ও বিপত্তি। পথের ধারে ঘর হওয়ার যে কী অসুবিধা তাহা মর্মে মর্মে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করিতেছি। বেগার খাটিয়া খাটিয়াই জীবনের অর্ধেক কাটিয়া গেলো। এ গৃহ হইতে কবে যে নিষ্কৃতি পাইব তাহাও জানি না। নিরক্ষর অর্থ-বানের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবন যেন দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছে।

অন্দরমহলে কঠার ঘরে ফোন বাজিয়া উঠিল।

—বলি অ বোমা, কোথায় যে বাইশকোপ না ঠিয়েটার যাবার কথা ছিলো তোমাদের।

—তার এখন কি মা? সে তো সে-ই সকালের সময়।

—ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবে যে!

—মোটরে বাবো মোটরে আসবো, ঠাণ্ডা লাগবে কি করে?

—বা ভালো বোর করো বাছা। বলি অসুখ কমলানেবুর রস পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

—হ্যাঁ।

—ওলো অ পদ্ম, দু'চারখানা ঠাকুরদেব নাম করবি আর দিকিন। ঘরের মধ্যে কি যে দিনরাত বই মুখে করে বসে থাক! এই খোকা ডাক তোর দিদিকে। পদ্মর রামপেরসাদি গান বুঝি শুনিসনি নন্দরাণী?

উত্তরে নন্দরাণী কি বলিল তাহা শুনিবার পূর্বেই বনমালীর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

—আজ কেমন আছেন?

—একটু ভালো।

—জর কমেছে?

—কমছে আর বাড়ছে। বাড়ছে আর কমছে। কপালে ভোগান্তি আছে বুঝলে না?

—এখন কি করছেন।

—কিছু না, ঘুমোবার চেষ্টা করছি।

—তাহলে এই মণি-অর্ডারটা লিখে দিন দিকিন। আদিকাও দাস, পাটামুণ্ডাই, কটক—

—থাক, থাক ও তো আমি জানি।

বনমালী বাড়ীওয়ালার পাচক। বাড়ী উড়িয়াতে। বাংলায় থাকিয়া থাকিয়া বান্দালী বনিয়া গিয়াছে। আদিকাও দাসের নামে তাহার বহু মণি-অর্ডার ইতিপূর্বে করিয়া দিয়াছি। ঠি ঠানাটা মুখস্থ হইয়া গিয়াছে।

—কুইনান খেয়ে উপকার কিছু হোল বুঝছেন?

—কুইনানটা তোমার খড়িমাটিতে ভর্তি।

—খড়িমাটি? বলেন কি? বড় কঠার দোকানের যে?

—অধরবাবু কি আজকাল কুইনাইনেরও কারবার করছেন ?

লুকিয়ে লুকিয়ে। কাউকে বলবেন না যেন। বনমালী আর দাঁড়াইল না। পোষ্ট-অফিসে নাকি তাড়াতাড়ি না যাইলেই চলবে না।

রেজাসের টিকিট কিনিলে কেমন হয় ! ফাষ্ট প্রাইজ না হোক অন্ততঃ সেকেন্ড প্রাইজ বা ঐরূপ কিছু, কিংবা যদি রাণীগঞ্জের অফিসে তাহাকে কালই পাঠাইয়া দেওয়া হয় ? তাহা হইলে ? তাহা হইলে আর বাহাই হউক অর্থোপার্জনের জন্য চিন্তা করিতে হইবে না। কলিয়ারি অঞ্চলে পথে ঘাটে নাকি পরসা ছড়ানো।

ভালো করিয়া বসিবার চেঁচা যত করিতেছি কাপড়টা তত ছিঁড়িয়া যাইতেছে। পুরাতন কাপড় আর কত অত্যাচার সহ করিবে। মাত্র দুইখানা কাপড় আর কত অবশিষ্ট। বাজারে কাপড় আছে, মিলিবার উপায়টা শুধু নাই। তারিণী একদিন প্যান্ট, কোট পরিবার মতলব দিয়া তাহার কতকগুলি উপকারিতা সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য বুঝাইয়া দিয়াছিল। আমার মনঃপুত হয় নাই। তারিণীকে দেখিলে দুঃখ হয়। টুইলের একটা সাদা হাফ সার্ট আর ড্রিলের একটা সাদা প্যান্ট পরিয়া বছরের সমস্ত ঋতুগুলো তাহাকে কাটাইতে হয়। শীতকালে তাহাকে মাঝে মাঝে একটা কোটও হাতে বুলাইয়া আনিতে দেখিয়াছি। কিন্তু সেটা যেমন ছোট তেমনি জীর্ণ। গায়ে চোকে না। চমুলজ্ঞার খাতিরে শুধু আনিতেই হয়। অন্যান্য প্রোচ কেরানীরা কানাকানি করে যে, গরম জামা গায়ে দিবার মত শীত নাকি এ বছরে পড়ে নাই। কথাগুলো তারিণীর গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া বিদেশী রাজসজ্জার আমারও কেমন বিতৃষ্ণা। তাছাড়া মস্ত কথাটা

এই যে, আমার মত কোট, প্যান্ট পরিহিত পঞ্চাশ টাকার একজন ক্ষুদ্রতম কেরানী পঞ্চাশ শো টাকার বৃহত্তম সায়েব লেমলি হিউবার্ট উইলকিনসন্ এস্কোয়ারের সম্মুখে এক অবজ্ঞাত ও কুৎসিততম জীব বিশেষ।

জুতার চটাস্ চটাস্ শব্দ করিতে করিতে অপ্রত্যাশিত-ভাবে ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন অধর বাবু। প্রস্তুত ছিলাম না। ঘরিতে উঠিয়া চেয়ারখানা আগাইয়া দিয়া অভ্যর্থনা করিতে হইল। ‘আসুন আসুন।’ ময়লা জামা কাপড়গুলো যত তাড়াতাড়ি পারিলাম মশারির উপর লুকাইয়া ফেলিলাম। ভদ্রলোক বলিয়া বাহিরে একটা নাম ডাক আছে, নিজের দৈন্য অপরের কাছে প্রকাশ করি কিরূপে।

—শুনলুম আজ আপিস্ বেরোননি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। গোটা কতক ছুটি পাওনা ছিলো তাই আর বেরোই নি।

—তা বেশ, তা বেশ। অধর বাবু সমস্ত ঘরখানা একবার দেখিয়া লইলেন। কহিলাম, দাঁড়িয়ে কেন বসুন।

—ঘরে আপনার বুল জমেছে বিস্তর। চাকরটাকে দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে নিতে পারেন না ?

—নোব’ধন।

—এ ঘরটা ভাল লাগে আপনার ?

—মন্দ কি।

—ধুলো আর ধোঁয়া—ধোঁয়া আর ধুলো, অসুবিধে হয় না ?

—ঘরে রাস্তিরটুকু ছাড়া আর থাকি কখন। অসুবিধে হলেও বুঝতে দিই না।

—তনা একটা ভালো ঘর যদি আপনাকে দিই ?

—এর চেয়ে ভালো।

—নিশ্চয়ই।

—তা হলে খুবই ভালো হয়।

—হয়েছে কি জানেন, কদিন থেকে এক চীনেম্যান বড় ভাগাদা দিচ্ছে, একটা ঘর তার চাই-ই। দাঁতের না কিসের দোকান করবে। ভেবেছিলুম অন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা তাকে করে দোব। পরে ভেবে দেখলুম, এটাই ওর ঠিক হবে। তাহাড়া আপনি একটা উদর লোক। বরাবর আপনাকে তো আর এ ঘরে কেনে রাখতে পারি না। একটা ভাল ঘর আপনার চাই। তাহাড়া না হয় ঐ একই দেবেন। অন্য লোক গেলে আরও বেশী পাঁচটাকা ভাড়া নিতুম। আপনার কাছ থেকে নোব না। কি জানেন আপনি হচ্ছেন বরাবরের লোক, বলতে গেলে আপনারই। আপনার লোককে আর বিব্রত করি কি করে বনুন। থাকুক বাটারা নোংরা ঘরে—নিজেরা যেমন নোংরা। চীনে মাংস একুণি ফেঁা করছিল।

—যে ঘরটা আমাকে দেবেন, সেটা আমার একবার দেখা দরকার।

—দেখবেন বইকি, একশবার দেখবেন। আমি ভেবেছিলুম আপনি দেখেই বসে আছেন। ওটা নামেই মটর গ্যারেজ। একটুখানি চুনকাম করে দিলেই একখানা পাকা বাড়ী। আসুন দেখিয়ে আনি।

—মটর গ্যারেজ।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ বাড়ীর পেছন দিকেই। জ্বাকেননি বুঝি সেটা? খাসা জায়গা মশাই। এ পর্য্যন্ত হাতছাড়া করিনি শুধু আপনাকে দোব বলেই। চলুন না দেখিয়ে দিই গে। হুমিনিটের তো মামলা।

—ও আমি দেখেছি।

—তবে আর কথা কি। কিছু চুনকাম করিয়ে দোব—বাস্।’ বলিতে বলিতে তিনি চলিয়া গেলেন। মটর গ্যারেজ! শেষ পর্য্যন্ত গ্যারেজকে করিতে হইবে বাসস্থান। তাহার জানালা বলিয়া কোন পদার্থ নাই। একটা পথ আছে মাত্র গাড়ীর প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য।

আশার বেটুকু আলো জলিয়া উঠিয়াছিল এক কুৎকারেই তাহা নিভিয়া গেল। কিন্তু উপায় নাই। ঘর সংগ্রহ করা আরম্ভের বাহিরে। বাক গে বাহা হইবার হইবে। ষোঁতা প্রদত্ত চিঠিখানা বিছানার উপর পড়িয়া রহিয়াছে। পত্রপ্রেরকের পিতার নজরে পড়িয়াছে কিনা কে জানে। এক ছোকরা আসিয়া দরজার সামনে দাঁড়াইল।

—অধরবাবু কোথায় থাকেন?

—এই বাড়ীতেই।

—দয়া করে ডেকে দেবেন?

—কেন?

—একটু দরকার আছে।

—বুঝেছি চাকরীর জন্তে এসেছেন।

—আজ্ঞে চাকরী বাকরী নয়।

—তাহলে সাহায্যপ্রার্থী।

—কাপড়ের দরকার।

—ঐ একই। চাকরী পাওয়াও যা, সাহায্য পাওয়াও তা, কাপড় পাওয়াও তা। সব এক। কিন্তু উনি তো দানধররাং বড় একটা করেন না।

—দান ধররাং মানে? ভিকিরি নাকি? ক্র-কুক্ষিত করিয়া ছোকরা কহিল ‘দত্তরমতো’ টাকা কেনবো নিয়ে যাবো।

—ওর কাপড়ের দোকান নেই। আপনি ভুল করছেন।

—কিছু ভুল করিনি মশাই। হকুমচাঁদের রুথ-র্যাশান-সপএ গিয়েছিলুম, সেখানে বলে দিলে সোজা অধরবাবুর বাড়ীতে চলে আসতে।

—অধরবাবুর বাড়ীতে কেন?

—জানেন না বুঝি? শুধু তবে শুধু কথাটা বলি। ভালো ভালো কাপড় সবই এঁর এখানে থাকে। দোকানে থাকে রদ্দি, খেলো মাল। আর এখান থেকে ভালো জিনিষ পেতে গেলে, টাকা ছাড়তে হয় মশাই বুঝলেন। জেনে রেখে দিন এসব। আপনারও কাপড়ের দরকার হবে।

—নিশ্চই দরকার তো বটেই। দিন না ভোগাড় করে।

—আমুন, টাকা দিন।

—একুপি—কত?

—দিন না টাকা বাইশেক। ভালো একজোড়া ধুতি পেয়ে যাবেন।

—বা-ই-শ টাকা।

—হ্যা। বলুন এখন অধরবাবুকে কোথায় পাওয়া যাবে?

—বুঝতে পেরেছি আপনি ব্রাক-মার্কেটিং করেন।

—ছনিয়া-শুক লোক করছে মশাই, আমি তো কোন ছাড়। আর ভারী তো বাইশ-চব্বিশ টাকার মামলা। সোকারের মাইনেই দিন পয়তাল্লিশ টাকা।

—কিন্তু অধরবাবু তো অন্তরমহলে এখন।

—জাহান্নামে থাকুক তা দেখবার আমার দরকার নেই। টাকা ফেলে দোব বাজিরে শুধে নিয়ে পাওনা

মাল দিয়ে দেবে—এই তো সম্বন্ধ। রং খেলতে তো আর আসিনি।

ছপ্ দাপ্ আওয়াজ করিয়া ছোকরা চলিয়া গেল। বর্ণচোরা আমের মত। দেখিয়া চিনিবার উপায় নাই। আর এ গুপ্ত খবরটার সম্বন্ধ ঐ ছোকরা রাখে অথচ আমি শুনি নাই, বড় আশ্চর্য।

কিছুক্ষণ ধরিয়া চোখে জল আসিতেছে। সম্ভবতঃ একাদিক্রমে কয়েকঘণ্টা ধরিয়া ক্রস্ ওয়ার্ড লইয়া পড়িয়া থাকাই তাহার কারণ। ভাগ্য ভালো এখনও জ্বরটা আসে নাই। আসিলেই বা করিবার কি আছে। চক্ষু মুদিয়া অদৃষ্টকে ষিকার দেওয়া ছাড়া আর কি করিবার থাকিতে পারে। বৃষ্টি কেরাণীগিরি, লক্ষ্য বড়বাবুর উচ্চাসন, কর্তব্য, রোগের সহিত যুদ্ধ! অর্থাৎ এক কথায় Struggle for existence! মহলা বিছানার উপর হইতে লেপটা শূণ্যে উঠিয়া গিয়া একেবারে খাটের তলায় পড়িয়া গেল। শরীর এরূপ দুর্বল যে উচ্চ কণ্ঠে প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত হারাইয়াছি।

—এখনও ঘুম। ব্যাপার কি?

চক্ষু মুদিয়া পড়িয়াছিলাম। কণ্ঠস্বরে বুঝিলাম কেরাণীজীবনের আদি ও অকৃত্রিম সুস্থান তারিণী।

—জ্বর এলো নাকি।

—না এখনও আসেনি।

—না এলেই মজল। নইলে তোমাকে বা ভোগাচ্ছে।

—অফিসে বড়বাবু কিছু বলছিলেন?

—না। তিনি তো জানেন তোমার জ্বর।

—মাইনে কেটেছে নাকি।

—বন্ধুর মনে হয় কাটেনি।

—কাটলেই বা করছি কি?

—ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলে ?

—আজ্ঞা আর যেতে পারিনি। কাল যাবো'খন।

—কাল কেন? আজই যাও একবার।

নিতাকার মত তারিণী প্যান্ট ও হাকসার্ট পরিয়া আসিয়াছে। প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকাইয়া এক তাড়া কাগজ বাহির করিয়া কহিল, 'একটা খবর আছে। আরে গোবিন্দ পোদ্দার কে হে।'

—জানি না।

—চিঠি লিখেছে অথচ জানো না।

—আমি লিখিনি। বাড়ীওয়ার মেয়ে লিখেছে। পোষ্ট করে দেবে ?

—দাঁও টিকিটের দাম। কাল পোষ্ট করে দোব।

—টিকিট লাগানো নেই ?

—না। যাক গে ওসব। এক কাজ করতে হবে।

—মানে এখান থেকে তোমার উঠতে হবে।

—কেন ?

—ভালো ঘর মিলেছে। বিছানা-পশুর ভাড়াটাড়ি ঠেঁখে ফ্যালো। আজ রাতের মধ্যেই এ জায়গা ছাড়তে হবে। কই কি কি জিনিস আছে দেখি। বলিয়া তারিণী জিনিষপত্র দেখিতে লাগিয়া গেল। দেখা হইয়া গেলে কহিল, 'মোটো এই কটা জিনিষ। বাঁধতে ছাঁদতে বিশ মিনিট। খুব—খুব হয়ে যাবে। এগুলো এখন থাক। আগে চলো বরং চা খেয়ে ডাক্তারের কাছে ঘুরে আসি।'

নূতন ঘর পাওয়া গিয়াছে শুনিয়া আহ্লাদ হইবারই কথা। তারিণীর কথার উঠিয়া বসিলাম। কি জানি না উঠিলে তারিণী যদি চটিয়া যায়।

—আমা গায়ে দিবে জুতা পরে নাও চটপট।

আমা গায়ে দিয়া জুতা পরিয়া বাহির হইতেই দেখা গেল অধরবাবু হস্তদন্ত হইয়া আসিতেছেন। কাছাকাছি কোথাও গিয়াছিলেন। কাছে আসিয়া লাড়াইয়া পড়িলেন 'চুনকামের ব্যবস্থা করে এলুম মশাই।'

—ও।

—দেখবেন নাকি গ্যাংজটা।

আমি কিছু বলিবার পূর্বেই তারিণী বলিয়া উঠিল 'এখন এক জায়গায় যাচ্ছি। এসে দেখবো।' 'তা বেশ তা বেশ।' বলিতে বলিতে অধরবাবু ঠিক তেমনি বেগে প্রস্থান করিলেন। তারিণী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল 'গ্যাংজে ট্রান্স্কার করতে চায় বুঝি।'

—হঁ।

—সে বুঝেছি। যত সব।

চা পান করিয়া ডাক্তারএর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া মেজাজটা বেশ প্রকুল বলিয়া মনে হইতেছে। তারিণী ভিতরে গিয়াছে অধরবাবুকে ডাকিয়া আনিতে। বিছানা, বালিশ, মশারী, ট্র্যাক ও স্লটকেশ গুছাইয়া ঘরে বসিয়া তারিণী ও অধরবাবুর সমস্ত অপেক্ষা করিতেছি। বাহিরে দুইটা রিক্সা অপেক্ষা করিতেছে। ইচ্ছা বাড়ীওয়ার সহিত দেখা করিয়া দেনাপাওনা চুকাইয়া দিয়া, দুর্গা নাম স্বরিয়া দুইজনে বাহির হইয়া পড়িব।

কিছু পরেই তারিণী অধরবাবুকে লইয়া ঢুকিল। ঢুকিয়াই অধরবাবু প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পুঁজিপাটা বেঁধে চলেন কোথায় এই রাস্তারে !

তারিণী রসিকতা করিয়া উত্তর দিল—কেলোটা / অধরবাবু ও হইয়া লাড়াইয়া পড়িলেন।

তারিণী কহিল ‘অফিসের লোকগুলো ভারী বজ্জাত মশাই। ওকে আর এখানে থাকতে দিলো না। বদলি করে দিয়েছে সেই পাণ্ডববর্জিত দেশে, রাণীগঞ্জে। ছুটিতে কেমন মিলেমিশে চাকরী করছিলুম।’

অধরবাবু সামনের ভাঙ্গা কাঠের বাক্সের উপর বসিয়া পড়িলেন। তারিণী বলিয়া চলিল ‘অবিশ্রি মাস শেষ হতে চারদিন এখনও বাকি থাকলেও, তাড়াটা আপনি পূরোপুরি এক মাসেরই পাবেন। কি বল হরিহর?’

ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলাম—হঁ।

বাড়ীভাড়ার টাকাটা গুণিয়া গুণিয়া অধরবাবুকে দিতে দিতে আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া তারিণী কহিল—তোমার অফিসের চিঠি আমি বয়ে নিয়ে এলাম। ওখানে গিয়ে যেন পৌছানোর সংবাদ দিতে ভুলো না। বুঝলে?

—আচ্ছা।

—এরপর থেকে অফিসটা বড় ফাঁকা লাগবে।

—মাসের শেষেই টাকাটা তোমার পাঠিয়ে দোব।

—টাকার জন্ত ভাবছে কে। তোমার কাছে কি আর টাকা মারা যাবে।

আজ যেন কিসের উল্লাস। তবুও এই উল্লাসের মধ্যে কোথায় যেন একটা বেদনার স্বর প্রচ্ছন্ন রহিয়া রহিয়া

বাজিতেছে। মৃদু আলোর সামনে এই মাত্র অধরবাবু ঘরভাড়ার পুরা টাকাটা গুণিয়া নইয়া ভুতের মতন বসিয়া আছেন। তারিণী জিনিষপত্রগুলো একে একে রিক্সা বোঝাই করিতেছে। অননুমত নিন্তক। অধরবাবুর মাতা ও স্ত্রী প্রভৃতি ব্যয়স্বোপ না থিয়েটার গিয়াছেন। ভিতর ও বাহির নীরব!

একসময় বিদায় নইয়া দুজনেই রিক্সায় উঠিয়া বসিলাম। অধরবাবু ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তারিণী চীৎকার করিয়া কহিল ‘গুড্‌নাইট।’

—শেষ পর্যন্ত মোগলসরাই প্যাসেঞ্জারে তুললে দেখছি।

—তারিণীকে মনে রেখো। এরকম লোক পাবে না।

রিক্সা চলিল। রহিয়া রহিয়া বিষাদের সেই স্বর বাজিতেছে। ধূলা-পরিপূর্ণ সেই ঘরখানি—দ্বিপ্রহরের সেই অক্ষুট কোলাহলে সেই ইলেকট্রিক মিস্ত্রী, বাইশ টাকার কাপড় কিনিবার খরিদার, ভিক্কু রমণী, ষোঁতা আর সেই পদ্ম। কোথায়—তাহারা সব কোথায়। সহসা নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া তারিণী কহিল ‘সেই চিঠিখানা দেখি গোবিন্দ পোদ্দারের। বিনা টিকিটেই Letter Boxএ কেলে দোব।’

পঞ্চকবি

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিগণ সব রবীন্দ্রনাথের আগেই বিদায় নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের আওতা পড়ে তাঁরা তাঁদের যথাযোগ্য আদর পাননি। এতদিনে তাঁদের কিছু কিছু আদর হওয়া উচিত ছিল—তাঁদের লেখা নিয়ে আলোচনা করবার প্রবৃত্তিটা জাগা উচিত ছিল।

আমি যে কবিদের কথা বলছি, তাঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল, দেবেন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, অক্ষয়কুমার ও গোবিন্দদাসের নাম উল্লেখযোগ্য।

রজনীকান্তকে সঙ্গীত রচয়িতাদের শ্রেণিতে ফেলিতে হয়। দেশে যখন ব্রাহ্মসমাজের আগ্রহে ভাগবত সঙ্গীতের খুব প্রভাব চলছে—লোকে যখন রবীন্দ্রনাথের গীতগুলি ঘরে ঘরে গাইতে আরম্ভ করেনি—তখন রজনীকান্তের গানগুলির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ২৫।৩০ বৎসর ধরে রজনীকান্ত দেশের লোকের সঙ্গীতপিপাসা নিবৃত্তি করেছিলেন।

রজনীকান্ত আমাদের বাঙ্গালা দেশের নিজস্ব গান রচনার ধারা বজায় রেখেছিলেন। রজনীকান্তের গানে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, দেওয়ানজি, রূপচাঁদ পক্ষী ইত্যাদির প্রভাব যেমন আছে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবও তেমনি তাঁর গানে পড়েছিল। তাই হিন্দু দেবদেবীর বদলে ব্রাহ্মসমাজের মণ্ডল ব্রহ্মের উদ্দেশ্যেই তাঁর ভাগবত গানগুলি সৃষ্টিত হয়েছে। তাই ব্রাহ্মসমাজেও তাঁর গানগুলি গীত হ'ত। গানের ভাষা, ছন্দ ও গঠন

সৌষ্ঠবের দিকে লক্ষ্য করলে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও তাঁর উপর পড়েছিল,—স্ববশ্য তাঁর হাসির গানে পড়েছিল দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব। বাঙ্গালার গীতি-সাহিত্যের ইতিহাস হ'তে রজনীকান্তের নাম কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না।

দ্বিজেন্দ্রলালকে দেশের লোক ভোলেনি। তবে তাঁর রচনার যথাযোগ্য আদর কই হচ্ছে? দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলি নগরের রঙ্গমঞ্চ হ'তে একরূপ বিদায় নিয়ে এখন পল্লীর বারোয়ারীতলার আশ্রয় নিয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলি নাট্যকলার দিক থেকে নাটকের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলে মনে করা হয় না কিন্তু তার পর যে নাটকগুলির রচিত ও অভিনীত হচ্ছে সেগুলি কি দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলির চেয়ে উৎকৃষ্টতর? যে সকল উপন্যাস নাটকে পরিণত হয়েছে সেগুলোর কথা আমি বলছি না। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলি সাহিত্য হিসাবে যাই হোক—দেশাত্মবোধ জাগরণে যে সেগুলি যথেষ্ট সহায়তা করেছে তা অস্বীকার করার যো নেই। রঙ্গমঞ্চে নাটক সাফল্য লাভ করে সুদক্ষ নটনটীর সহায়তায়। আদ্যকাল সুদক্ষ নটের সংখ্যা বেড়েছে—কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলি সুনিপুণ নটের সহায়তা লাভ করে নি। রঙ্গমঞ্চের কথা বাদ দিলে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলি সাহিত্যক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট। দ্বিজেন্দ্রলাল কবি। তাঁর নাটকগুলিতে কবিত্ব মাধুর্য ওতপ্রোত। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলি নাট্যরূপায়িত কাব্য। রঙ্গমঞ্চের বিচারে যদি নাটকগুলি উৎকৃষ্ট বলে স্বীকৃত না হয়, তা হলেও

কোভের কারণে—শ্রাব্য কাব্য হিসাবে এগুলি চমৎকার।

দ্বিজেন্দ্রলালের দেশাবোধমূলক সঙ্গীতগুলি বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব সৃষ্টি। শুধু কাব্যের দিক হতে বিচার করে একথা বলছি না। গানের দিক হতেই ঐগুলির যথেষ্ট মর্যাদা। পৌরুষব্যাপ্তক ভাষার দেশী বিদেশী সুরের অপূর্ব মিশ্রণ পূর্বে কখনও হয়নি! এইরূপ কোরাস দেওয়া গানগুলিকে সজ্ব-সঙ্গীত বলা যেতে পারে। এই গানগুলি আজও দ্বিজেন্দ্রলালকে ভুলতে দেয়নি। দ্বিজেন্দ্রলাল গানে যে পদ্ধতির সৃষ্টি করে গেছেন আজও সে পদ্ধতি—লোপ পায়নি। এখনো বৈজ্ঞান্যী সুরের গান ছাড়া আমাদের উৎসব জমে না।

দ্বিজেন্দ্রলাল অমর হাসির গানে। এদিকটার দ্বিজেন্দ্রলালের লক্ষ্য কেউ নেই। জগতের যে কোন সাহিত্য এই শ্রেণীর হাসির গান পোলে ধন্য হতে পারে। বাঙ্গালী আজ নানা বিড়ম্বনার হাসিতে ভুলে যেতে বসেছে—নানা ঝগাটে সে আর হাসির গানের আদর করে না।

কবি সারাজীবন হেসে কাটিয়েছেন, সকল দুঃখ-ভাগকে হেসেই উড়িয়ে দিয়ে গেছেন এবং স্বজাতির ক্ষম হাসির ভাণ্ডার রেখে গেছেন। আজ হাসি আমাদের আর বরদাস্ত না হতে পারে, তা বলে যিনি আমাদের বিরাম বিশ্রামের দিনের ক্ষম ব্যবস্থা করে গেছেন তাঁকে তোলা কিছুতেই উচিত নয়।

একজন খাঁটি কবি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। এঁর কথা কেউ আর মুখেও আনে না। আমরা প্রথম যৌবনে এঁর কবিতা পড়ে বড় আনন্দ পেতাম। রবীন্দ্রনাথের অশ্রান্ত সাধনার কাব্যের অন্তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে বহিরঙ্গের দিকটা ক্রমে এতই অনবদ্য হয়ে উঠল

যে—বহিরঙ্গের অপূর্ণতা কাব্যের অপরিহার্য অঙ্গ বলে গণ্য হল। বহিরঙ্গের অপূর্ণতা না থাকলেও যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাব্য হ'তে পারে এ কথা আজ কেউ স্বীকার করে না। কিন্তু রসজ্ঞগণ বলেন বহিরঙ্গের সৌষ্ঠব না থাকলেও অন্তরঙ্গ রসৈশ্বর্য ও অমুভূতির নিবিড়তার সংকাব্য হ'তে পারে। দেবেন্দ্রনাথের কবিতা তার উদাহরণ। কেউ কেউ বলেন দেবেন্দ্রনাথের কবিতার অমুভূতির সংঘম নেই—উচ্ছ্বাসের আধিক্যই বেশী—অতএব আঁট হয়ে উঠেনি। এ কথা স্বীকার করি—দেবেন্দ্রনাথের কোনো কোনো রচনা তাই বটে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের সনেটের কঠোর বাঁধন সংঘমেরই পরিচয় দেয় এবং বহিরঙ্গের ক্রটি সনেটের মধ্যে বিশেষ কিছু নেই। কেউ কেউ বলেন তাঁর ভাষা গম্ভীর। এ সকল অনুযোগ শুষ্ঠে রসের দিকে প্রথর দৃষ্টি না দিলে। আমরা কি গম্ভীর মধ্যে রস পাই না? রস যদি থাকে—তবে ভাষার কারুকার্য না থাকলেও কাব্য হতে পারে। দেখতে হবে দেবেন্দ্রনাথের রচনার রস আছে কিনা—ভাষাবিশ্রাস অনবদ্য হলে সোনার লোহাঙ্গা হ'তো। রস থাকলে অবদ্বন্দ্বের ছোটখাট ক্রটি মার্জনীয়। কিন্তু কে দেখবে? সকলেই শু তাঁকে ভুলতে বসেছে।

অবশ্য একথা স্বীকার করি তাঁর গ্রন্থাবলী বৈরা ধরে পড়বার লোক পূর্বেও ছিল না। সেজন্য মনে হয় তাঁর রচনাগুলির একটি চরনিকা হলে পাঠকসমাজ তাঁকে চিন্তে পারবে। দেবেন্দ্রনাথের পরম ভক্ত ও আত্মীয় কবি মোহিতলাল ভার নিলে চরনিকাখানি সর্বজনস্বন্দর হয়।

আমরা প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে এতই মুগ্ধমান হয়ে পড়েছিলাম, যে তাঁর সমসাময়িক কোন

কবির দিকে আমাদের চাইবার অবসরও ছিল না। তাঁরা যে উল্লেখযোগ্য কোন কবিতা লিখতে পারেন তা আমাদের ধারণাতেই আসত না। তারপর সাহিত্য-সেবকদের যে সম্প্রদায়ে আমরা মিশতাম—সে সম্প্রদায়ের সাহিত্যিকরা অক্ষয়কুমার বা গোবিন্দদাসের নামও মুখে আনত না। রবীন্দ্রনাথ যে ভাবের, যে ভঙ্গীর, যে ছন্দের কবিতা লেখেন, সে ভাব, ভঙ্গী, বা ছন্দ ছাড়া যে কবিতা হতে পারে—তা' আমাদের মাথাতেই আসত না। সে জন্য গোবিন্দদাস বা অক্ষয়কুমারের কবিতা আমরা বহুসহকারে পড়তাম না—পড়লেও রসগ্রহণের চেষ্টাই করতাম না।

‘সাহিত্য’ পত্রিকাকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের বিরোধী একটা দল ছিল। সে দলের সর্কশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন অক্ষয়কুমার। তাঁরা অক্ষয়কুমারের কবিতা নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করতেন, এবং রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভাকে এত ছোট করে দেখতেন যে রবীন্দ্র-বিরোধী দলের উপাশ্রু কবিটির প্রতি আমাদের কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। অক্ষয়কুমার নিজেরও রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে কখনো অমূল্য মত ব্যক্ত করতেন না। নানা কারণে অক্ষয়কুমারের কাব্যগ্রন্থে কি সম্পদ আছে তা দেখবার আগ্রহ আমাদের হয় নি।

তারপর পূর্ববঙ্গের কবি গোবিন্দদাস। তাঁর রচনার মার্জিত রুচির অভাব আছে এবং তাঁর কোন প্রকার তথাকথিত কালচার ছিল না বলে তাঁর কাব্য আমরা পড়তাম না। ব্রাহ্মসমাজের নাগরিক প্রভাব আমাদের উপর এত বেশী পড়েছিল যে, গ্রাম্য হিন্দুকবির লেখার প্রতি আমাদের কোনো শ্রদ্ধাই ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার গঠনশিল্পের যে চরমোৎকর্ষ দেখিয়েছেন—তাকেই আমরা কাব্যের পরমাদর্শ বলে ধরে নিয়েছিলাম।

সে আদর্শ গোবিন্দদাস একেবারেই অসংগত করেন নি। তাঁর কাব্যে সংস্কৃত কবিদের বা ইংরাজ কবিদের কোনো প্রভাব পড়ে নি। তিনি নিজস্ব দেশী ছাঁদে পল্লীজীবন ও স্বকীয় গার্হস্থ্য জীবনের কথা কাব্যে পরিস্ফুট করতেন—সে কাব্যকে আমরা নাগরিক শিক্ষিত সমাজের পাঠ্য বলে মনে করতাম না।

ক্রমে যখন রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের চমৎকৃতি উপশান্ত হয়ে এল—অক্ষয়কুমার ও গোবিন্দদাস দু'জনেই ইহ-জগৎ হতে বিদায় নিলেন—আমাদের মস্তিষ্ক ক্রমে প্রকৃতিস্থ হয়ে এল—তখন রবীন্দ্রনাথের চারিদিকে আমরা তাকিয়ে দেখতে শুরু করলাম—তখন গোবিন্দদাস ও অক্ষয়কুমারের লেখাগুলি পড়ে দেখতে লাগলাম। ক্রমে বুঝতে পারলাম—এদের কাব্যের মধ্যেও রস পাওয়া যেতে পারে। এঁরা যে রবীন্দ্রনাথের সর্কগ্রাসী প্রভাবে আত্মস্বাতন্ত্র্যের বিলোপ সাধন করেন নি—এঁরা যে অক্ষরে অক্ষরে তাঁর ছাঁদের নাগা বুলান নি—তা এঁদের পক্ষে কৃতিত্বেরই কথা। এঁদের বহু রচনা সংকাব্যের মর্যাদা লাভ করেনি সত্য—কিন্তু এঁদের রচনার মধ্যেও যে অপূর্ণতা ও চমৎকারিতা আছে তা আমরা আজ বুঝতে পারছি। অবশ্য দেশের পাঠক সাধারণ হয়ত আজও তা বুঝেননি। কিন্তু আমরা রবীন্দ্রভক্তের দল আর এঁদের রচনাকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিই না। গোবিন্দদাসের অমার্জিত ভাবভঙ্গীর মধ্যেও যে আন্তরিকতা, সত্যনিষ্ঠা ও গভীর দরদ আছে তা আমরা ধরতে পেরেছি এবং কাব্যের বা প্রকৃত সম্পদ তা কক্ষ অমসৃণ আতাকলের ভিতরকার রসের মত গোবিন্দদাসের কাব্যের মধ্যে বিরাজ করছে তা আমরা বুঝতে পারছি। গোবিন্দদাসের কাব্যের মধ্যে কোথায় চমৎকারিতা আছে তা দেখাবার সময় এসেছে।

অক্ষয়কুমারের 'এষা' যে বাংলার কাব্যভাণ্ডারের অপূর্ণ সামগ্রী সে বিষয়ে এখন আর কারো সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল দাস মহাশয় 'এষা' কাব্য সম্বন্ধে একখানি সমালোচনা পুস্তকই লিখেছেন। অক্ষয়কুমারের রচনাভঙ্গীর এমন একটা বৈশিষ্ট্য বা অন্য কারো মধ্যে নেই। 'এষা'র কবিতাগুলি পাঠ করলে চোখে জল আসে, অন্তরের অন্তস্থল হ'তে দীর্ঘশ্বাস পড়ে বলে কবিতাগুলো উৎকৃষ্ট বলছি না। কবিতাগুলির রসঘনতাই আমাদের মুগ্ধ করেছে। এত অল্প কথার এত অল্প পরিসরের মধ্যে গভীর অনুভূতিকে রসে পরিণত করতে অল্প কবিই পারেন। যেখানে তিনি তত্ত্ব বা তথ্যকে সংক্ষিপ্ত ভাষায় প্রকাশ করেছেন সেখানে রস জ্বলন্ত সত্য—কিন্তু সেখানে অন্তরের অনুভূতিকে সংবত ব্যঙ্গনামর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন সেখানে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী—শোকের লোণা-জল সেখানে কাব্যের মধুর রসে পরিণত হয়েছে।

'এষা'র কবিতা সম্বন্ধে বা বলা যায়, 'শব্দ' ও 'বনকাজলির' অনেক কবিতা সম্বন্ধেও তাই বলা যায়। 'এষা' পাঠকসমাজে আদৃত হয়েছে,—কিন্তু তা কার্যণ্যের জন্য। আমাদের কাছে 'এষা' ও 'শব্দ'র আদর অন্য কারণে। কার্যণ্য ও অন্যান্য আন্তরিক অনুভূতি ঐ দুইখানি পুস্তকের অনেক কবিতায় সংক্ষিপ্ত বাক্যবিন্যাস ও সংবত আবেষ্টনীর মধ্যে রসঘন হয়েছে বলেই আমাদের এত ভাল লাগে।

অক্ষয়কুমারের কবিতা অতিপিন্ধ বহলে অসম্যক সমাবৃত্তবোধন। তাপস-কন্যাকার ন্যায়। ভাবাবেগের এত কঠোর সংবম কাহারও কাব্যে নেই। এতটা সংবম যে মনে হয় যেন ইহা দেবেজনাথ বা গোবিন্দদাসের রচনাভঙ্গীর antithesis, মনে হয় যেন এতটা সংবম না

থাকলেই ভালো হ'ত। এক 'এষার' কবিতা সম্বন্ধে একথা বলা চলেনা। 'এষা'র কবিতাগুলিকে আদর্শ ধরলে অন্যান্য কবিতায় সংযমাতিশয়ের দোষই ঘটেছে বলতে হয়। অক্ষয়কুমারের কবিতা স্বরাস্কর সংস্কৃত শ্লোকের মত গাঢ়বন্ধ, ব্যঙ্গনাগর্ভ, রসঘন। তাঁর এক একটি কথা বহিষ্কৃতিদের মত।

গোবিন্দদাসের মধ্যে এ সংবমের অভাব আছে। সংবমের জন্য গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব নর,—উচ্ছ্বাসের জন্যই তাঁর কবিতা আমাদের অন্তর স্পর্শ করেছে। ঐ উচ্ছ্বাসে অনুভূতির উদ্গাম ব্যাকুলতা আছে এবং ঐ ব্যাকুলতার অকৃত্রিমতাই তাঁর অনেক কবিতাকে রসরচনার পরিণত করেছে।

সত্যানুভূতির এমন অকুণ্ঠিত অনলঙ্কৃত অভিব্যক্তি কাহারও কাব্যে দেখা যায় না। অন্তরের সত্যেরই একটা নিঃস্ব রস আছে; তাহার বাণীরূপ লাভ করিবার জন্য Borrowed plumesএর দরকার হয়। নিরাবরণ নিরাভরণ সত্য আমাদের মর্ম স্পর্শ করে অপরোক্ষভাবে। গোবিন্দদাসের কাব্য অসঙ্কুচিত। নির্ভীক অকপট আত্ম প্রকাশের জন্যই আমাদের ভাল লাগে।

আমি যে কল্পজন কবির কথা এই নিবন্ধে উল্লেখ করলাম তাঁদের অনেক রচনা উচ্চ কাব্য সাহিত্যের পদবীতে স্থান পেতে পারে না সত্য, কিন্তু এঁদের রচনা উপেক্ষণীয় নর। সংখ্যায় বেশী না হলেও সকলের কাব্যগ্রন্থেই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রচনা আছে। সেগুলিকে খুঁজে বের করা রসজ্ঞ সাহিত্যিকের কর্তব্য এবং প্রত্যেকেরই এক একখানি চরনিকা হওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব-বন্যার মাঝে তাঁদের দান একেবারে ভুলে না যাব, এ জন্যই আমাদের উদ্বেগ ও আকিঞ্চন।

ভারতে সোনা ও রূপার দর

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

ভারতে সোনা ও রূপার বাজার দর অবিচ্যুতভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে এদেশে সোনার দর ছিল প্রতি ভরি ৩৮।৩২ টাকা, এখন ইহা প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়া ১০৪।১০৫ টাকায় পৌঁছাইয়াছে। সোনার তুলনায় রূপার বাজার দর আরও বেশী বাড়িয়াছে। এখন প্রতি শত ভরি রূপা ভারতের বাজারে ১২১ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। যুদ্ধকালীন মুদ্রানীতির দোহাতে এখনকার টাকা আধুলি প্রভৃতি মুদ্রাধণ্ডে রূপার পরিমাণ আগেকার তুলনায় কম, তবু রূপার দর যদি শতভরি ২০০ টাকা হয়, এই মুদ্রা গলাইয়াও লোকে শুধু রূপা বেচিয়া লাভবান হইতে পারিবে। এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া এখন আর অসম্ভব নয়। ভারতসরকার যে বর্তমানে নিকেলের তৈয়ারী আধুলি সিকি বাহির করিয়াছেন, মুদ্রার ধাতুমূল্য কমাইয়া মুদ্রামূল্য ও মুদ্রানীতির সমতারকাই ইহার আসল উদ্দেশ্য।

যদিও ভারতের মুদ্রাব্যবস্থার স্বর্ণ অপেক্ষা রৌপ্যের গুরুত্ব কিছু বেশী, তবু স্বর্ণের মর্যাদা ভারতবর্ষেও কম নয়। ভারতের মুদ্রামান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ মুদ্রামানের উপর পুরাপুরীভাবে নির্ভর করে বলিয়া ভারতে সোনা ও রূপার মূল্য অনেকটা ব্রিটেনের সোনা ও রূপার মূল্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অবশ্য যুদ্ধের সময় অন্যান্য নানা জিনিষের সহিত এই ধাতুমূল্যের হারেও প্রচুর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ভারতের টাকা এখনও

ব্রিটিশ ষ্টার্লিংয়ের উপর নির্ভরশীল হইলেও নানা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণে ভারতে সোনারূপার বাজার দর ব্রিটিশের তুলনায় অসম্ভব চড়িয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ সরকার ও মার্কিন সরকার সোনার বাজার দর নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন বলিয়া এই দুই দেশে ভারতের ন্যায় ধাতুমূল্য বৃদ্ধি পায় নাই। ব্রিটেনে এক আউন্স সোনার মূল্য ৮ পাউণ্ড ২১ শিলিং এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক আউন্স স্বর্ণের মূল্য ৩৫ ডলার। এই হিসাবে প্রতি টাকার বিনিময় মূল্য ১ শিলিং ৬ পেন্স ধরিলে ভারতে প্রতি ভরি সোনা ৪২ টাকার বিক্রীত হওয়া উচিত। কিন্তু ভারতে স্বর্ণের প্রচণ্ড অভাব, মুনাফাখোঁরদের দৌরাত্ম্য, রৌপ্যের আপেক্ষিক মূল্যবৃদ্ধি, লোকের স্বর্ণসঞ্চয়ে আগ্রহ প্রভৃতি কারণে সোনার দর ভয়ঙ্করভাবে বাড়িয়া প্রকৃতপক্ষে অনসাধারণের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। বিদেশ হইতে স্বর্ণ আমদানী সম্পর্কে সরকারী নিষেধাজ্ঞা আছে বলিয়া ব্রিটেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া অথবা আমেরিকা হইতে সোনা কিনিয়া আনিয়া ভারতের বাজারে সেই স্বর্ণ বিক্রয় দ্বারা সোনার দাম কমান হইতেছে না। তাছাড়া বাস্তবিক সম্ভ্রুতি ভারতে সোনার প্রচণ্ড অভাব দেখা দিয়াছে। ১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে বোম্বাইয়ের বাজারে ২ লক্ষ ৫০ হাজার ভরি আন্বায় সোনা ছিল; ভারত সরকার কর্তৃক একশত টাকার উচ্চ মূল্যের নোট বাতিল সংক্রান্ত নোট অর্ডিন্যান্স জারীর ফলে আতঙ্কগ্রস্ত নোট-মালিকদের সোনার বদলে নোট হস্তান্তরকরণের আগ্রহে বাজার হইতে এই সোনার

অধিকাংশ অদৃশ্য হইয়াছে। খুব বেশী যদি হয় বোম্বাইয়ের বাজারে এখন মাত্র ৫০ হাজার তোলা সোনা আছে। কাজেই ব্যবসারী মুনাফাখোর ও গৃহস্থর দল এই সামান্য পরিমাণ সোনা লইয়া কাড়াকাড়ি মারামারি করিতেছে বলিয়া সোনার দর না উঠিয়া পারে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এখন স্বর্ণ বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়াছে বলিয়াও অবস্থা ভুলি হইয়া উঠিতেছে। তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্বর্ণ বিক্রয় করিতে থাকিলে সেই সোনা বিকিকিনির কলে সোণার দর তলার দিকে থাকিত বটে, কিন্তু সেই স্বর্ণ বিক্রয়ে প্রকৃত লাভবান কে হইত তাহা ঠিক বলি যায় না। ভারতের কেহ সরকারী আইনবলে বাহির হইতে সোনা আমদানী করিতে পারে না, অথচ কিছুদিন আগেও ব্রিটিশ সরকার দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রতিভরি ৩২ টাকা দরে সোনা কিনিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মারক্‌সে সেই সোনা ৭০।৮০ টাকা দরে বিক্রয় করেন। বৃহৎ ও বুদ্ধোত্তর অর্থ-নৈতিক মনো বাজারের আশঙ্কার অর্থবান লোকেরা দীর্ঘকাল যাবৎ বাড়তি টাকার সোনা মজুত করিবার প্রবৃত্তি দেখাইতেছেন বলিয়াও চাহিদার চাপে সোনার দর হ্রাস করিয়া বাড়িয়া বাইতেছে। অবশ্য এই সঙ্গে চোরাকারবারীরা এবং স্পেকুলেটররা লোকের এই চাহিদার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণে উদগ্রীব হইয়া সোনার দর চেষ্টা করিয়া তেজী করিতেছে। কেন্দ্রীয় পরিষদে সম্প্রতি উত্তরাধিকার কর সংক্রান্ত বিল উত্থাপিত হইয়াছে; ভারতসরকারের বর্তমান আর্থিক অবস্থার বিবেচনার এবং বুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের দায়িত্বগ্রহণের জন্ত এই বিল আইনে পরিণত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সমস্ত অকৃষি সম্পত্তি, এমন কি জীবনবীমার উপরও এই বিল প্রযোজ্য। এই বিলের আওতা হইতে পুত্র বা উত্তরাধিকারীকে আর্থিক বাঁচাইবার জন্তও বহু সম্পদশালী ব্যক্তি বাজারের সামান্য

সোনার একাংশ যে কোন মূল্যে কিনিবার জন্য ব্যগ্রতা দেখাইতেছেন বলিয়াও সাধারণ দেশবাসীর দিক হইতে বাজারের অবস্থা এখন ক্রমেই শোচনীয়তর হইয়া উঠিতেছে।

আন্তর্জাতিক আর্থিক মন্দাবাজারের চাপে ব্রিটেন ১৯৩১ সালে স্বর্ণম্যান ত্যাগ করে। যদিও ব্রিটেন স্বর্ণতহবিলের অভাবেই এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তথাপি স্বর্ণের দিক হইতে অত্যন্ত স্বচ্ছল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেকটা ব্রিটেন তথা বহির্জগতের সহিত বাণিজ্য ব্যবস্থার সমতারক্ষার জন্য এইসঙ্গে স্বর্ণম্যান পরিত্যাগ করিয়াছিল। এই সময় স্বর্ণের সম্বন্ধ নিঃসন্দেহে কতকটা ক্ষুণ্ণ হয় এবং পৃথিবীতে স্বর্ণমূল্য কমিয়া যায়। ভারতে এই সময় সোনার দর পাড়ায় ভরি পিছু মাত্র ২১।২২ টাকা। তবে এই স্বর্ণ মূল্য হ্রাস নিতান্তই সাময়িক ব্যাপার। আসলে পৃথিবীর সকল অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্র পরিচালকদের মনে স্বর্ণের প্রতি সম্বন্ধবোধ বজায় ছিল। ১৯৩২ সালে বৃহৎ বাণিজ্য পর হইতে মুদ্রাস্ফোতির প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে স্বর্ণ তহবিল বাড়াইবার দিকে সব দেশই নজর দেয় এবং বিশেষ করিয়া বিদেশী গন্তর্গমেন্ট পরিচালিত ভারন্তবর্ষে লোকে অনিশ্চিত ভবিষ্যত সম্পর্কে আতঙ্কিত হইয়া বৃহৎ বাজারে সোনা মজুত করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহশীল হইয়া উঠে। এইভাবে পৃথিবীর সর্বত্র বৃহৎ মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই সোনা ও রূপার চাহিদা অত্যধিক বাড়িয়া যায় এবং ধাতুশূন্য সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধিত হইলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনে পর্যাপ্ত সোনারূপা লইয়া কিছু কিছু চোরাকারবার চলে। ভারতে ধাতু মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয় নাই এবং প্রকৃতপক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মারক্‌সে খোদ ভারতসরকার সোনারূপা বেচিয়া

মুনাফা গ্রহণ করেন বলিয়া প্রকাশ্যভাবেই এদেশে এই ধাতুদ্বয়ের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে ক্ষীণ হইয়াছে। ১২৪৫ সালের যে মাসে অর্থাৎ বুদ্ধ শেষ হইবার কিছু আগে ভারতের বাজারে সোনার মূল্য প্রতি ভরি ১ শত টাকার দাঁড়াইয়াছিল। বুদ্ধ শেষ হইবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভোগে আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্য উন্নয়নের জন্য যে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ও মুদ্রাভাণ্ডার গঠিত হইয়াছে, তাহার জন্য আবার পৃথিবীতে স্বর্ণের মর্যাদা ও চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বর্ণের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ বিকল্পধাতু হিসাবে রূপার চাহিদা এবং মূল্যবৃদ্ধি। হ্রাস হইয়াছে, আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ও মুদ্রাভাণ্ডারে যে সকল দেশ সম্মত হইবে তাহাদের :দের চাঁদার শতকরা ২৫ ভাগ স্বর্ণ দিতে হইবে। এই প্রতিষ্ঠানে ভারতের :দের চাঁদার পরিমাণ মোট ৮০ কোটি ডলার বা প্রায় আড়াই শত কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ভারতকে প্রায় ৬০ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ দিতে হইবে। এদিকে ভারতসরকারের হাতে যে স্বর্ণ মজুত আছে তাহার পরিমাণ ষৎসামান্য। ভারতে ১২ শত কোটি টাকার বেশী নোট চালু আছে, ইহার বিপরীত দিকে মজুত আছে মাত্র ৪৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার স্বর্ণ। এই মজুত স্বর্ণের মূল্য অবশ্য পুরানো দরের হিসাবে নির্ধারিত হইয়াছে, বর্তমান বাজার দরে ইহার মূল্য প্রায় ১ শত কোটি টাকা হইবে। তবে ইহা সঙ্কেত প্রচলিত নোটের তুলনায় ইহা একেবারেই নগণ্য। বাহা হউক, ভারত সরকারের এখন স্বর্ণের প্রয়োজন অত্যধিক। তাছাড়া ভারতের অর্থবান লোকেরাও আরকর ইত্যাদি ঠাঁকি দিবার মোহে অথবা সাময়িক প্রয়োজনে এবং স্বর্ণের প্রতি সমস্তায় সোনা কিনিবার জন্য ব্যস্ত। এইরূপ প্রচণ্ড চাহিদার পরিবর্তে যদি ভারতের খনিতে যথেষ্ট

স্বর্ণ উত্তোলিত হইত তবু সমস্তা সমাধানের কিছু আশা থাকিত, কিন্তু ভারতের খনিগুলি হইতে পৃথিবীর স্বর্ণ উৎপাদনের হিসাবে সামান্য পরিমাণ স্বর্ণই উত্তোলিত হয়। ১২৪৪ সালে পৃথিবীতে যখন মোট ২ কোটি ৭৫ লক্ষ আউন্স স্বর্ণ উত্তোলিত হইয়াছিল, সেখানে ভারতে উত্তোলিত হয় মাত্র ১ লক্ষ ৮৭ হাজার আউন্স। বলা নিশ্চয়োক্তন, চাহিদার অসাধারণ তীব্রতা সঙ্কেত জোগান এইরূপ কম হইলে এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের কোনরূপ আগ্রহ না থাকিলে সোনার মূল্য এবং তদনুপাতে রূপার মূল্য বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য।

ভারতে সোনার তুলনায় রূপার অবস্থা আরও শোচনীয়। আগেই বলা হইয়াছে, রূপার প্রচণ্ড অভাবের জন্য ভারতসরকার টাকার রূপার পরিমাণ অত্যন্ত কমাইয়া দিয়াছেন এবং নিকেলের সিকি আধুনি প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য বাজারে ছাড়িয়াছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রূপার সম্ভ্রুতি মূল্যবৃদ্ধির জন্য স্বর্ণমূল্যবৃদ্ধি ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন রোপ্যাব্যবসায়ী সিনেটরের বিরাট মুনাফাবৃদ্ধি দাবী। আগে আমেরিকার প্রতি আউন্স রূপার দর ছিল মাত্র ৪৫ সেন্ট; উক্ত সেনেটরদের কারসাজীতে ইহা এখনই ৯০ সেন্টে দাঁড়াইয়াছে এবং ভবিষ্যতে ইহাকে ১২০ সেন্টে তুলিবার গভীর বড়বন্দ চলিতেছে। ভারতের বাজারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সোনাক্রপা বিক্রয় বন্ধ করিয়াছেন, দেশবাসী চড়ায়রের জন্য রূপা কিনিতে পারিতেছে না, রূপার এই অস্বাভাবিক অবস্থা সোনার বিরাট মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। ইহা ছাড়া ভারতসরকার রূপা লইয়া আর এক বিপদে পড়িয়াছেন। ঋণ ও ইজারা ব্যবহার দরুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে যুদ্ধের সময় অত্যন্ত নানা বস্তুর সহিত ১৬ কোটি

আউল রৌপ্য ধার দিয়াছিল। গত ১৬ই মে ভারতের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থা সম্পর্কিত সেনসেনের সমস্ত গণ্ডগোল মিটিয়া গিয়াছে; কিন্তু স্থির হইয়াছে ভারতবর্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাওনা ১৬ কোটি আউল রূপা আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে শোধ করিবে। বলা বাহুল্য, ভারতসরকারের যখন রৌপ্য তহবিল বাড়াইবার এত বেশী প্রয়োজন তখন ভারতের বাজারে শীঘ্র রূপার মূল্য কমিবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

বাহা হউক, মোটের উপর কথা হইতেছে, প্রচণ্ড ঋণাত্মক অভাব সত্ত্বেও মুনাফাখোর ও চোরাকারবারীদের কারসাজীতেই ভারতে সোনা রূপার দাম এইরূপ অবিচলভাবে বাড়িয়াছে। ভারতসরকার যদি এই দুই

মূল্যবান অত্যাশঙ্কক ধাতুর মূল্যনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ব্রিটিশ ও মার্কিন কর্তৃপক্ষের হাথ কড়াকড়ি করিতেন, তাহাঁ হইলে অবস্থা কিছুতেই এরূপ হতাশাজনক হইতে পারিত না। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের জামুরারী অধিবেশনে স্থার জিয়াউদ্দিন আমেদ ভারতের শেয়ার ও সোনাক্রপার বাজার বন্ধ করিয়া দিবার একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। এই সব বাজার একেবারে বন্ধ করা যদি সম্ভব নাও হয়, সরকার কর্তৃক এইগুলি অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত না হইলে বিরাট অসমর্থনবর্টন সম্বলিত এই দেশে বাজারের উপর কিছুতেই কুঁকিদার ও মুনাফাখোরদের এইরূপ জুলুমের অবসান ঘটিবে বলিয়া আমরা আশা করি না।

একটি শূন্যতা

শ্রীঅমিল ঘোষ

স্বপ্নের বনিকা ঘুরে ঘুরে যায় :—

নতুন প্রভাত আসে।

সোনালী স্বপ্ন

নতুন স্বর্ষের রঙে

ব'রে পড়ে নিস্তরঙ্গ জলে;

স্বর্ষের রূপালী রশ্মি বকের মতন

ভিড় করে মেমে এলো।

আলোকিত মুগ্ধ জলে

হাঁসছটি চলে,—

কলরব স্রব হয় চঞ্চল সলিলে :

সবুজ আলোকে নেবে হাঁসছটি ভেসে যায় দূরে।

* * *

সায়াহের আলোছায়া :— হাঁসছটি নাই

শূন্য জল, কোথা গেছে চ'লে।

যবনিকা নেমে আসে শুক আধারের—

স্বপ্ন-শেষ : বিরাজে শূন্যতা ॥

শান্তিনিকেতনে

শ্রীপ্রবোধকুমার ঘোষ

আমার মত নগণ্যেরও একবার শান্তিনিকেতনের পৌষ-উৎসবে যোগ দেবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সে অবশ্য সাত আট বছর আগের কথা—তখন রবীন্দ্রনাথ জীবিত ছিলেন।

দেশ-বিদেশে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো, ধূলুতে গেলে, আমার নেশা এবং পেশা—তাই নানা প্রকার দ্রুত ও অদ্রুত যানবাহনে চড়বার অভিজ্ঞতা আমার আছে কিন্তু সেবার বোলপুর যেতে হাওড়া থেকে যে ট্রেনে চেপেছিলাম তেমন অদ্রুতগামী ট্রেনে কমই চেপেছি। এরূপ ছঃসহ বেগহীন রেলগাড়ীতে চ’ড়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে বিরক্তি লেগে গিয়েছিল মনে আছে। একজাতীয় গরু আছে লেজ না-মোরালে হাঁটে না—এ গাড়ীও নিতান্ত যেতে হবে বলেই ভারী অনিচ্ছায় ধেমে ধেমে যেন কোনও ক্ষমে চলছিল—ধামছিল—আবার চলছিল... ..। অনেক রাতও হয়েছিল আর বিরক্তিতে যখন চোখে জল এসে যাবার উপক্রম হ’লো তখন অকস্মাৎ “বোলপুর” স্টেশনে এলাম.....।

অবশেষে বিশ্বভারতীর বাস্ শান্তিনিকেতনের মধ্যে যখন এসে হাফ ছেড়ে দাঁড়ালো তখন রাত প্রায় বারোটা। ঠাণ্ডাও পড়েছিল খুব আর মিহি কুয়াশার আবরণে চতুর্দিক এমন আবৃত করেছিল যে শান্তিনিকেতন মারাপুরী মনে বোধ হচ্ছিল।

মোটর বাস্ থেকে নামতেই অপ্রত্যাশিতভাবে কয়েকটি শিল্পীবন্ধুর সংগে দেখা হ’লো—এরাও আমার মতই উৎসবে যোগ দিতে এসেছেন। ভারী খুসী হ’লাম

এদের পেয়ে আর সিংহ ভবনের হলে স্থান ক’রে সারারাত প্রায় গল্প ক’রেই কাটিয়ে দিলাম; অবশ্য শোবার মত বিছানাও সংগে ছিল না।

সারারাত গল্পগুজবে শ্রান্ত হ’য়ে বোধ হয় একটু তন্দ্রামত এসেছিল, হঠাৎ প্রভাতী গানের সুর শুনে চমকে উঠলাম এবং নীরবে উৎকর্ষ হ’য়ে শুন্তে লাগলাম। প্রভাতী সংগীতকারী দল গান গেয়ে শান্তিনিকেতন পরিভ্রমণ করতে করতে দূরে চলে গেল। এরা সকলে এখানকার ছাত্র-ছাত্রী। বইতে পড়েছি যে পুরাকালে মুনি-ঋষিদের আশ্রমের তাপস বালকবালিকারা ব্রাহ্মবৃহর্ষে শ্রব পাঠ করতো। এ প্রভাতী গান শুনে ভারী মধুর মনে হয়েছিল এবং শ্রবপাঠের কথা মনে হ’লো।

অল্প পরেই ভোর হ’লো—আজ ৭ই পৌষ—উৎসবে যোগ দেবার জন্য সকলে প্রস্তুত হ’তে লাগলেন। উৎসুক আনন্দের অসীমতার অতো নীতেও সকলেই সাতটার মধ্যে স্থান সেরে চা খেয়ে প্রস্তুত হলেন এবং উপাসনা মন্দিরে এসে সমবেত হলেন। আজকের উপাসনার রবীন্দ্রনাথ পৌরোহিত্য করবেন মেনে আনন্দে চকল হ’য়ে উঠলাম।

৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা দিবস—একথা অনেকেই জানেন নিশ্চয়। প্রতি বৎসর এই দিনে এখানে উৎসব ও নানারূপ আমোদ আক্লাদ ও সম্মেলনের আয়োজন হয়। গুরুদেব উপস্থিত থাকলে উৎসবের আনন্দ আরো বেড়ে যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। ইনি প্রথমে সামান্য একটি

টোলের মত ছোট প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন—উপাসনা ও ধর্মালোচনার জন্য। শহরের কলরবমুখর জীবনে শান্তি লাগলে তিনি এখানে একছদ্দিন থেকে আনন্দ ও শান্তি পেতেন। এই ছোট প্রতিষ্ঠানটুকুকে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বর্ধিতকলেবর ও বিশ্ববিস্তৃত করেছেন।

বীরভূম জিলার বোলপুর স্টেশন থেকে দুমাইল দূরে একটি অপেক্ষাকৃত উঁচু ও খোলা জায়গায় শান্তিনিকেতন অবস্থিত; স্থানটি যেমন মনোরম তেমন স্বাস্থ্যকর। শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্য ও কর্মক্রম সকলেরই কিছু কিছু জানা আছে—তাছাড়া এখানকার অরূপ বিদ্যালয়, শ্রীনিকেতনের শির শিকল ও বিশ্বভারতী আজ শিক্ষিত সমাজে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সকলেরই পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজের সমস্ত টাকাই বিশ্বভারতীকে দান করেছেন এবং তাঁর সমস্ত লেখার কপিরাইট (স্বত্ব) বিশ্বভারতীর বিস্তারিত আছে—যার ফলে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়াও অবশ্য ভারতবর্ষের ওখা পৃথিবীর বহু ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানকে অর্থসাহায্য করছেন এবং বহুশ্রী ও নিপুণ ব্যক্তি শান্তিনিকেতনের উন্নতি-বিধানকল্পে কার্যিক ও মানসিক পরিশ্রম করেছেন। আজকাল নানারূপে উন্নত হ'য়ে শান্তিনিকেতন তীর্থস্থানের মত প্রিয় হয়ে উঠেছে—কত দূর দূরান্তর থেকেই, যে দর্শক ও পর্যটক আসে তার ইয়ত্তা নেই।

ঠিক সাতটার রবীন্দ্রনাথ উপাসনা মন্দিরে উপস্থিত হলেন। আজ রবীন্দ্রনাথকে খুবই কাছে থেকে দেখতে পেলাম। রবীন্দ্রনাথকে ঘাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন যে এরূপ স্মৃতি ও স্মদর্শন পুরুষ দেখা সৌভাগ্যের কথা। আমি তো বলি যে রবীন্দ্রনাথ যদি কবি বলে পৃথিবীতে খ্যাত নাও হতেন তবু শুধু স্মপুরুষ বলেই পৃথিবীতে তাঁর একটা খ্যাতি অনায়াসে থাকতে পারত। সেদিন

দেখলাম শুভ্র বেশ শুভ্র বেশ একটু হাল্কা দেহ (বয়সের আধিক্যের জন্যই) এসে উপাসকের আসন গ্রহণ করলেন এবং আমার বোধ হ'লো ছবিতে বা ফটোতে আমরা তাঁর যে চেহারা দেখি তাতে তাঁর প্রকৃতরূপের সত্য আভাস একেবারেই পাওয়া যায় না। দেহের সে দিবা কান্তি বা নয়নের সে প্রসন্ন স্নকুমার দৃষ্টি ক্যামেরা বা শিল্পীর তুলিতে ধরা দেয় না। বাই হোক সেদিন রবীন্দ্রনাথের গান, উপাসনা ও বক্তৃতা যা শুন্গাম তাতে আমার মন ভরে গিয়েছিল। তখন ইতালী ও হাবসবুয়ের যুদ্ধ চলছিল এবং এ বিষয় তাঁর বক্তৃতা বিশেষ মর্মস্পর্শী হয়েছিল। বিশ্বকবির কোমল হৃদয় ক্ষমতালাভের এই বীভৎস হানাহানিতে যে কিরূপ ক্ষতবিস্তৃত হচ্ছিল তা তাঁর অনমুকরণীয় ভাষায় অভিব্যক্ত করেছিলেন, আন্তর্জাতিকতা ও মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধের মহান নীতি যিনি আজীবন পুষ্ট, গুষ্ট, সংগীতে এবং নানা সুযোগে সর্বরূপ ব্যক্ত করেছেন—তাঁর কাছে এ যুদ্ধ যে নিষ্ঠুর, নিরর্থক ও মানিকর মনে হবে তা আর আশ্চর্য কি? পরিতাপের বিষয় এই যে মানুষের সততার, মানুষের ব্যবহারে তাঁর অগাধ বিশ্বাস তিনি কোন্‌তে কোন্‌তে একদিন স্মৃষ্টিকর্তাকে প্রণয় করেছিলেন—

যাহারা তোমার বিবাইছে বায়ু

নিভাইছে ওব আলো

তুমি কি তাদের ক্ষমা করিরাছ

তুমি কি বেসেছ ভাল?

আজন্ম আশাবাদী ও শান্তির দূত যিনি সেই রবীন্দ্রনাথকে যে কত হৃৎথে বসতে হয়েছিল—

“শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস...”

তা ভেবে দেখতে হয়।

ন'টার মধ্যে উপাসনা শেষ হ'লো—রবীন্দ্রনাথ উঠে চলে গেলেন। সকলে বাইরে এলাম। আমি গতকাল রাত্রে আমার এখানকার একটি পরিচিত ভদ্রলোককে খুঁজতে চেষ্টা করিনি—আজ তাঁকে পেলাম—তিনি বিশ্বভারতী প্রেসে কাজ করেন। তিনি আমাকে সংগে ক'রে সব ঘুরে ঘুরে দেখালেন। প্রথমেই শিশুনিকেতন; এখানে ছোট ছেলেরা থাকে, এবং এত ছোট ছেলেরাও থাকে যে রাত্রে পড়ে ঘাওয়ার ভয়ে খাটের চারিদিকে রেলিং দেওয়া আছে। এত ছোট শিশুদের নেওয়া হয় ভেবে অবাক লাগে। এই শিশুদের আনন্দ দেবার জন্য এবং তাদের কোতুহলী মনকে তৃপ্ত করার জন্য শিশুদের উপযোগী কত ছবিই যে দেওয়ালে ও ছাদে শিরাচার্য নন্দলাল বসু ও তাঁর শিষ্যেরা এঁকে রেখেছেন তার শেষ নেই। এতে ক'রে শিশুদের সৌন্দর্যবোধও বেড়ে যায়।

লাইব্রেরী দেখলাম—এখানে দেওয়ালে বাইরের দিকে নন্দলালবাবুর আঁকা অতি উচ্চাঙ্গের সব Wall-painting আছে। সত্যি, আর কিছু না-হোক শুধু নন্দলালবাবুর চিত্রাবলী দেখার জন্যও শান্তিনিকেতনে ঘাওয়ার মার্কিতা আছে। লাইব্রেরীর ভিতরে গিয়ে দেখি—পৃথিবীতে যেন বই ছাড়া কিছু নেই। পরে শুনেছি যে শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরীর মত এত বড় প্রতিষ্ঠান অল্পই আছে—বিশেষতঃ সংস্কৃত, চীনা ও পারস্যভাষার পুস্তক নাকি একসঙ্গে এত কোথাও নেই। প্রসংগক্রমে বলা উচিত যে এর দু'এক বছর পরে বোধহয় শান্তিনিকেতনে চীনাভবন প্রতিষ্ঠিত হয়। আজকের এই উৎসবেও বহু চীনা ভদ্রলোক এসেছেন দেখলাম। এদের দু'চারজনকে সংগে আলাপ করে দেখেছি, এরূপ অমারিক ও ভদ্রমন বাক্তি বড় খেঁজা যায় না। ভাগ্যবশতঃ অতিথিণালয় খাবার সময়

আমার প্রতিবেশী ছিলেন একটি চীনা যুবক। খেতে খেতে তাঁর সংগে আলাপ ও বহরকম গল্প হ'লো—ভদ্রলোকটির নাম কিন্তু আমি মনে রাখতে পারিনি। কিন্তু তাঁর অমারিক ব্যবহার এবং বাংলা দেশ বাংলা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর কথাবার্তা শুনে ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়েছিলাম। লাইব্রেরীতে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ পুস্তক শূপের মধ্যে বাকি আবিষ্কার। করলাম—তিনি পূজনীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন—এঁকে আমি কোনদিন দেখিনি—তাই আলাপ করার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু তিনি পুস্তক পাঠে এতই বিভোর ছিলেন যে সে লোভ সম্বরণ করলাম। তাঁর অনেক লেখা পড়েছি এবং আমার বিশ্বাস তাঁর মত সত্যিকারের পণ্ডিত লোক অতি অল্পই আছেন।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বতন বাসগৃহ ঘুরে দেখলাম। রবীন্দ্রনাথ তেমন সুস্থ নন ব'লে তাঁর সংগে বিশেষ প্রয়োজন না-হ'লে কেউ দেখা করে না। ছাত্রদের বাসগৃহ দেখলাম, এদের অতিশয় সাদাসিধেভাবে থাকতে হয়—আসবাব কিছু নেই। নিজেদের অনাড়ম্বর আবাসগৃহ নিজেদের হাতেই পরিচ্ছন্ন করতে হয় এবং শান্তিনিকেতনের সুকঠোর নিয়মাদি কার্যমানে পালন করতে হয়। বাইরে অনেকের ধারণা যে এখানে ছেলেরা বদুচ্ছ জীবন যাপন করতে পারে কিন্তু আসলে ঠিক তা নয়। এরা সবাই বেশ সজীব, সপ্রভিত এবং অতিথিদের সাহায্য করার জন্য উন্মুখ। এই শেষোক্ত গুণটি আমার বড় ভাল লেগেছে। অল্প সময়ের মধ্যেই এখানকার ছাত্রছাত্রীদের সংগে একটা হৃদয়তা জন্মেছিল যার মাধুর্য এখনো মনকে দোলা দেয়।

আমার মনে হ'লো এখানে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অবাঙালী বেশী এবং অবাঙালীর মধ্যে গুজরাতী বেশী।

খাওয়াদাওয়ার পর বাইরে এসে দেখি—বাপরে! বিরাট মেলা বসে গেছে যে! নাগরমোলা, বাত্রাগান, সাঁওতালী মেয়েদের নাচ, সাফী, চুড়ি, মিঠাই ও খেলনার দোকান সবই আছে—আর আছে বিবিধ ও বিচিত্র প্রকারের মানুষের ভিড়। এরা কেহ আশেপাশের গ্রাম থেকে আবার কেহ দূরের শহর থেকেও এসেছে—বাই হোক অভাব কিছুই নাই—আমিও ভিড়ে মিশে গেলাম। তেঁপু বাজিরে, নাগরমোলার চেপে, হুলা করে কটখানেক পরে বাত্রাগান শুভে গিয়ে বসলাম। বাত্রার দল কাছের কোন গ্রাম থেকে এসেছে—পালা হচ্ছে ‘সীতা উদ্ধার’। তখন লংকাদহন হচ্ছে—আর হনুমানের কী দাপট ও আশ্চর্য। অন্যায় রকম লম্বা একটি পুচ্ছের তাড়নার ঠেক তো কট্টেই শ্রোতাদেরও হনুমান ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিল। এমন সময় কয়েকটি শীর্ণকার রাক্ষস হনুমানকে ধরতেই তার বিরাট চীৎকারে চতুর্দিক প্রকম্পিত হলো। মানুষের ভাষার (বীরভূমের টান রয়েছে) সে বলল—খপরদার আমাকে ধরিস্ নাই। ছেড়ে দে কানে, লম্বা তো, মারবো, মাইরি মারবো, মেরে মাথা কেটিয়ে দেব।” ভয়ে উঠে এলাম। যে হনুমান স্বর্গকে বঙ্গলদাবা করতে পারে এবং গন্ধমাদন পর্বতকে টাঁকে ওঁড়ে অনারাসে নিয়ে আসতে পারে সে যদি মাথা ‘কেটিয়ে’ দেব বলে শাসার তবে হংকল্প হয় না এমন বলিষ্ঠ হৃদয় আমার নয়। তবে বলিষ্ঠহৃদয় ব্যক্তি সেখানে ছিলেন বারা আমার উঠে আসার পরেও হনুমানের ধমক উপেক্ষা করে, বাত্রা শুভে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে এলাম যেখানে তীরধনুকের খেলা হচ্ছে। আজকাল বন্দুকের কল্যাণে তীরধনুকের আর রেওয়াজ নেই যদিও, তবু সাঁওতালদের মধ্যে এ জিনিষের কদর এখনো আছে এবং ছাঁচার জনকে সাধারণ মনে হলেও বেলীর ভাগ

সাঁওতালই শরসন্ধানে এমন নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিল যে তাক লেগে গিয়েছিল।

বেলা তিনটে নাগাদ একখানা মোটর স্কুলে শ্রীনিকেতনে বাচ্ছিল—সুযোগ বুঝে উঠে পড়লাম। শ্রীনিকেতন ছাত্রছাত্রীদের শিল্পশিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠান। এখানে নানাপ্রকার কাজ হাতেনাতে দেখানো হয়, হুতার, চামড়ার, তাঁতের, আরো অনেক। বাঙলা দেশে বহু প্রদর্শনীতে শ্রীনিকেতনের জিনিষপত্র দেখা যায়। প্রায় বর্টখানেক ঘুরে প্রতিষ্ঠানটি দেখলাম এবং শুনলাম বিশ্বভারতীর একজন যুরোপীয় অধ্যাপক বহু অর্থ দিয়েছেন এই শ্রীনিকেতনের উন্নতিবন্দে।

সন্ধ্যাবেলার আন্তঃস্বামী পোড়ানো দেখতে সকলে খোলা মাঠে এসে উপস্থিত হলাম। দেশী নানারকম বাজীর খেলা প্রায় বর্টখানেক দেখা গেল। এখানেও বহুবিধ পোষাকের বিদেশী লোক দেখা গেল। প্যান্ট কোট পরা অথচ খড়ম পায় ছাটী করাসী ভদ্রলোককে দেখলাম—এরা মোটরে বেঝিয়েছেন পৃথিবী ভ্রমণে। রঙীন খড়ম পছন্দ হওয়ার পায় দিয়ে অনভ্যস্তভাবে খুব বেড়াচ্ছেন। এই দিনের উৎসবে শান্তিনিকেতনের পূর্বতন অনেক ছাত্রছাত্রী সমবেত হয় এবং নির্দোষ আমোদপ্রমোদের সব ব্যবস্থাই থাকে দেখলাম।

সাধারণের ধারণা কবিজাতীর লোকগুলা যেমন অলস, তেমন বাস্তবজ্ঞানহীন—হয়ত কোনও কোনও কবির পক্ষে এ কথা সত্য হ’তে পারে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ অসত্য উক্তির প্রমাণ হ’য়ে গেল শান্তিনিকেতন ঘুরে। কী বিরাট সংগঠন শক্তি, পরিচয় ও ঐকান্তিক

যত্নের ফলে যে একপ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে
তা চিন্তা করাও কঠিন অথচ এর প্রত্যেকটি কাজের
পিছনে রবীন্দ্রনাথের পরিশ্রম ও শ্রম আছে। অদ্বৈতকর্মা
রবীন্দ্রনাথ এবং অদ্বৈত তাঁর ব্যক্তিত্ব নইলে অধ্যাপক
কিতিমোহন সেনের স্থায় পণ্ডিত, ভগদানন্দ রায় প্রমুখ
অধ্যাপক ও নন্দলাল বসু প্রভৃতির স্থায় শিল্পী কেন
শাস্তিনিকেতনকে জানে, গরিমায়, উজ্জল ও মধুর করে
রেখেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও চিরস্থায়িত্ব
সকলেরই কাম্য।

বাড়ী কিরগাম যখন সারাদিন চক্রাকারে ঘুরে তখন
শ্রান্ত ছিলাম, তবুও আনন্দের স্বাভাবিক ও স্থায়ী মাঝে
মন বলছিল—

“যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
অলিয়া অলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হ’তে রূপে
প্রাণ হ’তে প্রাণে।
নিশীথে প্রভাতে
বা কিছু পেরেছি হাতে
এসেছি করিয়া কয়
দান হ’তে দানে
গান হ’তে গানে।”

বিহাতি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বিদেশেতে বাসোদ্ভানে আনন্দ উৎসবে
পেরেছিলাম সাদর নিমন্ত্রণ,
সে কি ফুলের সমারোহ। হয়নি নাহি হবে—
হরেক রকম ফুলের উপবন।

(২)

২৭ কত, গন্ধ কত, কত রকম নাম
চেনা ফুলের সংখ্যা অতি কম,
নাইকো চাঁপা, নাগেশ্বর কি কমল অভিরাম
যুঁই কি বেলা মিষ্ট মনোরম।

(৩)

আনন্দ ও আশাশ্রিত্যের পাই না বেন ওর
তবু কিসের অভাব ঠেকে মনে,
পায়ের কাছে বিছুতি গাছ ছইটী পাতা ছোড়
ঠেকলো পায়ের অম্বনি শুভক্ষণে।

(৪)

চিন্তিনিরে উঠলো পাটি চিন্তে পেরে তারে
মুখে আমার ধরছে না যে হাসি,
ওরে আমার বন্ধু দেনী লুকিয়ে ছিলে আড়ে
দেখতে তোমার পাইনি হেথায় আসি।

(৫)

ভিন্ন দেশের আবহাওয়াতে বদলে গেছে জাহা
চেহারা তোর, ডাঁশ মধুপ তাই,
চিন্তে তোমার পারিনি কো বাঃ রে বিদেশ বাহা
করলে আলাপ হল ফুটায় তাই।

কুচবিহারে সবজীচাষ

শ্রীসুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায় বি-এ

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে খাদ্যসমস্যাই সর্বপ্রধান সমস্যা। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার একটা বড় অংশ অর্কশনে দিন কাটায়, কারণ ভারতবর্ষে যে খাদ্য জন্মায় তাহা সমস্ত দেশবাসীর পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। অন্তর্দেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিয়া এই অভাব পূর্ণ করিতে হয়, কিন্তু গত মহাযুদ্ধের সময়ে সে সুবিধা ছিল না। তখন হইতে খাদ্যসমস্যা অত্যন্ত তীব্রভাবে দেখা দেয় এবং সরকার ও দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ইহার প্রতীকারের চেষ্টা করিতেছেন। সমস্যাটি যখন খাদ্যাভাব—তখন অধিক পরিমাণে শস্ত জন্মানই ইহার প্রতিকার। কাজেই যথাসম্ভব অধিক জমিতে শস্তাদি জন্মাইতে হইবে। কোন জমি ফেলিয়া রাখা চলে না।

সহরে বাহারা বাস করেন তাঁহাদের গৃহসংলগ্ন জমিতে নানাপ্রকার ভুক্তিরকারী উৎপাদন করিয়া তাঁহারা নিজ নিজ পরিবারের জন্য কিছু খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে পারেন। কুচবিহার সহরে অনেকেরই বাড়ীতে সবজী চাষের উপযোগী কিছু না কিছু জায়গা আছে। কুচবিহারের জমি এবং আবহাওয়া অনুযায়ী কি কি সবজী জন্মান চলে তাহাই এই প্রবন্ধে বলা হইতেছে।

জমী প্রস্তুত প্রণালী—সবজীচাষের জন্য এমন জমি বাছিয়া নিতে হইবে যাহা প্রচুর রৌদ্র পায়। জমি উচু হওয়া দরকার যাহাতে জল না দাঁড়ায়। প্রথমতঃ জমিটি উত্তমরূপে ঝিরিয়া কতকগুলি ছোট ছোট অংশ বা কেয়াবীতে ভাগ করিয়া নিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেক অংশের চারিপাশ দিয়া আসা বাওয়া করা যায় এবং

সহজে জল সেচন করা চলে। ১২ ফুট লম্বা ও ৬ ফুট চওড়া করিয়া কেয়াবী প্রস্তুত করিতে হয়। ইহার উপরিভাগ বেশ সমতল করিয়া দিতে হয় যাহাতে সমস্ত স্থানে জল সমান ভাবে ছড়াইয়া যাইতে পারে। জমির উপরিভাগ হইতে ২ফুট পর্যন্ত খুঁড়িয়া সমস্ত মাটি শুঁড় করিতে হইবে। তারপর উপযুক্ত পরিমাণ সার মিশ্রিত করিয়া সেই মাটি প্রস্তুত করিতে হয়। মাটি বেশ খুরখুরে থাকে দরকার যাহাতে ভিতরে বাতাস প্রবেশ করিতে পারে। কিছুদিন পর পর ছোট কোদাল দিয়া জমি নরম করিয়া দিতে হয় এবং আগাছা তুলিয়া ফেলিতে হয়। শুধু সার দিলেই ভাল সবজী জন্মায় না। জমি প্রস্তুত করিবার দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কখনও বেন মাটি শক্ত হইয়া না যায়।

সাধারণতঃ গোবরের সারই জমির পক্ষে উৎকৃষ্ট। হাজার বর্গফুট পরিমাণ জমিতে দুইগাড়ী সারের প্রয়োজন। পচা পাতার সারও সবজী চাষের পক্ষে অতি উপযোগী। কোদাল বা লাঙ্গলের সাহায্যে জমিতে চাষ দিয়া সার ছড়াইয়া দিতে হয়। পরে ঘাস ও অন্যান্য আগাছা বাছিয়া ফেলিয়া মাটির সহিত সার উত্তমরূপে মিশ্রিত করিতে হইবে। মনে রাখা দরকার যে মাটি বেন বেশ আলাগা থাকে, কোথাও চাপ ধরিয়া শক্ত হইয়া না যায়। কেহ কেহ রাসায়নিক সারও ব্যবহার করেন। বর্তমান সময়ে ইহার মূল্য অধিক বলিয়া ইহার ভেদন প্রচলন নাই।

চারার—

চারার প্রস্তুতের জমি চারিপাশের জমি হইতে কয়েক ইঞ্চি উচু, ৫৬ ফুট লম্বা এবং ৩৪ ফুট চওড়া হইবে। এক ডালি সার দিলেই কাজ চলিবে। প্রতি সারিতে ৪ ইঞ্চি ব্যবধানে বীজ বুনিতে হয় এবং সারিগুলি কাছাকাছি থাকিবে। সকালে অথবা বৈকালে জল ছিটাইয়া অল্প না উঠা পর্যন্ত বীজভূমিকে সিক্ত করিতে হয়। অল্প উঠিলে রোজ জল না দিলেও চলে।

জলসেচন—

জলসেচন ভাল না হইলে উত্তম সবজী উৎপাদন করা যায় না। অবশ্য আবহাওয়া, জমির রকম এবং সবজীর প্রকারের উপর জল সেচন নির্ভর করে। মোটামুটি নিয়ম এই যে এরূপ ভাবে জলসেচন করিতে হইবে যাহাতে গরমের দিনে ২৪ ঘণ্টা পর এবং শীতকালে ৪৮ ঘণ্টা পর খুরপি দিয়া জমি নিড়াইয়া দেওয়া চলে। প্রতিবার জল সেচের পর জমির উপরিভাগ নরম করিয়া দিলে ভাল হয়।

কয়েকটি সাধারণ নিয়ম—

(১) নিয়মিতভাবে ক্ষেত হইতে আগাছা তুলিয়া দিতে হয়।

(২) পোকামাকড় বাহাতে গাছ নষ্ট না করে সে দিকে নজর রাখিতে হইবে। অর্জসের পরিমাণ তামাক-পাতা চূর্ণ পাঁচসের জলে ২৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল ছাঁকিয়া নিতে হয়। পরে আরও দশসের পরিমাণ জল ইহার সঙ্গে মিশাইয়া সেই জল ক্ষেতে ছিটাইয়া দিলে পোকামাকড় থাকে না।

(৩) ক্ষেতের একই অংশে প্রতি বৎসর একই তরকারি বা একজাতীয় তরকারি (যেমন লক্ষা, বেগুন,

কিলাতী বেগুন) উৎপাদন না করিয়া এক এক বৎসর এক এক রকম সবজী চাষ করিলে জমিও ভাল থাকে এবং ফলও ভাল হয়।

(৪) যে সব বীজের খোসা পুরু সেই সব বীজ পূর্বে জলে ভিজাইয়া মাটিতে অন্ততঃ তিন ইঞ্চি নীচে বপন করিতে হয়। অন্যান্য বীজের উপরে একটা আলগা মাটির স্তর থাকিলেই চলে। বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য বীজভূমিকে আচ্ছাদিত রাখিতে হয় কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন রোদ্দ একেবারে বন্ধ না হয় কারণ তাহা হইলে চারা দুর্বল হইয়া পড়িবে। বীজ-ভূমিতে কাঠের ছাই ছিটাইয়া দিলে পোকামাকড়ের উৎপাত থাকে না। চারপাঁচটি পাতা বাহির হইলে চারা তুলিয়া ক্ষেতে বপন করা চলে। চারা তুলিয়া নিবার পূর্বে বীজভূমিকে জলদিয়া ভাল করিয়া ভিজাইয়া দিতে হয়। তারপর ছোট খুরপি দিয়া এমনভাবে চারা তুলিয়া নিতে হইবে যাহাতে শিকড়ের সঙ্গে কিছু মাটি থাকে। চারা কখনও টানিয়া তুলিতে নাই। ক্ষেতে চারা বসাইয়া চারার চারিপাশের মাটি একটু চাপিয়া দিতে হয় এবং চারা না লাগিয়া যাওয়া পর্যন্ত সপ্তাহে দুইতিনদিন প্রাতঃকালে বা সন্ধ্যায় জল সেচন করিতে হয়।

(৫) সব সময়ে ভাল বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে। সমস্ত বীজ একসঙ্গে বপন না করিয়া কিছুদিন পরপর বপন করিলে একই তরকারি অনেকদিন ধরিয়া পাওয়া যায়।

বর্ষাকালের সবজী

কুমড়া, করলা, খিঙা, শশা প্রভৃতি সবজী বর্ষাকালে চাষ করা হয়। এই জাতীয় সবজীর গাছ লতাইয়া

চলে এবং প্রচুর সার না দিলে এই সবস্বী ভাল হয় না। গোবর এবং পাচপাতার সার দিলে ফসল ভাল হয়। ফুল ফুটিবার পূর্বে পর্যন্ত প্রচুর জল দেওয়া প্রয়োজন। এই জাতীয় গাছ পোকামাকড় দ্বারা আক্রান্ত হয়। সকালবেলা বধন পাতা ভিজা থাকে তখন পাতার উপর কাঠের ছাই ছড়াইয়া দিলে পোকা বসিতে পারে না।

করলা—ইহা প্রকার করলা আছে। একপ্রকার আকারে ছোট হয়। ইহাকে উচ্ছে বলে। অপর প্রকার আকারে বড় হয়। ইহাই করলা নামে পরিচিত। মার্চ মাস হইতে জুন মাস পর্যন্ত করলার চাষ চলে। সাধারণতঃ বর্ষার পূর্বেই বীজ বপন করিলে বর্ষাকালে বেশ ভাল ফসল পাওয়া যায়। গাছ বড় হইলে মাচানে তুলিয়া দিতে হয়।

ঝিঙা—সর্বপ্রকার জমিতে ঝিঙার চাষ চলে কিন্তু অল্পসারযুক্ত জমিতে ঝিঙা জন্মে ভাল। বর্ষার ঠিক পূর্বে সারি করিয়া এককুট অন্তর বীজ বুনিয়া দিতে হয় এবং গাছ বড় হইলে মাচানে লতাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রতি চার দিন পর জল দিলে চলে। অবশ্য বৃষ্টি নামিলে জল দিবার প্রয়োজন নাই।

চালকুমড়া—মে মাসের মধ্য হইতে জুলাই মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত অল্প বালি আছে এরূপ জমিতে চাল কুমড়ার চাষ ভাল হয়। আড়াই ফুট ব্যাসার্ধের একটি অগভীর গর্ত করিয়া তাহার মধ্যে খড় কুটা, ওকনা পাতা ইত্যাদি আবর্জনা কেলিয়া তাহা আগুন দিয়া পুড়াইয়া দিতে হয়। তারপর এক ডালি গোবরের সার ঐ ছাইয়ের উপর ঢালিয়া উত্তমরূপে ছাইয়ের সঙ্গে মিশ্রিত করিতে হয়। এখন ইহার উপর চালকুমড়ার বীজ আগান চলে। এরূপ এক একটি স্থানে চারটি

করিয়া গাছ হইতে পারে। চালকুমড়া গাছে প্রচুর জলের প্রয়োজন।

মিষ্টিকুমড়া—ইহা দুই প্রকার। এক প্রকার শীতকালে এবং অপর প্রকার বর্ষাকালে জন্মে। প্রচুর সার আছে এরূপ জমিতে মিষ্টিকুমড়ার চাষ করিতে হয়। বর্ষাকালের কুমড়ার বীজ মে মাস হইতে জুলাই মাস পর্যন্ত বপন করা চলে। এক জাতীয় পোকা কুমড়া নষ্ট করিয়া ফেলে। এক ছটাক পরিমাণ লেড্ অর্সেনেট (Lead arsenate) ৮ সের জলে গুলিয়া তাহার সহিত আধসের গুড় মিশ্রিত করিয়া সেই জল ক্ষেতে ছিটাইয়া দিলে পোকের উৎপাত থাকে না। বর্ষাকালের কুমড়ার গাছ মাচানে তুলিয়া দিতে হয়। কুচবিহারে কুমড়ার বেশ চাহিদা আছে।

শশা—মার্চ হইতে জুন মাস পর্যন্ত শশার চাষ চলে। বাহির হইতে বীজ আমদানী না করিয়া স্থানীয় বীজ ব্যবহার করিলে সুকল পাইবার সম্ভাবনা। সারযুক্ত দোআশ জমি শশা চাষের উপযোগী। তিন চার মাস ধরিয়া এক একটি গাছ হইতে ফল পাওয়া যায়। লালবর্ণের এক প্রকার কীট শশার চারা নষ্ট করিয়া ফেলে। গাছের পাতার কাঠের ছাই ছড়াইয়া দিলে পোকা আসে না।

ফুটি—কেতুগারী ও মার্চ এই দুই মাস এই স্থানে ফুটির চাষ ভাল হয়। চার ফুট অন্তর এক একটি বীজ সারি করিয়া বুনিতে হয়। ছইটি সারির দূরত্ব পাঁচ ফুট হইবে। গাছ মাটিতে লতাইয়া চলে। কাঁচা ফল রন্ধন করিয়া এবং পাকা ফুটি ফল হিসাবে আহার করা চলে।

চেডস—এই গাছ প্রায় ৭৪ ফুট উঁচু হয়। এক প্রকার চেডসের ফল ধর্মাকার এবং অপর প্রকার প্রায় ৮।১০ ইঞ্চি লম্বা হয়। বর্ষাকালে যে কোন সময়ে চেডসের

চাষ করা চলে, দুই ফুট অন্তর বীজ বুনতে হয় এবং
যে কোন জমিতে ঢেড়স জন্মে। বীজ বপনের ৬৭ সপ্তাহ
পর হইতে ফল পাওয়া যায়। নরম অবস্থায় ফল তুলিয়া
নিতে হয়।

বেগুন—বেগুন শীত, গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই চাষ
করা চলে এবং সারা বৎসরই বেগুন পাওয়া যায়। দো-
আশ মাটি এবং যেখানে বেশী জৈবপদার্থ নাই ও জল জমে
না। এরূপ মাটিতে বেগুনের চাষ ভাল হয়। অধিক জৈব
পদার্থ থাকিলে গাছ তেজী হয় বটে কিন্তু ফলন ভাল হয়
না। চারা প্রস্তুত করিয়া পরে সেই চারা ক্ষেতে লাগাইয়া
দিতে হয়। আঠার ইঞ্চি পর পর এক একটি গাছ
বসাইতে হয়। হাজার বর্গ ফুট জমিতে আধ ছটাক বীজ
যথেষ্ট। শীতের বেগুনের ফলন বেশী।

লক্ষ্য—

শীত এবং বর্ষা উভয় ঋতুতেই লক্ষ্য চাষ হয়। নানা
রকমের লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। লক্ষ্য চারা প্রস্তুত
করিয়া চারা একবার লাগাইয়া দিলে আর বেশী দেখাওনা
করিবার প্রয়োজন নাই—মাঝে মাঝে জল
দিতে হয়। এবং আগাছা বাছিয়া ফেলিতে হয়।
হাজার বর্গ ফুট জমিতে প্রায় আধ ছটাক বীজ লাগে।

শাটনের 'কলোসাল', 'স্প্যানিশ', 'জায়াট', এবং 'গোল্ডেন
কুইন' অতি উত্তম লক্ষ্য। যে জুন মাসে চারা লাগাইলে
সেপ্টেম্বর হইতে ফল পাওয়া যায়।

পেঁপে—ফল এবং তরকারী হিসাবে পেঁপের স্থান
অতি উচ্চ। এই গাছ সহজেই জন্মান চলে। গাছের
গোড়ের জল জমিলে গাছ মরিয়া যায়। বীজ হইতে চারা
প্রস্তুত করিয়া সেই চারা জমিতে লাগাইবার উপযোগী
হইয়া উঠিতে প্রায় দুই মাস সময় লাগে। পাঁচফুট
অন্তর এক একটি গাছ লাগাইতে হয়। পুরুষ এবং স্ত্রী
দুই জাতীয় পেঁপে গাছ দেখা যায়। ফল না ফোটা
পর্যন্ত কোনটি জিক জাতীয় গাছ বোঝা যায় না।
সেই ক্ষণ প্রথমে চারা একটু ঘন করিয়া লাগাইতে হয়
পরে পুরুষ গাছগুলি তুলিয়া ফেলিতে হয়। মার্চ এপ্রিল
মাসে বীজ বুনিলে যে জুন মাসে চারাগাছ ক্ষেতে লাগান
চলে। ষটাকালাই চারা বসাইবার পক্ষে উপযুক্ত সময়
দুই ফুট লম্বা, দুই ফুট চওড়া ও দুই ফুট গভীর এক একটি
গর্ত করিয়া সমস্ত মাটি তুলিয়া ফেলিতে হয়। পরে সেই
মাটিতে ইহার এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ সার মিশাইয়া গর্তটি
পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। মাটি একটু চাপিয়া বসাইয়া দিতে
হইবে। এখন এই স্থানে পেঁপের চারা লাগান চলে।

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

উপনদী

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রুতধা স্থির করিল—প্রথমে অশোককে জামিনে মুক্ত
করিতে হইবে। তারপর সাক্ষীসাবুদ যোগাড় করিয়া
প্রমাণ করিতে হইবে অভিযোগের কারণ একেবারেই
ভিত্তিহীন।

শ্রুতধা স্থির করিল চারঘাটে গিয়া সে চাষীদের লইয়া
নিজে সব ব্যক্তি করিবে; আর মৃত্যুর বাবাকে যেমন
করিয়াই হোক না কেন অশোকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান হইতে
বিরত করিতে হইবে। আর একবার প্রদোষদাকে বলিলে হয়

প্রদোষের কথা ভাবিতে সুলেখার কেমন মেনে আসতকের সৃষ্টি হইল। ইদানিং সে প্রদোষদার চোখেযুখে কেমন এক ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছে। যে প্রদোষদা তাহার শিক্ষক ছিল, এ বেন সে প্রদোষদা নয়। প্রদোষকে দেখিলে এখন তাহার শ্রদ্ধা না জাগিয়া আশঙ্কা জাগে। বিশেষ করিয়া অশোকের প্রতি তাহার জাগতিক বিদ্বেষের ভাব সুলেখা বহুবার লক্ষ্য করিয়াছে।

প্রদোষের কথা ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাহাকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সুলেখা কেমন বেন নার্ভাস হইয়া পড়িল। সে প্রস্থানোদ্যত হইল।

—কোথায় চলেছো লেখা?

প্রদোষের গম্ভীর কণ্ঠস্বরে সুলেখা অমুমান করিল ঝড়ের পূর্বলক্ষণ। শান্তকণ্ঠে সে কহিল—বিশেষ একটা জরুরি দরকারে।

প্রদোষ উত্তরকণ্ঠে বলিল—অদরকারে যে এই রাত্রে বার হোচ্ছনা তা আমি জানি। কিন্তু আমিও বিশেষ জরুরি দরকারে তোমার কাছে এসেছিলাম। আমার দরকারটা বোধহয় তুমি অমুমান করতে পারছো।

সুলেখা প্রদোষের এ কথার কোন উত্তর দিল না?

সুলেখার চিঠি পড়িয়া প্রদোষ বিস্মিত হইয়াছিল—হঠাৎ কা কারণে লেখা পার্টির সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতেছে? বিপিন এবং গ্রামের অপর দু'একজনের কাছ হইতে যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে তাহাতে তাহার ধারণা জন্মাইয়াছে অশোকই ইহার মুখ্য কারণ।

প্রদোষ কহিল—কী আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না বে? সুলেখা কহিল—মনটা আজ বড় অশান্ত প্রদোষদা। অশোকের জন্তে তবু দুর্ভাবনার পড়েছি। বিশেষ করে ও আমার ছোট ভাইয়ের বন্ধ। তুমি কিছু এ বিষয়ে যদি সাহায্য করো—

সুলেখার এই নিলজ্জ প্রস্তাবে প্রদোষ রাগে বাকুদফাটা হইল। লজ্জাহীনতার একটা সীমা থাকা উচিত! লেখা সেই সীমা অতিক্রম করিয়াছে। অশোক তার বিরুদ্ধবাদী—তাহার শত্রু। অশোকের প্রতি সুলেখার আকর্ষণ এতবেশী যে সে কথা প্রকাশ করিতেও লেখা লজ্জা অনুভব করিল না?

প্রদোষ প্রদীপ্ত কণ্ঠে কহিল—জানো অশোক আমাদের বিরুদ্ধবাদী?

সুলেখা উত্তর দিল—তবুও তোমাদের নীতির দিক থেকেও অন্ততঃ তাকে এ ব্যাপারে তোমার সাহায্য করা উচিত, প্রদোষদা! ক্ষমতাদৃষ্ট অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ক্ষমতাহীন দরিদ্র কৃষকের পক্ষ অবলম্বন করার অশোক আজ বিপদগ্রস্ত।

প্রদোষ ব্যঙ্গ স্বরে কহিল—তাই কীটা দিয়ে বুঝি কীটা তুলতে চাইছো লেখা? তোমার বুদ্ধির তারিক করি আমি। কিন্তু একটা কথা তোমার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আমি। নাটকীয় হলেও এ আমার অন্তরের সত্য—‘হয় কর্ণ নরপার্শ্ব ধরা হতে লইবে বিদায়!’

সুলেখা আর কোন বাক্যব্যয় না করিয়া উঠিয়া পড়িল। প্রদোষ বিজ্ঞাসা করিল—উঠছো বে? আমার জরুরি দরকারটা এখনও শেষ হয় নি তোমার সঙ্গে।

—কিন্তু আমার সময় নেই এখন প্রদোষদা। তোমার বা দরকার আমার কাছে তা লিখে পাঠিয়ে দিও। আর তোমার পাঠি সম্বন্ধে আমার সুনিশ্চিত অভিমত তোমাকে পূর্বাভাসেই জানিয়ে দিয়েছি! এ সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা করতে আমি অনিচ্ছুক।

সুলেখার কথার প্রদোষ আরও ব্যঙ্গ প্রকাশ করিয়া কহিল—কিন্তু পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনে তোমার এই নাটকীয় প্রেম অত্যন্ত বিসদৃশ, লেখা। আর এ কাহিনী

লোকের অবদিতও নেই। এরপর তোমার এখানে চাকরি করা হুঃসাধ্য হবে—সে কথাও ভেবে দেখো।

সুলেখা ক্রোধে গর্জন করিয়া উঠিল—প্রদোষবাবু। প্রদোষ ব্যঙ্গের হাসি—হাসিয়া কহিল—একেবারে দাদা থেকে বাবু? সুলেখা কঠিন স্বরে কহিল—হ্যাঁ। পরিচয়ের কোন সুত্রই তোমার সঙ্গে আমার আর থাকতে পারে না। এরপর তুমি আর আমার বাড়ি না এলে অন্ত্যস্ত খুশি হব।

হন্ হন্ করিয়া সুলেখা সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

অপমানিত প্রদোষ হাঃগুর মতন চুপ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল শুধু!

তারপর পৈশাচিক পরিকল্পনা মনে মনে আঁকিতে আঁকিতে সে সুলেখার গৃহ হইতে নিজ্জাত হইল।

অশোক কিছুতেই জামিন গ্রহণ করিবে না।

বিবেক, বুদ্ধি, কর্তব্য এবং আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যে কাজ সে করিয়াছে—আইনের চক্ষে যদি তাহা দোষণীয় হয় তবে তাহার জন্য সে শাস্তি গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নয়। আত্মপক্ষ সমর্থন করার নীতিগত দুর্বলতা প্রকাশ পায়।

পুলিশ তদন্ত এখনও চলিতেছে। তদন্ত শেষ হইলে কোর্টে বিচার আরম্ভ হইবে। বিচারের সময় অকপটে সকল কথাই স্বীকার করিবে সে। বিপিন ডাক্তারের বাড়ি কোন দিনই অশোক যায় নাই। তবে বিপিন ডাক্তারকে যে কথা বলিয়াছে সে তাহা তাহার বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ীই ব্যক্ত করিয়াছে। আইনতঃ কোন অপরাধও সে করে নাই।

নিজের জন্য তাহার কোন দুর্ভাবনা নাই। কিন্তু সনাতনের জন্য সত্যই সে চিন্তিত হইয়া

উঠিতেছিল। চারঘাট হইতে চাবীর দল প্রত্যহই আসে।

সেদিন তাহাদের মাঝে হঠাৎ সুলেখাকে দেখিয়া অশোক বিস্মিত হইয়া উঠিল।

সুলেখা উকীল সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। ওকালতনামা দিয়া এখুনি জামিনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

অশোক তাহাতে আপত্তি প্রকাশ করিল—না। লেখাদি, এ আমার নীতিবিরুদ্ধ।

অন্ত্যস্ত গম্ভীর হইয়া সুলেখা কহিল—ছেলেমানুষী করো না অশোক। জামিন তোমাকে নিতেই হবে। এ কেন আমরা কনডাক্ট করবো।

—আপনারা? মানে—ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি? অশোকের কথার তীক্ষ্ণতাকে উপেক্ষা করিয়া সুলেখা কহিল—না। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। তারা তোমার বিরুদ্ধবাদী। অশোক জিজ্ঞাসা করিল—তবে?

সুলেখা উত্তর দিল—আমরা মানে—আমি আর চারঘাটের সকল চাবীসম্প্রদায়। তুমি তাদের ভেতর যে নবজীবনের প্রেরণা জাগিয়েছ তা অহুত্রেই বিনাশ হ'তে দিতে পারিনে আমরা। তোমাকে দিয়ে আমাদের এখনও অনেক কাজ বাকী। অশোক বলিল—কিন্তু আমার নীতির সঙ্গে আপনার নীতির তো কোন সামঞ্জস্য নেই। আর রাজনৈতিক জীবনে আমরা পরস্পর বিরুদ্ধধর্মী।

সুলেখা বাধা দিয়া কহিল—আমার মতবাদের পরিবর্তন ঘটেছে, অশোক। কিন্তু সে আলোচনা এখন থাক—আমরা আগে তোমার জামিনের ব্যবস্থা করি।

অশোকের জীবনে আবার যেন মোহের মঞ্চার হয়। তাহার স্বপ্ন তবে সার্থক হইয়াছে? লেখাদি আজ

সত্যকার দৃষ্টি দিয়া তাহাকে চিনিয়াছেন? অশোকের প্রতিবাদের দৃঢ়তা কমিয়া গেল। সুলেখার নির্দেশে সে জামিন লইতে স্বীকৃত জানাইল।

অশোক এবং সনাতন জামিনে মুক্ত হইয়াছে। চারঘণ্টার ক্লমক সম্প্রদায় মাতিয়া উঠিয়াছে—নূতন উদ্বোধনার উদ্ভূত হইয়া। অশোক ডাক্তার এবং সনাতনকে মুক্ত করিতেই হইবে।

সুলেখা তাহাদের নবমস্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে। শক্তিহীনদের দল আজ শক্তিমস্ত্রে উদ্ভূত হইয়াছে। ঋষি, অন্তায়, ধর্ম, অধর্মকে তাহারা আর বিচার করিবে না। আপন শক্তির দ্বারা তাহারা জয় করিবে আপন অধিকার। বিরুদ্ধবাদীদের শায়েস্তা করিবে দৈহিক শক্তিমত্তার।

সর্বনাশা ধ্বংসের মত্ততার চাবীদের শীর্ণমাংসপেশীগুলি ক্ষীণ হইয়াছে। সুলেখার চক্ষের ক্রান্তি কালিয়া মুছিয়া গিয়া অগ্নিশিখার প্রদীপ্ততার ধ্বক্-ধ্বক্ করিয়া জলিতেছে।

একদিনেই সুলেখার চাকরি গেল। শুধু চাকরি যাওয়া নয় তাহার সঙ্গে অনেক কুংসিত মন্তব্য ও কানা-ফুসা চলিতেছে—অশোক ডাক্তারের সঙ্গে হেড মিস্ট্রিসের নীতি বিগর্হিত সম্বন্ধের অনেক তথ্যই নাকি প্রকাশ পাইয়াছে।

অশোককে সাসপেন্ড করা হইলে সে পদত্যাগ পত্র দাখিল করিল।

সুলেখার চাকরি যাওয়ার কারণ প্রদোষ। স্কুলের প্রেসিডেন্ট বিপিন ডাক্তারের পক্ষে। প্রদোষ এবং বিপিন ডাক্তারের প্ররোচনায় সুলেখার বিরুদ্ধে চার্জশীট গঠন করা হইল তাহার নৈতিক চরিত্র সম্ভাবজনক নয়। সুলেখার কর্মচ্যুতির সংবাদে অশোক বিষন্ন হইল। তাহার জন্য লেখাদির এই বিপর্যয়!

কিন্তু বহু অসুসন্ধান করিয়াও সুলেখার কোন সংবাদ পাইল না অশোক। আশ্চর্য! কয়েকঘণ্টার মাঝেই লেখাদি তাহার কোয়ার্টার ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।

সেই রাত্রেই এক বিপর্যয় ঘটিল।

কয়ানিষ্টে পাটির ক্যাম্প অগ্নিদগ্ধ হইয়াছে। কাহারো দলবদ্ধভাবে গভীর রাত্রে ক্যাম্পে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে—জিনিসপত্র ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া তচনচ্ করিয়াছে। প্রদোষ প্রকৃত হইয়াছে।

পরদিন সকালেই প্রদোষ দলবল লইয়া সরিয়া পড়িল। এখানে আর একদিন মাত্রও বাস করিলে নাকি তাহার প্রাণহানি ঘটিলার আশঙ্কা আছে।

যাহারা রাত্রে তাহাকে শাসাইয়াছে, তাহাদের কাহাকেও সে চেনে না এবং আশ্চর্যের ব্যাপার তাহাদের মধ্যে নারীবাহিনীও অন্তর্গত সজ্জিতা ছিল।

কড়া পুলিশবাহিনীও গ্রামের সর্বত্র টহলদারী করিতে লাগিল। জোড় পুলিশ তদন্ত চলিতেছে—কিন্তু ভ্রূতগণের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

কয়দিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে দুর্ধোগের প্রলয় চিহ্ন দারুণ বিপদের আসন্ন বিপর্যয়ের সূচনা প্রকাশ করিতেছে। বিরামহীন বৃষ্টির জলে নদী, ডোবা, পথ, ঘাট সব পরিপ্লাবিত হইয়া গেল।

ইছামতীতে বান ডাকিয়াছে। ইছামতীর বস্তার জোয়ারের প্লাবন আসিয়া উপনদীকে কুলে কুলে জল-প্রবাহে ভরাইয়া তুলিল।

একদিন অমাবস্তার ঘন অন্ধকার রাত্রে বড়ের দুর্ধোগে ইছামতীর উপকণ্ঠবাসিনীও রুদ্ধআক্রোশে গর্জন করিয়া পাড় ভাঙ্গিল।

সারাগ্রামে আভঙ্কের ঘনছায়া। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এই মরা নদীই নাকি একদিন গ্রাম ভাসাইয়াছিল। সে বস্তার কথা স্মরণ করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

ক্রমশঃ—

রাজপরিবারের সংবাদ

শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর কাশ্মীর হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন। তলপেটে তিনি একটি বেদনা অনুভব করেন এবং এক্ষরে চিত্র লইয়া অস্ত্রোপচার করা স্থির হয়। গত ২৩শে জুলাই এলগিন নাসিংহোমে তাঁহার তলপেটে অস্ত্রোপচার হয়। ২৫শে জুলাই তারিখের এক বুলেটিনে প্রকাশ মহারাজ ভূপ বাহাদুরের অবস্থা মোটের উপর সন্তোষজনক। মহারাজের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া মহারাজকুমার শ্রীইন্দ্রজিতেন্দ্র নারায়ণ কলিকাতা গিয়াছিলেন; ২৫শে জুলাই তিনি কুচবিহার প্রত্যাবর্তন করেন।

মাতৃ শ্রীমহারানী সাহেবা কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন। কাশ্মীরের মহারাজের আগমনে তাঁহার কাশ্মীর যাইবার কথা ছিল; কিন্তু মহারাজ ভূপ বাহাদুরের অসুস্থের জন্য যাত্রা স্থগিত রাখিয়াছেন।

স্থানীয় সংবাদ

প্রধান মন্ত্রীর ডেপুটেশন :—

কুচবিহারের প্রধান মন্ত্রী সর্দার ডি, কে, সেন মহোদয় দেশীয় রাজন্যবর্গের Negotiating Committeeর অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। এই কমিটির কার্যোপলক্ষ্যে সর্দার সেন গত ১২ই জুলাই হইতে রাজন্যমণ্ডলের চ্যান্সেলার বাহাদুরের নিকট ডেপুটেশনে প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে মহারাজ ভূপ বাহাদুর স্বয়ং নিজ হস্তে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন।

কুচবিহার আইন-সভার নির্বাচন :—

আগামী আগষ্ট মাসে কুচবিহার আইন সভার নির্বাচন হইবার কথা ছিল। মহারাজ ভূপ বাহাদুর আদেশ দিয়াছেন যে ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নূতন নির্বাচন হইবে। কুচবিহার শাসন আইনের ১৮ ধারা অনুসারে পুনরাদেশ পর্যন্ত বর্তমান আইন-সভার আয়ুষ্কাল বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

সুনীতি একাডেমির ম্যাট্রিক পরীক্ষার

ফল :—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় স্থানীয় সুনীতি একাডেমির ফল অত্যন্ত সন্তোষজনক হইয়াছে।

১২ জন ছাত্রী পরীক্ষা দিয়াছিল। তন্মধ্যে ১১ জন পাশ করিয়াছে। পরীক্ষার পাশের হার শতকরা ৯১.৬ জন; বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের হার শতকরা ৫৮ জন। একাডেমির এই ফলের জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দিত করিতেছি।

ভিক্টোরিয়া কলেজের বি-এ পরীক্ষার ফল :—

এই বৎসর স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেজ হইতে ৩৭ জন ছাত্রছাত্রী বি-এ পরীক্ষা দিয়াছিল; তন্মধ্যে ২১ জন পাশ করিয়াছে। উত্তীর্ণদিগের মধ্যে তিন জন ডিষ্টিন্শন

পাইয়াছে, তন্মধ্যে একজন ছাত্রী। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের হার শতকরা ৫২.৮ জন; কলেজের পাশের হার শতকরা ৫৭ জন; এই ফল সন্তোষজনক।

মহারাজ ভূপ বাহাদুরের পীড়া—

রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী সর্দার ডি, কে, সেন মহোদয় ডেপুটেশনে যাওয়ার মহারাজ ভূপ বাহাদুর স্বয়ং রাজকাৰ্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। তিনি পীড়িত হইয়া কলিকাতা থাকায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যের ভার রাজস্বসচিব রায় বাহাদুর করালীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহোদয়ের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। আমরা শীঘ্র মহারাজের রোগমুক্তি কামনা করি।

দেশবিদেশের কথা

শ্রার মির্জা ইসমাইলের হারদ্রাবাদে নিয়োগ—

শ্রার মির্জা ইসমাইল বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে তিনি হারদ্রাবাদের নিজাম সরকারের শাসনপরিষদের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাংলার প্রাথমিক শিক্ষা—

বাংলার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে বাংলা সরকার এক কনফারেন্স আহ্বান করিয়াছিলেন। এই কনফারেন্সে স্থির হইয়াছে যে প্রাইমারী স্কুল সমূহে এবং উচ্চ ইংরাজী স্কুলসমূহের প্রাইমারী ক্লাসগুলি হইতে ইংরাজীর পাঠন পাঠন তুলিয়া দেওয়া হইবে। প্রাইমারী স্কুলের পাঠ্যতালিকা সংশোধনের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়

এবং সরকারী কর্তৃক পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ফিলিপাইনের স্বাধীনতা—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৬ সালে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে স্বাধীনতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে গত ৪ঠা জুলাই ফিলিপাইনের স্বাধীনতা ঘোষিত হইয়াছে। ঘোষণা-প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্র্যামান বলেন যে, আমেরিকা সর্ববিধ উপায়ে ফিলিপাইন গণতন্ত্রকে সাহায্য করিবে।

শান্তি সম্মেলনের ব্যবস্থা—

প্যারিসে, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুশিয়া ও আমেরিকার পররাষ্ট্রসচিবদিগের সম্মেলনে স্থির হইয়াছে যে জার্মানী ও তাহার ভাবদার রাষ্ট্রসমূহের সহিত সন্ধিসন্ধি নির্ধারণের নিমিত্ত আগামী ২০শে জুলাই প্যারিসে শান্তি-সম্মেলন

আহত হইবে। এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য ২১টি রাষ্ট্রকে আহ্বান করা হইয়াছে; ভারতবর্ষ অন্যথো অন্ততম। এই সম্মেলনের ফলে পৃথিবীতে একত শান্তি স্থাপিত হউক, আমরা ইহাই কামনা করি।

শ্রাম গভর্নমেন্টকে ভারতের ঋণদান—

ভারতগভর্নমেন্ট ২০ বৎসরের মেয়াদে এবং শতকরা তিন টাকা সুদে শ্রাম গভর্নমেন্টকে ৫ কোটি টাকা ঋণ দিতে সম্মত হইয়াছেন। এই ঋণের অর্থে শ্রাম গভর্নমেন্ট ভারতবর্ষ হইতে যুদ্ধের বাড়তি মালপত্র ক্রয় করিবেন। এই ব্যবহার ফলে শ্রাম গভর্নমেন্ট ভারতবর্ষের নিকট চাউল বিক্রয় করিতে রাজী হইয়াছেন।

নর্মদা উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার আবিষ্কার—

গুজরাট ও মধ্যভারত অঞ্চলে নর্মদা নদীর উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সভ্যতা পাঁচ হাজার বৎসরেরও অধিক পুরাতন এবং মেহেন্দ্গিরো ও হারাপ্পাও আবিষ্কৃত সভ্যতা অপেক্ষাও প্রাচীন। রাজপিনলী রাজ্যের পুরাতত্ত্ব বিভাগ এই আবিষ্কারে অগ্রণী হইয়াছেন। ইন্দোর রাজ্যে মহেশ্বর নামক স্থানে একটি সহরের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে; বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন যে ইহা পুরাণোক্ত মাহিস্তমী নগর।

বাংলার শিক্ষাবিভাগের নূতন ডিরেক্টর—

বাংলার শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মি: এ, কে, চন্দ্র অবসর গ্রহণের পূর্বে দীর্ঘ ছুটি নিয়াছেন। বাংলা সরকার তাঁহার স্থান হুগলী মাদ্রাসার অধ্যক্ষ খান বাহাদুর এ, এম, আসাদকে বাংলার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর নিযুক্ত করিয়াছেন। খান বাহাদুর আসাদ এক সময়ে মুসলিম শিক্ষার সহকারী ডিরেক্টর ছিলেন।

ব্রিটেনের রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসার—

যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটেনের শিল্প ও বহির্বাণিজ্যের প্রসার আরম্ভ হইয়াছে। গত ছয় মাসের মধ্যে ব্রিটেনের রপ্তানী বাণিজ্য দ্বিগুণ বর্ধিত হইয়াছে। গত মে মাসে এই রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ ১৯৩৮ সালের মাসিক গড় অপেক্ষাও অধিক হইয়াছিল। যুদ্ধোত্তর ব্রিটেনে কিরূপ দ্রুত পুনর্গঠন হইতেছে, ইহা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কলেজ সমূহে আবশ্যিক টিউটোরিয়াল ক্লাস—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট বাংলা ও আগামের কলেজসমূহে নির্দেশ দিয়াছেন যে, বর্তমান সেসন হইতে কলেজ সমূহে আবশ্যিক (Compulsory) টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রত্যেক বিষয়ে টিউটোরিয়াল ক্লাসের বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং ছাত্রদিগকে টিউটোরিয়াল ক্লাসে পৃথকভাবে, পার্সেন্টেজ রাখিতে হইবে।

ডাকবিভাগে ধর্মঘট—

গত ১১ই জুলাই হইতে ডাকপিয়ন ও ডাকবিভাগের নিম্নপদস্থ কর্মচারীদিগের ধর্মঘট চলিতেছে। ধর্মঘটের আশঙ্কায় ডাকবিভাগ পূর্বে হইতেই মণিঅর্ডার, ইন্সিওরেন্স ও রেজেষ্ট্রি মাল গ্রহণ বন্ধ করিয়াছেন; কেবলমাত্র সাধারণ চিঠিপত্র গৃহীত ও বিলি হইত। ২২শে জুলাই হইতে এই ধর্মঘট আরও ব্যাপক আকার ধারণ করায় ডাকবিভাগ সকলপ্রকার চিঠিপত্র গ্রহণ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কেবল সরকারী চিঠিপত্র গৃহীত ও বিলি হইবার ব্যবস্থা বলবৎ রহিয়াছে। এই ধর্মঘটের ফলে জনসাধারণের অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে।

বাংলা ও আসামে বন্যা—

অতিরিক্ত বারিপাতের ফলে বাংলা ও আসামের নিকে দিকে প্রবল বন্যা দেখা দিচ্ছে এবং জনসাধারণ দারুণ দুর্গতির সম্মুখীন হইয়াছে। চট্টগ্রাম জেলার ছয় শত বর্গমাইল স্থান জলপ্লাবিত রহিয়াছে এবং কসল সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আসামের কামরূপ, নগা প্রভৃতি চারিটি জেলার অবস্থাও সন্ধান। বিভিন্ন সাহায্য-সমিতি দুর্গতদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়াছে। পরলোকে শ্রীযুক্তা সরলা রায়—

ডক্টর পি, কে, রায়ের স্ত্রী শ্রীযুক্তা সরলা রায় গত ১৪ই আষাঢ় ৮৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

শ্রীযুক্তা রায় প্রসিদ্ধ সমাজ সংস্কারক দুর্গামোহন দাসের কন্যা ছিলেন। প্রথম জীবন হইতেই শ্রীযুক্তা স্বামীশিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ঢাকায় ও কলিকাতায় স্বামীশিক্ষা বিস্তারের জন্য মহিলা সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন; পরে কিছুদিন তিনি কলিকাতার ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী ছিলেন; উক্ত জীবনে মহামতি গোখলের স্মৃতিরক্ষার নিমিত্ত তিনি কলিকাতায় গোখলে মেমোরিয়াল স্কুল ও কলেজ স্থাপন করেন। শ্রীযুক্তা রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা স্নেহো ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলার অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

সাময়িক প্রসঙ্গ

মন্ত্রীমিশনের পটল—ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের নিমিত্ত মন্ত্রীমিশন যে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা প্রচার করিয়াছিলেন—কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও দেশীয় রাজস্ববর্গ সেই পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। কেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত গভর্ণমেন্ট গঠনের যে প্রস্তাব ছিল কংগ্রেস তাহা গ্রহণ না করার আপাততঃ রাজনৈতিক নেতৃগণকে লইয়া অন্তর্ভুক্ত গভর্ণমেন্ট গঠন স্থগিত রহিয়াছে; বড় লাট স্থায়ী কর্মচারীদের লইয়া একটি তত্ত্বাবধায়ক গভর্ণমেন্ট (caretaker Government) গঠন করিয়াছেন।

ভাষ্য শাসনতন্ত্র গঠনের জন্য গণপরিষদের নির্বাচন মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা জরুরী। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক আইনসভা হইতে গণপরিষদে

তাঁহাদের মনোনীত প্রার্থী প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছেন। দেখা যাইতেছে যে বিভিন্ন আইনসভা হইতে সাধারণ আসনগুলিতে প্রধানতঃ কংগ্রেস প্রার্থী ও মুসলমান আসন গুলিতে প্রধানতঃ লীগ প্রার্থী নির্বাচিত হইতেছেন। শিখদিগের জন্য চারিটি আসন নির্দিষ্ট রহিয়াছে; ইহাদের পাল্লাব হইতে নির্বাচিত হইবার কথা; আট জন শিখ নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিল করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাঁহারা মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করেন। সাধারণ আসন হইতে ইউরোপীয়গণ নির্বাচিত হইতে কিংবা নির্বাচনে তাঁহারা ভোট দিতে পারিবেন কিনা, ইহা লইয়া মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল; কিন্তু পরিশেষে বাংলা ও আসামের আইন-সভার ইউরোপীয় সদস্যগণ গণপরিষদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবেন

না হির করার এই সমস্তার সম্ভাবজনক সমাধান
হইয়াছে।

প্রাদেশিক মণ্ডলীগঠনের বিরুদ্ধে কংগ্রেস হইতে
তীব্র আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। আসাম ও উত্তর
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশদ্বয় মণ্ডলীগঠনের পক্ষপাতী নহে।
অসাম আইনসভা হইতে গণ-পরিষদে নির্বাচিত
সদস্যগণকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহারা অন্য
কোন প্রদেশের সহিত মণ্ডলীগঠনের প্রস্তাবে বাধা দিবেন
এবং কেবলমাত্র আসাম প্রদেশের ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের
শাসনতন্ত্র গঠনের সভাসমূহেই যোগ দিবেন। এই অবস্থায়
মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবিত মণ্ডলীগঠন হইবে কিনা বলা
কঠিন। আমরা আশা করি গণপরিষদে এই বিষয়ের
সম্ভাবজনক মীমাংসা হইবে।

দেশীয় রাজন্যবর্গ মন্ত্রীমিশনের শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা
গ্রহণ করিয়াছেন এবং কিতাবে তাঁহারা গণপরিষদে যোগ
দিবেন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহের আলোচনার জন্য
একটি আলোচনা কমিটি (Negotiating committee)
গঠন করিয়াছেন।

পার্লিমেণ্টের লর্ডস সভায় লর্ড শেখসপির লরেন্স ও কমন্স
সভায় স্যার টাফোর্ড ক্রোপ্স ভারতে মন্ত্রীমিশনের
কার্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে,
প্রথমতঃ বুটেন যে ভারতবর্ষকে সত্য সত্যই স্বাধীনতা দিতে
ইচ্ছুক—মন্ত্রীমিশন এই বিশ্বাস ভারতবাসীর মনে সৃষ্টি
করিতে সক্ষম হইয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেস ও লীগের
মধ্যে মতের সামঞ্জস্যবিধানের জন্য মিশন যথাসাধ্য চেষ্টা
করিয়াছেন কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হইতে পারেন নাই। কিন্তু
তাঁহারা উভয়েই আশা প্রকাশ করেন যে কংগ্রেস ও
মুসলিম লীগ দলগত মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া ভারতের
কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিবেন।

আগবিক বোমার পরীক্ষা—

প্রশান্ত মহাসাগরের মার্কান দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত
বিকিনি দ্বীপে গত ৩০শে জুন আগবিক বোমা বিস্ফোরণের
পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। একটি বিমান হইতে আগবিক
বোমাটি কতকগুলি জাহাজ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ হইয়াছে;
বোমাটি দুই মিনিট পরে বিস্ফোরিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে
অগ্নিশিখা ও ধুমরাশি পঞ্চাশ হাজার ফুট উর্দ্ধে উদ্ভিত
হইয়া সমগ্র স্থান আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। ধূমজাল কিছু
পরিমাণে কাটিয়া গেলে দেখা যায় যে লক্ষ্যস্বরূপ সমুদ্রে
যে জাহাজগুলি রক্ষিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কয়েকখানা
জলিতেছে এবং কয়েকখানি ধ্বংস হইয়াছে। প্রকাশ
যে এই বোমাটি নির্মাণে ৫০ কোটি ডলার এবং বিস্ফোরণ
আয়োজন করিতে ৭ কোটি ডলার খরচ হইয়াছে।
অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, আগবিক বোমার
বিস্ফোরণ উপলক্ষে ঝড়ঝন্ডা, ভূকম্পন, ভলক্যান, অগ্ন্যুৎপাত
প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটবে; কিন্তু তাহা কিছুই
ঘটে নাই; প্রকাশ আরও দুইটি বোমা লইয়া পরীক্ষা
হইবে; একটি ফাটানো হইবে অল্পজলে, অপরটি গভীর
জলে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই যে আগবিক বোমা লইয়া
পরীক্ষা করিতেছে ইহার উদ্দেশ্য কি? অনেকে মনে
করেন, ইহা দ্বারা আমেরিকা জগৎবাসীকে ভীতিপ্রদর্শন
করিয়া জানাইয়া দিতেছে যে কেহ যেন তাহার
প্রতিকূলতা করিতে সাহস না করে। তাহার হাতে
এমন মারাত্মক অস্ত্র আছে যে, সে ইচ্ছা করিলে
মুহূর্ত মধ্যে তাহার শত্রুর ধ্বংসসাধন করিতে পারে।
ইহা হস্ত সত্য; কিন্তু এই ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা কি
পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হওয়া সম্ভব? আমাদের
মনে হয় আগবিক বোমার এই আতীত প্রয়োগ মানব-
সভ্যতার বিকৃতির পরিচায়ক। মানুষে মানুষে প্রীতি,
ভ্রাতৃত্ব ভ্রাতৃত্ব সন্ধান স্থাপন করিতে না পারিলে
সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য।

পুস্তক-সমালোচনা

অন্নকূট—অনিলকুমার ভট্টাচার্য প্রণীত। অর্চনা পাবলিশিং, ৮ বি রমানাথ সাধুবা নেন হইতে প্রকাশিত। মূল্য—দেড় টাকা।

অনিলকুমার ভট্টাচার্য বাংলা গল্প ও উপন্যাস সাহিত্যে নূতন হইলেও সুপরিচিত। তাঁহার লেখা “নিশিগন্ধা” এবং “মাটির পৃথিবী” ইতিমধ্যে বাংলার পাঠকপাঠিকাদের সমাদর লাভ করিয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানি একখানি নাতিদীর্ঘ ছোটগল্পের বই। ইহাতে নয়টি ছোটগল্প আছে। এই গল্পগুলি বখন বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল তখন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

গল্পগুলি প্রায়ই নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালী-জীবনের চিত্র। শুধু প্রথম গল্প “অন্নকূটে”র নায়ক কাঙালীচরণ সাধারণ শ্রেণীর লোক। প্রত্যহ কলিকাতার রেশনের দোকানে চাউল আনিতে বাইরা ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসা, পরপর তিনদিন পরিবার সহ অনাহার। অবশেষে তৃতীয় দিনে সাড়িবদ্ধ হইয়া লাড়াইয়া ঠিক বখন চাউল পাইবে সেই সময়ে উত্তেজনাবশে পতন ও মূর্ছা—“অন্নকূট” গল্পটি ইহারই একখানি হৃদয়গ্রাহী কথাচিত্র। “মিতা” গল্পটির আখ্যানভাগ বড়ই মনোরম। গরীব কেরানী

অবনী স্ত্রী শুক্লাকে নইয়া কলিকাতার টিনের বাড়ী ভাড়া নইয়া থাকে। পাশেই প্রাসাদতুল্য বড় বাড়ীটির নূতন মালিক সন্দীপ তাঁহার স্ত্রী সুমিত্রাকে নইয়া সেখানে বাস করিতে আসিলেন। জানালা হইতে আলাপের কলে শুক্লার সহিত প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইল সুমিত্রার। কিন্তু কেউ কাহারও ভিতরের পরিচয় পায় নাই অনেক দিন। তারপর মহসা একদিন শুক্লা জানিল সুমিত্রার স্বামী সন্দীপ তাহারই পূর্ব-পরিচিত সন্দীপদা—যাহার সহিত এক সময়ে তাহার বিবাহের কথাবার্তা হইয়াছিল; আর অবনী জানিল শুক্লার মিতা সুমিত্রা—যাহার সহিত তাহারই অতীত জীবনের একটি স্মৃতি জড়িত। এর পর অবনী ও শুক্লা তাহাদের পুরাতন আবাস পরিবর্তন করিতে উদ্যোগী হইল। “জলসত্র” ও “সংস্কার” গল্প দুইটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। “বড়বাবু” গল্পে বড়বাবুর চিত্রটি খুবই বাস্তব এবং কোতুকপ্রদ। মোটের উপর সব কয়টি গল্পই পাঠক পাঠিকাদের প্রশংসা অর্জন করিবে। লেখকের ভাষা সরস, সাবলীল এবং বর্ণনাভঙ্গী খুবই চিত্তাকর্ষক। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

ইংলণ্ড ভারতীয় ক্রীকেট দল—

ল্যাঙ্কাসায়ার দলের সহিত ক্রিকেট খেলার ভারতীয় দলের ভাইস ক্যাপ্টেন মার্চেন্টে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ৪৫৬ রান করেন। ইহার মধ্যে মার্চেন্টে ২৪২ রান করিয়া নট আউট থাকেন। এবংসর ইংলণ্ডে বস্তু খেলা হইয়াছে তাহার মধ্যে মার্চেন্টের মত এত রান ইংলণ্ডের কোন খেলার কেহ তুলিতে পারেন নাই। ইংলণ্ডের সমস্ত খেলোয়াড়দের মধ্যে মার্চেন্টেরই গড়পরতা রান সর্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে। ল্যাঙ্কাসায়ার দলের খেলাটি অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হয়।

ম্যানচেষ্টার মাঠে ভারতীয় দলের সহিত ইংলণ্ড দলের দ্বিতীয় টেষ্টম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। পাতোদ্রির নবাব টমে জিতিয়াও মাঠের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ইংলণ্ড দলকে ব্যাট করিতে দেন। খেলার সময়ে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল; মাঝে মাঝে ঝড়ি ঝড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। ইংলণ্ড দল সকলে আউট হইয়া ২০৪ রান তুলেন। অমরনাথ ২৬ রানে ৫টি এবং মানকড় ১০১

রানে ৫টি উইকেট পান। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে ১৭০ রানে সকলে আউট হন। মার্চেন্টের ৭৮ রান এবং যুতাক আলির ৪৬ রান উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলণ্ড দল ৫ উইকেটে ১৫৩ রান করিয়া ডিক্লেয়ার করেন। ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসে ৯ উইকেটে ১৫২ রান করিলে খেলার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। শেষ ৩ টি হিন্দেলকর ও সোহনী বখশ খেলা আরম্ভ করেন তখন আর মাত্র ১০ মিনিট খেলিবার সময় অবশিষ্ট ছিল। দর্শকবৃন্দ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত প্রতিটি বল লক্ষ্য করিতেছিলেন নাটকীয় গতিতে খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

ফুটবল লীগ—

ইষ্টবেঙ্গল দল গতবৎসরের ন্যায় এবারেও লীগ চ্যাম্পিয়ন হইয়াছে। এই দল ২৪টি খেলায় ২০টি খেলায় জয়ী ও একটিতে পরাজিত হইয়াছে। তিনটি খেলা ড্র হয়। মোট ৪৩ পয়েন্ট পাইয়া ইষ্টবেঙ্গল দল লীগে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছে। এইবার গইয়া মোট তিনবার ইষ্টবেঙ্গল দল এই গৌরব অর্জন করিয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

ডিপার্টমেন্ট অব ইন্ডাস্ট্রিজ, কোচবিহার।

সাবান প্রস্তুত শিক্ষা ও মক্ষঃস্থল' কেন্দ্রে সাবান ফ্যাক্টরী স্থাপন।

সাবান প্রত্যেক গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ, কোচবিহার রাজ্যে যত সাবান কাটিতি হয় উহার পরিমাণ নিতান্ত কম নহে। লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের সাবান প্রতি বৎসর বাহির হইতে কোচবিহারে আমদানী ও বিক্রয় হয়। এই সমস্ত পরসাই বিদেশীয় মহাজন ও কারিকরেরা কোচবিহার হইতে পাইতেছে।

বুঝাবসানে সাবান প্রস্তুত করিবার তৈল ও কষ্টিকসোডা প্রভৃতি আবার সুলভ হইতেছে। কোচবিহার শিল্পবিভাগে সাবান প্রস্তুত শিক্ষা করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। বাহারা সাবান প্রস্তুত শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক তাহারা নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট দরখাস্ত করিলে উপযুক্ত বৃত্তি দিয়া সাবান শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে।

ব্রীজীমহারাজ ভূপ বাহাদুর ইচ্ছা করেন, তাঁহার রাজ্যের বিভিন্ন মক্ষঃস্থল কেন্দ্রে বাহাতে সাবানের ছোট ছোট কারখানা গড়িয়া উঠে সেই উদ্দেশ্যে সাবান প্রস্তুত শিক্ষাকারীগণকে শিক্ষা সমাপ্ত হইলে ফ্যাক্টরী স্থাপন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেপ বা সরঞ্জামাদির সাহায্য ও স্বগদান করিবার ব্যবস্থা সরকার হইতে করা হইবে। যে সমস্ত শিক্ষার্থীগণ মক্ষঃস্থল হইতে কোচবিহার সহরে আসিয়া সাবান প্রস্তুত শিক্ষা করিতে পারিবে না, তাহাদের শিক্ষা জন্য শিল্পবিভাগ হইতে ভ্রাম্যমান সাবান শিক্ষার কেন্দ্র শিক্ষার্থীগণের বাসস্থানের নিকট স্থাপন করিয়া শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হইবে। এক এক স্থান হইতে ৫১৬ জন উপযুক্ত শিক্ষার্থী একত্রে দরখাস্ত করিলে মক্ষঃস্থল শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিবার বিষয় বিবেচনা করা হইবে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে সাবান শিক্ষা সমাপ্ত হইলে সাবানের কারখানা স্থাপন করিতে হইবে। এইরূপ সর্বো সাবান শিক্ষা দেওয়া হইবে।

শিক্ষার্থীগণ নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট শিল্প বিভাগে আবেদন করিবেন।

ইন্ডাস্ট্রিজ ডিপার্টমেন্ট,
কোচবিহার,
২৭।৪।৪৬ ইং।

শ্রী ললিতমোহন বসু,
ডেপুটি কমিশনার,
কোচবিহার।



কুচবিহার দর্পণ

নবম বর্ষ

ভাদ্র ১৩৫৩ সন, রাজশক ৪৩৭

৫ম সংখ্যা

লোক-সংস্কার *

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম-এ, ডি-লিট

ভয়-ভক্তি, ঘৃণা-ভালবাসা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস—এই নিয়েই মানুষের প্রায় ষোল আনা মন। এতে সভ্য অসভ্য, আদিম আধুনিক কোন ভেদ নেই। তবে ছনিয়া যেমন বদলাচ্ছে, আমাদের ভাবের পাত্রও তেমনি বদলাচ্ছে। আদিম মানুষ যা যা ভয় করত, আধুনিক মানুষ হয়ত তার সবটাকে ভয় করে না। ভয়ের পাত্র বদলে গেছে, ভয় কিস্তি রয়ে গেছে। ভক্তি, ঘৃণা, ভালবাসা, বিশ্বাস প্রভৃতি মনের ভাবগুলি সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যখন গোটা ছনিয়াটা বদলে গেছে তখন বাংলা দেশটাই বা বদলাবে না কেন? আজ আমরা সংস্কার ও বিশ্বাসের দিক থেকে বিষয়টা আলোচনা করব।

বিজ্ঞানের আলোয় আজ আমরা অনেক আচার ব্যবহার ও বিশ্বাসকে কুসংস্কার বলছি। কিন্তু একদিন ছিল যখন এগুলি ধর্মকর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের ন্যায় সকলের

প্রকার সামগ্রী ছিল। এগুলি যে কত প্রাচীন, তা গণে বলা কঠিন। একটা দৃষ্টান্ত দিই। পোঁচার ডাককে আজও বোধ হয় অল্প জনসাধারণ অন্তত বলে মনে করে। আমরা বলি এটা কুসংস্কার। তবুও গতবছর ব্যাংক পোঁচার ডাক তুললে মনটা কেমন হাঁক করে ওঠে। এই যে সংস্কার বা কুসংস্কার কত কালের? আমরা কখনো দেখতে পাই—কি পোঁচার ডাককে মৃত্যুর লক্ষণ মনে ক'রেছেন—

‘বহুলুকা বদতি মোঘমেতদ্ যৎ কপোতঃ পদমগ্নৌকগোতি ।
যশ দূতঃ প্রহিত এব এতৎ তস্মৈ যমায় নমো অস্তু মৃত্যবে ॥’
(১০।১৬৫।৪)

‘এই পোঁচা যা বলছে মিথ্যা হোক। এই কপোত অগ্নিকোণে পা রেখেছে। যার দূত হয়ে এ এসেছে, সেই যমকে, সেই মৃত্যুকে নমস্কার।’

এই ঋগ্বেদের উল্লেখ থেকে বুঝলুম অন্ততঃ তিনহাজার বৎসর আগেও লোক পোঁচাকে ধর্মের দূত বলে মনে করত। তারও আগে থেকে যে এই সংস্কার চলে আসছিল তাতে আর সন্দেহ কি ?

পুরাণে আছে অশুর রাহ চাঁদ ও সূর্যকে মধ্যে মধ্যে গ্রাস করে। তাতে করে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হয়। এই বিশ্বাস কোন শিক্ষিত লোক আর করে না। কিন্তু এখনও গ্রহণের সময় নিষ্ঠাবান হিন্দু শঙ্খধ্বনি এবং স্নান-দান-ধ্যান করেন; আর হিন্দু মাত্রেই হাঁড়িকুড়ি ফেলে দেন। গ্রহণ মাথায় কেউ ধায় না। এখানে বিশ্বাস নাই; কিন্তু প্রাচীন আচার বজায় আছে।

চাঁদের কলক সম্বন্ধে পুরাণে নানা কথা আছে। কিন্তু বাঙ্গালার জনসাধারণের বিশ্বাস ছিল যে এক বুড়ী বটভাগ্য বলে চরকার হতো কাটছে। বাকি বুড়ীর হতো বলা হয়, সে ঐ বুড়ীরই চরকার হতো। আসলে কিন্তু বুড়ীর হতো এক জাতীয় ছোট মাকড়সার জাল। এর ইংরেজি নাম হচ্ছে gossamer. এক সময়ে ইংলণ্ডের লোকে বিশ্বাস করত যে যিশুখ্রীষ্টের মা সেন্ট মেরীর শব বধন আকাশে উঠছিল, তখন তার চাঁদের হতো ধ'সে পড়ে; তাই হ'ল এই বুড়ীর হতো।

সন্ধ্যাবেলায় আকাশে একটি তারা দেখা অন্তত মনে করা হ'ত। এই বিশ্বাস বাংলার বাহিরেও ছিল। বিদ্যাপতির পদে দেখিঃ-
বিরহিনী রাধিকা আক্ষেপ করে বলছেন—

“কি হাম সঁঝক একসরি তারা

ভাদর চৌঠিক শনী।

হৈথি হুহ মাঝ কণন মোর আনন

যে পহু হসি ন হেরসি ॥”

“আমি কি সন্ধ্যার একটি তারা কিংবা ভাদ্রমাসের চতুর্থীর চাঁদ ? এই দুয়ের মধ্যে আমার মুখ কোনটি যে প্রভু, তুমি হেসে কখনও চাওনা ?”

নদীতে জনসন্ত দেখা যায়, লোকে মনে করত ইজের ঐরাবত হাতী মেঘের মধ্য দিয়ে শুঁড় নামিয়ে জল তুলছে। পরে এই জন থেকে পৃথিবীতে বৃষ্টি পড়ে।

বজ্র পড়বার সময় এখনও কেউ জৈমিনি মূনির নাম করে। তাঁর নাম করলে নাকি বজ্রের ভয় থাকে না।

ভূমিকম্প সম্বন্ধে লোকে বিশ্বাস করত যে পৃথিবী বায়ুচ্ছিন্ন হাজার ফগার উপর আছে। বধন সে ফগা বদলার, তখন পৃথিবী কেঁপে ওঠে।

জীবজন্তু সম্বন্ধে অনেক সংস্কার আগেকার লোকদের ছিল। বাঘ ও বিড়াল দেখতে প্রায় একরূপ। তাই তারা মনে করত বিড়াল বাঘের মাসী। বাঘিনী আঁতুড় হ'লে বিড়াল মানুষের বাড়ীতে আগুন নিতে এসেছিল। মাছের কাঁটাকুটো খেয়ে সে এমন ভুলে গেল, যে মানুষের বাড়ীতেই রয়ে গেল।

কাঁঠবিড়ালীর গায় ডোড়া দাগ কেন ? সে রামচন্দ্রের জন্তু সমুদ্রে সাঁকো বঁধতে সাহায্য করেছিল। তাই তিনি আহলাদ ক'রে তার গায় হাত বুনিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর আত্মুলের দাগ আজও কাঁঠবিড়ালীর গায় রয়ে গেছে।

পশ্চিমবঙ্গে থাকে বলা হয় ‘চোখ গেল পাখী’, পূর্ববঙ্গে তাকে বলে ‘চৈতার বউ’। সে এক গেরদেহের বউ ছিল। পরে কি করে পাখী হয়ে গেল তার এক রূপকথা আছে।

বিড়ালকে মারতে নেই। কেননা সে বগী দেবীর বাহন।

বাস্তব-সাপ মারলে অমঙ্গল হয়।



কাকগুলো নাকি দৈবজ্ঞ। কাকের ডাক থেকে
নানারূপ ভবিষ্যৎ গণনা করা হতো। জ্যোতিষ-রত্নাকরে
আছে—

ক ক কল্যাণলাভ।

কঃ কঃ রাজোপদ্রব।

করকঃ করকঃ বন্ধুজনের সাক্ষাৎ।

কেতং কেতং রত্নহানি। ইত্যাদি।

• রাত্রিকালে কাকের ডাক ঘোর অমঙ্গল-সূচক বলে
মনে করা হ'ত। কাকচরিত্র ব'লে একখানি বইও লেখা
হয়েছিল। খনার জিব কেটে বরাহ নুকিয়ে রেখেছিলেন।
টিকটিকি তাই খেয়ে ফেলে। সেই থেকে সে দৈবজ্ঞ
হয়ে গেছে। খনার বচনে আছে—

উত্তরে টিকটিকি হাঁচি স্নীলাভ কারণ।

ঈশানে হইলে মৃত্যু কে করে বারণ॥

কথা বলবার সময় টিকটিকি ডাকলে, লোকে বলে
'ঠিক, ঠিক'। সে যেন কথার সার দেয়।

বহরের কয়েক মাস চিল দেখতে পাওয়া যায় না।
'লোকে মনে করত এরা রাবণের চিতার কাঠ দিতে দক্ষিণে
লক্ষ্য চলে যায়। রাবণের চিতা নাকি এখনও আছে।

বুনো পাখরা ঘরে বাসা বাঁধলে সোভাগ্যের সূচনা
করে। এ জন্য কথায় বলে 'সুখের পাখরা'।

শঙ্খচিল মঙ্গলসূচনা করে। এ জন্য কেউ তাকে
'মা শঙ্খেশ্বরী' বলে নমস্কার করে।

কোকিল কাকের বাসায় গিয়ে ডিম পাড়ে। কাক
সেই ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা তোলে। এই জন্য কথায়
হ'লে, 'কাকের বাসায় যেন কোকিলের ছানা।'।

জন্তুদের মধ্যে শিয়াল খুব চালাক। এই জন্য তার
নাম শিবরাম পণ্ডিত।

পাখীদের রাজা হচ্ছে কিঙে; পূর্ববঙ্গে একে বলে
কেচুয়া। কি ক'রে সে রাজা হল তার এক রূপকথা
আছে।

রাত্রিতে বাঘ ও সাপের নাম করতে নাই। নাম
করলে তারা আসে।

কুকুরে মাটির পাত্র চাটলে তা অপবিত্র হ'য়ে যায়।
এজন্য তা ফেলে দিতে হয়। পাগলা কুকুরের লাল
বিধাক্ত। তার থেকে সাবধান হবার জন্য বোধ হয়
এই আচার প্রচলিত হয়েছে।

বিড়ালের এঁটো খেলে হাঁপানি রোগ হয়।

চকচকী দিনে একসঙ্গে থাকে। রাত হ'লে তারা
আলাদা হয়ে যায়।

নেউল সাপের শত্রু আর সাপের কামড়ের ওষুধ
সে জানে। এই জন্য নেউলকে বেজী অর্থাৎ বৈজ্ঞ
বলা হয়।

অতি পূর্বকালে অন্ততঃ বার হাজার বৎসর পূর্বে
যখন হিন্দু-ইউরোপীয় জাতি এক সঙ্গে বাস করত,
তখন থেকে এপর্যন্ত প্রেতাচার বিশ্বাস চলে আসছে।
পুনর্জন্মে বিশ্বাস ভারতীয় আখ্যদের বিশেষ বিশ্বাস।
সম্ভবতঃ তাঁরা এদেশের আদিম জাতিদের থেকে এই
বিশ্বাস নিয়েছেন। কিন্তু ভূত, প্রেত, শাখচুরী,
ব্রহ্মদৈত্য, মামদো, কককাটা, আলোয়া, নিশি এ সমস্ত
বিশ্বাস বৈদিক আখ্যদের মধ্যে ছিল না। শিকার সঙ্গে
এ সমস্ত বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়ে আসছে।
তবুও যারা মুখে বিশ্বাস করেন না বলেন, অকলার
মাঠে ঘাটে বিশেষ ক'রে শ্মশানে চলতে গেলে তাঁদেরও
কি একটা অজানা ভয়ে বুক দূর দূর করতে থাকে।
নিশি রাত্রিতে ডাকে। সে দিনে একবার মাত্র ডাকে।

এই ক্ষুদ্র সাধারণ লোক রাতে এক ডাকে জ্বাব দেয় না। তিনবার ডাকলে, তবে সে জ্বাব দেয়।

এখনও অনেকে শুভাশুভ স্বপ্নে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাস অতি প্রাচীন এবং সকল জাতির মধ্যেই দেখা যায়। ঋগ্বেদের একটি সূক্তে (১০।১৬৪) হুশ্বপের দেবতার স্তব আছে। রামায়ণে (২।৬২) দেখতে পাই ভরত হুশ্বপ্ন দেখে বলেছিলেন—

“নরো যানেন্ধঃ স্বপ্নে খরযুক্তেন যতি হি।

অচিরাৎ তস্ত ধূমাগ্রং চিতাশাং সম্প্রদৃশতে ॥”

“যদি কোন লোককে স্বপ্নে গাধার গাড়ীতে যেতে দেখা যায়, তবে শীঘ্রই তার চিতার ধোঁয়া উঠতে দেখা যাবে।”

শুভাশুভ দিন তিথি নক্ষত্রে বিশ্বাস পাজির প্রত্যেক পাতায় পাওয়া যাবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের পূর্বে এইগুলি নিয়েই জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা ছিল। এ সমস্তকে বলা হয় ফলিত জ্যোতিষ। জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত এই সমস্ত বিশ্বাস দূর হবার নয়। যদিও আমাদের হান্তরসিক কবি ঠাট্টা করে বলে গেছেন—

“ভুলেও যেন জন্মানা কেউ বিষ্ম্যবাদের বারবেলা,

জন্মাও যদি পারবেনাক সইতে কভু তার ঠেলা।”

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

জ্যোতিষে বিশ্বাসের স্রাব দুর্লক্ষ বা সুলক্ষণে বিশ্বাসও এক সময় সাধারণের মধ্যে ছিল। রামায়ণে দেখি, যখন রামচন্দ্র যুগল্লপী মারীচকে মেরে কুটিলে ফিরেছেন তখন শিয়াল তাঁর পিছে ডেকেছিল আর পশুপক্ষী তাঁর বাঁ দিকে বিকট চীৎকার করেছিল। এতে করে তিনি সীতার অমঙ্গল আশঙ্কা করেছিলেন। কলও তাই হয়েছিল।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলে দেখি রাজা দ্রুপদ নিজের বাহর স্পন্দন থেকে মনে বিশ্বাস করেছিলেন তাঁর শকুন্তা স্ত্রীলাভ হবে—

“শান্তমিদমাত্মমপদং দুরতি চ বাহুঃ কুতঃ কলমিহাস্ত।

অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র ॥”

ফলে তিনি শকুন্তলাকে পেয়েছিলেন। সাস্বতেও একটা বচন আছে—

“বামেতর বাহুস্পন্দো বরস্রীলাভসূচকঃ ॥”

ডাকের বচনে আছে—

শূন্য কলসী শুকনা না।

শুকনা ডালে ডাকে কা ॥

যদি দেখ মাকুন্দ ধোপা।

এক পাও না বাড়ান বাপা।

ডাক বলে এরেও ঠেলি।

সামনে যদি না দেখি তেলি ॥

বড়ুচণ্ডীদাসের পদে দেখি শ্রীমতী রাধিকা নিজের হৃদয়ের ক্ষুদ্র আক্ষেপ করে বলেছেন—

কোণ অক্ষুভ খনে পাম বাচাইলোঁ।

হাঁহী ভিঠী আয়র উকট না মানিলোঁ ॥

শুন কলসী লই সখি আগে ভাএ।

বাঞ্ছার শিয়াল মোর ডাহিনে জাএ ॥

কথোদূর পথে মোঁ দেখিলোঁ মঙ্গলী।

হাথে ধাপর ভিধ মাজে এ যোগিনী ॥

কান্দে কুরুজা লহা ডেলী আগে জাএ।

সুখান ডালত বসি কাক কাড়ে জাএ ॥

(শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, ৩১৮ পৃঃ)

সাধারণের কাছে হাঁচিটা উপেক্ষার জিনিষ ছিল না।
১ ধনার বচনে পাই—

“দিকের নির্ণয় করি বুঝই সুবুদ্ধি।
উর্দ্ধভাগে হৈলে ধন ভোগকার্য সিদ্ধি ॥
পূর্বদিকে অগ্নিকোণে হৈলে ভয় হয়।
দক্ষিণেতে অগ্নিভয় জানিহ নিশ্চয় ॥
নৈর্ঋতে কলহলাভ পশ্চিমেতে ভাব।
বায়ুকোণে নববস্ত্র গন্ধ জয়লাভ ॥”

এখনও বোধ হয় অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে এর
১ কতক বিশ্বাস রয়ে গেছে।

কতকগুলি কাজে চুরি বদনাম হয়, এইরূপ বিশ্বাস
ছিল। বড়ুচণ্ডীদাসের পদে দেখি রাখিকা আক্ৰেপ
ক’রে বলছেন—

“তাদের মাসের তিথি চতুর্থীর রাতি।
জল মাঝে দেখিলে। মো কি নিশাপতী ॥
পূন্ন কলসে কিবা ভরিলে। হাথে।
যে কারণে বাশী চুরী দোষসি জগন্নাথে ॥

...
...
...
শুক্লর আসনে কিবা চাপিখা বসিলে।।
জলের আধর কিবা ভূমিতে লেখিলে।।
ধণ্ডবিচনীরা কিবা বাস ভুলী লৈলে। তাএ।
তে কারণে কাহাঞি বাশী চুরী দোষাএ ॥
(শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ৩২১.পৃঃ)

এরূপ বিশ্বাস আজকাল নাই বললেই চলে। কিন্তু
একেবারেই যে লোপ পেয়েছে, সে কথা জোর ক’রে
১ বলা চলে না।

ধাঙাধাঙ বিচার হিন্দু, ইহুদী ও মুসলমান ধর্মে
আছে। তার অতিরিক্ত তিথিবিশেষে বেগুন, মূলা,
পটল প্রভৃতি সুধাভাঙ ও অধাঙ হয়, পাখিতে এরূপ

দেখা যায়। সাধারণে মানুষ বা না মানুষ, টোলের
পণ্ডিতেরা এখনও এসমস্তকে বেদবাক্য তুল্য মনে ক’রে
থাকেন। কেউ কেউ আবার বিরুদ্ধভোজনে বিশ্বাস
করে। এই কারণে তারা কিছুতেই ভুধর সঙ্গে মিশ
খাবে না। চিকিৎসকেরা না বললেও এরা বিশ্বাস করে
যে বিরুদ্ধভোজনে কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ হয়।

বাহুমান, ঝাড়ুৎকে বিশ্বাস খুব পুরাণে। ঋগ্বেদে
(১০।২৭; ১৩৭; ১৬১; ১৬৩) এর প্রমাণ আছে।
অথর্ববেদ এই রূপ মন্ত্রে বোঝাই বলেই চলে। ঋগ্বেদে
(১০।১৪৫; ১৫২) সতীনের উপর প্রভুত্বলাভের মন্ত্র
আছে। এখনও অশিক্ষিত লোক এই সমস্ত ঝাড়ু
হুৎকে বিশ্বাস করে। বিশেষ করে সাপে-কাটা রোগীর
জন্তে ওঝা ডেকে না ঝাড়িয়ে কেউ আশ্রয় হতে
পারে না। চোর ধরবার জন্ত বাজিচালা, নলচালা
প্রভৃতি এখনও অশিক্ষিত সমাজে কিছু পরিমাণে চলিত
আছে। তাদের মধ্যে এখনও কেউ কেউ ডাইনৌতে
বিশ্বাস করে। বিলাতে এক সময়ে ডাইনৌদের পুড়িয়ে
মারা হত।

কারও কারও পচা, মরণচাঁদ, শুইয়া ইত্যাদি বিস্ত্রী
নাম শুনতে পাওয়া যায়। যে সব মায়ের ছেলে
আঁতুড়ে মারা যায়, তাদের ছেলেদের নাকি বিস্ত্রী নাম
রাখলে যমে ছোঁয় না। তাই এই রকম নামকরণ
করা হয়। এই রকম মায়ের ছেলে হলে কখন কখন
কড়ি নিয়ে দাইয়ের কাছে ছেলে বেচা হয়। আসলে
বেচা নয় কেবল বমকে ফাঁকি দেবার জন্তে বেচা।
এই সকল ছেলের নাম হয় এককড়ি, তিনকড়ি,
পাঁচকড়ি, সাতকড়ি ইত্যাদি।

সন্ধান করলে এই রকম অনেক বিশ্বাস ও সংস্কার আবিষ্কার করতে পারা যায়। সূর্যের আলোর যেমন আধার দূরে পালার, বিজ্ঞানের প্রভাবে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূরে যাচ্ছে। নিশ্চয় পঞ্চাশ বৎসর আগে যে বাংলা ছিল আজ আর সে বাংলা নেই। সমস্ত দুনিয়া সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। কিন্তু নৃতত্ত্ব (Anthropologyতে) এই সমস্ত সংস্কার ও বিশ্বাসের যথেষ্ট মূল্য আছে। এগুলি Folklore বা লোক-সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত। ইউরোপ ও আমেরিকার Folklore Society

দেশ-বিদেশের বিশ্বাস ও সংস্কার বহু ক'রে সংগ্রহ ক'রেছেন এবং করছেন। আমাদের এদেশেও এর প্রয়োজন আছে। হয়ত আর পঞ্চাশ বৎসর পরে এগুলির সন্ধান পাওয়া ভার হবে। বিজ্ঞান কোন জিনিসকেই সামান্য বলে উপেক্ষা করে না—

“যেখানে দেখিবে ছাই,

উড়াইয়া দেধ ভাই,

পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।”

বৃষ্টি

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পাল

বড়ের পরে বৃষ্টি। আবার বৃষ্টি।

ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি

মধু মিষ্টি

প্রথম ক্ষণের।

মন-চিকিত্ত বলয়ে দ্বিগলয়ে

তোরণ ধ্যানের।

আধারি অরূপ হৃদি-মিশ্রণ

অন্তরে অন্তরে

অবোধ দৃষ্টি।

আয়োজন উদ্বোধনের।

অবাক চোখে সজ্জা নামে

গোপন ধাসনার বিলম্ব-ভটে।

অকণ্ট নিকটে।

স্থির বামে

অকাল বর্ষণের ইতিহাস থাকে।

চিন্তা-মোড়ানো হৃদয়ের বাক

ধ্যান স্পর্শনের

নব দৃষ্টি।

—এর সংকত বড়ের পরে বৃষ্টি

নামে মনোমননের

মিষ্টি।

ঝিরিঝির বৃষ্টি ॥

সাহিত্যিকের মন

শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী

সাহিত্যিকের মনকে অনায়াসেই ভুলনা করা চলে একতাল নরম কদা-মাটির সংগে। আলতো আঁচড়েই সেখানে দাগ কাটা যায় গভীরভাবে—অল্প আঘাতেই তাকে দমিয়ে দেওয়া যায় অনেকখানি। সামান্য একটা তুচ্ছ জিনিসকে সাহিত্যিক মন যেমন অনেক বড় ক’রে দেখতে পারে—দেখতে জানে, ঠিক তেমনি আবার অনেক বিরাট জিনিসকেও ওরা তুচ্ছ ক’রতে পারে অনায়াসেই।

সাধারণ লোক ওদের বলে পাগল। অর্থাৎ তাদের সংগে ওদের ব্যবহারটা মিলতে চায় না কোনখানে বিশেষ। নিজের কৃপাকে সমুদ্র ভাষা মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আমি যা বুঝি—আমি যা জানি, তার বাইরেও যে আরো কিছু বোঝার থাকতে পারে—তার বাইরেও যে আরো কিছু জানবার আছে একথা বিশ্বাস ক’রতে কিছুতেই কোন মানুষ পারে না—কোন মানুষ চায় না! কাজেই এখন দেখি অন্য কোন লোক ঠিক আমার মতন চলছে না—তার ব্যবহারে—তার কার্য-কলাপে আমার চেয়ে অনেকখানি স্বাভাবিক ফুটে উঠছে, তখন তাকে ‘পাগল’ বলে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। যারা শিল্পী, যারা সাহিত্যিক, যারা চিন্তাশীল—তাদের মন সর্বদাই ঘুরে বেড়ায় এমন একটা তরঙ্গে যেখানে প্রবেশাধিকার সকলের সব সময় মেলে না—যেখানে পৌছন সকলের পক্ষে সম্ভব নয় কিছুতেই। সে একটা অদ্ভুত রাজ্য। অদ্ভুত সেখানকার নিয়ম-কানুন—আশ্চর্য্য সেখানকার আবহাওয়া।

একটা কাঠকে সামনে দেখলে লোকে তাকে কাঠই ভাবে। কিন্তু একথা কেউ ভাবে না যে, ওই কাঠ

একদিন ছিল একটা বিরাট গাছ—তাতে পাতা ছিল, ছিল ফুল, ছিল ফল! কতো ক্লান্ত পখিককে সে ছায়া দিয়েছে—মায়ের মতো স্নেহভরে বাতাস করেছে তার শাখা ছলিয়ে! যে কোন জিনিসের অতীত বা ভবিষ্যৎকে নিয়ে অতো বেশী মাথা ঘামাতে সাধারণ লোক মোটেই রাজী নয়। তাম্র তার বর্তমান থেকেই নিখুঁত বার করবে যেটুকু সম্ভব রস। বর্তমানের সংগে সংগেই ওর প্রয়োজন তাদের কাছে সমাপ্ত। কিন্তু শিল্পী মনের আসল তফাৎই হ’লো এখানে। তাদের মনের করুণা-পার্বীটা ঘুরে বেড়ায় বাঁধনছাড়া রাঙ্গো—দিক থেকে দিগন্তে—জীবন থেকে জীবনান্তরে! কেবল তার চেটো কোন বানে পাওয়া যায় একটু নোতুন কিছু,—একটু অসাধারণ কিছু—অনিভা এই সংসারকে কী করে বেঁধে রাখা যায় নিত্য-কালের কঠিন-বন্ধনে! নিয়ত এই অনুসন্ধানের ফলে শিল্পী মানুষটার বাইরের ব্যবহারটাও হ’লে পড়ে খানিকটা অসাধারণ।

সাধারণ বলতে আমরা কি বুঝি? মানুষের মধ্যে বেশীর ভাগ মানুষ যে ভাবে চলে তাকেই আমরা ব’লে থাকি সাধারণ হিসাবে। শুধুমাত্র জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যেই বেশীর ভাগ মানুষ বাস্তব থাকে সারাটা দিন-রাত। Struggle for existence—জৈবিক বাঁচার বাইরে যে আত্ম কোন জগৎ আছে এ তাদের ধারণার বাইরে। অথচ, সাহিত্যিকের কাছে জীবনের চেয়ে বড় হচ্ছে তার শিল্প—তার সৃষ্টি! জীবন তার কাছে কিছুই নয়! তাই তার জীবনে এত লাহুনা—এত

নিষ্ঠাভন,—পদে পদে তাই এত আঘাত—এতো বেদনা! লাভ আর লোকসানের অকণ্ঠলোকে চোখে চোখে রেখে—ডাইনে আর বায়ের ঘূর্ণিপাকে ধাপ ধাপে পড়ে পড়ে না কিছুতেই ওরা নিজেদের।

লোকে ওদের ক'কি দেয়! আর ভাবে, কি বোকা! ক'কি দিয়ে দিলাম তাও বোকার ক্ষমতা নেই। বেচারী অসহায় জীব! কিন্তু সত্যই কি তাই? সত্যই কি অতোখানি নিবোধ তারা? আমি বলবো—না! বুঝতে তারা পারে। খুব ভাল করেই বুঝতে পারে এই ক'কি দেওয়াকে। শুধু তাকে রোধ ক'রবার জন্যে যে কঠিন মনের প্রয়োজন—তার টুঁটি টিপে ধরতে হলে যে শক্ত হাতের দরকার অভাব ওদের সেইটেরই। তাই নিজেরা ক'কে পড়ে অন্যকে আত্মপ্রসাদ লাভের সুবিধা দিয়ে যায় ওরা বরাবর। মানুষের মন নিয়ে যাদের কারবার—জীবনের প্রতি পদক্ষেপকে যারা বিশ্লেষণ করে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে—আর যাই হোক বোকা তারা নয়—ক'কি দেওয়াকে তারা বোঝে নিশ্চয়ই।

সাহিত্যিক সম্বন্ধে সাধারণের নাক উঁচু হ'য়েই আছে। কোন এক প্রতিবেশিনী ভদ্র-মহিলা একদিন জিজ্ঞেস ক'রেছিলেন আমার ছোট ভাইকে :—তোমার দাদা কি করে? ভাই বলেছিল :—দাদা! দাদা গল্প লেখে। ঘোষ নেই সে বেচারীর। সে দেখছে কাগজে নাম ছাপা হয় দাদার—তুনেছে গল্প লেখে দাদা—অতএব সব কিছু ছেড়ে সেই পরিচয়টাই আগে দিতে গেছে। কিন্তু খুশী হতে পারেন নি ভদ্রমহিলা উত্তরটা শুনে—‘ওঃ’ বলে নিশ্চুপ হ'য়ে গেছেন একেবারে। এর চেয়ে ভাইটি যদি তাঁকে বলতো :—দাদা আমার অধিক চটকলে কুলীগিরী করে—হয়তো তিনি খুশী হতে পারতেন তবু বা হোক কিছু করে এই ভেবে। হয়তো কিছু জোলা

সহায়ভূতিও প্রকাশ কর্তে কুণ্ঠিত হতেন না। এবং এর চেয়ে কোন সম্মানজনক কাজের জোগাড় যাতে হয় তার জন্যে আমার হয়ে তার স্বামীর কাছে সুপারিশ করে দেখবেন এমন ইংগিতও কর্তে পারতেন অনায়াসেই। কিন্তু যেহেতু সাহিত্যিক, চুপ করে গেলেন তিনি তাই। সাহিত্যিকরা সমস্ত বিচারের বাইরে সমস্ত কথার অতীত। ওদের সম্বন্ধে কোন অনুগ্রহ, কোন সহায়ভূতির প্রশ্নই উঠতে পারে না। এঁদের ধারণায় ওরা যেন একটা অকারণ বাড়তি জঞ্জাল—পৃথিবীর একটা অহেতুক ভারাক্রান্ত জীব!

তবু কিন্তু সাহিত্যিকের গর্ব যে সে সাধারণের চেয়ে অনেক ওপরে। লক্ষপতি, কোটীপতি মানুষের কাছেও তার মন মাথা নীচু করবে না—সেখানেও সে বলবে, থাক না পরমা—তবু আমি ওর চেয়ে অনেক বড়। আমার সমান ও কিছুতেই হ'তে পারে না—হাজার চেষ্টা করলেও। মনের দিক থেকে তাই কারুর কাছেই ওদের কোন সংকোচ নেই—ভয় নেই। যারা ওদের বোকা ভাবে—যারা ওদের অসহায় মনে করে, সেই সাধারণ মানুষকে সাহিত্যিকেরা সব সময়েই একটা কৃপা-মিশ্রিত দৃষ্টি নিয়ে দেখবে—নিজেকে সব সময়েই একটা উঁচু আসনে রাখবে তাদের কাছ থেকে। তারা ভাবে সাধারণ মানুষগুলো যেন জীবনের কিছুই পেলো না—কিছুই জানলে না। আমাদের এই অগৎ—আমাদের এই আনন্দের যদি কণামাত্রও ওরা পেতো কোনদিন। কিন্তু তাদের এই আত্মস্তরিতার সুর বাইরের ব্যবহারে ধরবার উপায় নেই একেবারেই। বিশেষত্ব হচ্ছে সেইখানে। মানসিক উৎকর্ষতার ফলেই হয়তো এটা সম্ভব।

গোড়াতেই বলেছি মাটির মত নরম মন সাহিত্যিকের। আঘাত-সংঘাতের তাই আর শেষ নেই ওদের জীবনে। যেন ছলছে ওরা দোলনার বসে ছোট ছেলের মত।

একবার ওঠে—আবার নেমে যায় সংগে সংগে। নিত্য এই ভাংগা-গড়া আর ওঠা-পড়ার মাঝখানে সে এক বিচিত্র জগৎ।

রাস্তার যেতে যেতে চোমাখার মোড়ের বইয়ের ষ্টলটার হুমড়ি খেয়ে পড়লাম উৎসুক-চোখে। কতো অজস্র বই—বিভিন্ন নামের আর বিভিন্ন মলাটের। হাঁ—ওঠতো রয়েছে এমাসের মীনা-মহল কাগজখানা ওপরেই। তুলে নিই হাত বাড়িয়ে। তরতর করে কয়েকখানা পাতা উন্টেই পেয়ে যাই সূচীপত্র। বিদ্যুৎ-ঝলকের মত এক নজরেই পড়ে ফেলি সমস্ত নামগুলো। নাঃ—নেই! আমার নামের গন্ধটাও নেই যেখানে! আবার দেখি—আবার—আবার। সন্দেহ দূর হয় নী তবু একটা একটা করে সমস্ত পাতাগুলো খুঁজতে থাকি—মেনে না তবুও আমার লেখার দেখা। মনটা ধারাপ হয়ে যায়। ক্লান্ত হাতে রেখে দিই কাগজখানা বখাস্থানে। এগিয়ে চলি আবার সামনের পথ ধরে। সন্দেহ জাগে নিজের প্রতিভার ওপর—নিজের সাধনার ওপর। হয়তো তা হলে নেই আমার মধ্যে কিছু, নইলে কেন বের হ'লো না লেখাটা? বার বার ওই একই প্রশ্ন আমাকে পাগল করে তোলে—কেন? কেন? কেন?

মোড়টা পার হবার মুখেই দেখা 'তরুণ বীণা' সম্পাদক অরুণবাবুর সংগে। ছিপছিপে একহারা গড়ন সুন্দর একটা লালিত্য ঠুর সমস্ত মুখে-চোখে, হাতে একটা ঝোলান চামড়ার ব্যাগ—শ্রীনিবেশের কাজকরা। হেসে বললেন,—এই যে ভাল আছেন তো? হাসবার ইচ্ছা না থাকলেও হাসতে হয়। বলি,—এই একরকম আর কি! আপনি?—আমাদের আর থাকা থাকি! বেঁচে আছি এই পর্যন্ত! হাঁ, ভাল কথা—আপনার লেখাটা এ মাসেই যাচ্ছে—প্রফ্টা আপনিই দেখবেন তো, না দেখে দোবা।

এ চড়া ক'রে ঘুরে যায় মনের ষ্ট্রিয়ারিংটা অন্তরিকে সমস্ত পৃথিবীর রঙটাই প্রায় বদলে যায় যেন! আচ্ছা,

বাবো'ধন একদিন আপনাদের অফিসে। চলুন না একটু চা খাওয়া বাক। বনিষ্ঠভাবে এগিয়ে যাই অরুণ বাবুর দিকে।—আজ থাক! আমার একটু জরুরী কাজ রয়েছে এখন। আপনিই বরং আসুন আমাদের ওখানে একদিন। চা-টা আমিই খাওয়াবো আপনাকে। কান্নাই আসুন না ছপরের দিকে! আচ্ছা চলি তাহলে—আমার ট্রাম এসে গেছে। নমস্কার। নমস্কার ক'রে অরুণবাবু ট্রামে উঠে পড়েন।

একটু আগের সেই বিখ্যাত, ভাংগা মন চাংগা হ'য়ে ওঠে এবার। লেখা—অজস্র লেখা—সহস্রভাবে চারপাশে ছুটে আসে বস্তার ঘনের মত। রস্মীন আকাশে যেন কতো কথা—পৃথিবীময় একটা অপরূপ ছন্দ!

—ছোটো পরসী বাবু! হাত পাতে একটা তিথিরী। অনারাসেই একটা আনি তুলে দিই তার হাতে। শুধু একটা আনি কেন—স্বর্গ-মর্ত্য সমস্ত দিয়ে বলি-রাজার মত পাতাল-প্রবেশেও হয়তো আপত্তি ক'রবো না এখন।

সামান্য একটু ধাক্কাতেই মনের এই যে বিপর্যয়—এই যে টলটলায়মান অবস্থা স্বাভাবিকতার মাপ-কাঠিতে হয়তো এটা মোটেই সুখের নয়। কিন্তু শিল্পী-মনের—সাহিত্যিকের মনের এই তো স্বরূপ।

সাহিত্যিকেরা যতো অবহেলাই পাক আর যতো লাজনাই সহ্য করুক না কেন, বেঁচে থাকে তবু তাহাই অনাদিকাল ধরে। মুছে যায় সব কিছু—মরে যায় সব কিছু, কিন্তু মোছে না সাহিত্যিকের সৃষ্টি,—মরে না সাহিত্যিকের মন। এরাই তো বাঁচিয়ে রাখে ইতিহাসকে—এরাই তো কালের দাকী—কাল থেকে কালান্তরে বয়ে চলে মানুষের চিন্তাধারাকে—মানুষের সভ্যতা—মানুষের সংস্কৃতিকে।

জগতের এক অদ্বীত পদার্থ—বিধাতার এক সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি এই সাহিত্যিকের মন।

নূতন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আমি নূতন—প্রথম আগন্তক

(৪)

কারো সাথে নাইক পরিচয়,
একেবারে অচেনা মোর মুখ—
বিস্ময় আমি, আশা ও সংশয়।

(২)

আমি অশোক খোদাই শিলালিপি
আমি সিজার ভুবন করি স্রব,
আমি 'ফারাও' গড়াই পাষাণটিপি—
নূতন করাই আমার পঙ্কিচয়।

(৫)

নাই ইতিহাস—ঐতিহ্য নাই মোর
উচ্চকুলের দাবী আমার নাই,
কি যে আমি? সন্বেহ হর মোর
নূতন আমি এই প্রশংসা পাই।

(৩)

কেউ বা দোষে কেউবা বলে ভাল
সবার সাথে সামঞ্জস্যহীন,
নূতন রঙে রঙায় আমার আলো
কারো কাছে নাইকো আমার ঋণ।

(৬)

যুগের যুগের রোদ্ভবলের চিনা
কালের হাতের কস্ লাগেনি গায়,
আমি নবীন—অ-বাক্যানো বীণা
বিচিত্র ফুল ধরায় আভিনায়।

বেগ্নিরে আসি হঠাৎ কানন থেকে
গহন বনের রঙিন মনের টিরা,
বেড়াই আমি সবই নূতন দেখে
কাঁচা সোনার চৌপয় মাথায় দিয়া।

দৃষ্টিহীনতা

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস

কোথায় যেন পড়েছিলুম, কে যেন বলেছেন, নেতৃত্ব করতে যে সব গুণের মরকার, ঠিক সেই সব গুণই মহা দোষের হয়ে ওঠে, যদি নেতৃত্ব না ক'রে পরাধীনতা করতে হয়।

• এই কথাটাই মনে পড়ে গেল, যখন শুনলুম—

‘মুখপোড়া মিন্বে কোথায় গেল রা! মুখপোড়া, ঝাড়হাবাতে মিন্বে।’ গর্জন-কারিগীর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে দেখি, উক্ত দক্ষানন ব্যক্তিটি সম্প্রতি মুখাধির ব্যবহার জন্য ভিড়ের পিছনে গিয়ে একটা বিড়ি ধরিয়েছেন। চৌক্যার শুনে কম্পিতপদে সামনে এলেন, স্বরের মধ্যে যতটা সম্ভব রুদ্ধতা এনে বললেন,— ‘কি’

বুঝলাম ক্ষতবিক্ষত পদমধ্যাদা বজায় রাখবার চেষ্টা করছেন। এতগুলো লোকের সামনে তাঁর স্বামিদের অপমান!

‘কেবল বিড়ি! কেবল বিড়ি!’—গর্জন করলেন মহিলা, ‘নাও না, পোর্টলা-পু’টলিগুলো একটু দেখে শুনে তোল না। ওরে পুটু, ফুতু, বুলু—’

ভদ্রলোক চাপাগলার বললেন, ‘হাঁ, বত সব—’

আমি দেখলুম যেমনি অসংখ্য বোঁচকা-পু’টলি, তেমনি অগুণতি ছেলেপুলে। তারা সব বাস্খানিকে ধ্বংসমুখ আলো-আঁধার ক’রে ঠেসাঠেসি ক’রে বসল। আমি ভাবলুম এই মহীয়সীর পরিবারবর্গ, মালামাল প্রভৃতি সব উঠে গেলে, কতটুকু জায়গা আমাদের সকলের জন্যে বাকি থাকবে, সে একটা নিদারুণ সমস্যা।

বাসের ড্রাইভার ভাড়া দিয়ে উঠল, ‘উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন।’

• পূজা আগন্তপ্রায়। ভোরবেলা এক্সপ্রেস থেকে যখন আমাদের ট্রেনে নামলুম, আকাশে, বাতাসে, সবুজ ঘাসের শিশির-বিন্দুতে, ট্রেনের কোল-ঘেঁষা চেঁউথেলানো ধানের মাঠে সেই কথাটাই লেখা যেন দেখতে পেলুম,— পূজা আসছে।

খাবার-দাবার, জামা-কাপড়, টাকা-কড়ি সবকিছুই টানানিতে মানুষের মনটা শুক যেন আজ আটপেটে বাঁধা। কিন্তু ট্রেনে নেমে হঠাৎ এক নিমেষে কী যে হয়ে গেল। মনে হল, মুক্তি পেলুম, মুক্তি পেলুম।

সেই পুরাণো লালধুলার পথ, সেই কাঁপখোঁচা ময়রার দোকান গরুর গাড়ীগুলি, দূরের ছায়াঘন তরুসারি,— কত আনন্দময় আশৈশবের পরিচয় এদের সঙ্গে!

‘ওমা। মুখপোড়া মিন্বে কানা নাকি গো।’— স্তম্ভীত স্বকাবে সর্পদষ্টের মতো। সচকিত হয়ে দেখি, সর্বনাশ। করেছি কি। অসম্মত কখন যে কিসের একটা পু’টলি ঠেসান দিয়ে বসে পড়েছি সীটের এক প্রান্তে।

পু’টলিটাতে কোন নরম জিনিষ ছিল নিশ্চয়, অসম্মানে বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক কি ছিল তা’ জিজ্ঞেস করবার সাহস হ’ল না। আমার ঠেসানিতে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। পুরাণো তেঁতুল হতে পারে, কিংবা তামাকও হ’তে পারে। খুব সম্ভব তামাক নয়, তেঁতুলই। তামাক নয়, কারণ সে হল তাঁর স্বামীর উপভোগ্য, তার জন্যে এই স্তম্ভীত উমা কি সম্ভব। বিশেষতঃ যে দাম্পত্যপ্রীতির পরিচয় আগেই পেয়েছি।

কিংবা তামাকও হ'তে পারে! স্বামীর উপভোগাই যে তাই বা কে সঠিক বলবে। মহৌষসীর যে ব্রহ্ম চেহারা আর হাঁক-ডাক, তাঁর পক্ষে তামাক খাওয়াটা আর এমনি শক্ত কথা কি!

বাস্ চলছে বড়বড়িরে। সারাটা পথ বহুনি খাচ্ছি দৃষ্টিহীনতার জন্তে।

মহৌষসীর স্বামী আমারি একপাশে বসেছেন, শ্রীর কাছ থেকে বতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে। মান, মনজ্ঞ কিন্তু কৃতজ্ঞতাবরা তাঁর দৃষ্টি। আশুন তাঁকে রেহাই দিয়ে আমার আলাচ্ছে, একত্রেই বোধ হয় কৃতজ্ঞতা।

মুহুরে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করলুম। অল্পকিছু জমি-জমা আছে তাঁর, প্রজারা অনেক টাকা ব্যক্তি ফেলেছে। দেশে ছিলেন না অনেকদিন, তাঁর স্বপ্নের গত হওয়াতে সেখানকার জমি-জমা বা সব পেয়েছেন তাই সেহলেন সামলাতে। এবার দেশে ফিরছেন। সাব্বস্তা করবেন প্রজাদের।

আবার আমার মনে পড়ল, কোথায় বেন পড়েছিলুম, যে বতবড় নির্ধ্যাতিত, সে তত বড় নির্ধ্যাতক। কোথায় পড়েছি মনে নেই। অত স্বতিশক্তি থাকলে আজ আমার এই দশা হবে কেন?

কত কাজই তো করলুম। কত দেশ-বিদেশ ঘোরা হ'ল। গ্রাম্য পোষ্টাফিসের পোষ্টমাষ্টারি, রেলের বুকিং ক্লার্ক, পাট-গুদামের কেরানী। শেষে বুড়ে নাম লিখিয়ে গেলুম পেশওয়ার। লড়তে অবিশ্রি হয় নি, এক অদৃষ্টের সঙ্গে ছাড়া।

পেটের মধ্যে হল এক বিষম কোড়া। ডাক্তারেরা ছুরি-কাচি-সাঁড়াশি নিয়ে মহোলাসে কাটা-ছেঁড়া ক'রে কি জানি কেন শেষে জামাই ছেড়ে দিলে। বশে দিলে,

পেটের ভেতরের পাকষলের গলিঘুঁড়িগুলো একটু বে-মজবুত হ'য়ে রইল। একটু সাব্বানে থাকি যেন, নইলে প্রাণটা যে-কোনো মুহুর্তে তারি মধ্যে নিখোজ হ'য়ে যেতে পারে।

প্রথম সাব্বানতা হল চাকরি ছাড়া। দেশে ফিরছি, পেম্বন একটা যেমন-তেমন পাবই।

তাঁর স্বামীর সঙ্গে আলাপ করছি দেখে মহৌষসী মাঝে মাঝে অগ্নি-দৃষ্টি হানছেন আমাদের দিকে। কিন্তু সে বেশিক্ষণের জন্তে নয়।

বেশিক্ষণের জন্তে নয়, তার কারণ এই। লাল রাস্তা স্থানে স্থানে কাদায় কালো হয়ে গেছে। মেরামতের অভাবে আর বর্ষার জলপ্লাবনে ঢেউ খেলানো। কালোরদের বাসস্থান। পথের বত খানাডোবাতে মহিষের মতো যেন ধামসাতে ধামসাতে চলেছে। তারি টক্কর সামলাতে না পেরে মাঝে মাঝে আমাদের মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে যাচ্ছে। বড় গাছেই ঝড় লাগে বেশি। ভদ্রমহিলার বিপুল বপূর আলোড়নে তারি পরিচয় পাচ্ছি।

আমার সামনের সীটে জান্কার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছেন একজন তরুণী। হাতে আনুকেরা বিলিতি নভেল, ভ্যানিটি ব্যাগ, পায়ে আঠে-পৃষ্ঠে নানাছাঁদে জড়ানো শাওল। যুক্তোস্তর পরিকল্পনার কথা ভাবছেন বললেন। চাকরি করতে গিয়ে কোন্ কোন্ দেশ দেখেছি জানতে চাইলেন। পেশোয়ার শুনে জিজ্ঞেস করলেন, 'সীমান্ত-পাকীকে দেখেছেন?'

তরুণী বললেন, যুক্তোস্তর পরিকল্পনার প্রসঙ্গে গ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি নিজের চোখে দেখে নোট ক'রে নিয়ে রিপোর্ট দাখিল করবেন শুনের সভাব।

একটু চোখ টিপে রহস্ত ক'রে বললেন, গ্রামের বর্তমান পরিস্থিতির নোট একটা মনে মনে ইতিমধ্যেই করে



নিষেহেন।—এই ব'লে ইসারায় বোচকা-পোটলা নেঙী-গেঙী সহ বিপুলকায়। মহীয়সীর দিকে ইঙ্গিত করলেন।

আমি আর হাসি চাপতে পারলুম না। কথায় কথায় আমাদের দেশের নারীজাগরণের কথা উঠল। মেয়েদের স্বাধীনতা, মেয়েদের সমাজ, ভোটাধিকার, সম্পত্তিতে অধিকার, ডাইভোর্স।

মহিলাটি শুনছিলেন সব। এবার আর থাকতে না পেয়ে বলে উঠলেন, ‘মুখো আগুন, ডাইভোর্সের মুখো আগুন।’

তরুণী মুখটিপে শুধু একটু হাসলেন। বান্ধকা-প্রীড়িত দেহ ও অনগ্রসর মনকে নিঃশব্দে কথাবাত করা এই হাসি।

মনটা ভারাক্রান্ত হল। শরৎ-প্রভাতে সোনার আলোর আভ্র কতই না ভালো লেগেছিল সব। এতদিনের অনুপস্থিতির পর অবিস্মরণীয় এই পুরাণো দেশের বা কিছু কী অপরূপ হয়েই না দেখা দিয়েছিল। কিন্তু হায় রে, এই অনগ্রসর মন! মহীয়সীর ওই নিরেট বিপুলতার মতোই অঙ্গদলপাথর হয়ে বসে আছে দেশের বুকে। কেবলি স্থল স্বার্থ, স্নেহহীন, নির্মম, নিষ্ঠুর। আর অন্ধ,—কিছু দেখবে না, কিছু বুঝতে চাইবে না, গতানুগতিককে আঁকড়ে পড়ে থাকবে কেবল।

“গেল গেল! আমার এত কষ্ট ক’রে ব’য়ে আনা মিষ্টির হাঁড়িগুলো সব গেল!”— গর্জন ক’রে উঠলেন গর্জনশীলা।

বেশ খানিকটা গভীর গর্তে পড়েছিল আমাদের বাসের একখানা ঢাকা। তরুণী ছিটকে এসে পড়লেন আমারি অনিচ্ছাকৃত আলিঙ্গনে। ছোটো মিষ্টানের হাঁড়ির সঙ্গে সজোরে ঠোকাঠুকি হয়ে গেল।

“মুখো আগুন!”

গাড়ীর ঢাকাটা উঠল ধাক্কা সামলে; কিন্তু আমি পড়লুম বা’সের মেঝেয়। পেটের মধ্যে সেই বস্ত্রাণা,— অসহ্য, অসহ্য!

কে বে ধরাধরি ক’রে নানাল বাসের ভিড় থেকে রাস্তার ধারে, কে বে চোখে শুধে ওলের ঝাপটা দিল, জানি নে। চোখে অন্ধকার দেখছি।

অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বগেছি, এতে কারো কোনো দোষ নেই, ওটা আমারি একটা হতভাগা অস্থব, আমারি হতভাগা কপালটার মতো নির্যাসদী।

কোঁ বে হ’ল সঠিক জানি না, শুধু কাণে যেটুকু এসেছে, তাই বনতে পারি।

“ও গিন্নী! আর কত দেরি করবে? চল এসো। ডাইভার থামতে চাইছে না আর, ফিরতি খেপে ওর নাকি ন’টার ট্রেন ধরতে হবে।”— সঙ্গ চিম্বে গলার কত! বললেন। এতক্ষণ তিনি গিন্নীর ধমক খেয়েই এসেছেন, এইবার তার শোধ তুলছেন।

“মুখো আগুন, নটার ট্রেনের মুখো আগুন! একটা মানুষ মরে, তার প্রাণের চেয়ে ডাইভার মুখ-পোড়ার ন’টার ট্রেনই বড় হল।”

বিশ্বাস করতে পারলুম না নিজের কাণ্ডটাকে!— “এখন কেমন বোধ হচ্ছে বাবা? আহা মরে বাই! আর একটু জল খাবে?”— এমন মিষ্টি গলার স্বর কি তাঁরই ধীর কণ্ঠে এতক্ষণ “মুখো আগুন” ছাড়া আর কিছুই শুনি নি।

ভগবান! কোন্ অভাবনীয় অলক্ষ্যে তুমি যে কত মধুই জমিয়ে রাখো! তোমার সৃষ্টির মধ্যে কত যে পরমার্চর্য আছে!

“উঠে এসো না! মা! দে'রি হ'য়ে যাচ্ছে বেঁ!”—
সমবেত নাকিস্বরের কোরাশে বুঝলাম এটা ঐ ডজন-
খানেক সম্মান-সম্মতিরই আবেদন।

“তাই তো! ভারি আশ্চর্য্য তো! হঠাৎ লোকটার
এরকম ব্যাধা,—ভারি আশ্চর্য্য তো!”—সুমাজিত
মিস্ত্রিরে বুঝলাম এ উক্তি সেই তরুণীর।

“নেকী খুকী!”—গর্জন ক'রে উঠলেন আমার
খুব কাছ থেকে তিনিই, যাকে এতক্ষণ বিজ্ঞপ ক'রে
মনে গনে নাম দিয়েছিলুম ‘মহীরসৌ’—“জানেন না
যেন কিছুই! চুপ ক'রে গায়ে পড়ে থাকুন মোর এখন
—চাকা সাজছেন! মুখ্যে—”

“দেখুন”—তরুণীর সুমাজিত কণ্ঠ—“দেখুন,
আপনার স্ত্রীকে সা-ধান হতে বলুন। ভদ্রমহিলার সম্মান
উনি রাখতে জানেন না!”

আমি হাঁফাতে হাঁফাতে বললুম বধাসম্ভব চেষ্টায়,
বাত্তে বাসের সবাই শুনতে পার, “আমার জন্তে
আপনাদের সবাইকে ভারি অসুবিধার পড়তে হয়েছে।
আমি একটু পরেই, সেরে উঠব। আপনারা আর
অপেক্ষা করবেন না। যান। আপনিও যান।”

“খ্যমো তুনি”—স্নেহে ধমক দিলেন মহিলা,
“তোমার আর আদিখ্যেতা করতে হবে না। থাক
না, বাদের দরকার আছে তা'র চলে থাক না।”

শুনতে পেলুম, বাসের মধ্যে একটা কোলাহল
উঠেছে। বাসের সকলেরই দৃষ্টি আমার ফেলে যাওয়া।
ভদ্রমহিলা কিন্তু কারো কথার জবাব করলেন না,
যেমন একমুখে আমার মাথায় হাওয়া করছিলেন, তেমনি
হাওয়া করতে লাগলেন।

ছি, ছি, কী লজ্জা! আমার অচল দেহবস্ত্রটার
ওপর রাগ হল। কতবার কত অসুবিধাতেই ফেলেছে
এ, কিন্তু এমন নিদারুণ লজ্জা কোনোদিন পাই নি!
এ যেন ঠিক নিজের নাক কেটে অপরের বাতাসত্ব করা!

কিন্তু কিছু বলবার আর সাহসে কুলালো না।
আবার যদি ‘আদিখ্যেতা’ করা হয়!

কর্তা অবশেষে তার ব্রহ্মাণ্ড ছাড়লেন, “উঠে এসো!
শিগ'গির উঠে এসো! যদি না আসো, তোমার এই
বৌকটা বুঁকটি, হাড়ি-কুড়ি সব ফেলে দেব!”

আমি বললুম, “যান মা, আপনি যান। আমি
এখন অনেকটা ভাল আছি। ব্যাধাটা কমে আসছে।
আপনি যান।”

মহিলা বললেন, “দিক ফেলে। জিনিষ তো আর
মানুষের প্রাণের চেয়ে বড় নয়! মুখপোড়ার অসাম্প্রদায়িক
কম্বো নেই। কিন্তু চোখরাঙিরে কাজ আদায় করবে
আমার কাছ থেকে, এমন লোক আজও জন্মায় নি।”

ওদিকে ধানিকরণ সমস্ত চুপচাপ। বোঝা গেল
কর্তার মনে প্রবল ক্রোধ এবং কিছুটা গৃহিণী-ভীতি,—
এ দুইয়ে দ্বন্দ্ব বেধেছে।

অবশেষে তাঁর ক্রোধেরই জয় হল। ধূপধাপ,
হুমদাম শব্দে বুঝলুম গৃহিণীর অত সাধের পৌটলা-পুঁটলি
সব রাস্তার ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে।

সশব্দে বাস চলে গেল। আমি চোখ বুজে চুপ
ক'রে পড়ে রইলুম।

গিন্নী পরম স্নেহে বললেন, “কিছু জেবো না বাবা
তুমি। তোমার সেরে ওঠা চাই। ও মুখপোড়ার
অমনি বেয়াড়া রাগ। নিজেই আসবে কিরতি বাসে,
তুমি দেখে নিও নিজেই তুলবে পৌটলা-পুঁটলি,
রাগের মাথায় বা ফেলে দিয়ে গেছে। বুঝলে বাবা,
তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো দিকি, তাহলেই সেরে
উঠবে।”

সেরেও উঠলাম, কর্তাও ফিরে এলেন। সবি তো
বুঝলুম, বুঝলুম না শুধু একটি কথা। আমাদের
দৃষ্টিশক্তি এমন ক্ষীণ কেন হয়? কেন আমরা মানুষের
বাইরেটা দেখেই তার পুরোপুরি বিচার ক'রে বসি,
তার অন্তরটা দেখবার আর বৈধ্য থাকে না?

আপাততঃ আমার দৃষ্টিশক্তির কথা না বলাই
ভালো। চোখের জলে সেটা ঝাপসা হয়ে গেছে।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ

শ্রীউষাপতি ঘটক

বহুদিন হইতেই এই বিশ্ববিদ্যালয় দেখিবার আমার খুব আগ্রহ ছিল; কিন্তু সুযোগের অভাবে এই আশা পূর্ণ হয় নাই। শুনিয়াছিলাম,—নালন্দা দেখিবার উপযুক্ত সময় শীতকাল ও প্রাতঃকাল; কিন্তু আমাকে দেখিতে হইয়াছিল দারুণ গ্রীষ্মের প্রায় মধ্যাহ্নে, সুতরাং আমার অভিজ্ঞতা যে অভিনব ভাষাতে আর সন্দেহ কি?

১৯৪০ সালের গ্রীষ্মকালে যখন ইউরোপে রণদেবতা ধ্বংস-যজ্ঞে লিপ্ত,—ঠিক সেই সময়ে এই সুযোগ পাইলাম। এক ঝড়-বৃষ্টির রাত্রিতে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া পরদিন সকালে নওরাদা পৌঁছিলাম। ষ্টেশনের কাছে একটি সাইনবোর্ডে লেখা ছিল,—‘নওরাদা হইতে নালন্দা ২৪ মাইল পশ্চিমে’। এখানে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে উঠিলাম। বিহারে তখন বেশ গরম পড়িয়াছিল। বৃষ্টি নামিবার আশায় কয়েকদিন অপেক্ষা করিলাম; কিন্তু গরম উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল,—কাজেই আর বৃষ্টির আশা অপেক্ষা করা সম্ভবপর হইল না। বাইবার সময় একজন সঙ্গী পাইলাম।

একদিন সকালে নওরাদা হইতে নালন্দা যাত্রা করিলাম। নওরাদা হইতে বিহার-সরীফ পর্যন্ত বাসে বাইতে হয়। এই যাত্রাটি বড় সুন্দর; তখন সকাল প্রায় সাড়ে আটটা। পথের দুই পার্শ্বে শুষ্ক মাঠ ধুঁধু করিতেছে। মাঝে মাঝে পাহাড়; শতক্ষেত্রও দেখিলাম, কিন্তু দেখিবার মত নয়। তখন সবেমাত্র কৃষিকার্য্য আরম্ভ হইতেছে। কৃষকগণ কোথাও যুক্তিকা কর্ষণ করিতেছে,—কোথাও বা কুপ হইতে জল তুলিয়া ক্ষেত্রে

ঢালিতেছে। পথের দুইদারে অসংখ্য ভালগাছ। এইগুলি রাস্তার দুই পার্শ্বে থাকায় পথটি বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। প্রায় ২-৩৫ মিনিটে বিহার-সরীফে পৌঁছান গেল। বাসভাড়া লাগিল প্রত্যেকের দশ আনা। এই স্থানটি খুব সুদৃশ্য নহে। এখানে জৈনদের একটি ধর্ম্মশালা আছে।

এখান হইতে মাটিন কোম্পানীর লাইট রেল চড়িয়া নালন্দা বাইতে হইবে। এই লাইন বস্তিন্দারপুর হইতে রাজগীর (রাজগৃহ) পর্যন্ত গিয়াছে। ট্রেন প্রায় ৪৫ মিনিট দেরীতে আসিল। বেলা প্রায় ১২ টার সময় আমরা ট্রেনে উঠিলাম। ট্রেন কি কলিকাতার সেকেন্ড ক্লাস ট্রাম, ভাল বৃথা গেল না। পথে একটি ষ্টেশনে গাড়ী কিছুক্ষণ থামে—স্থানটির নাম ‘দোপনগর’। নগরের কোন চিহ্নই নাই। নামটি শুনিয়া মনে হয় যেন সেই অতীত যুগে এই স্থানটি রাত্রিতে আলোকমালার সজ্জিত থাকিত। ইহার পরবর্তী ষ্টেশন—নালন্দা। এখানে যখন পৌঁছান গেল, তখন বেলা প্রায় ১টা। রোদ্দে তখন এত কষ্ট হইতেছিল যে, ভাবার তাহা প্রকাশ করা যায় না।

নালন্দা ষ্টেশনটি খুব ছোট। একটি ঘর বজিলেও চলে। এখান হইতে হাঁটাপথে আমাদেরকে নালন্দার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে বাইতে হইবে। ষ্টেশনে খুব বেশী করিয়া জল খাইতে হইল; একপ না করিলে লু নাগিবার সম্ভাবনা ছিল। পথে দুইজন সঙ্গী মিলিল,—ইহারীও নালন্দা-বাসী। সেই প্রচণ্ড রোদ্দে ধুলার উপর দিয়া

বাইতে বাইতে মনে হইতেছিল আমরা যেন মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিতেছি! শুনিলাম, এই পথটি প্রাচীন যুগে যেক্রপ ছিল, এখনও সেইরূপ আছে। পথের দুইপাশে মাঠ খাঁ খাঁ করিতেছে। নিকটে বা দূরে লোকালয় দেখা যায় না। রাত্ৰিকালে এই স্থানটির নির্জনতা কল্পনা করিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে! ষ্টেশনে লেখা আছে—নালন্দা এখান হইতে দেড় মাইল; কিন্তু পথ যেন আর শেষ হইতে চায় না।

— যখন দূর হইতে নালন্দার স্তূপগুলি দেখা গেল, তখন সত্যিই প্রাণে এক অপূর্ণ আনন্দ বোধ করিলাম।

বৌদ্ধযুগে ভারতে যতগুলি শিক্ষাকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল, তন্মধ্যে তক্ষশিলা ও নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নাম সর্বপ্রগণ্য। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বা খৃষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ নাগার্জুন ইহার ‘মহাবিবর’ (অধ্যক্ষ) ছিলেন; তখন হইতেই ইহার উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে থাকে। সপ্তম শতাব্দীতে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন যখন ধানেশ্বরের রাজা ছিলেন, তখন নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় যুগ। সেই সময় এখানে প্রায় দশহাজার ছাত্র অধ্যয়ন করিত; তখন বাল্মীকী শীলভদ্র ছিলেন ইহার অধ্যক্ষ। সর্বশাস্ত্রেই ইহার সমান দক্ষতা ছিল; চৈনিক পরিব্রাজক হিউএনৎ সাঙ (ইউ-য়ান্-চাঙ) ইহার ছাত্র ছিলেন। ইনি শীলভদ্রের পতীর পাণ্ডিত্যের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন এই দশহাজার ছাত্র ও অধ্যাপকমণ্ডলীর ব্যয়ভার বহন করিতেন। যে কোন করণেই হউক, সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে এই ছাত্রসংখ্যা মাত্র তিন হাজারে পরিণত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগে ইহা বঙ্গদেশীয় পালরাজ্যের অধিকারে আসে। ১১৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম শুনা যায়। হ্রদর ভিত্ত,

চীন প্রভৃতি দেশ হইতে অগণিত ছাত্র এখানে অধ্যয়ন করিতে আসিত। কিরূপে যে এই বিদ্যায়তনের বিরাট সৌধগুলি বিধ্বস্ত হইল তাহা জানা যায় নাই।

ক্রমশঃ আমরা স্তূপের দ্বার-দেশে পৌছিলাম। বাহির হইতে ইহাকে দুর্গ বলিয়া ভ্রম হয়। যে প্রধান দ্বার দিয়া হিন্দুর সেই অতীত গৌরবের দিনে ধানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্দ্ধন অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেন, আজ প্রায় বারশত বৎসর পরে আমরা সেই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতেছি কিনা তাহা কে বলিতে পারে? একদিন যেখানে নাগার্জুন, শীলাদিত্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, ইউ-য়ান্-চাঙ, ই-ৎ-সিং, উ-কঙ্ প্রভৃতি চীন দেশীয় পরিব্রাজকগণ যেখানে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন,—আজ আমরা তাহার দ্বারদেশে উপনীত হইয়াছি। যে স্থান হইতে একদিন ভিক্ষতে লিখন ও পঠন পদ্ধতির প্রচার হইয়াছিল,—আজ তাহার কী শোচনীয় অবস্থা!

ভিতরে প্রবেশ করিতেই আমরা একটি তৃণাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িলাম। এই প্রাঙ্গণের একপাশে ‘গাইডের’ আস্তানা। দ্বিপ্রহরের নিস্তরুতার বেচারী নিদ্রা বাইতেছিল। আমরা তাহার ঘুম ভাঙাইলাম। প্রত্যেকের হুই জানা করিয়া দর্শনো লাগিল। তাহার পর দেখিবার পালা।

এইখানকার স্তূপগুলির বিশেষত্ব এই যে, ইহার একদিকে সারি সারি মন্দির ও অপরদিকে সারি সারি ছাত্রাবাস, অধ্যাপনাগৃহ প্রভৃতি। ছাত্রাবাসগুলির চারিপাশে কক্ষ; মন্দির ও ছাত্রাবাসের মধ্যে প্রাঙ্গণ; ছাত্রাবাসগুলির মধ্যেও একটি করিয়া প্রাঙ্গণ আছে। এখানে উদ্যান ও পাতকুরা আছে। ছাত্রগণ এখানে স্নান করিত। সেই যুগের একটি পাতকুরা হইতে গাইড

আমাদিগকে জল আনিয়া খাওয়াইল। খুব পরিষ্কার শীতল জল। এইরূপ সাতটি পাতকুরা পাওয়া গিয়াছে।

প্রথমে মন্দির বামপার্শ্বে দেখিলাম একটি বিরাট মন্দির-স্তূপ। ইহা উচ্চতায় পাঁচ-ছয়তলা বাড়ীর সমান। স্তূপের উপরে মন্দির ছিল, বুদ্ধদেবের মূর্তি ছিল,—সব ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; আছে কেবল মন্দির চত্বর ও মন্দিরের তল (Floor)। তাহারই উচ্চতা ছ'তলা বাড়ীর সমান। মন্দিরটিতে আরোহণ করিবার ক্ষমতা দুই যুগের সিঁড়ি আছে। প্রথম যুগের সোপান শ্রেণীর উপর দিয়া দ্বিতীয় যুগের সোপানশ্রেণী নির্মিত হইয়াছে।

ক'একটি মন্দিরে বুদ্ধদেবের কাঁচামাটির মূর্তি আছে। মূর্তিগুলি উচ্চতায় প্রায় দেড়তলা বাড়ীর সমান। এগুলি যে খুব প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে মূর্তিকার দ্বারা ইহা নির্মিত, তাহার রাসায়নিক সংমিশ্রণের ফলে ইহা আজ পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। আমাদের পূজা-পার্বণের মাটির প্রতিমাগুলি রঙ দিবার পূর্বে যেরূপ দেখায়, এই মূর্তিগুলি অনেকটা সেই ধরণের। কোন মূর্তিরই মস্তক নাই, আবার কোনটির পা আছে, কিন্তু দেহের উপরিভাগ নাই।

প্রথম মন্দির-স্তূপের এক পার্শ্বে এখানকার খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর অধ্যক্ষ নাগার্জুনের কষ্টিপাথরের মূর্তি দেখিলাম। মূর্তিটি যেন অভিবাদনের ভঙ্গিতে সম্মুখে বসিয়া আছে। নাগার্জুনের মূর্তির নিকটে কষ্টিপাথরের 'অবলোকিতেশ্বর' মূর্তি রহিয়াছে দেখিলাম। ইহার চারিদিকে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্তি শোভা পাইতেছিল।

প্রত্যেক মন্দিরের ভিত্তিমূলে কারুকাৰ্য্যখচিত খেত প্রস্তরের নানা বুদ্ধমূর্তি মন্দির-স্তূপটি বেষ্টিত করিয়া

আছে। কোন কোন মন্দিরের ভিত্তিগাত্রে জাতকের গল্পগুলি ও বুদ্ধের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা ক্লেদিত ও উৎকর্ষ চিত্রের সাহায্যে দেখান হইয়াছে। কয়েকটি উৎকর্ষ মূর্তি বর্ণসমাবেশের দ্বারা চিত্রিত করা হইয়াছে। এই বর্ণ আজ পর্যন্ত মলিন বা বিনুশ্চ হয় নাই। কোন কোন মূর্তির চোখ দুটি এত সুন্দর করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে যে, চোখের মণি দুইটি স্বচ্ছ বলিয়া বোধ হয়।

একটি ছাত্রাবাসে দেখিলাম চৌত্রিশটি কক্ষ; প্রত্যেক কক্ষের দেওয়ালে একটি করিয়া কুলুঙ্গি। এখানে এক একটি বুদ্ধমূর্তি থাকিত। ছাত্রগণ অশুষ্ক, চন্দন প্রভৃতি ধূপ জালাইয়া বুদ্ধের উপাসনা করিত। এই কক্ষগুলিতে একটি করিয়া প্রবেশদ্বার আছে কিন্তু জানালা নাই। এই গরমদেশে মানুষ কি করিয়া এরূপ কক্ষে থাকিতে পারে তাহা ভাবিবার বিষয়। শিক্ষার্থীগণ মূর্তিকানির্মিত পাত্র ব্যবহার করিত কিনা তাহা জানা যায় না,—তবে মূর্তিকার অনেক পাত্র কূপগুলির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে।

মন্দিরগুলির নিকট সমাধি-স্থল বা স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ স্তম্ভ-সমূহ। এখানে মৃতব্যক্তি বা পুরিত্রাজকগণের চুল, দাঁত, ও দেহের অন্তান্ত অঙ্গ সমাহিত করা হইত। কয়েকটি সমাধিধননের ফলে দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। সব স্তূপ দেখা শেষ হইলে, গাইড আমাদিগকে একটি প্রাচীরবেষ্টিত বাগীতে লইয়া গেল। এখানে কষ্টিপাথরের একটি বিরাট মূর্তি আছে। শুনিলাম, এই স্তূপগুলি অবিকৃত হইবার বহুপূর্ব হইতেই স্থানীয় অধিবাসিগণ ঐ মূর্তিটিকে "কাল-ভৈরব" বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু উহা যে বুদ্ধের মূর্তি তাহাতে

কোন সন্দেহ নাই। মূর্তিটির নাসিকার অগ্রভাগ ও পায়ে আঙুল কোন লুণ্ঠনকারী ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

এখানে রত্নোদধি, রত্নসাগর ও রত্নরঞ্জক নামক তিনটি অট্টালিকায় নানা পুণ্ড্র সংরক্ষিত ছিল; শুনা যায় তৈধিক (হিন্দু) ভিক্টু ঐ পুণ্ড্রশালা পোড়াইয়া দিয়াছিলেন। এই অট্টালিকা তিনটির কোন ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাই নাই। নালন্দায় যে একবার অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল তাহার চিহ্ন প্রাচীরগাত্রে আছে। স্থানে স্থানে ইষ্টক দগ্ধ হইয়া মসীবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। অগ্নি এত তীব্র হইয়াছিল যে কোন কোন স্থানের ইষ্টক ঘেন গলিয়া গিয়াছে। ঐ সময়েই সেই বৃহৎ পুণ্ড্রশালাটি ভস্মভূত হইয়া গিয়াছিল কিনা তাহা কে বলিবে? অনেকে বলেন ঐগুলি অগ্নিকাণ্ডের চিহ্ন না-ও হইতে পারে।

এখানে শতদলশোভিত সরোবরের কথা বর্ণনার পাঠ করিয়াছিলাম। দূর হইতে স্তূপগুলির পার্শ্বে সরোবরের শোচনীয় বিধ্বস্ত অবস্থা দেখিলাম। কিন্তু বর্ণনার সহিত কিছুই মিলে না। এখন সে নির্মল ফটকের স্তায় স্বচ্ছ জল আর নাই,—পদ্মবনেরও আর সে শোভা নাই।

এইবার আমরা মিউজিয়মের (Museum) দিকে চলিলাম। হিউ-এনথ্-সাণ্ডের বিবরণীতে দেখা যায় যে এখানে পূর্বে অনেক আত্মবৃক্ষ ছিল। স্তূপ হইতে মিউজিয়মে বাইবার পথে অনেকগুলি আত্মবৃক্ষ দেখিলাম। এগুলি অবশ্য সেকালের গাছ নহে। ছোট ছোট চারা গাছ,—কিন্তু সবগুলিতেই আম কাঁলিয়াছে।

মিউজিয়মে অনেক দেবদেবীর মূর্তি, শীলমোহর, শিক্ষার্থীগণের ব্যবহার্য মৃৎপাত্র, সে যুগের নানা শ্রেণী তাল, সমাধিতে প্রাপ্ত দাঁত প্রভৃতি রহিয়াছে। এখানে যে চাউলের ব্যবহার হইত, তাহা মাসকেশের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। এগুলি কালজীরা বা কৃষ্ণভিনের স্তায় বর্ণপ্রাপ্ত হইয়াছে। ৬৭ ফুট উচ্চ একটা পোড়া মাটির জালা দেখিলাম। ইহার কাণার নীচে অনেকখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

ফিরিবার পথে স্তূপগুলির দিকে একবার চাহিলাম এখনও অনেক স্থান খনন করিতে বাকী আছে। সেই স্থানগুলি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগ হইতে চিহ্নিত করিয়া রাখা হইয়াছে।

বন্দী

ডাঃ শ্রীনীলাল দে

নারায়ণ শিলারূপে কাদে সর্বক্ষণ,
বন্দীরূপে গৃহকোণে দুর্ভিক্ষ জীবন,
ভক্তি শ্রদ্ধা পবিত্রতা সব লাভ বটে;
কিন্তু প্রেম, স্বাধীনতা নাহি মোর ঘটে।

বিভিন্ন

ডাঃ শ্রীনীলাল দে

হাট কহে লোকারণ্য অস্থির জীবন,
মাঠ কহে জনশূন্য মন উচাটন।
বাট কহে ক্ষণে ধরি জন-পদ-রেখা,
ঘাট কহে ক্ষণে পাই অনেকের দেখা।

পুরুষশ্চ চরিত্রম্

শ্রীসত্যভূষণ সেন

সেদিন সকাল বেলা শিশু রোড ধরিয়া গোহাটি
সহরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম। সঙ্গে ছিলেন গৃহিণী।
তিনি কি চিন্তা করিতেছিলেন তাহা আমি জানি না—
দ্বিষশ্চরিত্রম্ পুরুষশ্চ ভাগ্যম্ দেবা ন জানন্তি কুতো
মানবাঃ। আমি বাহা চিন্তা করিতেছিলাম তাহাও আমার
পত্নী সেই সময়ে জানিতে পারেন নাই। পত্নী সেই সময়ে
কি চিন্তা করিতেছিলেন তাহা জানিবার জন্য আমি চেষ্টা
মাত্রও করিলাম না; কিন্তু আমি বাহা চিন্তা করিতেছিলাম
তাহা জানাইবার জন্য চেষ্টার কটমাত্র নাই—এই
কাহিনীটুকু প্রচারিত হইলে আমার গৃহিণী কেন পৃথিবীস্থ
সকল গৃহের গৃহিণীরাও জানিতে পারিবেন।

সুন্দর প্রভাত। সূর্য্যকরোজ্জ্বলা ধরণী। সম্মুখে দেখা
বাইতেছে কামাখ্যা পর্ব্বতশীর্ষে ভুবনেশ্বরী মন্দিরের
শুভ্রকান্তি রৌদ্রকিরণে দীপ্ত। রৌদ্র তখনও উত্তপ্ত হইয়া
ওঠে নাই, মহম্মদ বায়ুপ্রবাহে স্নিগ্ধতার প্রলেপ স্পষ্ট
অনুভূত হইতেছিল। ভাবামুসঙ্গে মনে পড়িল এমনই আর
একটি রৌদ্রদীপ্ত সুন্দর প্রভাতের কথা।

প্রায় সিকি শতাব্দী পূর্বে সামরিক বিভাগের কার্য-
উপলক্ষে বেলুচিস্থানে ছিলাম। বেলুচিস্থানের রাজধানী
কোয়েটা নগরী। সেখানে এমনই এক সূর্য্যকরোজ্জ্বল
প্রভাতে বন্ধু সীতাংগ আমাকে লইয়া গেলেন থিওসফিক্যাল
সোসাইটির গৃহে (Theosophical Society Hall)।
গৃহের শীর্ষদেশে বড় বড় অক্ষরে লিখিত ছিল “There
is no religion higher than Truth” সত্যের চেয়ে
আর কোনও ধর্ম্মই বড় নয়। এই আদর্শ বাক্যটি আমার

মর্ম্ম স্পর্শ করিল। কতকটা এইজনাও এবং কতকটা
কৌতুহলের বশবর্তী হইয়া এবং সার্বাপরি বন্ধু আগ্রহাতি-
শয্যে থিওসফিক্যাল বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় একখানা পুস্তক
পড়িতে লইয়া গেলাম। এই পুস্তকের প্রসঙ্গে ছিল মানুষের
চিন্তাপ্রবাহ এবং অপরের উপর চিন্তাশক্তির প্রভাবের
কথা। চিন্তাশক্তিকে কেন্দ্রীকরণের অভ্যাস করিলে
নিজের চিন্তাশক্তি দ্বারা অপরকে কতকটা চালিত করা
যায়; যেমন আমি পথপার্শ্ব গৃহের অভ্যন্তরে বসিয়া
আছি, কিছুদিন চেষ্টা করিলেই দেখা যাইবে যে আমার
ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে পড়িয়া পথচারী প্রায় সকলেই আমার
দিকে একবার তাকাইয়া দেখিয়া যাইতেছে। বাহারা আরও
একটু অগ্রসর হইরাছেন তাহারা হ্রত সভ্যভূতিযোগে
অথবা আরও কোন গূঢ়তর সঙ্কেতপ্রভাবে অপরের
মুখতাব লক্ষ্য করিয়া তাহাদের চিন্তাধারাও পাঠ করিতে
পারেন।

ভাবামুসঙ্গে এবং চিন্তাপ্রবাহে এত কথাই মনে
পড়িতেছিল। এমন সময় নজরে পড়িল আমাদেরই
সম্মুখে অনতিদূরে একটি লোক বেশ অগ্রসর হইয়া
চলিয়াছে; পথে লোকের ভিড় তখনও আরম্ভ হয় নাই।
সেই জন্য এই লোকটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।
লোকটির গতি সম্মুখের দিকে; খালি পারে, খোলা
ছাতাটি কাঁধের উপর কেনিয়া বেশ নিশ্চিন্তভাবে চলিয়াছে।
ছাতার আবরণ শরীরের অধিকাংশই আমার দৃষ্টির
অগোচরে; তাহার পদক্ষেপ মাত্র আমার দৃষ্টিগোচর
হইতেছিল। যতটুকু দেখা যাইতেছে শুধু তাহারই

সাহায্যে লোকটির চেহারা সম্বন্ধে কতকটা অনুমান করা যায় বটে—দেহের বর্ণ কালো নয়, চেহারাও দুর্বল নয়, যৌবন বয়স পার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পদদ্বয়ের গড়নে এবং চলন-ভঙ্গিতে শক্তির পরিচয় দেখা যায়। কোন্ জাতির বা কোন্ বর্ণের লোক তাহা বুঝিবার উপায় নাই। ভাবিতে লাগিলাম ইহার দেহাংশের ওইটুকু মাত্র দেখিয়া ইহার চরিত্র সম্বন্ধে কিছু অনুমান করা যায় কি, অথবা ইহার বর্তমান চিন্তাধারা সম্বন্ধে ?

এমন সময় লোকটি চলিতে চলিতে পথের উপরেই দাঁড়াইয়া পড়িল। ছাতার ভঙ্গি একটু আড়ষ্ট হইল, ছাতার ভঙ্গি অনুসরণ করিয়া বুঝিতে পারিলাম মস্তক ঈষৎ অবনত এবং সোজা সম্মুখ দিক হইতে একটু বাম দিকে চালিত। আমাদের সম্মুখে একটু বামদিকে কামাখ্যা পর্বত। অনুমানে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে পর্বতশীর্ষে ভুবনেশ্বরী মন্দির দেখিয়া লোকটির মস্তক অবনত হইয়াছে। অতএব লোকটি হিন্দু এবং দেবদ্বিজে ভক্তিমান। কিন্তু প্রণাম করিতে তো এত সময় লাগিবার কথা নয়, বুঝিতে পারিলাম যে লোকটি শুধু প্রণাম করিয়াই তৃপ্ত নয়, নিশ্চয়ই দেবীর নিকট

কোন কামনা জানাইতেছে। অতএব লোকটি শুধু হিন্দু নয় এবং শুধু দেবদ্বিজে ভক্তিমান নয়; ভাবে বোধ হইতেছে যে লোকটি পরম ভক্ত এবং ধর্মবিশ্বাসী সরলচিত্ত লোক।

লোকটির চেহারা দেখিবার জন্য কৌতুহল হইল। লোকটি দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে, আমরা অগ্রসর হইয়া চলিতেছি; অতএব আরও একটু অগ্রসর হইলেই ইহার মুখের চেহারা দেখা যাইবে, ভাবিতেছিলাম ইহার দেহভঙ্গি এবং গতিভঙ্গি দেখিয়াই লোকটির সম্বন্ধে কতকটা অসন্দিগ্ধ পরিচয় লাভ হইল। অতএব চেহারা দেখিতে পাইলে এবং শাস্ত্রানুসঙ্গত ভাবে অভ্যাগ্ন করিলে মানুষের চরিত্র এবং চিন্তাধারা সম্বন্ধে যে অনেক পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। খিওসফিক্যাল বিজ্ঞান মিথ্যা নয়।

এইটুকু চিন্তা করিতে করিতেই আমরা লোকটির পাশাপাশি আসিয়া পড়িলাম। অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ইহার দিকে তাকাইয়া দেখিলাম যে ইহার শরীরের গঠন সম্বন্ধে যাহা অনুমান করিয়াছিলাম তাহা হয় ত মিথ্যা নয়; কিন্তু ইহার মাথায় মুসলমানী টুপি, লোকটি ছাতাস্কন্ধ আড়ষ্ট হাতে দেয়াশলাই কাঠি জালিয়া বিড়ি ধরাইতেছে।*

কবি

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

আমি কবি আমি কবি।

আমি ধরণীর অজ্ঞাত কোণে বসে অঁকি নানা ছবি।

তোমরা যখন কন্ঠে মগন,

পৃথিবী মথিয়া কর লুপ্তন,

আমি হেরি বসে ছিন্ন মেঘের মাঝারে সোনালী রবি।

আমি কবি আমি কবি।

আমি কবি আমি কবি।

আমি ভয়ে ভয়ে দূরে রেখে চলি যা কিছু সভ্য সবি।

তোমরা রচিছ নব্য বিধান—

পোষাকে ভাষণে কত পরিমাণ,

আমি বনপথে পল্লীর কোলে ঘুরে ফিরে সুখ লাভি।

আমি কবি আমি কবি।

আমি কবি ছোট নদী।

• ঝোপের আড়ালে গাছের তলায় ধীরে ধাই নিরবধি।
শ্রামা শিস দেয়,—আমি নেচে উঠি,
চাঁদের আলোতে করি নুটোপুটি,
ধমকিরা শুনি রাখালের গান উদাস চিত্তামোদী
আমি কবি ছোট নদী।

আমি কবি ব্যথাভুর।

নিখিল জনের সকল বেদনে করি হিরা পরিপূর।
অতিথি ভিখারী তোমাদের দ্বারে
বেদনা জানাতে ঘুরে বারে বারে,
সমবেদনার তাদের বেদনা আমি করি নিতি দূর।
আমি কবি ব্যথাভুর।

আমি কবি হাসি, গাই।

নৈন্যপেধে হৃদয়ের আলায় হেসে বুকে দিই ঠাই।
তোমরা কাদিছ হৃদে অনটনে
কৃতি-লোকসান-শোক-পরশনে,
আমি অনশনে হরষ ভুলি না, শোকে ভেঙে নাহি ঘাই।
আমি কবি হাসি, গাই।

আমি কবি প্রেম-ভোর।

কণিক আলাপে চকিত দরশে করি দান হিয়া মোর।
তোমরা তুষিছ আশ্র-জনারে,
দাওনাকে প্রেম কভু বারে তারে,
আমার চপল হৃদয় নিবৃত ছড়ায় পৌরিত্তি-ভোর।
আমি কবি প্রেম-ভোর।

আমি কবি নহি ধীর।

আজ বারে চাই, কাল তারে ত্যাগি, আমি চির-অস্থির।
তোমরা বা' কিছু নিষেছ আদরে,
তা' হ'তে পরাণ কভু নাহি সবে,
আমি বাহা পাই আর বাহা আছে ভেঙে করি চৌচির।
আমি কবি নহি ধীর।

আমি কবি আমি বীর।

ন্যায়ের অগ্নি পুষি অহরে পূজি সত্যেরে স্থির।
সত্যের ডাকে তোমরা পিছাও.
ন্যায় বিধানিতে আগায়ে না বাও,
আমি দুর্কলে করিতে রক্ষা নশ্তুরে হানি তীর।
আমি কবি আমি বীর।

আমি কবি দুর্কার।

সমাজ-বিধান, বিধির বিধান ভেঙে করি চুরমার।
তোমরা পালিছ বাহা সন্যতন,
সভরে পোষিছ পরাণ আগুন,
আমি তেজে সৃষ্টি সদাই নূতন বিধে এ বিধাতার।
আমি কবি দুর্কার।

আমি কবি রূপ-আশী।

রূপের নেশায় কোথা হৃদয় খুঁজিবারে ভাগবাসি।
দেখিতে যা ভাগ হৃদয় তাই—
তোমরা এ কথা বলিছ সদাই,
পতিত ঘৃণ্য কুৎসিত মাঝে আমি হেরি শোভারাসি।
আমি কবি রূপ-আশী।

আমি কবি উপাসক।

আমার দেবতা সুনীল আকাশ, সমুদ্র, গিরিলোক।

আমি পূজি যেরা অখাত বীর,

আমি পূজি হিয়া বঙ্গনারীর,

পূজি সে পাগলে সব স্বপ্নের দ্রষ্টা ও যে সাধক।

আমি কবি উপাসক।

আমি কবি কালজয়ী।

আমার উক্তি কালে কালে আর দেশে দেশে লেহে বচি'।

আমার বাণীর গভীর নিনাদ

জাগায় ভেঁরে, ঘুচায় বিষাদ,

বীর ম'রে যায়, নেতা ভেসে যায়, মম বাণী গাণময়ী।

আমি কবি কালজয়ী।

আমি কবি সুবিশাল।

ঘন অরণ্যে, গিরির শিখরে, পারাবারে উত্তাল;

স্বাপদের সাপে, নাজির তলার,

চলে স্বর্গে নীরদে তারার,

বঠোর নরুভু শাখারে বড়বা ছড়াই প্রাণের জাল।

আমি কবি সুবিশাল।

আমি কবি, আমি কবি,

আমি বক্রগাব, আমি প্রাণের আমি অষ্টার ছবি।

আমি বিদ্রোহ, আমি মঙ্গল

আমি সংহার আমি প্রাণবল,

স্নিগ্ধ-কিরণ চন্দ্রমা আমি, তাপময় ধর রবি।

আমি কবি, আমি কবি।

‘চরিত্রহীনের’ নারীচরিত্রে প্রেম

শ্রীবীরেন্দ্রলাল সরকার বি-এস-সি

অদ্বিতীয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রায়ই আমরা একটি অনুযোগ এই শুনিয়া থাকি যে, তাঁহার নারীচরিত্রে বৈচিত্র্য নাই—সবই এক ছাঁচে ঢালা। কথাটা আংশিক ভাবে হয় তো বা সত্য। কিন্তু ঐ একই ছাঁচের উপর তুলির শুক্ক মাত্র এই চারিটি মোহন টানে কতখানি বৈচিত্র্য যে তিনি কুটাইয়া তুলিতে পারেন তাহা এক ‘চরিত্র-হীনের’ প্রধান চারিটি নারীচরিত্রে প্রেমের বিভিন্নমুখী দ্বারা অনুধাবন করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব।

স্বরবাল্য হিন্দুস্তার আদর্শরূপে কুটিয়াছে। স্বামীর প্রতি তাহার ভালবাসা নৈব্যক্তিক। “স্বামী” এই

ভাবেরই সে পূজারিণী, কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়। তাই তাহার প্রব বিশ্বাস উপেক্ষা ছাড়া আর কাহারও সহিত তাহার বিবাহ হইতেই পারিত না। সে মনে করে তাহাদের মিলন শুধু এ জন্মের নহে, জন্মজন্মান্তরের। মৃত্যুর পূর্বে হয়তো বা তাহার বিশ্বাস কিছুটা শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, তাই উপেনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

“আবার তোমাকে পাবো তো?”

এইরূপ নৈব্যক্তিক ভালবাসার স্পষ্টতর চিত্র দেখি নৌকাডুড়ি’র “কমলা”তে। “রমেশ” তাহার স্বামী নহে এ কথা জানিবার পর রমেশের আশ্রয়ে থাকা কমলার

পক্ষে আর সম্ভব হইল না। প্রথম সন্মিলনেই গাজিপুত্রের বাথলো ত্যাগ করিয়া বুকভরা আশা ও বিশ্বাস লইয়া অজ্ঞাতপ্রায় স্বামীর সন্ধানে বিপুল বিধে সে বাহির হইয়া পড়িল।

স্বামীর প্রতি সুরবালার ভালবাসা অগাধ। মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়াও সে বেশী দিন এত একা থাকিতে চাহে না।

হিন্দুর বিধিনিষেধ, হিন্দুর শাস্ত্র, হিন্দুর রানায়ণ-মহাভারতের প্রতি তাহার বিশ্বাস অটুট। তাই শরশব্যার পড়িয়া ভীষ্মের তুষ্ণা যে পাতালের গঙ্গাওলেই নিবারণ হইয়াছিল অন্য কোনও জলে হয় নাই, তাহা বিশ্বস্ত চিত্তে সে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। এই বিশ্বাসের কাছেই কিরণময়ীর এত বিদ্যা, এত বুদ্ধি নিমেষে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

সুরবালা যেন শুভ্র রজনীগন্ধা। তাহাতে স্নিগ্ধ সুবাস আছে; কিন্তু রং নাই। তাই আনন্দ দেয়, মুগ্ধ করে; কিন্তু “পরাণে না জাগে আকুল পিয়সা।”

সরোজিনী বালিকামাত্র, তাহার প্রেমও বালিকা-সুগভ। কিছুটা রোমাটিক। সে ভালবাসিয়াই খালাস। দয়িতের প্রতি তাহার আকর্ষণ এত প্রবল যে কিছুতেই তাহাকে রোধ করিতে পারিল না। শশাঙ্কমোহনের এত চেষ্টা এত অধ্যবসায় সবই বিফল হইল। সতীশের নিজের মুখে ও পরে বেহারীর নিকট সাবিত্রীর সহিত সতীশের নিবিড় সম্বন্ধের কথা নিজের কানে শুনিয়াও সতীশের প্রতি বিমুগ্ধ হইতে পারিল না। তাহার অসুখের কথা শুনিবামাত্র তাহার সেবা করিতে ছুটিল।

সে যেমন জ্যোতিষের ভগ্নী তেমনি তাহাকে ছোট বোনটি বলিয়া আদর করিতে ইচ্ছা করে। মাধুরী আছে; কিন্তু আলোড়ন তোলে না।

এ যেন একটি অক্ষুট পুষ্পকোরক। বর্ণ গন্ধ সব ভিতরে ভিতরেই “কানিছে অন্ধ হ’য়ে।”

কিরণময়ী শরৎচন্দ্রের এক অপূর্ব সৃষ্টি। “তোমার বাড়ির” “দিনোদিনো”র সহিত তাহার কিছু কিছু মিল থাকা সত্ত্বেও প্রবল আবির্ভাবে সে বাঙালী পাঠক-সমাজে প্রবল আন্দোলন তুলিয়াছিল। নানা কারণে সে আন্দোলন আজ প্রশমিত। কিন্তু আমাদের পক্ষে ভুলিয়া যাওয়া কঠিন যে তাহার চরিত্রের দাপ্তিতে অনেকেরই চক্ষু বলসাইয়া গিয়া দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছিল।

কিরণময়ীর ভালবাসা যেমন অতৃপ্ত, তেমনই উগ্র। তাহার রূপ যেমন বহির্নিখার মত উজ্জ্বল, তাহার প্রেমও তেমনই কেবলমাত্র দহন করে, তৃপ্তি দেয় না।

তাহার ভালবাসার উগ্রতার আমরা স্তম্ভিত। নির্লজ্জতার চরমসীমা অতিক্রম করিয়া উপেনের নিকট সে প্রেম নিবেদন করিল। কিন্তু যখন বুকিতে পারিল উপেনের কাছে সে প্রতিদান পাইবে না, উপেন তাহাকে “নাশ্তিক, অপবিত্র, ভাইপার” বলিয়া ঘৃণাভরে চলিয়া গেল, তখন তাহার উৎকট ভালবাসা প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইয়া যাহা করিল তাহা কেবল তাহার পক্ষেই সম্ভব।

শরৎচন্দ্রের ভাষায় “কাচপোকা যেমন করিয়া পতঙ্গকে টানে, তেমনি করিয়া ছর্নিবার বাছুরে কিরণময়ী অর্দ্ধসচেতন, বিমূঢ়চিত্ত হতভাগ্য দিবাকরকে ভাহাজঘাটে টানিয়া আনিয়া উপস্থিত করিল।” তাহার পর নিজে ভাসিয়া এবং দিবাকরকেও ভাসাইয়া সেই সুদূর আরাকান যাত্রা করিল।

তাহার যুক্তিঙ্গল অকাটা; কিন্তু মর্ম স্পর্শ করে না। তাই “ললিতার” মত মনে মনে ইচ্ছা হয় কেহ

তাহাকে তর্কে একেবারে পরাস্ত করিয়া দিক। কিন্তু “গোরা’র” সহিত বেহাই যেমন তর্কে আঁটিয়া উঠিতে পারে না, তেমনিই দিবাকরের সকল কথাই তাহার যুক্তির বজায় ভাসিয়া যায়। উপেন বসিয়া বসিয়া কেবল শোনে; কিন্তু তাহারও বোধ হয় উত্তর যোগায় না।

সে যেন জীবন্ত বিদ্রোহ, একটা বিরাত প্রলয়। আনে বজ্রা, আনে ভূমিকম্প, আনে অধ্যুৎপাত; কিন্তু ব্যরিসিঙ্কন করিয়া স্নিগ্ধ করে না।

এ যেন মরুময়ী ফুল। বর্ণের ছটার দিক উদ্ভাসিত করে; কিন্তু গন্ধ নাই বলিয়া মন কাড়িতে পারে না।

সাবিত্রী শরৎ প্রতিভার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। অন্তর শরৎ চন্দ্র বলিয়াছেন, “বড় প্রেম কেবল কাছেই টানে না, দূরেও সরাইয়া দেয়।” এ সেই “বড় প্রেমের” অল্পম চিত্র।

প্রথম পরিচয়ে তাহাকে দেখি মেসের সামান্য একটি বিরূপে; কিন্তু সে “অত্যন্ত সুশ্রী।” শরৎচন্দ্রের একটি ছর্বলতা এই যে তাহার নারিকারা প্রায় সকলেই অত্যন্ত সুরূপা; কিন্তু সাবিত্রী কেবল সুশ্রী। তাহার পর চিত্র যতই উদ্ভাসিত হইতে থাকে ততই তাহার বাহ্যিক দূরে সরিয়া যায়, ফুটিয়া উঠে অন্তরের শ্রী।

যতই মনে প্রশ্ন জাগে কে এই মহীয়সী নারী, বাহার সম্পর্শে যে আসিতেছে সেই উহাকে ভালবাসিতেছে? ইহার বিগত জীবনের রহস্য কি? কে ইহার পিতা? কে ইহার স্বামী? কে কেমন, করিয়া ইহাকে বিপথগামিনী করিল? কিন্তু পরিণত শিরী শরৎচন্দ্র সেই রহস্যের আভাসমাত্র দিয়া আকুলতা আরও বাড়াইয়া তোলেন। চিত্রের প্রায় শেষ অঙ্কে যখন তাহার পূর্ণ

পরিচয় পাইলাম তখন দেখি উপেন্দ্রের মত লোকও অনুশোচনার পরিপ্লুত হইয়া বলিতেছেন, “উপেন, ভালো কর নাই।” বোধ হয় তাহার মনে হইয়াছিল, “Do not judge lest ye be judged.”

তাহার এই মহিমার উৎস কি? এমন কোন্ স্পর্শমণির সে অধিকারিণী যাহার যাত্ৰস্পর্শে সবই সোনা হইয়া যায়? সে উৎস, সে মণি তাহার কামনাবিহীন প্রেম। এ সেই—

“রজকিনী প্রেম

নিকষিত হেম

কাম গন্ধ নাহি তার।”

প্রিয়তমকে ভালবাসিয়া তাহার সেবা করিয়াই তাহার অন্তর পূর্ণ; প্রতিদানে সে কিছুই চায় না।

পূর্বে বলিয়াছি কিরণময়ীর প্রেম দহন করে। সেই দহনে পাঠকের মনে যে জ্বালায় সৃষ্টি হয় তাহা নিবাক্রিত হয় সাবিত্রী-প্রেম-পূতবারির অনুসেচনে।

এই ছই বিভিন্নমুখী প্রেম আলোছায়ায় সৃষ্টি করিয়া পাঠকের মনে যে মায়াজাল বুনিতে থাকে তাহা কাটিয়া বাতির হওয়া তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। তাই এই সুবৃহৎ উপন্যাসখানি পড়িতে আরম্ভ করিলে একেবারে শেষ না করিয়া আর ছাড়িয়া উঠা যায় না।

সতীশ সাবিত্রীকে ভালবাসিত; কিন্তু তাহার ভালবাসায় কামনা ছিল। তাই বিপিনঘটিত মিথ্যা কলঙ্ক কালনের চেষ্টা মাত্র না করিয়া সে সতীশকে দূরে ঠেলিয়া দিল। কিন্তু তাহার সংযম আর বাধ মানিল না। “বুক-কাটা কর্তে” “ওগো, এই পাপিষ্ঠাকে কেন এত ভালবেসেছিলে” বলিয়া “আর একবার ভূমিষ্ঠলে নুটাইয়া পড়িল।”

সতীশকে সে দূরে সরাইয়া দিল বটে, কিন্তু বুঝিল যে সতীশের সেবার জন্য আবার তাহাকে আসিতে

হইবে সে তো সতীশকে ভালো করিয়াই চিনিয়াছিল। তাই
বাইবার সময় বেহারীকে বলিয়া গেল সেই চরম দিনে সে
যেন খবর পায়।

সেদিন আসিল, তাহাদের পুনর্মিলনও হইল। কিন্তু
মিলনের পর আবার যখন বিচ্ছেদ ঘনাইয়া আসিল, তখন
সতীশ এবার আর কিছুতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিতে
স্বীকৃতি হইল না। কিন্তু সাবিত্রী তো জানে তাহাদের
ঐহিক মিলন হইতে পারে না। সে মিলনে সমাজের মূণে

আঘাত করা হইবে। সমাজ তাহাকে না চাহিলেও সে
সমাজকে চায়। তাই তাহাকে সমাজের বাহিরেই
ধাকিতে হইল। এ ত্যাগের তুলনা নাই।

সাবিত্রীর মত রমণীকুলরত্ন গৃহলক্ষ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত
হইতে পারিল না, ইহাট “চরিত্রহীনের” চরম ট্যাগেডি।

সাবিত্রী বর্ণে, গন্ধে অতুলনীয় শরৎকালীন বিকশিত
কমল। কিন্তু হায়, আঘাত বলিয়া দেবতার পূজায়
লাগিল না।

দখিনা বাতাস ফিরিয়া এলো না আর

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

কালবোশেখীর ঝঞ্ঝার মত ছুধের ক্রন্দ খেলা

দিশেহারী করে আমারে বারম্বার।

তুমি চল গেলে দখিনা বাতাস ফিরিয়া এলো না আর,

কেন এত অবহেলা?

শ্যামারিত ঘন সমতলভূমে তোমারে শ্যামলী পেয়ে

যাত্রা আমার হয় নি বিফল জানি।

দিবসের শত কর্মের মাঝে তুমি মোর স্মৃতিরানী

ছায়া সম সব ছেয়ে।

পালংকশর কীর্তিজড়িত কীর্তিনাশার ভাঁয়ে

ওই যে বনানী বিশ্বয় চেয়ে রয়,

হোথাব তোমারে হেরেছি প্রথম রমণীয় কিশলয়—

গাহন করিতে নীরে।

মোদের মিলন স্বপনের দিন আজো ঘুমজাগরণে

নিরুমে লগনে আমার সপুখে কোটে—

তোমার বিরহে নিখিল-বিরহ ব্যথাবেননায় ওঠে

বেথার অতীত ক্ষণে।

নদীর তূপারে মরণের ঘূমে ঘুমায়েছে জনপদ

ভেঙে ভেঙে পড়ে গাঁৱের কুঁড়িরগুলি,

কালের যাত্রা-ধ্বনি শোনা যায় : চলে বর্ষের রথ

যুগের কুসুম তুলি।

হেথা বসে আছি উতল মনের বিরল স্তব্ধতায়

মেঘভাঙা নীল আকাশের পানে চাহি;

বিশ্বরূপের খেলাঘরে আজ খেলিয়ার কিছু নাহি!

কেন নিরেছ বিদায়?

পাগল

শ্রীহিমাদ্রি ভট্টাচার্য

ছোট শহরের স্বল্পখ্যাত সিনেমা হল।

সুজিত আজ একা-একাই সিনেমা দেখছিল। সঙ্গী সাথী কেউ ছিল না। ওদের নিতেও ও বড়-একটা চার না। তবু প্রায়ই কোথা থেকে এসে এক জন জুটে যায়, ও আর এড়াতে পারে না তাদের। কিন্তু আজ ও একা, কেউ এসে জুটতে পারে নি। মনে তাই একটা নিঃশব্দের স্বচ্ছন্দভাব আর অব্যাহত মুক্তির আনন্দ নিয়েই ও সিনেমা দেখছিল। সিনেমা হলে বন্ধুবান্ধবের সাহচর্য্য সত্যিই ওর মনটাকে ওদের প্রতি বিতৃষ্ণায় বিষিয়ে তোলে। তাই এই নিঃসঙ্গতা আর একাকীভাব আজ ওর মনটাকে একটা অব্যক্ত নিবিড় আনন্দে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছিল।

বড় ভাল লাগছিল বইখানাকে। তন্ময় হ'য়ে যাচ্ছিল ও দেখতে দেখতে। বইয়ের দ্রুতধাবমান ঘটনাগ্রবাহে নিজের মনটাকে ভাসিয়ে দিচ্ছিল সুজিত, আর সে স্রোত শুকে টেনে নিয়ে কোন্ অজানা লোকে পৌছে দিচ্ছিল। এমন করে গা ভাসিয়ে দিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলার মাঝে ও খুঁজে পাচ্ছিল কেমন বেন একটা আবছায়া সুখের ইঙ্গিত; অস্পষ্ট আনন্দের শান্তিমাধা আভাস। মুক্তি আর এমন সুন্দর আনন্দের সমন্বয় এর আগে কোনদিন সিনেমা দেখার সময় ওর ভাগ্যে ঘটে ওঠে নি। সার্থক সুন্দর লাগছিল তাই এই সংগীহীনতা, সরসমধুর মনে হচ্ছিল তাই এই নীরব নিঃসঙ্গতা।

সুজিত একমনে দেখেই চলেছিল। বইখানার গলিটা ছিল, অনেকটা শরৎবাবুর 'রামের স্মৃতি' গোছের। বৌদি আর একটা মাতৃহীন দেবরের মধ্যে স্নেহের সম্পর্কটাই ছিল বইয়ের মূল। মাতৃহীন হয়েও ছেলেরা কেমন একটা মা পেয়েছিল—তাই নিয়েই বইটাকে লেখা হয়েছিল। দর্শকের অন্তরকে আর্দ্র করে তুলবার ক্ষমতা সত্যি সত্যিই বইখানা লেখকের কাছ থেকে পেয়েছিল।

বৌদির ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন—নামকরা অভিনেত্রী, অনিতা দেবী। অভিনয় তাঁর সফল এবং যথেষ্ট প্রশংসনীয়ই হচ্ছিল। চরিত্রকে সঠিক রূপ দেবার ক্ষমতা যে সত্যি তাঁর আছে একথা স্বীকার করে নিতে উপস্থিত কারও পক্ষে আপত্তি করা মোটেই সম্ভব বলে মনে হচ্ছিল না।

দর্শকগণ বেশ আর্দ্র জ্বীভূত চিত্তেই দেখে যাচ্ছিলেন। আর তাঁদেরই মাঝে একখানা দশ আনার সিটে একাকী বসে দেখে যাচ্ছিল সুজিত। বড় ভাল লাগছিল তার এই বৌদির ভূমিকাটাকে। একমনে সে দেখেই চলেছিল। কোন দিকে খেয়াল নেই।

পর্দার বুকে অনিতা দেবীকে সে বহুদিন দেখেছে। কিন্তু এমন করে তো কোন দিন দেখতে পারিনি। এমনি স্নেহময়ী মায়ের রূপে কোন দিন তো তাঁকে দেখতে পারিনি সুজিত। সেই জন্যই বোধ হয় বড় ভাল লাগছিল তার এই বৌদিদিকে। চূপ করে নিঃশব্দে

বসে দেখেই চলেছিল, আর আপনার অগোচরে মনের নিভৃত গোপন কোণে শুধু একটা ব্যাশার ঘটছিল, ক্রমে ক্রমে সেখানে পুঞ্জীভূত হচ্ছিল অনিতা দেবীর প্রতি কিছুটা শ্রদ্ধা, কিছুটা ভালবাসা।

সিনেমা ভেঙ্গে গেল।

একটা ক্লাস্ত ধম্ধমে ভাব নিয়ে সজ্জিত ধীরপদবিক্ষেপে হল থেকে বেরিয়ে এল। তারপর রাস্তায় নেমে অলস গতিতে পা ছটোকে চালিয়ে দিলে বাড়ীর দিকে। মনের মাঝে তখনও চিন্তায় একটা সুরঝংকার শঙ্কায়মান সেতারের মত দ্রুতগতিতে বেজে চলেছিল। প্রাণের প্রতি স্পন্দন বেন এক অননুভূত সুখকর আনন্দে ভরে উঠছিল। কল্পনার একটা প্রবাহ বেন ওর হৃদয়ের দুই কূলকে প্রাবিত করে ছরস্তু হৃদয় গতিতে বয়ে চলেছিল।

মনে পড়ছিল ঐ বৌদির কথাই। সত্যি, বাত-প্রতিবাত ছুঃখকষ্টের জগতের মাঝে অমন একটা নারীর স্নেহাঙ্কুর তলায় একান্ত নির্ভয়ে নিজের ভারগ্রস্ত মাথাটাকে মাঝে মাঝে রাখতে পারার সুযোগ পাওয়া সত্যি বড় লোভনীয় ব্যাপার। এমনি একটা নারীর স্নেহকোড়ের মাঝে নিজেকে সমর্পণ করার ভেতর কি যেন একটা অপরিজ্ঞাত তৃপ্তি আছে। কর্মব্যস্ত জীবনের সমস্ত গুরুভার এতে বেন নিমেষে লঘু হয়ে আসে। শান্তি, তৃপ্তি এবং মুক্তির নিঃশ্বাসের তিতর দিয়ে সমগ্র রক্ত বুকখানাকে হাফা করে দেওয়া যায়,— অনাবিল আনন্দের সুন্দর বাতাস এসে বেন সমস্ত অন্তরকে পুলকিত করে দিয়ে যায়। মাতৃহীন হয়েও এমনি একটা মা পাওয়ার ভাগ্য সত্যিই বড় লোভনীয়।

ভাবতে ভাবতে সজ্জিতের মনে পড়ে যায় তার অতীত জীবনের কতকগুলো অস্পষ্ট আবছা স্মৃতি। জীবনপুস্তকের কয়েকখানা অরণীর ওলটানো পৃষ্ঠা হঠাৎ বেন একটা দম্কা হাওয়ার ওর মনের মাঝে ডানদিকে উন্টে যায়। জল জল করে ভেসে ওঠে ওর চোখের সামনে সেই কটা পাতার ওপর লেখা গোটাকয়েক অস্পষ্ট অক্ষর। কি বেন সজ্জিত তাতে লিখে রাখবার চেষ্টা করেছিল। কালের ধারে সেগুলো আজ প্রায় মুছে এসেছে। তবু ও চেষ্টা করে সেই বেদনামধুর স্মৃতিগুলিকে জোর করে মনের মাঝে টেনে আনতে।

আস্তে আস্তে মনে পড়ে যায় ওর সব কথা। ঐ রকম বৌদির মত একটি স্নেহময়ী নারী ও পেয়েছিল জীবনে। সে ওর কাকীমা, অগ্নিমা দেবী। তখন সজ্জিত খুব ছোট, সেটা আজও ওর মনে আছে। কাকীমা ওকে ভালবেসেছিলেন—ঠিক অম্নি ভাবেই। কাকীমার প্রত্যেকটা কথা আজ আবার নতুন করে ওর কানের কাছে ধ্বনিত হতে থাকে। তাঁর প্রত্যেকটা স্মৃতি এক এক করে আবার ওর চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে। সেগুলো বার বার করে ভাবতে আজ ওর বড় ভাল লাগলো। কিরে যেতে ইচ্ছে করল পুরোনো দিনে। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়লো আর একটা কথা। চোখ দুটো ওর মলে ভরে উঠলো। নিয়তির কঠোর হাতের দৃঢ়মুষ্টি থেকে সে স্নেহকে ছিনিয়ে নিয়ে ওতো পারেনি নিজের কাছে রাখতে। হৃদয়ের আকর্ষণ তাঁকে টেনে নিয়ে চলে গেছে কোন্ অজানা লোকে।

জলন্তরা চোখ দুটোকে হাত দিয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে সজ্জিত ভাবতে ভাবতে চলেতে থাকে। মনের মাঝে ও তখন ছোট নারীকে পাশাপাশি আসনে বসিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। একজন অগ্নিমা দেবী আর একজন

অনিতা দেবী। দুজনকেই আজ ওর সমান ভাল লাগছিল। দেখতে দেখতে অকস্মাৎ যেন ওর মনে হ'ল এ দুজনই এক; এক হয়ে গেল যেন ওর চোখে অণিমা দেবী আর অনিতা দেবী। দুজনকার মাঝে যে পার্থক্য তা যেন নিমিষে ওর কাছে নুপু হ'য়ে গেল—মুছে গেল সব নিঃশেষ হয়ে। তার ঠিক সেই মুহূর্তেই, যে ব্যাপারটা এতক্ষণ আপনার অঙ্গোচরে মনের মাঝে গোপনে ঘটে চলেছিল—অত্যন্ত আকস্মিকভাবে তা ওর কাছে ধরা পড়ে গেল। ও বুঝল—অনিতা দেবীকে ও প্রকা করেছ, ভালবেসেছে, ভক্তিও কিছু করেছে। কেন যেন হঠাৎ অনিতা দেবীকে মা বলে ডাকবার একটা দরস্ত দুর্দম বাসনা একেবারে পোয় বসল ওকে। প্রবল একটা ইচ্ছা যেন ওকে পাগল করে তুলতে লাগল।

বাড়ীতে প্রবেশ করে কোথাও অপেক্ষা করলো না স্মৃতি। সোজা দোতিলার ওর পড়বার ঘরে চলে গেল। আলোটাকে জালিফে নিয়ে পড়তে বসল ও। তারপর কিছুক্ষণ ধরে চুল পড়বার একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা। বইয়ের মাঝে কিছুতেই আজ ওর মন বসতে চাইছে না। অন্যমনস্কভাবে পড়তে পড়তে মাঝে মাঝেই ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছে অনিতা দেবীর মুখ আর সঙ্গে সঙ্গেই মা বলে ডাকবার জন্যে মনটা কেমন যেন আন্টান করে উঠছে। মনের মাঝের এই দুর্দম বাসনাটা কেন যেন ওকে ক্রমশঃ বেশী পাগল করে তুলছে।

কি একটা মনে হতেই প্যাড আর কলমটাকে টেনে নিল স্মৃতি। খানিকক্ষণ একমনে চিন্তা করে ঝুঁপু করে একখানা চিঠি লিখে ফেলল অনিতা দেবীর কাছে। শেষ হয়ে গেলে আর একটুকুণ বাইরে তাকিয়ে থেকে কলমটাকে বন্ধ করতে করতে চিঠিটাকে পড়তে লাগল। ভাল লাগলো না। ছিঁড়ে ফেল চিঠিটাকে টুকরো টুকরো

করে। আর একখানা কাগজের ওপর আবার লেখা চলে। ভাল লাগলো না—সেটাও। তার দশাও হল অগেঁকারখানার মতন। ফেলে দিল ও দূর করে সে ওলোকে। কোনখানাই যেন মনের মত হতে চায় না। অনেক চিন্তার পর এবটা মাদা কাগজের ওপর ও লিখল—মাত্র দুহত্র—“আপনাকে মা বলে ডাকবার কেমন একটা দরস্ত ইচ্ছা যেন আমার পেয়ে বসেছে। জানি না সে অধিকার আপনি আমার দেবেন কিনা।—স্নেহপ্রার্থী।”

অনেকক্ষণ ধরে কাগজপত্র বেঁটে বেঁটে স্মৃতি খুঁজে বের করল অনিতা দেবীর বাড়ীর ঠিকানা। বইয়ের মাঝে আশ্বেকার কেনা একটা খাম ছিল। সেটার মাঝে চিঠিটাকে পুরে তার ওপরে বেশ ভাল করে ধরে ধরে অনিতা দেবীরই বাড়ীর ঠিকানাটা লিখে ফেলল ও। তারপর রাত্রে নীচে খেতে বাবার সময় বাড়ীর পাশের ডাকবাঁহটার ফেলে দিয়ে নিশ্চিত হল স্মৃতি। শান্তি, স্বস্তির একটা হাক্স খাস নিজস্ব করে দিয়ে ও যেন পরম পরিতৃপ্তি অনুভব করল। রাত্রে বিছানায় শুয়ে মাঝে মাঝেই চিঠিটাকে বাব্ব ফেলে দেওয়ার কথা মনে পড়েছে আর তাতে পেয়েছে একটা মানসিক আরাম। আপনা থেকেই যুম কখন ওর চোখের পাতার ওপর নেমে এসেছিল, ও জানে না।

পরদিন বিকেল বেলা।

ছুটির দিন বলে একটু আগে আগেই বেড়াতে বেরিয়ে পড়ল স্মৃতি। শহরের চঞ্চলতা কোলাহল ওর ভাল লাগে না। তাই রোজই বিকেলবেলা ও নদীর ধারে বেড়াতে যায়। শান্ত নদীটা যুহ শব্দ করতে করতে বয়ে যায় শহরের এই নির্জন প্রান্তে দিয়ে। বড় কেউ

এদিকে বেড়াতে আসে না। সজ্জিত তাই একা একা এখানে একবার বিকেলে আসে। ক্ষীণ, শুষ্ক নদীটার খুঁচু জলের ওপর অন্তায়মান সূর্যের রশ্মিতে রাঙান আকাশখানার ছায়া পড়ে ঝলমল করে ওঠে, ওর দেখতে বেশ ভাল লাগে। দূরে দেখা যায় নদীটা দৈর্ঘ্যে চলে গেছে—কোনখানে ঠিক বোঝা যায় না। ওপারে নীল আকাশটার গায়ে আঁকা নীরব ছবির মতো দাঁড়িয়ে থাকে বৈকুণ্ঠ বনানী। পৃথিবীতে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার সাথে সাথে সারি দিয়ে পাখীরা উড়ে চলে যায় ঐ বনানী পেরিয়ে কোন্ অচেনা লোকে। এসব দেখতে বড় ভাল লাগে সজ্জিতের। আত্মহারা হয়ে যায় ও।

নদীর ধার দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল ওর গত কালকার চিঠিটার কথা। কেমন একটা শিহরণ খেলে গেল চকিতে ওর সারা দেহ মনের মাঝে। একটা তরল আনন্দের ঝাপটা যেন ওর সারা অস্তিত্বকে সিক্ত, আর্দ্র করে দিল। ও ভেবে যেতে লাগল নীরবে, মুখের বাইরে তা কোন রকম অভিব্যক্তি পেল না।

চিঠিখানা হয়তো এতক্ষণ অনিতাদেবীর হাতে গিয়ে পৌঁছেছে। ওপরে অত ভাল করে ঠিকানা লেগা দেখে তিনি বোধহয় প্রথমে খুবই আশ্চর্য্য হয়েছেন। তারপর—খুলে ভেতরে যা দেখেছেন—তাতে হয়তো মনের মাঝে কেমন একটা সাময়িক পরিবর্তন এনে দিয়েছে! অচেনা অজ্ঞাত একটা ছেলের এমন অদ্ভুত কাণ্ড হয়তো তাঁর মনে এনে দিয়েছে স্নেহের প্লাবন। বসে বসে হয়তো কল্পনার মধ্যে দিয়ে ছেলেটাকে দেখবার একটা আগ্রহময় চেষ্টা বার বার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। খালি চিন্তাই মনটাকে তার দিচ্ছে আর সেই সঙ্গে মন থেকে ধানিকটা স্নেহ অদৃষ্ট বালকের প্রতি নিষ্ফলভাবে ধাবিত হচ্ছে।

আবার হয়তো বা মনে মনে চিঠিটার উত্তরেই একটা খসড়া কচ্ছেন: সেটা মন থেকে আশ্রয় নেবে কাগজে এবং তারপর এসে পৌঁছবে সজ্জিতেরই হাতে। চিঠিতে থাকবে হয়তো দুটো লাইন। কিন্তু তার মধ্যে দিবেই যাবে পড়বে অচেনা স্নেহ, শ্রাবণধারার মত। ভরিয়ে দেবে তা সজ্জিতের মনকে আনন্দে আর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ভালবাসায়। সজ্জিত শুধু ভেবেই চলেছিল তন্ময় হয়ে।

কিন্তু সেখানে যা ঘটছিল সেটা একটু অন্তরকম—মিস্ অনিতাদেবীর সুসজ্জিত ছুইংরুম। সমর বিকেলবেলা।

টেবিলের সামনের একটা চেয়ারে চোখ বুঁজে বসেছিলেন সুপ্রসিক্ত ডিরেক্টর মিঃ ঘোষ। হাতে জলছিল তাঁর একটা চুরুট আর তা থেকে একটু একটু মৃদু ধোঁয়া মস্তুরগতিতে নিকাস্ত হচ্ছিল। তারপর বায়ুমণ্ডলে সেটুকু নিক্ষেপে যে কোথায় হারিয়ে ফেলেছিল তার কোন ঠিকানা পাওয়া বাচ্ছিল না। মিঃ ঘোষ নিম্নকণ্ঠে একটা সুর তাঁরবার প্রচেষ্টা করছিলেন।

পিয়ন এসে একখানা চিঠি টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। মিঃ ঘোষ চোখ দুটোকে ঈষৎ উন্মুক্ত করে একবার চিঠিখানার দিকে একটা উদার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। পরমুহূর্তেই অনসন্তোষে চোখ দুটোকে অড়িয়ে নিয়ে আসলেন। ইচ্ছে করলো না যে উঠে একটু ভাল করে দেখেন।

বৈকালিক ভ্রমণের জন্য সজ্জিত হয়ে মিস্ অনিতা দেবী দর্জার পর্দাটা ঠেলে ঘরের মাঝে প্রবেশ করেই বলে উঠলেন—বউ দেবী হয়ে গেল,—না? মিঃ ঘোষ চোখ দুটোকে আবার একটু ধুলে দীর্ঘশ্বাস কেলেন বললেন—হলো বৈকি। হ্যাঁ একটা চিঠি আপনার ঐ বে—।

আংগুল দিয়ে চিঠিটাকে নির্দেশ করবার চেষ্টা করলেন।

টোবলের কাছে এগিয়ে এসে চিঠিটাকে ছিঁড়ে পড়তে লাগলেন অনিতা দেবী। কয়েক সেকেন্ড পরেই একটু মৃদু হাসির সঙ্গে সেটাকে মিঃ ঘোষের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে, মনের সমস্ত ভাবটাকে ব্যক্ত করে কেললেন মাত্র একটা বাক্যের মধ্যে দিয়ে,—জগতে কত রকমেরই বে পাগল থাকে।

মিঃ ঘোষ হাত বাড়িয়ে চিঠিটাকে টেনে নিলেন।

কুচবিহারে সজীচাষ

শ্রীসুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায় বি-এ

গত সংখ্যায় “কুচবিহারে সজী চাষ” প্রবন্ধে বর্ষাকালে কুচবিহারে কি কি সজী জন্মান বাইতে পারে সে বিষয় আলোচনা করা হইরাছে। এই প্রবন্ধে শীতকালে যে সমস্ত সজীর চাষ করা চলে তাহার বিষয় বলা বাইতেছে।

বীন—

নানা জাতীয় বীন দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ক্ষেপ বীন নামে পরিচিত এক শ্রেণীর বীনের কথাই এখানে বলা হইতেছে। এই বীন দুই প্রকার। এক প্রকার গাছ লতান ও আর এক প্রকার গাছ আকারে খাট। বর্ষাকাল শেষ হইলে ভূখণ্ড প্রায় অক্টোবরের মাঝামাঝি বীনের চাষ হয়। হাজার বর্গফুট পরিমিত ক্ষেত্রে এক গাড়া গোবরের সার দিলেই চলে। সম্পূর্ণ মাটি গুঁড়াইয়া মাটির সহিত সার উত্তমরূপে মিশাইয়া দিতে হয়। তার পর এক ফুট অন্তর এক একটি বীজ মাটির অন্ততঃ ৩ ইঞ্চি নীচে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে পুঁতিয়া দিতে হয়। শ্রেণীগুলি

পাশাপাশি থাকিবে এবং প্রত্যেকটি শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান দেড় ফুট রাখিলেই চলে। হাজার বর্গ ফুট পরিমাণ জমির জন্য আশ সের বীজ হইলেই চলে। লতান বীজের জন্য ৩৭ হাত উঁচু বাঁশের বাঁধারি পুঁতিয়া দিয়া আড়াআড়ি ভাবে কয়েকটি বাঁধারি মাথার দিকে বাঁধিয়া দিতে হয়। বীন গাছ লতাইয়া বাঁধারির মাথার কাছে ছড়াইয়া যায়। খাট বীন আর একটু ফাক ফাক বুনিতে হয়। এই গাছ সাধারণতঃ দুই ফুট উঁচু হয় এবং নিজেই মাটির উপর ঊড়াইয়া থাকিতে পারে। জমি শুষ্ক বোধ হইলেই জল দিতে হয়; কুচবিহারে মাটি ভিজা থাকে বলিয়া সপ্তাহে একদিন জল দিলেই চলে। ফল ধরিলে জল আর একটু ঘন ঘন দেওয়া দরকার।

সাধারণতঃ আট হইতে দশ সপ্তাহের মধ্যেই গাছে ফল আসে এবং এক একটি গাছে এক মাস ধরিয়া ফল পাওয়া যায়। বীনের তরকারি অতিশয় সুস্বাদু।

সীম—

সীম এক বিশেষ শ্রেণীর বীণ। ইহা অতি সহজে এবং যে কোন জমিতে জন্মান চলে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে সীম বপন করা চলে। মাটি বেশ খানিকটা উচু করিয়া সেই মাটির সঙ্গে পচা গোবরের সার মিশ্রিত করিয়া দিতে হয়। খুব বেশী সার না দিলেও চলে। এখন এই মাটিতে কয়েকটি সীমের বীণি মানের অন্ততঃ ৩৪ ইঞ্চি নীচে পুঁতিয়া দিতে হয়। পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে বীজ ফুটিয়া অঙ্কুর বাহির হয়। গাছ একটু বড় হইলে ৩টি গাছ রাখিয়া বাকী গাছ উপড়াইয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। সীম গাছ লতাইয়া চলে। সেই জন্ত ঐ স্থানে হাত চারেক উচু করিয়া একটি মাচান দেওয়া প্রয়োজন। সীম গাছ বড় হইলে মাচানে তুলিয়া দিতে হয়। গাছের গোড়ায় বৃষ্টির জল না জমে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। বর্ষার শেষ হইলেই গাছ খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পাইয়া সমস্ত মাচানে ছড়াইয়া যায়। সেই সময় গাছের গোড়া অল্প একটু খুঁড়িয়া গোবরের সার দিয়া দিলে গাছ বেশ তেজী হয়। সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত সীম গাছ হইতে ফল পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে গাছের গোড়ায় জল দিয়া গোড়ারি জমি রসযুক্ত রাখিতে হয়।

মটর—

নানা জাতীয় মটর দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বেশী শীতে মটর জন্মে ভাল। দো-আশ জমি—যেখানে জল দাড়ায় না সেই জমিতে মটরের চাষ ভাল হয়। হাজার বর্গ ফুট জমিতে এক গাড়ী গোবরের সার

দিলে চলে। জমি প্রস্তুতের সময় সার মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে হয়।

দুই ফিট অন্তর এক একটি লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ছয় ইঞ্চি পরপর বীজ বুনিতে হয়। বুনবার পূর্বে বীজ ভাল ভিজাইয়া রাখিলে শীঘ্র অঙ্কুরের উদ্গমন হয়। একশত ফিট লম্বা একটি লাইনে প্রায় আধসের বীজ লাগে। সপ্তাহে একদিন করিয়া জল দিলে চলে। অবশ্য মাটি ভিজা থাকিলে আরও বিনয়ে জল সেচন করিতে হয়। গাছের জন্ত পাতলা বাথারির “জাকরি” প্রস্তুত করিয়া লাইনে বসাইয়া দিতে হয় বাগাতে গাছ লতাইয়া উঠিতে পারে। দুইমাস পর গাছে ফুল আসে। তখন গাছের আগা ভাঙ্গিয়া দিলে ফল বেশী পাওয়া যায়। এই সময় প্রচুর জল দিবার প্রয়োজন। তাহা হইলে ফল বেশ নরম থাকে এবং শীঘ্র পাকিয়া যায় না। প্রায় ছয় সপ্তাহ ধরিয়া একএকটি গাছে ফল দেয়। গাছে পোকা লাগিলে তামাকপাতাচূর্ণমিশ্রিত জল ছিটাইয়া দিলে পোকা মরিয়া যায়।

গাজর—

লম্বা, খাট এবং চ্যাপ্টা এই তিন শ্রেণীর গাজর দেখিতে পাওয়া যায়। জমিতে উত্তমরূপে চাষ দিয়া সার মিশাইয়া দিতে হয়। সার মিশাইবার পর কিছু দিন জমি ফেলিয়া রাখিয়া পরে আগাছা প্রভৃতি পরিকার করিয়া গাজরের বীজ বুনিতে হয়। সার মিশাইবার পর পরই বীজ ফেলিলে গাজরের আকৃতি বীকাচোরা হইয়া যায়। জমিতে সামান্য উচু আনের মত করিয়া ছয় ইঞ্চি পর পর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে গাজর লাগাইতে হয়। বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মিতে বেশ সময় লাগে। অক্টোবর, নভেম্বর মাসে গাজরের চাষ চলে। খুব

সামান্য পরিমাণে জল সেচন করা উচিত। বীজ বপনের তিনমাস পর ক্ষেত হইতে গাছের তুলিয়া নেওয়া চলে। গাছ দুই ইঞ্চি বড় হইলে কাঠের ছাই পনের দিন পরপর গাছের গোড়ায় দিলে গাছের আকারে বড় হয়।

বীট—

বীটের জমি বিশেষভাবে প্রস্তুত করিতে হয়। প্রায় এক ফুট পরিমাণ গভীর করিয়া চাষ দিয়া সমস্ত মাটি উত্তমরূপে শুড়া করিয়া দিতে হয়। অতঃপর উত্তমরূপে সার মিশাইয়া দিতে হয়। অক্টোবর মাসে বীট লাগান চলে। এক ফুট পর পর লাইন করিয়া প্রতি লাইনে আট ইঞ্চি পর পর একটি করিয়া বীজ বুনিতে হয়। তিন দিনের মধ্যেই অঙ্কুর বাহির হয়। অঙ্কুর বড় হইলে তুলিয়া অন্য আর একস্থানে লাগাইতে হয়। এইরূপে পনের দিন পর পর বার দুইতিন গাছ লাইনের একস্থান হইতে আর একস্থানে লাগাইলে বীট আকারে বড় হয়।

মুলা—

লাল ও সাদা দুই প্রকার মুলা দেখা যায়। সাদা মুলা আকারে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। মুলার জমি আঠার ইঞ্চি গভীর করিয়া চাষ দিতে হয় এবং সার মিশ্রিত করিয়া সমস্ত মাটি উত্তমরূপে শুড়া করিয়া দিতে হয়। মাটি যত গভীরভাবে চাষ দেওয়া হইবে এবং যত থাকিবে মুলা আকারে তত বৃহৎ হইবে। হাজার বর্গ ফুট পরিমিত স্থানে দুই আউন্স বীজ হইলে চলে। অক্টোবরের প্রথমদিকে মুলার চাষ হয়। ছয় সপ্তাহের মধ্যেই মুলা তুলিয়া নেওয়া চলে। মুলার শাকও উপাদেয় খাদ্য। কুচবিহারের কোন কোন অঞ্চলের

মুলা আকারে অতি বৃহৎ হয়। সাদা মুলার চাষও কুচবিহারে হইয়া থাকে।

আলু—

আলুই একমাত্র সব্জী বাহা সারা বৎসর ধরে রাখিয়া রাখা চলে। লালপাহাড়ি ও সাদাপাহাড়ি এই দুই প্রকার আলুর চাষ কুচবিহারে হয়; নাইনিতাল আলু তেমন প্রচলন নাই।

দোআশ জমি আলু চাষের উপযোগী। জমি উত্তমরূপে চাষ করিয়া তাহাতে গোবরের সার, কাঠের ছাই, চূণ, হাড়ের শুড়া এবং খৈলচূর্ণ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া জমি প্রস্তুত করিতে হয়। একই জমিতে বৎসরের পর বৎসর আলুর চাষ করিতে নাই। মাঝে মাঝে বন্ধ রাখিতে হয়। অক্টোবরের মাঝামাঝি বৃষ্টি বন্ধ হইলেই আলু বোনা চলে। দেড় ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রতি লাইনে ৮/১০ ইঞ্চি পর আলুর বীজ বুনিতে হয়। আকারে বড় হইলে আলু খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রতি খণ্ডে একটি করিয়া চোখ রাখিয়া সেই খণ্ডটি মাটির ৪ ইঞ্চি নীচে রাখিয়া মাটি ঢাপা দিতে হয়। আর যদি আলুর বীজ গোটা বোনা হয় তবে এরূপ আকারের আলু নিতে হয় বাহা আকারে বেশী বড়ও নহে, ছোটও নহে।

কুচবিহারে জমি সাধারণতঃ রসধুক্ত বলিয়া আলুর ক্ষেতে জল না দিলেও চলে। আলু বুনবার একমাস পরে ক্ষেত হইতে আগাছা প্রথমবার পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। ইহার পর আগাছা দেখা দিলেই পরিষ্কার করিতে হইবে। গাছ বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে মাটি দিয়া গাছের গোড়া ঢাকিয়া দিতে হয়। বীজ বুনবার ছয় সপ্তাহ পর প্রথমবার মাটি দেওয়া হয়। আলুর শুটি মাটি ঢাপা না থাকিয়া

বাহিরে থাকিলে স্থানালোকে সবুজ বর্ণধারণ করে এবং পোকায় গুটি নষ্ট করিয়া ফেলে। সেইজন্য মাটি দিবার উপর আলুর ফসল অনেকখানি নির্ভর করে।

পাতা শুকনা হইয়া আসিলেই মাটি হইতে আলু তুলিয়া ফেলিলেই চলে। সাধারণতঃ বীজ বুনিবার সাড়ে তিন মাস পরে আলু তুলিবার মত অবস্থায় আসে।

কুমড়া—

শীতকালে এক প্রকার কুমড়া জন্মে যাহা মাটিতে গতাইয়া চলে। আলু ক্ষেতের ফাঁকে ফাঁকে কুমড়ার বীজ বুনিয়া দিলেই চলে। আলু তুলিয়া লইবার পর কুমড়া গাছ ছড়াইয়া যায়। কুচবিহারে এই কুমড়াই বেশী পাওয়া যায় এবং এই জাতীয় কুমড়ার ফলনও বেশী।

শালগম—

লাল এবং সাদা দুই জাতীয় শালগম দেখা যায়। সাদা শালগম জন্মিতে সময় বেশী লাগে। বেশী শীতে শালগম চাষ ভাল হয়। জমি উত্তমরূপে প্রস্তুত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে গোবর এবং পচা পাতার সার মিশ্রিত করিতে হয়। মাটি হইতে আধ ইঞ্চি নীচে বীজ বুনিতে হয়। ২০ দিন পর পর বীজ বুনিলে অনেকদিন ধরিয়া শালগম পাওয়া যায়। প্রায় এক ফুট পর পর বীজ শ্রেণীবদ্ধভাবে বপন করিতে হয়। শালগমের জমি বেশ ভিজা থাকা দরকার। জমি শুষ্ক হইয়া গেলে শালগম শক্ত হইয়া যায়। ছয় সপ্তাহ হইতে আট সপ্তাহের মধ্যে শালগম ক্ষেত হইতে তুলিয়া লওয়া চলে।

বেগুন—

শীতের বেগুন আকারে অপেক্ষাকৃত বড় হয় এবং প্রচুর ফলে। কুচবিহারে বিভিন্ন জাতীয় বেগুনের চাষ

হয়। অক্টোবর মাসে বৃষ্টি থামিলে বেগুনের চারা প্রস্তুত করিয়া পরে সেই চারা তুলিয়া ১৮ ইঞ্চি পর পর ক্ষেতে রোপণ করিতে হয়। কাঠের ছাই বেগুনগাছের গোড়ায় দিলে পোকা ধরিতে পারে না। বেগুনের ক্ষেতে জল সেচনের বিশেষ দরকার নাই। তবে জমি বেশী শুষ্ক হইয়া পড়িলে জল দিতে হয়। চারা লাগাইবার তিন মাস পর গাছে ফল ধরে। সার্টনের Long Purple ও Improved Round ভাল বেগুন। কুপারের Early Black Beauty বেগুন অল্পদিনে জন্মায়।

বিলাতি বেগুন—

বিলাতি বেগুনের চাষ অনেকটা সাধারণ বেগুনের মত। প্রচুর রোঙ্গালোক পাশে প্রাচুর্য স্থানে বিলাতি বেগুন ভাল জন্মে। অক্টোবরের শেষে চারা প্রস্তুত করিয়া সেই চারা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ক্ষেতে রোপণ করিতে হয়। ফল ধরিলে গাছ বাড়িয়া যায়, সেই জন্য বাগানের বাগানি দিয়া গাছ খাড়া করিয়া রাখা হয়। ফল ফুটিবার কিছু পূর্বে জমির মাটি খানিকটা আলগা করিয়া খুড়িয়া উন্মোচন দিতে হয়। এপ্রিল পর্যন্ত বিলাতি বেগুন জন্মে। সবুজ বর্ণের ফলে খানিকটা লাল রঙ আসিলেই গাছ হইতে ফল তুলিয়া লইতে হয়। অতিরিক্ত পাকিয়া গেলে ফল নাড়াচাড়া করিবার সময় কাটিয়া বাইতে পারে। জমি যাহাতে শুষ্ক না হয় সেই জন্য মাঝে মাঝে জল সেচন করিতে হয়।

বাঁধা কপি—

অক্টোবরের মাঝামাঝি জমি একটু শুকনা বোধ হইলেই বাঁধা কপির চাষ চলে। দোআশ জমিতে কপির চাষ ভাল হয়। জমি একফুট গভীর করিয়া চাষ দিয়া তাহাতে পুরানো গোবরের সার ছিটাইয়া দিতে হয়। পরে মাটি

উত্তমরূপে গুঁড়া করিয়া সারের সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। বর্ষার শেষে চারা প্রস্তুত করিতে হয়। বীজের জমি খানিকটা উচু করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় এবং যাগাতে বৃষ্টি না পড়ে সে জন্য একটা আবরণ রাখিতে হয়। চারা ৪ ইঞ্চি লম্বা হইলেই ক্ষেতে রোপণ করা চলে।

কুচবিহারের মাটি অত্যন্ত ভিজা বলিয়া ক্ষেতে চারা লাগাইবার পর জলসেচনের প্রয়োজন নাই। মাঝে মাঝে হাত লাগল দিয়া ক্ষেতের মাটি উঠাইয়া দিতে হয়। মাটিতে বেশী রস থাকিলে গাছের বৃদ্ধি হয় না। চারা শ্রেণী বদ্ধ ভাবে রোপন করিতে হয়। দুইটি চারার দূরত্ব ২ ফিট এবং দুইটি শ্রেণীর ব্যবধানও ২ ফিট হওয়া প্রয়োজন। জমি শুষ্ক হইয়া আসিলে জল সেচন করিতে হয়। কেহ কেহ রাসায়নিক সারও ব্যবহার করেন। আগাছা বাহিয়া দেওয়া, মাটি নরম রাখা এবং জল সেচন এই তিন দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। পাতা এক ফুট লম্বা হইলে গাছের গোড়ায় মাটি দিতে হয় এবং বিবর্ণ পাতা গাছ হইতে ফেলিয়া দিতে হয়। তিন মাস হইতে চার মাসের মধ্যে বাধা কপি খাইবার উপযুক্ত হয়। নানা জাতীয় পোক। কপি পাতা নষ্ট করে। তামাক পাতা চূর্ণ মিশ্রিত জল বা সামান্য কেরোসিন তৈল মিশ্রিত ছাই ছিটাইয়া দিলে পোকা বসে না। স্যান্ডর, ড্রামহেড, প্রভৃতি উত্তম শ্রেণীর বাধা কপি।

ফুল কপি—

ফুল কপি একটি উৎকৃষ্ট সজী। ফুল কপির জমিতে প্রচুর সারের প্রয়োজন। বাধা কপির মতই জমি এবং চারা প্রস্তুত করিতে হয়। অক্টোবরের মাঝামাঝি ফুল কপির চাষ চলে। ৪ মাসের মধ্যেই ফেত হইতে ফুলকপি পাওয়া যায়। একই জমিতে প্রতি বৎসর ফুলকপির চাষ করিতে নাই। যোবল উত্তম শ্রেণীর ফুল কপি।

পেঁয়াজ—

বালির পরিমাণ বেশী আছে এরূপ জমিতে পেঁয়াজ চাষ ভাল হয়। এক প্রকার পেঁয়াজ আকারে বেশ বড় হয়। এই শ্রেণীর পেঁয়াজ কুচবিহারে দেখা যায় না। ছোট আকারের পেঁয়াজের চাষই অধিক প্রচলিত। ৮ ইঞ্চি গভীর করিয়া জমি চাষ দিয়া তাহাতে গোবরের সার উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া জমি প্রস্তুত করিতে হয়। বীজের জমিতে পূর্বে হইতে চারা প্রস্তুত করিতে হয়। পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে চারা ক্ষেতে রোপণ করিবার উপযুক্ত হয়। চারা শ্রেণীবদ্ধভাবে ক্ষেতে রোপণ করিতে হয়। দুইটি চারার দূরত্ব চার ইঞ্চি এবং দুইটি শ্রেণীর দূরত্ব দশ ইঞ্চি রাখিতে হয়। অন্ন মাত্রায় জল সেচন করিলেই চলে। প্রতিবার জল সেচনের পর আগাছা বাহিয়া দিতে হয়। ঐধলের গুড়া জমিতে দিলে পেঁয়াজের ফলন বেশী হয়।

উপনদী

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মৃৎলা সে বন্যার গল্প শুনিয়াছে। সমস্ত অন্তর তাহার আশঙ্কায় ও ত্রাসে কাঁপিয়া উঠিতেছিল। দশখানি গ্রামের বরবাড়ি, মানুষপ্রাণীকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল এই মজিয়া-আসা নদীই একদিন পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বন্যার মহাপ্রাবনে। নদীর পাড় ধসার শব্দ শোনা যাইতেছে। পাড় ভাঙিয়া সদর রাস্তার কোলে কোলে জল উঠিয়াছে। রাস্তার ধারের বাড়ীগুলিতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। পঞ্চাশ বৎসর পরে ডাকিনী নদী বুঝি তাহার মহামারী ক্ষুধায় সমস্ত গ্রামখানি আবার গ্রাস করিবে।

সদর রাস্তার ধার হইতে লোক পলাইয়া গ্রামের অভ্যন্তরে আসিতে লাগিল। রাত্রির অবস্থা বুঝিয়া সকালে অন্য ব্যবস্থার ও আয়োজনের পরিকল্পনা চলিতে লাগিল।

মৃৎলা চমকাইয়া উঠিল—সদর রাস্তা নদীর জলে ডুবিয়া যাইবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। আর সদর রাস্তা হইতে অশোকের আস্তানা মাত্র স্বল্প পথের ব্যবধান।

বাহিরে ঝম ঝম করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। হুহ শব্দে মিগল কাঁপাইয়া ঘূর্ণিবাতাস বহিতেছে। কড়্ কড়্ শব্দে কোথায় যেন বজ্রনিদ্রাধ্বনি শোনা গেল।

মৃৎলা কেমন করিয়া এই হুঁয়োগের নিশানা মাথায় লইয়া ঘরের বাহির হইবে? কিন্তু অশোক ডাক্তার? অশোক ডাক্তার তাহার বাড়ি না ছাড়িয়া যদি চুপ্ চাপ্

ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকে, তাহা হইলে বিপদ যে কোন মুহূর্তে সর্বনাশ সাধন করিতে পারে।

বন্যার জল বধন বাড়ের গতিতে সাগরের মতই ফণা বিস্তার করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে—তখন বাড়ি-ঘর, মানুষ-প্রাণী, জীব-উদ্ভিদ, কীট-পতঙ্গ কোন কিছুই প্রতিরোধ তাহার গতিতে প্রশমিত করিতে পারে না। সর্বনাশ। বন্যার স্রোতে সব ভাসিয়া যায়। অশোক ডাক্তারও যদি এই বন্যার প্রাবনে নিমজ্জিত হয়?

মৃৎলা ছুটিয়া বাহির হইবার পথে আচম্বিতে পড়িয়া গিয়া সম্মুখ হারাইল। বাহিরে তখন বিপুল কনোচ্ছ্বাসে সগর্জনে হুঁয়োগ-বর্ষা ঝরিতেছে।

অশোক চুপ্ চাপ্ শুইয়াছিল।

আজ হুঁদিন সে একেবারে ঘরের বাহির হয় নাই। মামলার তারিখ আগাইয়া আসায় মন তাহার আরও বিষন্ন ঠেকিতেছিল। বাহিরের বর্ষার সঙ্গে অন্তরের হুঁয়োগ ততোন্ত মিল খুঁজিয়া পাইতেছে। শীর্ণ নদীটিকে দেখিতে হইলে তাহার তীরে যাইয়া দাঁড়াইতে হইত! গতিহীন বন্ধ জলাশয়ে জোয়াড় ভাঁটার কোন স্পন্দন ছিল না। দাম ঠেলিয়া লগি বাহিয়া যেখানে শুধু শান্তি চলিত—এখন সেখানে কানায় কানায় কনোচ্ছ্বাসের

শ্রাবণ। শুধু তাহাই নয়। নদীর তলে প্রবল শক্তি
জাগিয়াছে। চাকলের খরস্রোতে নদী তীব্রধার হইয়াছে।
পাড় ভাঙিয়া জল ক্রমশঃ রাস্তায় উঠিতেছে—সেঁ। সেঁ।
শব্দে, বানের জল গর্জন করিতেছে। মনে হইতেছে রক্ত
আক্রোশে নদী বুঝি গ্রামের পর গ্রাম গ্রাস করিবে।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

বাতাসের বেগ আরও বাড়িতে লাগিল। উন্নত
হাওয়া কুবিয়া ফুঁসিয়া গর্জন করিতেছে। মত্ত প্রলয়ে
পৃথিবী বুঝি বা ধ্বংস হইয়া যাইবে। তবুও অশোক
উঠিল না। পরম নিবিকার চিত্ত লইয়া সে শুইয়া আছে।
বন্যার স্রোত আসিয়া তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেলোও
তাহার যেন কোন ক্ষতি নাই।

কিশোরী বাবু শশব্যস্তে অশোকের কক্ষ প্রবেশ
করিলেন। গায়া বেহ তাঁর সিক্ত! সঙ্গে তাঁহার
আরও পাঁচ ছয়জন অসুচর।

কিশোরী বাবু হাঁপাইতেছিলেন। এইটুকু মাত্র
পথ অতিক্রম করিতে দুর্ভাগ্য পথপ্রসন্ন স্বীকার করিতে
হইয়াছে।

অশোক আজ ভয়ত ভুলিয়াছে। কিশোরীবাবুকে
ঘেঁষিয়া সে কোন আগ্রহও প্রকাশ করিল না।
এমন কি এই দুর্ভাগ্যে তাঁহার আগমনের হেতু নির্ণয়েও
মন তাহার উৎসুক হইল না।

কিশোরী বাবু হাঁপাইতেছিলেন। অধিক ব্যস্ততার
সহিত তিনি সন্দের অসুচরদের আজ্ঞা দিলেন—নাও,
তোমরা বতটা পার জিনিষপত্র সব বেঁধে নাও।

অশোক তবুও নীরব রহিল।

সন্দের লোকগুলি এটা, ওটা, সেটা লইয়া নাড়াচাড়া
করিতেছিল।

কিশোরীবাবু অশোককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—
উঠুন ডাক্তারবাবু, ওদের একটু help করুন! আপনার
জরুরী জিনিষগুলি সাজিয়ে নিন।

অশোক গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—বাপার কি?

কিশোরী বাবু বিস্মিতকণ্ঠে কহিলেন—আশ্চর্য
লোক বাহোক আপনি। দরজার গোড়ায় নদীর জল
এসে পৌঁছেছে—তার খবরই রাখেন না যে দেখছি।

অশোক বলিল—তা কোথায় বাবো?

কিশোরীবাবু শান্ত কণ্ঠে কহিলেন—আপাততঃ আমার
বাড়ি?

—কোজদারী আসামীকে আপনার বাড়ীতে জামনা
দেবার ভরসা রাখেন। আপনার তো দেখছি দুর্ভয়
সাহস? কিন্তু আমাকে মাপ করবেন মিষ্টার বোস,
আমার ভয়তাবোধ আপনাদের তুলনায় কথঞ্চিৎ কম।
আর আমার সাহসও একটু কম।

—অশোকের কণ্ঠে শ্রোতের স্বর ফুটিয়া উঠিল।

কিশোরীবাবু তাহা উপেক্ষা করিয়া কহিলেন—ওসব
কথা এখন থাক। নিন, উঠে পড়ুন।

অশোক গম্ভীরকণ্ঠে কহিল—না; আমাকে ক্ষমা
করবেন মিঃ বোস, আপনার বাড়ি যাওয়া আমার পক্ষে
নিতান্তই অসম্ভব।

কিশোরীবাবু দমিবার পাত্র নহেন।

হাসিয়া তিনি কহিলেন—তা আমি জানি ডাক্তার
বাবু। কিন্তু এক্ষেত্রে সেসব কথা ভাববার সময়
এখন নেই। আর আপনি ভুল করছেন—মামলার
আমি হয়ত আপনার বিবাদীপক্ষের সাক্ষী; কিন্তু বাড়ির
আর সব আপনার পক্ষেই আছেন। আপনাকে আহ্বান
জানিয়েছেন তাঁরাই—আমি নই।

অশোক তথাপি নিবিকার রহিল।

অদূরে নদী গর্জন করিতেছে। কোথায় যেন আবার পাড় ভাঙ্গার শব্দ হইল। কলোচ্ছ্বাসিত জল-ধারায় যেন আতঁনাদের ধ্বনি রণিয়া রণিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে।

আজ রাত্রে নিশ্চয়ই বান ডাকবে। কিশোরীবাবু কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন—ডাকারবাবু শীগগীর উঠুন, বাড়ির গোড়ায় আপনার জল এসে পৌঁছেছে।

একদা অশোক তাহার হারানো চেতনাকে খুঁজিয়া পাইল। শব্দা হইতে উঠিয়া সে কিশোরীবাবুর সহিত ক্ষিপ্ৰহস্তে জিনিষপত্র গুছাইতে আরম্ভ করিল।

নদীর জল কুল কুল করিয়া বাড়িতেছে। সদর রাস্তা অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ পল্লী অভিমুখে জল অগ্রসর হইতেছে। আর চূপ করিয়া বসিয়া থাকা চলে না।

অশোক বাড়ী ছাড়িয়া জিনিসপত্র লইয়া কিশোরীবাবুর বাড়িতেই চলিল।

১) রাত্রি পর্য্যন্ত অবশ্য আর কোন দুর্ভাবনার কারণ নাই। কিন্তু বন্যার গতি যদি প্রশমিত না হইয়া আরও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে তবে সমগ্র গ্রামে সমূহ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

সেদিক হইতে ইউনিয়নের মিটিং বসিয়াছে। মহকুমা হাকিমকেও খবর দেওয়া হইয়াছে। পল্লীতে পল্লীতে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হইতেছে।

২) অশোকের পৌছাইবার পূর্বেই মৃন্মাল্য চেতনা ফিরিয়া আসিয়াছিল। আকস্মিক উত্তেজনার তাহার ফিট হইয়াছিল। অশোক আসিয়া পৌছাইতেই সে বেশ চাঞ্চা হইয়া উঠিল।

গ্রামের মাতঙ্গর লোকেরা আসিয়া অশোককে বিরিয়া দাঁড়াইল। এতবড় দুর্ভোগের সময় তাহার মতন ডাক্তারের সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন। না বুঝিয়া এবং না জানিয়া তাহার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করা হইয়াছে সকল গ্রামবাসীই তাহার জন্য দুঃখিত।

কিন্তু সে সব শুনিবার সময় এখন নাই। নদীর জল ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে; বাঁধের পর বাঁধ দিয়াও তাহার গতিপথকে অবরোধ করা বাইতেছে না। আকাশের অবস্থাও যেরূপ সঙ্কটাপন্ন তাহাতে বিপদ বে কোন মুহূর্ত্তে চরম অবস্থায় উপনীত হইতে পারে।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সকলে জাগিয়া রহিল। দলে দলে গ্রামের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী বুঝিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

অশোকের সহিত মৃন্মাল্য বাচিয়া আলাপ করিল। গ্রামবাসীর মধ্যস্থতায় অশোকের বিরুদ্ধে মামলা তুলিয়া লওয়া হইতেছে।

মৃন্মাল্য কহিল—এই বন্যাই কিন্তু এই বিরোধের মীমাংসা করে দিলে। এরপর আপনি আবার চাকরি করবেন তো।

অশোক দৃঢ়তার সহিত জানাইল—না। কক্ষণো নয়।

—তবে ?

—এখান থেকে চলে যাবো।

—কেন ?

—এখানকার সঙ্গে আমার সত্যিকার কোন সম্পর্ক পড়ে ওঠে নি তাই।

—কোথায় যাবেন ?

—তার কিছু ঠিক নেই। আপাততঃ কলকাতায়
যাবো।

—না আপনার যাওয়া হবে না। মৃহলা দূত তার
সহিত জানাইল।

অশোক হিজ্রাসা করিল—তার মানে ?

—যে জনগণের তেতর আজ আপনি প্রাণ-চেতনাকে
উদ্ধৃত্ত করবার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তাদের কর্মপথে
আপনার শক্তি একান্ত প্রয়োজন। তাদের প্রগতিকে এখন
পিছিয়ে দেবার অধিকার আপনার নেই। আপনার
কর্তব্য থেকে আজ যদি বিপদের সম্ভাবনা দেখে আপনি
সরে দাড়ান—তাহলে আপনার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য।

মৃহলার কথা শুনিয়া অশোকের বিষয় জাগিল। চিরকথা
পল্লীগ্রামের স্বল্পশিক্ষিতা মেয়ের কণ্ঠে একথা শুনিয়া
অশোক স্তম্ভিত হইয়া গেল। মৃহলা বলিয়া চলিল—তাহলে
আমি বলবো, আপনি ভীক কাপুরুষ! দেশের কাজে
আত্মনিয়োগ ক'রে মাঝে মাঝে আপনি আপনার খেয়াল-
কেই শুধু চরিতার্থ করেন। তার গুরুত্বকে উপলব্ধি
করতে পারেন না আপনি।

অশোক গুরুবিস্ময়ে মৃহলার প্রতি তাকাইয়াছিল।
চোখে মুখে তার প্রতিভার অপূর্ণ বৈদ্যময়ী দ্যুতি বলমূল
করিতেছে।

(ক্রমশঃ)

পরবশ

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাট্টা

অপরের কানে শোনা, অপরের চোখে দেখা,
এর চেয়ে কি দুর্ভাগ্য মানুষের হবে আর ?
নিজের হল না জানা এই নিখিল সংসার ;
স্বাধীনতা নাই তার, চলিতে পারে না একা।
পরবশ সেই জন দুঃখ তার ভাগ্যে লিখা,
আত্মবশে নাহি কিছু, সুখ আছে কোথা তার ?
অপরের কাছে তার চিরদিন হল হার,
বিদ্যা তার হল মিথ্যা, পণ্ড তার সব শেখা।

অনুগ্রহে পুষি তার, আশা তার পর ভিক্ষা,
অপারগ অর্জনেতে অকর্মণ্য বাক্যবীর,
ইষ্টে লষ্টে, মিথ্যা তুষ্টে, আত্মবাতী সব শিক্ষা,
কলের পতুল সম অপরের চাহনির
ইঙ্গিতে চলিতে থাকে ; দাসো তার দীন দীক্ষা,
আপনার পরিণামে ফেলে শেষে আঁধি নীর।

রাজপরিবারের সংবাদ

শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর এখনও এলগিন্ নাসিং হোমে রহিয়াছেন। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তিনি নাসিং হোম হইতে বাহির হইবেন বলিয়া প্রকাশ। বর্তমানে তাঁহার আর কোন উপসর্গের কথা শোনা যায় নাই।

মহারাজ ভূপ বাহাদুর নাসিং হোম হইতে বাহির না হওয়া পর্যন্ত শ্রীশ্রীমহারাজী সাহেবা কলিকাতাতেই অবস্থান করিবেন। রাজকুমার গৌতমনারায়ণও কলিকাতায় আছেন।

অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে কলিকাতার বিগত হাস্যাময় কুচবিহার রাজপরিবারের কাহারও কোন অনিষ্ট হয় নাই।

মহারাজকুমার শ্রীইন্দ্রজিতেন্দ্র নারায়ণ ও ইশরাণী শ্রীকমলা দেবী পুত্রকন্যাসহ কুচবিহারে অবস্থান করিতেছেন।

স্থানীয় সংবাদ

মহারাজের রোগমুক্তি—

শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর গত জুলাই মাসে পীড়িত হইয়া পড়েন। ২৩শে জুলাই কলিকাতায় এলগিন নাসিং হোমে তাঁহার তলপেটে অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচারের পর ধীরে ধীরে তাঁহার অবস্থার উন্নতি হয় এবং প্রত্যহ বুলেটিন প্রকাশ করিয়া মহারাজের স্বাস্থ্যের অবস্থা কুচবিহারবাসীগণকে জানান হয়। ৭ই আগষ্ট শেষ

বুলেটিনে প্রকাশ যে, মহারাজের স্বাস্থ্য সম্ভোষণকভাবে ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছে এবং মহারাজ রোগমুক্ত হইয়া সুস্থ হইয়া উঠিতেছেন। মহারাজের রোগমুক্তিতে রাজ্যবাসী সকলেই আশ্বস্ত ও আনন্দিত হইয়াছে।

কুচবিহারের রবীন্দ্র মৃত্যুবার্ষিকী—

গত ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী কুচবিহারের জনসাধারণকর্তৃক সম্মতভাবে প্রতিপালিত

হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয় ও কলেজে ছাত্র-ছাত্রীগণ মিলিত হইয়া রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় কণ্ঠচাণ্ডীর উদ্যোগে ল্যান্ডাউন হলে অনুষ্ঠিত উৎসব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উৎসব দুই দিন ব্যাপিয়া হইয়াছিল। প্রথম দিন ২২শে শ্রাবণ ক্রীড়িত অশ্বমান দাশগুপ্ত এম্-এ, বি-এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি জনসভার অনুষ্ঠান হয়। এই সভায় বক্তৃতা, প্রবন্ধ পাঠ, আবৃত্তি ও সঙ্গীতাদির বিশেষ আয়োজন হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিন ২৩শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের “কিপোর্জেন” নাটকের অভিনয় হইয়াছিল; এই অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। উভয় দিনের অনুষ্ঠানে প্রবেশ মূল্য হিসাবে অর্থসংগ্রহ করা হয়; কিঞ্চিদধিক ৪৩৫ টাকা সংগৃহীত হয়। আমরা জানিতে পারিলাম যে স্থানীয়

কর্মচারীবৃন্দ আরও কিছু টাকা চাঁদা তুলিয়া মোট ৫০১ টাকা সংগ্রহ করিবেন এবং এই অর্থ নিখিল-ভারত রবীন্দ্র স্মৃতি-সমিতির হস্তে অর্পণ করিবেন। কর্মচারীদের এই সাধু প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

ঈদ ও দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বস্ত্র—

আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে মুসলমানের ঈদ ও হিন্দুর দুর্গাপূজা পড়িয়াছে। এই সময় জনসাধারণের বস্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনায় কুচবিহার কর্তৃপক্ষ রেশম প্রধার প্রত্যেককে পাঁচ গজ করিয়া বস্ত্র বিক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কুচবিহার গেজেটের এক বিজ্ঞাপনে প্রকাশ যে ২২শে আগষ্ট হইতে ৫ই অক্টোবর পর্যন্ত নির্দ্ধারিত দোকান সমূহে এই বস্ত্র কিনিতে পাওয়া যাইবে।

দেশবিদেশের কথা

দেশলাইয়ের মূল্য হ্রাস—

ভারত সরকারের বাজেট বক্তৃতায় অর্থসচিব ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, দেশলাইয়ের মূল্য হ্রাস করা হইবে। সম্প্রতি ভারতসরকার এক প্রেস নোট প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, বর্তমান আগষ্ট মাস হইতে ভারতের সর্বত্র দুই পরস মূল্যের দেশলাই কিনিতে পাওয়া যাইবে। প্রতি বাক্সে গড়পড়তা ৫০টি কাঠি থাকিবে। প্রিভি-কাউন্সিলে ভাওয়াল কুমারের জন্মলাভ ও আকস্মিক মৃত্যু—

ভাওয়ালের মধ্যমকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়ের উত্তরাধিকার লইয়া বহুদিন বাবত বে মামলা চলিতেছিল

গত ৩০শে জুলাই প্রিভি-কাউন্সিলে তাহার ধনিক পাত হয়। প্রিভি-কাউন্সিলের বিচারকগণ রাণী বিভা-বতীর আপীল ডিসমিস করেন এবং ভাওয়াল সম্রাসী বলিয়া পরিচিত রাজকুমারকেই প্রকৃত রমেন্দ্রনারায়ণ ও ভাওয়াল সম্পত্তির ঠিক অংশের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু নিয়তির এমনই তুর পরিহাস যে জয়লাভের তিনদিনের মধ্যেই গত ৩রা আগষ্ট কুমার তাঁহার কলিকাতার বাসভবনে রক্তমোক্ষণ রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের সিদ্ধান্ত—

আগামী বৎসরের জুলাই মাস হইতে মাতৃভাষায় সকল বিষয়ে শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রহণ করিয়াছেন। ইংরাজের পরিবর্তে হিন্দী, মারাঠী ও উর্দু ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজ সমূহ শিক্ষাদান করা হইবে। এই সকল ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ব্যবস্থাও বিশ্ববিদ্যালয় করিতেছেন। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক এবং ভারতীয় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে এই সদ্গুণীকৃত হউক, ইহাই আমাদের কামনা।

গোয়ালিয়রের বেসরকারী মন্ত্রী—

গোয়ালিয়রের মহারাজা ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহার মন্ত্রিসভায় দুইজন বেসরকারী মন্ত্রী নিযুক্ত হইবেন; শীঘ্রই ইহাদের নাম ঘোষণা করা হইবে। প্রকাশ যে, জনস্বার্থের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট কতকগুলি বিভাগের ভার এই মন্ত্রীদের হস্তে অর্পিত হইবে।

প্যারিস শান্তিসম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি—

প্যারিসের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ল্যাঙ্কেমবুর্গ প্রাসাদে গত ৩রা আগষ্ট শান্তিসম্মেলন আরম্ভ হয়। লন্ডনের ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী শ্রীমুখেন ব্রহ্মনাথন ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গের দলপতিরূপে এই সম্মেলনে যোগদান করেন এবং প্রথম বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে শ্রী শ্রীমুখেন বলেন যে, ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে ভারতের জনমত তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে; জাতিধর্মনির্বিশেষে পৃথিবীর সকল দেশের সহিত সমব্যবহার করা হউক, ভারত ইহাই কামনা করে।

ডাক ধর্মঘটের অবসান—

প্রায় তিন সপ্তাহকাল ধর্মঘট চলিবার পর গত ৭ই আগষ্ট বাংলার ডাক ও তার ধর্মঘটের অবসান

ঘটিয়াছে। এই ধর্মঘট কালে জনসাধারণকে অধর্মান্নে হুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে।

আজকাল চতুর্দিকে ধর্মঘটের গিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। বর্তমানে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে ধর্মঘট চলিতেছে।

স্বর্ণরৌপ্যের আমদানী শুল্ক হ্রাস—

গত মার্চ মাসে স্বর্ণের উপর প্রতি তোলায় ১৫৮ টাকা ও রৌপ্যের উপর প্রতি আউন্সে আট আনা আমদানী শুল্ক ধার্য করা হইয়াছিল। ইহার ফলে বিদেশ হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের আমদানী বিশেষ কমিয়া গিয়াছিল। বর্তমানে ভারত সরকারের এক আদেশক্রমে এই আমদানী শুল্কের পরিমাণ অর্ধেক করা হইয়াছে। আশা করা যায়, ইহার ফলে ভারতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের আমদানী বাড়িবে এবং বিত্তশালী ব্যক্তিগণ অধিক পরিমাণে স্বর্ণ রৌপ্য ক্রয় করিতে অনুরূপ হওয়ার সুস্বাদুত্ব কমিবে।

ন্যাশানাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী—

আমরা প্রসিদ্ধ ন্যাশানাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ১৯৪৫ সনের আয়ব্যাখ্যার হিসাব পাইয়াছি। এই হিসাব দৃষ্টে দেখা যায় যে, ১৯৪৫ সালে কোম্পানী ৫৫০ কোটি টাকার উপর নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন এবং আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর প্রায় ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। প্রিনিশামের হার অল্প এবং বীমাধারীদের পলিশির নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই কোম্পানী কার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। আমরা উত্তরোত্তর ইহার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স সোসাইটি—

আমরা হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটির ১৯৪৫ সালের রিপোর্ট ও আয়ব্যাখ্যার হিসাব পাইয়াছি। হিসাবদৃষ্টে দেখা যায় যে, কোম্পানী ইহার পূর্ণ রেকর্ড

ভর করিয়া অধিকতর সাফল্য ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। আলোচ্য বৎসর কোম্পানী ১২ কোটি ১০ লক্ষ টাকার অধিক বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন; পূর্ব বৎসর অপেক্ষা এই বীমাপত্রের পরিমাণ প্রায় দুই কোটি টাকা অধিক। বর্তমান বৎসরে কেবলমাত্র গিমিরাম হইতে কোম্পানীর আয় ১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকার অধিক হইয়াছে; এই আয় পূর্ব বৎসর অপেক্ষা ৪৩ লক্ষ টাকা অধিক। কোম্পানীর এই সাফল্যের জন্য আমরা কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দিত করিতেছি।

পরলোকে এইচ. জি. ওয়েলস্—

ইংলণ্ডে বিখ্যাত মনীষী ও লেখক এইচ. জি. ওয়েলস্ গত ১৩ই আগষ্ট রাত্রে পরলোকগমন করেন। মৃত্যু কালে তাঁহার বয়স ৭৯ বৎসর হইয়াছিল। ওয়েলস্ প্রথম জীবনে উপন্যাস লিখিয়া বশবী হন; পরে তিনি যুদ্ধ, ধর্ম, সমাজতত্ত্ববাদ ও ইতিহাস সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। বর্তমান চিন্তাজগতে ওয়েলসের অসাধারণ প্রভাব ছিল। তাঁহার প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থ “Outline of History” পনের লক্ষে ও উপর বিক্রী হইয়াছে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গণপরিষদের নির্বাচন—

মন্ত্রীমণ্ডলের প্রস্তাবানুসারে ভারতের ভাবী শাসন-তন্ত্র প্রণয়নের জন্ত যে গণপরিষদ (Constituent Assembly) গঠিত হইবার কথা ছিল, বিভিন্ন প্রাদেশিক আইনসভাসমূহ হইতে ভজ্জন্ত প্রতিনিধি নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। গণপরিষদের নির্দিষ্ট সদস্য সংখ্যা মোট ৩৮৯ জন; ইহার মধ্যে ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধি : ২৬ জন এবং দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি ২৩ জন। দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি নির্বাচন এখনও হয় নাই। ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধি সংখ্যা হইতে দেখা যায় যে কংগ্রেস মোট ২১০টি আসন এবং মুসলিম লীগ ৭৩টি আসন দখল করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই সংখ্যা দুইটো বোকা যায় যে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি নির্বাচনের পরে ৮৯ জন সংস্থার মধ্যে

কংগ্রেস অন্ত : ২১০টি আসন দখল করার অতীব নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। সাধারণ আসনসমূহের মধ্যে কংগ্রেস মাত্র ৯টি আসন লাভ করিতে পারে নাই; এই সাধারণ আসন কয়টিতে ডক্টর আব্দুদকর, শ্রী অরুণা প্রসাদ শ্রীয়াস্তব, দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি স্বতন্ত্র নেতৃগণ নির্বাচিত হইয়াছেন। মুসলিম আসনসমূহের মধ্যে মুসলিম লীগ মাত্র ৫টি আসন লাভ করিতে পারে নাই; এই আসনগুলিতে মোলানা আবুল কালাম আজাদ, খান্ আব্দুল গফুর খান, মৌলভী ফজলুল হক প্রভৃতি কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী মুসলমানগণ নির্বাচিত হইয়াছেন। শিখদিগের জন্ত নির্ধারিত ৪টি আসন এখনও শূন্য রহিয়াছে; ইংরাজী পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভা হইতে নির্বাচিত হইবেন। মনোনয়নপত্র দাখিল

করিয়া নির্বাচনের পূর্বে শিখগণ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন। কিন্তু শিখগণ পরে তাঁহাদের সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা করিয়াছেন এবং আশা করা যায় যে শীঘ্রই গণপরিষদে তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা হইবে।

গণপরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তালিকা দৃষ্টে দেখা যায় যে, ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণই নির্বাচিত হইয়াছেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃগণ ত নির্বাচিত হইয়াছেনই; তাহা ছাড়া প্রসিদ্ধ আইনবেত্তা, দার্শনিক, শিল্পপতি প্রভৃতি গণপরিষদে নির্বাচিত হইয়াছেন। ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র বাহাতে ভারতের শ্রেষ্ঠ মনোবীগণ কর্তৃক রচিত হয় তজ্জন্য কংগ্রেস নিজ প্রতিষ্ঠানের বাহির হইতেও যোগ্য ব্যক্তিগণকে নির্বাচিত করিয়াছে।

প্রকাশ যে সেপ্টেম্বর মাসে নয়া দিল্লীতে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন হইবে।

মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি—

কিছুদিন পূর্বে বোম্বাইতে মুসলিম লীগ কাউন্সিল ও ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মুসলিম লীগ পূর্বে মন্ত্রীমণ্ডলের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু বর্তমান অধিবেশনে লীগ মন্ত্রীমণ্ডলের প্রস্তাব অগ্রহ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। লীগ গণপরিষদে যোগ দিবে না, কিম্বা অস্বত্বীয় সরকারেও অংশ গ্রহণ করিবে না। এতদ্ব্যতীত পাকিস্তান অর্জনের জন্য লীগ সরাসরি ব্যবস্থা (Direct Action) অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করিয়াছে এবং মুসলমান খেতাব্দারাদিগকে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত খেতাব বর্জনের নির্দেশ দিয়াছে।

মুসলিম লীগের অধিবেশনের এক সপ্তাহ পরে ওয়ার্কিং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে কংগ্রেস এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বলে যে, যদিও মন্ত্রীমণ্ডলের কয়েকটি প্রস্তাব কংগ্রেস অনুমোদন করে না, তাহা হইলেও কংগ্রেস সমগ্রভাবে ব্রিটিশ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। মুসলিম লীগ গণপরিষদে যোগ না দেবার সিদ্ধান্ত করার কংগ্রেস দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলে যে, ভারতের বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণে সকল রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যিক।

পরবর্তী এক সংবাদে প্রকাশ যে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল অস্বত্বীয় সরকার গঠনের জন্য কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুকে আহ্বান করিয়াছেন এবং পণ্ডিত নেহেরু এই আহ্বান গ্রহণ করিয়াছেন। পণ্ডিত নেহেরু মুসলিম লীগের সভাপতি মিঠোর ডিয়ারকে অস্বত্বীয় সরকারে সদস্য মনোনয়ন করিতে আহ্বান করিয়াছেন; কিন্তু মিঠোর ডিয়ার এই আহ্বান গ্রহণ করিতে অস্বত্ব হইয়াছেন। আমরা আশা করি অস্বত্বীয় সরকার গঠনের সকল বাধা শীঘ্রই অপসৃত হইবে এবং কেন্দ্রে শক্তিশালী জাতীয় গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বাংলা সরকারের ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেট—

গত মার্চ মাসে বাংলার গভর্ণর ১৯৪৬-৪৭ সালের এক বাজেট প্রস্তত করিয়াছিলেন। তখন বাংলার ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুসারে গভর্ণরের শাসন চলিতেছিল; কিন্তু গত নির্বাচনের পরে বাংলার মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মন্ত্রীসভার অর্থসচিব সম্প্রতি বাংলার ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেট ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়াছেন; এই বাজেট দৃষ্টে দেখা যায় যে, চলতি



বৎসরে বাংলা সরকারের ৪২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আয় এবং ৫২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে এবং প্রায় ১০ কোটি টাকা ঘাটতি বইবে। অর্থমন্ত্রীর আশা করেন যে, বাংলার বিশেষ অবস্থা বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার বাংলার ঘাটতি পূরণে অগ্রসর হইবেন। বাংলা সরকারের বাজেটের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে,

চলতি বৎসরে বাংলা সরকার প্রায় ১২ কোটি টাকা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যে ব্যয় করিবেন। সেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার তৈয়ারীর কারখানা, হাসপাতাল প্রভৃতিতে মোটা টাকা ব্যয় করা হইবে। উন্নয়নমূলক কার্যের বাবতীয় ব্যয়ভার ভারত সরকার বহন করিতে রাজী হইয়াছেন।

খেলাধুলা

ক্রিকেট—

ভারতীয় দলের সহিত সাসেক্স দলের খেলায় ভারতীয় দল ১ উইকেটে জয়ী হইয়াছে। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে ৩ উইকেটে ৫৭৩ রান করিয়া ডিক্লার করেন। মার্কেট ২৫৫, নানকড় ১০৫, পাভোদি ১১০ (নট আউট) ও অমরনাথ ১০৬ রান করেন। সাসেক্স দল প্রথম ইনিংসে ২৫৩ রান করিয়া ফলোঅন করেন এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৪২৭ রান করেন। এই দলের কক্ষ ২৩৪ রান করিয়া নট আউট থাকেন। ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসে একটি উইকেট হারাইয়া ১৪৮ রান করিলে সাসেক্স দলের রান সংখ্যা অতিক্রম করে এবং ভারতীয় দল ২ উইকেটে জয়ী হয়। ভারতীয় দলের দুই ইনিংসে মোট ৪টি উইকেট হারাইয়া ৬৮১ রান হয়। ইংলণ্ডে ভারতীয় দলের ইহাই সর্বোচ্চ রান।

ভারতীয় দলের সহিত ইংলণ্ড দলের তৃতীয় টেস্ট খেলাটি বৃষ্টির জন্য সমাপ্ত হইতে পারে নাই এবং খেলাটি ড্র হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। দুইটি টেস্টে ড্র

এবং একটিতে ইংলণ্ড জয়ী হইয়াছে বলিয়া ইংলণ্ড দল 'রাবার' পাইল। মার্কেটে প্রথম ইনিংসে ১৩৮ রান করিয়া আউট হন। বোলিংএ মানকর বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

ফুটবল—

আই, এক, এ শীল্ড প্রতিযোগিতার খেলা চলিতেছে। ভবানীপুর দল ক্যালকাটা মিলটারি পুলিশ দলকে ৩-০ গোলে পরাজিত করিয়াছে। খেলার পরিচালনা ভাল হয় নাই। ভবানীপুর দলের এন বোস, নবাব ও আর দাস প্রত্যেকে একটি করিয়া গোল দেন।

মহম্মেডান স্পোর্টিং দল ১-০ গোলে স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলকে পরাজিত করিয়া কোয়ার্টার ফাইনালে উঠিয়াছে। পেনাল্টি গোলে খেলাটির সীমাংসা হইয়াছে। পেনাল্টি সীমানার মধ্যে এম, দাস হাওবল করিলে রেকর্ডার পেনাল্টি কিকের নির্দেশ দেন এবং মহম্মেডান দলের বাচ্চি খাঁ পেনাল্টি হইতে গোল করেন। উভয় দলই গোল করিবার জন্য বখানাখ্য চেষ্টা করিয়াছে তবে মহম্মেডান স্পোর্টিং দল দুইবার গোলের সুযোগ নষ্ট করিয়াছে।

অধ্যাপক শ্রীমন্ত্যরতন গুপ্ত এম-এ কর্তৃক সম্পাদিত ও কুচবিহার ট্রেড প্রেসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত।

কুচবিহার দর্শন



নবম বর্ষ

আশ্বিন ১৩৫৩ সন, রাজশক ৪৩৭

৬ষ্ঠ সংখ্যা

ভাবব্যাতা রবীন্দ্রনাথ

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের ঋষিদের বাণী, গীতা, ভাগবতী বাণী, পৌরাণিক উপাখ্যান, প্রাচীন সাহিত্য, বৌদ্ধযুগের জীবনধারা, বুদ্ধদেবের বাণী, প্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রথাপদ্ধতি, বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্য, শাক্তধর্ম ও সাহিত্য, শিব ও রুদ্রের পরিকল্পনা ইত্যাদি ভারতীয় সংস্কৃতির বহু অঙ্গের অভিনব ব্যাখ্যান দিরাছেন। আমি এখানে দুই চারিটির উদাহরণ দিব। সর্বপ্রধান দৃষ্টান্ত— রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য সংস্কৃতির আলোচনাগুলি। কবি নিজেই কালিদাসের কাব্য সংস্কৃতি বলিরাছেন—‘বে আনন্দ পেলুম তাত আনন্দের আনন্দ নর—সৃষ্টির আনন্দ। বেশ বুঝলুম এসব কাব্য আমি যেমন করে পড়লুম—দিতার আর কেউ তেমন করে পড়েনি।’ কবির এই উক্তি অকপট ও পরম সত্য।

উপনিষদের বাণীর ব্যাখ্যান তাঁহার শাস্ত্রানুসারে পর্যায়ের প্রবন্ধগুলি এবং অন্যান্য অনেক প্রবন্ধে একতাবে পাওয়া যায়। অত্যাধিক তাঁহার নৈবেদ্য কাব্যের মধ্য দিয়া পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রার্থনার মধ্য দিয়া তাঁহার উপনিষদের উপলব্ধি এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।—

হে পুষ্প, হে পরিপূর্ণ, অপারূপ, তোমার হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ খোলো। আমার মধ্যে যে গুহাহিত সত্য, তোমার মধ্যে তার অব্যবহিত স্বরূপ দেখে নিই। আমার পরিচয় আলোকে আলোকে উদ্ঘাটিত হোক।

হে পুষ্প, তোমার হিরণ্ময় পাত্রে সত্যের মুখ আচ্ছন্ন। উন্মুক্ত কর সেই আবরণ।

তোমার জ্যোতির স্তিমিত কেন্দ্রে মানুষ আপনার মহৎ স্বরূপকে দেখেছে—কালে কালে বলেছে—‘জেনেছি

আমরা অমৃতের পুত্র—বলেছে—‘জেনেছি অন্ধকারের
পার হতে আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষের আবির্ভাব।’

হে সবিতা, সরিয়ে দাও আমার এই দেহ, এই
আচ্ছাদন। তোমার তেজোময় অঙ্গের সূক্ষ্ম অগ্নিকণার
রচিত যে আমার দেহের অণু পরমাণু। তাহা অলক্ষ্য
অস্তরে আছে তোমার কল্যাণতম রূপ। তাই প্রকাশিত
হোক আমার নিরাল্প দৃষ্টিতে।

মহাকাল সন্ন্যাসী তুমি

তোমার অহলস্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গ শিখরে

উচ্ছ্রিত হয়ে উঠছে সৃষ্টি,

আবার নেমে বাচ্ছে ধ্যানের তরঙ্গ তলে।

প্রচণ্ড বেগে চলছে ব্যক্ত অব্যক্তের চক্রনৃত্য

তারি নিহত কেন্দ্রস্থলে

তুমি আছ অবিকলিত আনন্দে।

হে নির্মম, দাও আমাকে ঐ সন্ন্যাসের দীক্ষা

জীবন আর মৃত্যু, পাওয়া ও হারানোর মাঝখানে

বেধানে আছে অক্ষুর শাস্তি

সেই সৃষ্টি-হোমাগ্নি শিখার অন্তরতম

স্থিমিত নিভতে দাও আমাকে আশ্রয়।

কবি ওকারের এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন—“ও একটি
ধ্বনিমাত্র—তাহার কোন নির্দিষ্ট অর্থ নেই। এই শব্দ
চিন্তকে ব্যাপ্ত করে দেয়—কোন বিশেষ আকারে বাধা
দেয় না। এই একটি মাত্র ও শব্দের মহাসঙ্গীত জগৎ
সংসারের ব্রহ্মরূপ হইতে বেন ধ্বনিত হইয়া উঠিতে থাকে,
সঙ্গীতের স্বর যেমন গানের কথা মধ্য একটি
অনির্বচনীয়তার সঞ্চার করে তেমনি ও শব্দের পরিপূর্ণ
ধ্বনি আমাদের ব্রহ্মধ্যানের মধ্যে একটি অনির্বচনীয়তা
অবতারণ করিয়া থাকে। ও শব্দের অর্থ—হাঁ।
সুতরাং ও হচ্ছে স্বীকারোক্তি। এই যে পরিপূর্ণতা

যা সমস্তকে নিয়ে অগ্ৰ বা কোন ঋণকে আশ্রয় করে
নয়, বা চিন্তে নয়, স্বর্ঘ্যে নয়, মানুষে নয়, অগ্ৰ বা চন্দ্রস্বর্ঘ্য-
মানুষে, বা কানে নয় চোখে নয় বাক্যে নয় মনে নয়, অগ্ৰ
সমস্ত কানে চোখে বাক্যে মনে—সেই এককেই—সেই
হাঁ-কেই সমস্ত প্রাণ মন দিবে—সেই পরিপূর্ণতাকে স্বীকার
হচ্ছে ওকার। উপনিষদের ঋষিগণ বলেন—জগতে এবং
জগতের বাইরে ব্রহ্মই একমাত্র ও—তিনিই চিরন্তন।
হাঁ, তিনিই Everlasting Yea. আমাদের আত্মার মধ্যে
তিনি ও, তিনিই হাঁ—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেশকালকে অতিক্রম
করিয়া তিনি ও—তিনিই হাঁ। এই মহৎ, নিত্য, সর্বব্যাপী
যে হাঁ, ও ধ্বনি ইহাকেই নির্দেশ করিতেছে। প্রাচীন
ভারতে ব্রহ্মের কোন প্রতিমা ছিল না—কোন চিত্র
ছিলনা—এই একটিমাত্র ক্ষুদ্র অগ্ৰ স্বরূপ ধ্বনি ছিল
—ও।”

ব্রহ্মজনাথ গীতার বাণীর ব্যাখ্যান দিয়াছেন এইভাবে—

“আতশ কাচের একপিঠে যেমন ব্যাপ্ত স্বর্ঘ্যালোক
আর একপিঠে যেমন তাহারই সংহত দীপ্তরশ্মি—মহা-
ভারতেও তেমনি একদিকে ব্যাপক জনশ্রুতিরাশি আর দিকে
তেমনি তাহারই সমষ্টির একটা সংহত জ্যোতি। জ্ঞানকর্ম-
ভক্তির যে সমগ্র যোগ তাহাই সমস্ত ভারতেতিহাসের
চরম তত্ত্ব।

“মানুষকে ভগবান সধা ব’লে তখন সম্মান করেছেন
যখন তাকে দেখিয়েছেন তাঁর উগ্ররূপ, তাকে দিবে
যখন বলিয়েছেন—দুষ্টাঙ্গুতং রূপমুগ্রং ভবেদং। লোকজগৎ
প্রব্যথিত মহাত্মন—মানুষ যখন প্রাণমন দিবে এই স্তব
করতে পেরেছে—অনন্তবীৰ্য্যামিতবিক্রমস্বঃ সর্বঃ
সমাপ্রোষি ভতোহসি সর্বঃ।”

বেদান্ত সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—

“সমস্ত বেদের নানা পথের ভিতর দিয়া মানুষের চিত্তের একটি সন্ধান ও লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়— তাহাই বেদান্ত।”

কবি ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারায় প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির একটা অভিনব ব্যাখ্যান দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি রামায়ণ মহাভারতের বহু উপাখ্যানের রূপক বিশ্লেষণ করিয়াছেন। রামায়ণকে তিনি বলিয়াছেন—আর্যজাতির কবিবিস্তার হইতে গৃহধর্ম-নীতির উদ্বোধনের ইতিহাস।

কবি প্রথম যৌবনে প্রভাতসঙ্গীতে সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয় নামক একটি কবিতায় ব্রহ্মবিষ্ণুশক্তির ত্রিগুণ-ত্য়িকা ঐশী পরিকল্পনার একটি চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। পরে একটি প্রবন্ধে ভগবানের এই ত্রিমূর্তির একটা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিয়া বলিয়াছিলেন:—

“ব্রহ্মায় আর্যসমাজের আরম্ভকাল, বিষ্ণুতে মধ্যাহ্নকাল, শিবে তাহার শেষ পরিণতির রূপ।”

ব্রহ্মের এই ত্রিমূর্তির মধ্যে শিবই রবীন্দ্রনাথের চিত্রকে বিস্তারিত ও তীক্ষ্ণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে শৈব রবীন্দ্রনাথ বলা যাইতে পারে। আখ্যেয় মহাযোগী সর্ববন্ধনমুক্ত অনাদিনিধন ব্রহ্মময় শিব ও অনাখ্যেয় ভাঙধুতুরাখোর শ্মশানবাসী, দরিদ্র গৃহী ভয়ভূষণ ভুজবধর প্রেতপিশাচপরিবৃত শিব দুইয়ে মিলাইয়া আমাদের শিব। কালিদাসের মত রবীন্দ্রনাথের কল্পনার উপাস্ত শিব—আখ্যেয়ই শিব। কিন্তু অনাখ্যেয় শিব—যিনি আমাদের বঙ্গনাহিত্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথ সেই ভিখারী শিবের মহিমারও চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন—

মঙ্গলকাব্যগুলিতে জামাতার নিন্দা, শ্রোপুরুষের কলহ, গৃহস্থালীর বর্ণনা আছে; তাহাতে রাজতায় বা

দেবভাব কিছুই নাই। দাম্পত্যবন্ধনের মধ্যে একটা বিষয় বিগ্রহ করিতেছে দারিদ্র্য। বাংলার কবি-জগৎ এই দারিদ্র্যকে মহত্ব ও দেবত্ব নহোচ্চ করিয়া তুলিয়াছে। ভোবানাথ দারিদ্র্যকে অঙ্গের ভূষণ করিয়াছেন—দরিদ্র সমাজের পক্ষে এমন আনন্দময় সাধনা আর নাই। আনার সম্বল নাই যে বলে সেই গরিব। আনার আবশ্যক নাই যে বলিতে পারে তাহার অভাব কিসের? শিব তাহারই আদর্শ।

আখ্যেয় শিবকে কবি আপনার মনের নাধুরী ও মহত্ব দিয়া নূতন করিয়া বিশ্বাত্মক রূপে গড়িয়া লইয়াছেন। ইহাই তাহার উপাস্তের ধ্যানমূর্তি গঠন। এই শিবকে কখনো তিনি প্রলয়, কখনো মরণ, কখনো মহাকাল, কখনো আনন্দে বিস্তার নটরায়, কখনো গ্রৌণ্ডের উগ্রজ্ঞানাময়ী অভিব্যক্তি, কখনও বর্ষার নেঘনেছর বিকাশ, কখনও কলাগ গদ্যধর, কখনও সর্বসংস্কার-মুক্তির চিদানন্দবন প্রতীকের সহিত একাত্মকভাবে দেখিয়াছেন। সর্বত্রই তাহার বিশ্বরূপ। শিব ও রুদ্র কত রূপে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন তাহা বলিতে গেলে পৃথক প্রবন্ধ রচনা করিতে হয়।

গৌরীর সহিত হরের মিলনের একটা চমৎকার ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন—

“আমাদের পুরাণে শিবের, মধ্যে ঈশ্বরের দরিদ্র বেশ আর অন্নপূর্ণার তাঁর ঐশ্বর্য। বিশ্বে এই দুইএর মিলন সত্য। সাধুরা এই মিলনকে বধন স্বীকার করতে চান না—তখন কবিদের সঙ্গে তাঁদের বিবাদ বাধে। তখন শিবের ভক্ত কবি কালিদাসের দোহাই পেড়ে এই বৃগলকেই আমরা আমাদের সকল অসুখের নান্দীতে আহ্বান করব—যারা বাগর্থ্যবিসংপৃক্তো—যাদের মধ্যে অভাব ও পূর্ণতার নিত্যলীলা।”

বাংলার শাক্ত মঙ্গলকাব্যগুলিতে শিব হইতে শক্তিকে বৃত্ত করিয়া তাঁহার পূজা ও মহিমা প্রচার করিবার চেষ্টা হইয়াছে। শিব হইতে শক্তি বিযুক্ত হইলেই ধর্মের পরাভব ঘটে। রবীন্দ্রনাথ বলেন মঙ্গল-কাব্যগুলি ইহারই দৃষ্টান্ত।—

“একদা আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় উচ্ছ্বলতার সময় ভীত পীড়িত প্রজা আপন কবিদের যুগ্ম দ্বিধে শক্তিরই জয়গান করিয়াছে। কবিকল্প চণ্ডী, মনসার ভাসান অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি কাব্য প্রকৃত পক্ষে অশ্বেরই জয়গান। সেই কাব্যে অন্ত্যকারিণী ছন্দাময়ী নিহুয় শক্তির হাতে শিব পরাভূত। অথচ অদ্বৈত ব্যাপার এই যে—এই পরাভবকে মঙ্গল গান নাম দেওয়া হয়েছে।”

কবি মেঘদূতের অভিনব ব্যাখ্যা নানা প্রবন্ধেই করিয়াছেন। আবার এই ব্যাখ্যান মেঘদূত নামক কবিতাতেও রূপলাভ করিয়াছে।

“সম্বন্ধ শ্লোক—

বিশ্বের বিরহী বত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপনার অন্ধকার স্তরে
সবন সঙ্গীত যাবে পুরোভূত করে।”

ইহাই অভিনব ব্যাখ্যার মূল সূত্র।

বিদ্যার অভিশাপ, চিত্রাঙ্গদা, পাকারীর আবেদন, কর্কশসংবাদ ইত্যাদি কবিতার কবি মহাত্মার কল্পকগুলি উপাখ্যানকে অভিনব সার্থকতা (Interpretation) দান করিয়াছেন। “ভাষা ও ছন্দ” কবিতা বাগ্ম্যিক কবিত্ব লাভের একটি অপূর্ণ ব্যাখ্যা। “পতিতা” “অহল্যা” ইত্যাদি কবিতা রামায়ণের উপাখ্যানের অভিনব ব্যাখ্যা; “বৈষ্ণব কবিতা” “একাল ও সেকাল” “মেহের মিলন” “পশারিণী” ইত্যাদি কবিতা বৈষ্ণব কবিতার রসধর্মের ছন্দাময়ী ব্যাখ্যা। গীতাঞ্জলির

কোন কোন কবিতাও বৈষ্ণব রসধারাবহ ব্যাখ্যা। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবপদ্যকলার মর্মকথার একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন অতি অল্প কথায়—

“অসৌম্যকে সৌম্যর মধ্যে আনিয়া ভক্ত তাহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন। আকাশ যেমন গৃহের মধ্যে আবদ্ধ হইয়াও অসৌম্য এবং আকাশই, সেইরূপ রাধাকৃষ্ণের মধ্যে পরিচ্ছিন্ন হইয়াও অসৌম্য ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন। মানবমনে অসৌম্যের সার্থকতা সৌম্যবন্ধনে আসিয়া। তাহার মধ্যে আসিলেই তাহা প্রেমের বস্তু হয়—নতুবা প্রেমাত্ম্য সম্ভবই নয়। অসৌম্যর মধ্যে সৌম্যও নাই, প্রেমও নাই। সঙ্গীহারা অসৌম্য সৌম্যর নিবিড় সঙ্গলাভ করিতে চায়—প্রেমের জন্ত। ব্রহ্মের কৃষ্ণরূপ ও রাধাকৃষ্ণের মধ্যে এই ভাবই নিহিত। অসৌম্য ও সৌম্যর মিলনের আনন্দই পদাবলীর রূপ ধরিয়াছে—সৃষ্টিতে সার্থক হইয়াছে।” কবি তাঁহার একটি গদ্যকবিতার বৈষ্ণব সাহিত্যের অভিসারের একটি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন—

“তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে আনন্দের নব নব পথায়। পরিপূর্ণ অপেক্ষা করছে স্থির হয়ে—নিত্য-পুষ্প নিত্যচন্দ্রালোকে। নিতাই সে একা, সেইত একান্ত বিরহী। যে অভিসারিকা তারই জয়। আনন্দে সে চলছে কাঁটা মাড়িয়ে। সেও তো নেই স্থির হয়ে যে পরিপূর্ণ। সে যে বাজার বাশী—প্রতীকার বাশী। সুর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে। বাহ্যিকের আস্থান আর অভিসারিকার চলা পদে পদে মিলেছে এক তালে। তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে, সমুদ্র চলছে আস্থানের সুরে।”

ভারতীয় সংস্কৃতির এই একটি অঙ্গের Interpretation
কবি যেভাবে দিয়াছেন এখানে তাহার উল্লেখ করি—
গঙ্গার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—

মানুষের মুখা ভয় মৃত্যুভয়
কেমনে করিবে তারে জয় নাহি জানে
তাই সে হেঁচিছে ধানে
মৃদুবিজয়ীর জটা হতে অক্ষর
অমৃত শ্রোতে
প্রতিফলিত নামিছে ধরায়।
পুণ্যতীর্থ তটে সে যে তোমার প্রসাদ পেতে চায়
সে ডাকিছে মিথ্যা শব্দা নাগ-পাশ ঘূচাও ঘূচাও,
মংগেরে যে কালিমা লেপিয়াছি মুছাও মুছাও
গঙ্গার ভয়াল মূর্তি মরণের
তব কলধ্বনি মাঝে গান ঢেলে দিক্ তরণের
এ জন্মের শেষ ঘাটে।
শেষ দণ্ডে ভবে দিক্ তার কাণ
অজানা সমুদ্র পথে তব নিত্য অভিসার গান।

যজ্ঞের অভিনব ব্যাখ্যা—

যে সকল ক্রিয়াকলাপে মানুষ আত্মশক্তির দ্বারা
বিশ্বশক্তিকে উদ্বোধিত করে তোলে তাই মানুষের যজ্ঞ।
গীতাকার যদি একালের মানুষ হতেন তবে সমস্ত
আধুনিক বৈজ্ঞানিক অধ্যবসায়ের মধ্যে তিনি মানুষের
যজ্ঞকে দেখতে পেতেন। একদা যজ্ঞকাণ্ডের দ্বারা
যে চেষ্টা বিশ্বশক্তির সিংহদ্বারে আঘাত করছিল—
স্বীতা তাকেও সত্য বলে দেখিয়েছে।

কাশীধামের আধ্যাত্মিকতার ব্যাখ্যা—

“হিন্দুর কাছে কাশীর ভৌগোলিক সীমানা একটা
মায়া। পরামার্থতঃ যেখানে নিখিল বিশ্বের পরিচয়—সেই-
খানেই বিশ্বেশ্বরের আসন। যথার্থ হিন্দুর কাছে মৃত্যুর
মুক্তিবাহী কাশীতে বিস্তৃত সুরে প্রবেশ করে।”

কবি হিন্দুসমাজের সত্যবোধের চমৎকার ব্যাখ্যা
দিয়াছেন— তাঁহার অজস্র কবিতার ও প্রবন্ধে। তাঁহার
সমাজগ্রন্থের যতীচরণের চিঠিতে বৈষ্ণব্য ব্রতের এবং মাতৈঃ
নামক প্রবন্ধে সহমরণেরও চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

এই যে ব্যাখ্যানের কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিলাম—
সেই একই দিব্যদৃষ্টির ফল। সে দৃষ্টিতে দেখার ফলে
রসজগৎয়ের চোখে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতিকে নব কলেবর দান
করিয়াছেন। সেই দৃষ্টিই আমাদের সংস্কৃতির সর্বদিকে
আমাদের কাছে নব সার্থকতার মণ্ডিত করিয়াছে।
এই দৃষ্টিকে Cosmic, Synthetic or Universal
vision বলা যাইতে পারে। যাহা পুরাতন তাহাকে
বর্তমান যুগের উপযোগী সার্থকতা দান, যাহা লৌকিক
তাহার মধ্যে অতিলৌকিক ব্যঞ্জনার সন্ধান, যাহা
দেশকালের সীমার পরিচ্ছন্ন—তাহার সীমার্গাণ্ডের বিলোপ
সাধন, যাহা সংকীর্ণ ও সসীম তাহার সঠিত অসীমের
যোগসাধন, বিশেষকে সামান্যের মধ্যে মুক্তিদান, যাহা
প্রাকৃত তাহার উপর আধ্যাত্মিক আলোকপাত,—
গতানুগতিক চিন্তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার উদ্বোধন—
এই মানসদৃষ্টিরই ফল। ইহাকেই বলে Rational inter-
pretation—ইহাই বিশ্বজনীন গূঢ়ার্থের আবিষ্কার।
রবীন্দ্রনাথের মত এত বড় গূঢ়ার্থের আবিষ্কারক এদেশে
পূর্বে কেহ জন্মিয়াছেন বলিয়া আমার জ্ঞান নাই।

এইরূপ নব নব অর্থের আবিষ্কারে (ইংরাভিতে যাহাকে
বলে Symbolical, Spiritual, Universal
বা Transcendental Significance) ভারতীয় সংস্কৃতির
সর্বত্র নূতন আলোক উদ্গাসিত হইয়াছে। প্রাচীন
ভারতের ভাবলোকে যাহা কিছু গুহ্যহিত ছিল—আজ
স্ববির আলোকে সবই বলমল করিতেছে। নব নব অর্থ-
সম্পদের আবিষ্কারে ভারতের ঋষি, কবি, সাধু ও স্মরণের
বাণীর মূল্য যে কত বাড়িয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা
নাই।

বরেণ্য রাজনারায়ণ বসু

(স্মৃতিকথা)

শ্রীমুরেল্লনাথ সেন বি-এ

রাজনারায়ণ বসু মহাশয় গত শতাব্দীর একজন বিখ্যাত মনীষী বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব, তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা, বাংলা রচনায় এবং বঙ্গ-সাহিত্যের সমালোচনায় তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব, তাঁহার অকৃত্রিম স্বদেশ-প্রেম, তাঁহার নিখুঁত ভগবদ্ভক্তি, এবং তাঁহার নিভীক স্পষ্টবাদিতার জন্য তিনি সেকালের মুখ্যসমাজে অতি বরেণ্য পদ লাভ করিয়াছিলেন। এই বিরাট পুরুষের সমগ্রতা লইয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আলোচনা করিবার দুঃসাহস আমার নাই, আর তাহা সম্ভবও নয়। আমি বর্তমান প্রবন্ধে তাঁহার সম্বন্ধে কেবল মাত্র আমার একটি দিনের অভিজ্ঞতার কথাই বিশেষভাবে বলিব। আশা করি, পাঠকপাঠিকা ইহা ইহতেই সমগ্র মানুষটির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবেন।

কৈশোরেই এই মহাজনের নামের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে ইহঁতে বহু বৎসর তিনি শিক্ষাব্রতীরূপে মেদিনীপুরে বাস করিয়া উহার সর্বদ্রোণ উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেখানে শিথিল অশিক্ষিত, সকলেই তাহাকে অভ্যস্ত শ্রদ্ধাভক্তি করিত; হানোয় সরকারী বিদ্যালয়ে তিনি প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার আরও দুই ভাই দুর্গানারায়ণ এবং অভয়চরণ ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। আমি তাঁহাদের ছাত্র ছিলাম। রাজনারায়ণের ভাই বলিয়া মেদিনীপুরে

তাঁহার বিশিষ্ট এবং চিহ্নিত ব্যক্তি ছিলেন। স্বল্পভানৌ গম্ভীরপ্রকৃতি অভয় বাবু এবং সদ্যসঙ্গসাবধান সুরসিক দুর্গানারায়ণ বাবু দুইজনকেই ছাত্রসমাজ সমান শ্রদ্ধা করিত এবং ভালবাসিত।

এই দুইজন শিক্ষকের প্রভাবেই রাজনারায়ণ বাবুর প্রতি আমার কিশোরচিত্ত সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হইল। পরে প্রথমবোধনে বসু মহাশয়ের পুত্রোপম শিষ্য উদারমান দেশনাথক অম্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের সংস্পর্শে আসিরা এবং তাঁহার মুখে রাজনারায়ণ বাবুর পূণ্যচরিত্রের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার ও তাঁহার পরধূনি পাইবার জন্য আমার প্রাণে ব্যাকুলতার সঞ্চার হইল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে—ঠিক সাল মনে নাই—মহাবোগী ভাঙ্করানন্দ স্বামীকে দেখিবার জন্য কানীধামে গিয়াছিলাম। ফিরিবার পথে এক শুভ শারদ প্রভাতে দেবগৃহে (দেওঘরে) দেবপ্রতিম রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের প্রবাসনিকেতনে উপস্থিত হইলাম। বাড়ীর চাকর আমাকে বসিবার ঘরে আসন দিয়া গৃহস্থামোকে ধবর দিতে গেল। অন্তরঙ্গ পরেই বয়োভারে অবনত দেহ সপ্ততিপর বৃদ্ধ বসু মহাশয় ধূলিনলিন হস্তে গাছের গোড়া খুঁচিবার একখানি লোহার খুঁটি লইয়া হাসিমুখে গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং আমার সম্মুখেই আসিয়া বসিলেন। আমি তাঁহার বহু বাহিত

পদধূলি লইয়া কৃতার্থবোধ করিলাম। বাড়ীর বাগানের
 ফুলের কাছে শুনিয়াছি যে প্রতাহই তিনি অতি প্রত্নবে
 গাজোখান করিয়া ভগবানের নাম করিতে করিতে
 পুষ্পোদ্যানের তদারকে প্রবৃত্ত হইতেন এবং বেশী যৌৱ
 না উঠা পর্য্যন্ত ফুলগাছগুলির সেবা করিতেন। পরিচর
 এবং কুশল জিজ্ঞাসাদি শেষ হইলে তিনি আমাকে
 হাত মুখ ধুইবার জন্য বাহিরে লইয়া চলিলেন। বাড়ীর
 বিস্তৃত প্রাঙ্গণের একদিকের শেষপ্রান্তে শোচাগার অবস্থিত।
 একগাড়, ভাল স্বহস্তে বহন করিয়া তিনি আমাকে পথ
 দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। আমি উহাতে আপত্তি
 জানাইলে একবার আমার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া
 বলিলেন,—যদি কিছু শিখিতে আসিয়া থাক, শিখিয়া
 লও, আমাকে শিখাইতে চেষ্টা করিও না। বাধ্য হইয়া
 আমি নীরব রহিলাম। আমাকে যথাস্থানে পৌছাইয়া
 দিয়া বলিলেন,—বারান্দার বাইরা তোমার হাতমুখ ধুইবার
 জন্য সমস্তই পাইবে, আমি ততক্ষণ ঘরে বাইরা একটু
 বিশ্রাম করি। কিরিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম
 সতরঞ্চিতে ঢাকা একখানি নেয়াড়ের খাটিয়ার তিনি
 চোখ বুজিয়া শুইয়া আছেন, বুকের উপরে একখানি
 উপনিষদগ্রন্থ দুই হাতে চাপা। আমার নড়াচড়াতে শব্দ
 পাইয়াই তিনি উঠিলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা
 করিলেন,—হাতমুখ ধুইয়া বেশ সুস্থ হইয়াছ তো? ব'স,
 এখন একটু কিছু খাও, তারপরে তোমার সঙ্গে অনেক
 কথা হইবে। নিজেই ভিতরে বাইরা দুই বালিকা
 দোহিত্রীর হাতে আমাকে জলখাবার পাঠাইয়া দিলেন।
 আমার বতদূর মনে পড়ে ইহাদের একজন ছিলেন
 শ্রীঅরবিন্দ মহোদয়। সরোজিনী এবং আর একজন
 কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের হুহিতা কুমুদিনী।

কিছুক্ষণ পরেই রাজনারায়ণ বাবুর সঙ্গে আমার যে
 কথাবার্তা আরম্ভ হইল প্রমোদনের ভাবে তাহা বিবৃত
 করিতেছি :—

তিনি—কোথা হতে এখানে আসিলে?

আমি—কালী হইতে।

তিনি—সেখানে গিয়েছিলে কেন?

আমি—যোগিবর ভাস্করানন্দ স্বামীকে দেখিতে।

তিনি—স্বামীজীর সঙ্গে কথাবার্তা কিছু হ'ল?

আমি—অনেক কথা হয়েছিল।

তিনি—তুমি কি হিন্দী বলিতে পার?

আমি—বলিতে পারি, বলিতে পারি না।

তিনি—তবে কথাবার্তা কি করে হ'ল?

আমি—আমার কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবার জন্য
 দোভাষী সঙ্গে ছিল।

তিনি—স্বামীজী তোমাকে কি কি কথা বলিলেন?

আমি—যত প্রশ্ন করিয়াছিলাম, সবগুলিরই তিনি
 সহস্রর নিয়াছিলেন। এবং আমাকে তাঁর চরণেনুটাইয়া প্রণাম
 করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। আমি সে আদেশ পালন
 করিলে, সেই সদানন্দ পুরুষ তাঁহার এক হাতে আমার
 গলার চাদর এবং অপর হাতে আমার চিবুক এবং কণ্ঠ স্পর্শ
 করিয়া স্মিতমুখে 'গম বড়া ধুসী হরা' এই বাক্যটি
 দুইবার উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

তিনি—স্বক, তুমি অতি ভাগ্যবান। অতি অল্প
 লোকেই তাঁহার কাছে এমন আদর পাইয়া থাকে।
 ভাস্করানন্দের আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ এবং প্রখর।
 তাঁহার দৃষ্টি যে তোমার অন্তরকে ভেদ করিয়াছিল,
 তাহা কি তুমি টের পাইয়াছিলে?

আমি—না, আমি টের পাই নাই। এই বলিয়া আমি শহরিতা উঠিলাম।

তিনি—তুমি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার কখনও যোগ দিয়াছ ?

আমি—হামেশাই দিয়া থাকি।

তিনি—কেননা লাগে ?

আমি—মতবাদ হিসাবে খুবই ভাল লাগে। কিন্তু চক্ষু বুজিয়া যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণ বেন বিশেষ কিছুই পাই না। তার চাইতে বখন বেদো হইতে শিবনাথবাবুর আর্ন্তনাদে চক্ষু মেলিয়া তাঁহার অক্ষসিক্ত মুখের দিকে তাকাই তখন প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সেইজন্য কানীতে ভাস্করানন্দকে দেখিতে গিয়াছিলাম, এবং আপনাকে দেখিতে এখানে আসিয়াছি। আপনাদের পদধূলি পাইয়া এবং কথা শুনিয়া সত্যই কিছু পাইলাম বলিয়া মনে হয়।

তিনি—তোমার এই সরল স্বীকৃতিতে খুব খুশি হইলাম ; কিন্তু ভগবান বখন নিরাকার, তখন সেইভাবেই তাঁর আরাধনার অভ্যাস হইতে হইবে। মাটিকে চিনি বলিয়া থাকি। চিনির স্বাদ কখনই পাওয়া যাইবে না।

অন্তঃপর নিরাকারকে অনুভূতিগত করিবার অনেকগুলি উপায়ের কথা তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। অন্তর্গত একটি আমার বেশ মনে আছে। তিনি বলিলেন—আচ্ছা, তুমি বখন আমার সঙ্গে কথা কও, তখন কি ভ্রাতারূপে দেহটাকেই আমি বলিয়া মনে কর, না এই ক্ষেত্রে অন্তরালে যে নিরাকার অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে, বাহার আভাস তুমি হস্ত আমার চক্ষুর দৃষ্টির মধ্য দিয়া এখনও পাইতেছ, তাহাকেই

‘আমি’ বলিয়া মনে কর ? প্রশ্নটি কঠিন হইলেও গভীর চিন্তার উদ্রেককারী (thought-provoking) তাহাতে সন্দেহ নাই। তারপরে তিনি অষ্টাবক্রসংহিতার একটি শ্লোক তাঁহার সাক্ষাতেই আমাকে দিয়া মুখস্থ করাইয়া লইলেন। শ্লোকটি এইরূপ বলিয়া মনে পড়ে—

যদি দেহং পৃথক্ কৃত্বা
জীবী বিশ্রাম্য তিষ্ঠতি
অধুনৈব সুখী শাস্তো
বন্ধনুক্তো ভবিষ্যতি।

তিনি আরও বলিলেন যে, সেই পরমচৈতন্যকে উপলব্ধি করিতে পারা এবং তাঁহার সার্থক আরাধনা করিতে পারাই মানুষের পরম পুরুষত্ব। ইহা আরম্ভ করা কঠোর সাধনাসাপেক্ষ সন্দেহ নাই ; কিন্তু নিরাশ হইলে চলিবে না। একাগ্রচিত্তে অভ্যাস কর, পথ ক্রমে সহজ হইয়া আসিবে।

এই প্রসঙ্গ হইতে ক্রমে দেশের মহাজনদিগের কথা উঠিল। তিনি সাধু রামতনুলাহিড়ী মহাশয়কে অনাসক্ত অমুরাগী মহাপুরুষ বলিয়া নির্দেশ করিলেন এবং বলিলেন যে তিনি পদ্মপত্রে জলের কায় নির্লিপ্ত সংসারী এবং “সহজাবস্থা” স্বভাবস্বাদক ছিলেন। ‘সহজাবস্থা’ কাহাকে বলে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কুলার্ণবতন্ত্রের এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—

উত্তমা সহজাবস্থা,
মধ্যমা ধ্যানধারণা,
জপস্ততি শ্রাদ্ধমা,
হোমপূজাধর্মাদিমা।

হিন্দুচুড়ামণি ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে তিনি ভূদেবতা বলিলেন এবং তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্য এবং মহান চরিত্রের কুসৌ প্রশংসা করিলেন। খাটি

বর্ণাশ্রমী ভূদেবচন্দ্রের প্রতি ব্রাহ্ম রাজনারায়ণের এই গভীর অনুরাগমিশ্রিত প্রকা আশ্রয় বড় ভাল লাগিয়াছিল। শুনিয়াছি যে, বর্ণাশ্রমধর্ম লইয়া এই দুই বন্ধুর মধ্যে একদা যখন তুমুল তর্কযুদ্ধ হইতেছিল, তখন গুণগ্রাহী আদর্শবাদী ব্রাহ্মণ ভূদেবচন্দ্র নিজের গলার উপবীত হইতে একটি ত্রিহস্ত ধুলিয়া লইয়া বস্ত্রমহাশয়ের শলাক পড়াইয়া দিয়াছিলেন। রাজনারায়ণবাবু বন্ধুর এই অমূল্য উপহার একটি হস্তীদন্তনির্মিত ক্ষুদ্র কৌটার সমস্তে রক্ষা করিতেন এবং তাঁহার প্রবাসগৃহে সমাগত কোন কোন ভাগ্যবান অতিথিকে উহা দেখাইতেন।

কথায় কথায় বেলা যখন এগারটার মত হইল, যখন তিনি তাঁহার নাতিনৌদের আমাকে স্বান করাইয়া আনিতে আদেশ করিলেন। গোলপিবাগের মধ্যে এক কূয়া হঠাৎ জল তুলিয়া তাহার আমার গায়ে মাথায় ঢালিয়া দিতে লাগিল। তিনি অদূরে দাঁড়াইয়া হাসিমুখে তাহা দেখিতে লাগিলেন।

ঐদিন সেখানে আরও দুইদিনটি অতিথি ছিলেন। আমাদের সকলকে লইয়া তিনি আহায়ে বসিলেন। তাঁহার খাওয়া যখন আধাআধিও হয় নাই, আমার খাওয়া তখন প্রায় শেষ করিয়া ফেলিয়াছি দেখিয়া তিনি অসন্তুষ্ট হইলেন এবং আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—তুমি দেখিতেছি অত্যন্ত অধীর। এই অধৈর্য্যকে প্রশ্রয় দিলে তোমার আয়ুক্ষয় হইবে; এখন রেলগাড়ীর ঘটায় ত্রিশ মাইল গতিতেও তোমরা ধৈর্য্য রাখিতে পার না, আর আমরা গরুর গাড়ীতে সুদীর্ঘপথ চলিতেও ধৈর্য্য হারাষ্টরা না। মনে রাখিও, আহারকালে ব্যতীত হজমের পরিপন্থী।

আহারের পরে পুনরায় কিছুকণ কথাবার্তা হইল। শিক্ষাক্রমী অখিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের শুভ প্রচেষ্টার

তিনি অনেক প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন যে অখিনীকুমারের সাধনার ফলে বরিশাল জেলার চেহারা বদলাইয়া যাইবে। তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সকল হইয়াছে। বতদূর মনে পড়ে অখিনীবাবুর নিজের মুখেই শুনিয়াছিলাম যে কলিকাতার মোহ ত্যাগ করিয়া বরিশালকেই তাঁহার জীবনের কর্মক্ষেত্র করিতে বস্তু মহাশয়ের নিকট তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। রাজনারায়ণবাবু অখিনীকুমারকে বাংলার সক্রান্তিস্ বলিয়া অভিহিত করিলেন।

এইবারে তিনি একটু বিশ্রামের জন্য উঠিলেন এবং আমার হাতে তাঁহার রচিত 'Religion of Love (প্রেমের ধর্ম) নামক ছোট বইখানি দিয়া বলিলেন,—দুবানিদ্দা ভাল নয়, তুমি ঘুমাও না, এইটি পড়; আমি বিশ্রামান্তে তোমার কাছে ইহার সমালোচনা শুনিতে চাই। পূর্বরাত্রে গাড়ীতে মোটেই ঘুমাতে পারি নাই, কাজেই ঘুম ঠেকাইয়া বই পড়িতে অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। ভাগ্য বইখানির সমালোচনা পূর্বেই সম্ভাবনীয় কারণে আমার পড়া ছিল, যন্ত্রণা আমাকে বড়ই অপ্রস্তুত হইতে হইত। হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুজাতির প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল অসাধারণ। সমগ্রজগতে হিন্দুসম্প্রদায়ের পুনরুত্থানের স্বপ্ন তাঁহার চিত্তকে মগ্ন করিত। এই স্বপ্নকে তিনি তাঁহার প্রাণস্পর্শী ভাষায় জীবন্ত করিয়া স্বজাতিকে উপহার দিয়াছিলেন। সে বন্ধুদর্শন যুগের কথা। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদক এক প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি সুপ্ত হিন্দুসমাজকে জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রবর্তিত এবং আদি ব্রাহ্মসমাজে অনুষ্ঠিত ধর্মকেই তিনি স্বার্থ হিন্দুধর্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। সেদিন তিনি আমাকে পুনঃ পুনঃ

বলিয়াছিলেন,—মনে রাখিও তুমি হিন্দু, হিন্দুদের
গুরু কিছুতেই ত্যাগ করিও না।

বিদেশীয় ভাবে মশগুল হইয়া কাহারো বিদেশীয়
ভাষায় ব্যতীত বাক্যালাপ করেন না, বিদেশীয় পোষাকের
সর্বস্বত্বাধী লোকের গুরু অনুভব করেন। তিনি তাঁহাদের
প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। তিনি রামায়ণ এবং
মহাভারতকে হিন্দুসভ্যতার মেরুদণ্ড বলিয়া মনে
করিতেন এবং ঐ দুইখানি মহাগ্রন্থ ভাল করিয়া পড়িতে
আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার
বহিরাবরণের জৌলুবে বিভ্রান্তচিত্ত দেশবাসীর মোহাচ্ছন্ন
দৃষ্টিকে স্বদেশের দিকে কিরাইয়া আনিবার জন্য তিনি
যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা বলিবার
সময় তিনি মধ্যে মধ্যে উঠিয়া বাইরা পার্শ্বস্থ খাটিয়ার
শয়ন করিয়াছেন এবং উপনিষদ গ্রন্থখানি কিছুক্ষণ
পড়িয়া উহা বুকের উপরে চাপিয়া রাখিয়া মুদিতনেত্রে
ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। বাক্যালাপের মধ্যে ঠিক এমনটি
করিতে আমি সারাজীবনে অন্য কোন মানুষকে দেখি
নাই। শিশু যেমন তার বাহিরের খেলাধুলার মধ্যেও
এক একবার তার জননীর সন্ধানে ঘরে বাহর, এও
ঠিক সেইরূপ।

অপরূপ প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার সময় আমি
কিছুকালের জন্য বাহিরে যাইতে তাঁহার অনুমতি
চাহিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাইবে।
আমি বলিলাম,—বৈষ্ণনাথের Shrineটা দেখিতে।
তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—চিনিয়া যাইতে পারিব
কিনা। আমি বলিলাম, পারিব। তখন তিনি বলিলেন—
আচ্ছা যাও। কিন্তু আমি ঘরের বাহির হইয়া প্রায়শে
পা দিতে না দিতেই তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—

ওহে শোন শোন। কী দেখিতে যাইতেছ বলিলে।
আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। বাক্যে পারিলাম, ঐ
Shrine শব্দটি আমার কান হইরাছে; কারণ, তাঁহার
কোন আর একাল গ্রন্থে বিবৃত এই সবকিছু তাঁহার
মনোভাবের বিষয় আমার পূর্বে হইতেই জানা ছিল।
তথাপি কেন যে এই ভুল করিয়া ফেলিলাম তার
কারণটাও বলিতেছি। প্রত্যবে বগন আমাদের গাতি
বৈষ্ণনাথ জংশনে পৌঁছিল, তখন আমাকে দেখিতে
পাইয়া সেখানে এক বন্ধু বলিলেন,—বুঝিয়াছি, রা-
নারায়ণবাবুকে দেখিতে যাইতেছ; ভালই, কিন্তু বৈষ্ণনাথের
Shrineটাও দেখিতে যেন ভুলিও না। তখন হইতেই
এই Shrineএর ভূত আমার বাড়ে চাপিয়াছিল।

বহু মহাশয় বলিলেন—Shrineটি দেখিতে যাইতেছ
বুঝিলাম; কিন্তু উহার বাংলা প্রতিশব্দ তুমি জান না
কি? আমি বলিলাম—জানি, মন্দির। তিনি বলিলেন—
ঐ দুইটার কোনটা শুনিতে ভাল? আমি বলিলাম,
মন্দিরই বেশ মধুর শব্দ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা
করিলেন,—উহা কোনটা তোমার বেশি ঘনিষ্ঠ?
আমি বলিলাম,—মন্দির যে আমার মাতৃভাষা। তখন
তিনি আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন—
দেখ, আত্মমর্যাদাবোধের এই দৈন্ত তোমাদের মজ্জাগত
হইতে চলিয়াছে; ইংরাজী বলিতে ইচ্ছা হইলে সবটাই
ইংরাজীতে বলিও; উগা পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ ভাষা।
মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরাজী মিশাইয়া ভাষায় বর্ষসংবৎসর
সৃষ্টি করিবার হীনতা আর স্বীকার করিও না। আমি
অনুতপ্ত হইয়া কমা চাহিলে, তিনি আমাকে বুকের কাছে
টানিয়া লইলেন এবং বলিলেন—যাও মন্দিরের প্রধান
পাণ্ডা শৈলজানক দত্তবাবুকে যাত্রা আমার কথা

বলিও, তিনি তোমাকে সমস্ত দেখাইবেন। মন্দিরে বাইরা দত্তরাঁ মহাশয়কে আমার ইচ্ছা জানাইলাম। আমি রাজনারায়ণবাবুর কাছে আছি শুনিয়া তিনি স্মিতহাস্যে বলিলেন—দেখুন দেওঘরে দুই বৈদ্যনাথ : একজন সচল, আর একজন অচল, সচলের গৃহেই আপনি আছেন। বেশ, যখন আসিয়াছেন, তখন অচলকেও দেখিয়া বান। এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে ভক্তরাজ বিজয়রুক্মি গোস্বামী মহাশয়ের বখা। পুরোধামের লোকেরা তাঁহাদের জটীরাবাবাকে সচল জগন্নাথ নাম দিয়াছিলেন। মন্দির দেখিয়া আমি ঘণ্টাখানের মধ্যেই ফিরিলাম। প্রাঙ্গণে ঢুকিয়াই দেখিলাম বসুমহাশয়ের দৈনন্দিন সাক্ষাৎ মজলিস বন্ধিয়া গিয়াছে এবং তাঁহার উচ্চহাস্যধ্বনি শুনা যাউতেছে। এমন মনোরম বিশিষ্ট ভঙ্গিতে জ্ঞানগর্ভ কথা বলিবার এবং এমন হাসিবার এবং হাসাইবার ক্ষমতা অতি অল্প লোকেই দেখা গিয়াছে। শুধু কথা বলিয়া মানুষকে ভাসিয়া গড়িবার আশ্চর্য্য পটুতার জন্য অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার এই গুরুর কাছে কতখানি ঋণী ছিলেন তাহা ভাবিবার বিষয়। মজলিস ভাঙ্গিলে তিনি সাক্ষাৎ উপাসনার জন্য বাটীর ভিতরে গেলেন। উপাসনাকালে তিনি আমাকে লইয়া পুনরায় ভিতরে চলিলেন। তাঁহার সর্বকনিষ্ঠা কন্যা কবি কুমারী লজ্জাবতী বসু তখন রক্তনশালায় ছিলেন। আমাকে সেখানে রাখিয়া তিনি কন্যাকে বলিয়া গেলেন—তুমি ওকে বেশ করিয়া খাওয়াও। লজ্জাবতী আমাকে গরম গরম লুচি, তরকারী, মিষ্টি প্রভৃতি পরিবেশন করিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি কিছুই খাইতে পারিলাম না; সন্ধ্যাে আমি আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিলাম। কানিকঙ্কণ পরে বসু মহাশয় আসিয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন মা, উনি বেশ খেলেন ত? কন্যা বলিলেন—না বাবা, কিছুই খেলেন না। বসু মহাশয়

লজ্জাবতীকে আমার খাবার বাহিরের ঘরে পাঠাইয়া দিতে বলিয়া আমাকে লইয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরের ঘরে তিনি সম্মুখে বসিয়া আমাকে সবগুলি খাবার খাওয়াইয়া ছাড়িলেন।

এবারে তিনি আমাকে বটাপানেকের ছুটি দিয়া নৈশ আহারের জন্য ভিতরে চলিয়া গেলেন। আহারান্তে যখন তিনি বাহিরে আসিলেন তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা। তখন তিনি পুনরায় আমাকে লইয়া কথা বলিতে বসিলেন। রাত্রি বারোটায় আমার কলিকাতার গাড়ী পরিবার জন্য ষ্টেশনে বাইবার কথা। আমি তাঁহার নিকট কিছু বিশেষ উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন,—দেখ মেলাই উপদেশ শুনিয়া কোন লাভ হয় না। যতটুকু সহপদেশ কেতাবে পড়া যায়, অথবা মানুষের মুখে শোনা যায়, তাহাই কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টা সার্বিক জীবনের লক্ষণ। শুধু যদি তুমি একান্তই কিছু চাও, তবে বলিতেছি শুন,—ভাল হও, ভাল কাজ কর, এবং ভগবানকে ভালবাস। Be good do good, and love God. এর বাড়া কোন উপদেশ আমি জানি না। বিদায় লইবার সময় আমার চক্ষে জল দেখিয়া তিনি বলিলেন—ছিঃ, ওকি, হির হও। আমাকে ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিবার জন্য একটা ঘোমগাতির লঠন সহ একজন সাঁওতাল চাকরকে আমার সঙ্গে দিলেন।

গৃহ হইতে বাহির হইবার সময় তিনিও আমার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিলেন। শুক্লপঙ্কের রাত্রি। নিশ্চল নীল আকাশে চন্দ্র। চন্দ্রের রক্তকিরণধারায় সমস্ত প্রাঙ্গণ প্রাণিত। তিনি তাঁহার কন্যাগণের দক্ষিণহস্তধানি আমার মস্তকে রাখিয়া একটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন এবং বলিলেন—আমি তোমাকে আশীর্বাদ করিলাম, তুমি বৃদ্ধিতে পারিলে কি? আমি বলিলাম—না, বৃদ্ধিতে

পারি নাই। তখন তিনি বলিলেন—তবে তুমি, বাংলা ভাই
করিয়া বলিতেছি :—“তোমার আত্মরূপ শুদ্ধি পবিত্র
করিয়া ঈশ্বরের নামে রাখ। নিরাশা রাখিও না। এমন
একদিন আসিবেই আসিবে, যেদিন ভগবৎরূপাবারিষণ
যাতীনক্ষত্রের জল তোমার আত্মাশুদ্ধিতে পতিত হইয়া
মুক্তিরূপ মুক্তাকল বিধান করিবে।” এই বারিষণ তিনি
হই বাহ প্রসারিত করিয়া আমাকে বুকে টানিয়া লইলেন,
“আমার মস্তক আশ্রয় করিয়া আমাকে চুম্বন করিলেন এবং
“তুমি আবার আসিও” এই বলিয়া আমাকে বিদায়
দিলেন। ইহার পরে তিনি অল্প কয়েক মাসের মাত্র
জীবিত ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমার আর দেখা
হয় নাই।

নীরব

শ্রীঅমিতেশ্বরনাথ ঠাকুর

স্বর্গের ছায়া ধীরে পৃথিবীর উপর ভেসে যায়,
ছোট একটি নদীর মতন গোধূলির আলো,
মৃদু শীতে সন্ধ্যার হাওয়া উঠেছে বেদনা জাগিয়ে।
রাত্তা হাটে ঘর বাড়ি বিশ্বস্ত চুরমার,
মনে পড়ে খানিকটা ভাঙা দেওয়াল
মাটিতে ছড়ানো ঠট আর টালির টুকরো :

স্বর্গের ছায়া ধীরে পৃথিবীর উপর ভেসে যায়,
ছোট একটি নদীর মতন গোধূলির আলো,
মৃদু শীতে সন্ধ্যার হাওয়া উঠেছে বেদনা জাগিয়ে,
মায়াবী কোণায়? আকাশে ফুটেছে তারা
একটা, দুটো !

স্বর্গের ছায়া ধীরে পৃথিবীর উপর ভেসে যায়,
ছোট একটি নদীর মতন গোধূলির আলো,
মৃদু শীতে সন্ধ্যার হাওয়া উঠেছে বেদনা জাগিয়ে।
নিঃসাড়, সামান্য একটু দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ, তাও নেই
শব্দ ভিড়, শব্দহীন মহন ।

•চীনা কবি মা-উন্-ছেন হইতে অনুবাদ।

অভিমান

শ্রী গজেন্দ্রকুমার মিত্র

ভবনাথ বাবুর এটি শেষ মেয়ের বিয়ে—সুতরাং উৎসব সমাপ্তোহের একটু বাড়িবাড়ি হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। তাঁর অন্য মেয়েরা হয়ত এতটা ব্যয়বাহুল্য খুব প্রীতির চোখে দেখেনি বরং প্রায় প্রকাশ্যেই এই আধিক্যতাকে ভীমরতি নামে অভিহিত করেছে কিন্তু তবু যে তিনি কারুর কোন সহপদেষ শোনেননি তার মূলে আর একটা কারণও ছিল। তাঁর বড় জামাই অজিতের আগ্রহ এবং কোন কোন ব্যাপারে সক্রিয় অর্থাৎ আর্থিক উৎসাহেই এতটা আয়োজন তিনি সাহস করে করতে পেরেছেন—বর্দিও সেটা আর কেউ জানে না এমন কি অজিতের শাস্তাও না।

ভবনাথ বাবু সাধারণ অবস্থার লোক। ঠিক সামান্য কেরাণী না হ'লেও সওদাগরী আধিসের বড় বাবু, এ এ-ন কিছু মধ্যাদায়ুক্ত পদ নয়। আজকাল তিনি দু'শ পঁচিশ টাকা মাইনে পান—তা ছাড়া যে সব কন্ট্রাক্টরদের বিন পাশ হয় তারা পূজার সময় কিছু কিছু পান খেতে দিয়ে যায়। সেই টাকাটা ওদের লেক্সানে ভাগ হয়ে ওঁর হিম্মার পড়ে হাজার থেকে দেড় হাজার টাকা। তেমনি পূজার সময় তাঁর খরচও ত কম নয়। এতগুলি জামাই, শুধু মেয়ে-জামাইএর কাপড় আর মিষ্টি পাঠাতেই কতগুলি টাকা যায়। তা-ছাড়া এত মাইনে ত আর একদিনে হয় নি।

অবশ্য তাতে ভবনাথ বাবু খুব হুঁশিয়ার নন। তাঁর পাঁচটি মেয়ে, ছেলে হয়নি একটিও। মেয়েরা সবাই পরের বাড়ী চলে যাবে, বড়ো-কুড়োকে শেষ বয়সে

একাই কাটাতে হবে, এ একটা দুর্ভাবনা ছিল বটে—তেমনি ছেলেদের পেছনে আরও অনেক টাকা খরচ হ'ত এবং তাতেও মানুষ করে তোলা যেতো কি না শেষ পর্যন্ত, সে সন্দেহও ছিল। এই-ত কত বাপ-মা, কত কষ্ট ক'রেই না, ছেলেদের মানুষ করে তোলেন, ক'টা ছেলে শেষ অবধি বাপ-মাকে দেখে? বিয়ে হলে, নিজেদের ছেলে মেয়ে নিয়েই বিব্রত হয়ে পড়ে, বড়ো বাপ-মা তখন হয়ে উঠেন অনাবশ্যক, কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্ব্বাহ বোঝা। ছেলে ও বৌ-এর মন পেতে পারলে সংসারে ঠাই হয়—কিন্তু সে কাজটা বেশী বয়সে অসম্ভব করা কঠিন। বরং মেয়ে ভালো। মেয়েরা আর বয়সে স্বস্তরবাড়ী চলে যায় বটে, কিন্তু বাপের বাড়ীর ওপর টান একটা তাদের থাকেই। সেই জন্যই জামাইরা বাধ্য হয়ে স্বস্তর-শাস্তাটিকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে। বৃদ্ধ বয়সে অবলম্বন? দু-একটা নাতি নাতনী কাছে এনে রাখলেই হয়, মানুষ করবার বজাটটা তাঁরা পোয়ালে যে কোন মেয়েই রাজী হবে ছেলে-মেয়ে ছেড়ে দিতে। তা ছাড়া, দেখলে জামাইরাই দেখে। ছেলেঃ চেয়ে, যদি ভাল হয়, জামাইদের উপরেই বেশী ভরসা।

তাঁর সাক্ষী এই ত অজিত। আহা বেঁচে থাক সোনা! চাঁদ জামাই! শুধু সে যে সুপুরুষ, সচ্ছন্দ্র, ধনশ্রী ছেলে তাই নয়, বড় মায়া। স্বস্তরকে ত দেবতার মত শ্রদ্ধা করেই, শালীগুলিকেও ঠিক নিজের বোনের মত দেখে। সেই বেদিন থেকে বিয়ে হয়েছে সেইদিন

থেকে দায়ে-আদায়ে সুখে দুখে আগে সেই এসে দাঁড়িয়েছে। পরামর্শ দিতে সাহায্য করতে অজিতের মত আর তাঁর কোন জামাই নয়। অনেক তপস্যা করে তবে এমন জামাই পেয়েছেন। ভবনাথ বাবুর বড় মেয়ে ত চিরকথা, তাকে নিয়ে কটা দিনই বা অজিত শান্তি পেয়েছে, সেবা তাকেই করতে হয়েছে চিরকাল—তার সেবা নেওয়া আর বেচাবার ভগ্নো বটে ওঠেনি, তবু একটা অ-বোগের কপা ওর মাঝে কেটে শোনেনি। তার জন্য কোন নাশিষ্ট নেই। সে স্বস্তুর-শাস্ত্রীকে এর জন্য দাগী করতে পারত, অমুযোগ করতে পারত যে জেনে শুনেই তাঁরা রোগা মেরেকে তার বাড়ে চাপিয়েছেন কিন্তু তা সে করেনি বরং সে বড় ছেলের মতই আপদে বিপদে মাথা দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, আজ এ বাড়ীর অনেকেই ভুলে গেছে যে সে ছেলে নয় জামাই, সে তাদেরই একজন বান্ধা কোন কালে আপনার হয় না।

এমনকি মেয়ের বিয়েও—বড় মেয়ের বিয়ের পর আর কোন মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভবনাথ বাবুকে ভাবতে হয়নি। যা করেছে অজিতই। ছেলে খোঁজা থেকে শুরু করে দেনাপাওনা ঠিক করা, বিয়ের বাজার করা, ঝগাট-ঝামেলা পোহানো যা কিছু সব সেই করেছে। বিশেষত এবার বা করলে—বিবাহ সভার সম্প্রদান করতে বসেও কথটা মনে পড়ে একান্ত মেহে ভবনাথ বাবু চক্ষু মজল হয়ে উঠল—তার ত তুলনাই হয় না। ছোট শালী রমা ওর চিরকালই বেশী প্রিয়, কিন্তু এতটা যে তা তিনিও বুঝতে পারেননি কখনও। এত মোহ হয় মানুষ নিজের মেয়ে বা বোনের জন্যও করে না। খুঁজে খুঁজে সে প্রায় রূপকপার রাজপুত্রই ধরে এনেছে রমার জন্য। কেন রূপ তেমনি গুণ—মনের একমাত্র সন্তান, ডবল এম-এ পাস, সরকারী কলেজের অধ্যাপক। এ পার ভবনাথ বাবুর

শুধু অবস্থারই নয়—কল্লনারও অতীত ছিল। অজিতও অধ্যাপক, তারও অবস্থা ভাল কিন্তু তবু এত ভাল নয়। আর তা ছাড়া, সেই প্রথম কন্যার বিবাহ বলে বহু টাকা ঋণ করে অনেক খরচ করেছিলেন ভবনাথ বাবু। তবু তখন অজিত মাত্র এম-এ পাস করেছে, কোথাও চাকরীতে ঢোকেনি। অজিতের বাপের কলকাতা মহরে খান দুই বাড়ী ছিল বটে, তেমনি ভাইও তাঁরা চারটি। সে তুলনায় ছোট জামাই নরেন ত রাণী, দশ বার হাজার টাকার কম এমন পাত্র পাবার স্বপ্ন দেখাও অসম্ভব।

কিন্তু এও সম্ভব হ'ল অজিতের জন্য। নরেনের এক দূর সম্পর্কের দাদা ছিল ওর সহপাঠী, সেই সূত্রে আলাপ করে রমার অসামান্য গুণের কথা (রূপ তার এমন কিছু নেই, গায়ের বং পাত্তের চেয়ে অনেক ময়লা) দিন রাত ওর কানে শুনিতে বহু চেষ্টা করে নরেনকে আগে হাত করেছে। তবুও নরেনের মা বাবাকে রাজী করা কি সহজ কাজ! মোহ হয় এক বৎসর তনবরত ঘুরতে হয়েছে এবং অজস্র অর্থব্যয় করতে হয়েছে ওকে এই জন্য। কিন্তু তাঁরা কিছু না নিনেও বা ক্ষদ্র তৈরি হয়েছিল তা দেখে ভবনাথ বাবুর বুকের বক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল—ভেবেছিলেন নরেনের আশা তাঁকে ছাড়তে হ'ল। সেখানেও অজিত মাথা দিয়ে দাঁড়াল—শুধু রমার গহনাগুলি ছাড়া একে একে নিঃশব্দে সে সমস্ত খরচই নিজের হাতে তুলে নিলে। কাপড়, ফুলশস্যার বাজার, ফার্ণিচার সব কিছু সে নিজে কিনেছে নিজেরই টাকায়। অথচ পাছে স্বস্তুরের অমর্যাদা হয় বলে সে কাউকে এমনকি নিজের স্ত্রীকে পর্যাস্ত জানায়নি—ভবনাথ বাবুকেও জানাতে দেয় নি। অনেক বলে-কয়ে তাঁকে এ সাহায্য নিতে রাজী করেছে অজিত, এবং নির্বাক থাকতেও। তাই কি সে সাধারণ তিনিষ কিনেছে একটাও, বা কিছু কিনেছে বেছে বেছে বাজারের সেরা

জিনিষটি, নরেনের উপযুক্ত দেখেই নির্মাচন করেছে।

এতে যে কত টাকা খরচ হয়েছে তা মনে মনে হিসেব করতেও সাহস করেন না ভবনাথ বাবু, অত্যন্ত অগ্রিম প্রসঙ্গের মত বার বার এড়িয়ে যেতে চান।

অবশ্য অসুযোগ তিনি অনেক করেছেন, কিন্তু অজিত তার কথা শোনেনি। ছোর করতে গিয়ে উল্টো কল হয়েছে, তবে কি আপনারা আমাকে পরই ভাবেন এখনও? ব'লে সব ফেলে বাড়ী চলে গেছে। আবার গিয়ে সেখানে আনতে হয়েছে তাঁকে। অজিত তাঁর পুত্রাবিক—তার মনে ব্যথা দেওয়াও তাঁর পক্ষে কঠিন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাই তাঁকে এই দান, দানই বৈকি একরকম, হাত পেতে নিতে হয়েছে।

তুধু কি নিমিষপত্র! বাড়ী যা সাজিয়েছে অজিত, বহু লক্ষপতির বিয়েতেও এত অর্থব্যয় নোশ হয় হয় না এই কারণে! কাশী থেকে প্রায় সাতশ' টাকা খরচ করে সানাই এসেছে, ঢাকা থেকে এসেছে মিষ্টান্ন প্রস্তুতের কারিগর। তার আয়োজন দেখে ভবনাথ বাবুর স্ত্রী সভয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, 'এ কী করছ বাবা অজিত, আমাদের কি শেষ পর্য্যন্ত পথে বসাবে?' অজিত কুণ্ডকণ্ঠে জবাব দিয়েছিল, 'আমরা থাকতে আপনি পথে বসবেন এমন কথা কী করে মুখে এল মা!'

অজিত কুণ্ডকণ্ঠে জবাব দিয়েছিল, 'আমরা থাকতে আপনি পথে বসবেন এমন কথা কী করে মুখে এল মা!'

ভবনাথবাবুও ফার্নিচারের মহার্বাভা দেখে গুহকণ্ঠে না প্রশ্ন ক'রে থাকতে পারেন নি, 'তুমি কি শেষ পর্য্যন্ত একটা মোটরগাড়ীও কিনবে নাকি বাবা? এ কী কাণ্ড করছ।'

অজিত হেসে জবাব দিয়েছিল, 'এ নিয়ে আপনি মাথা বামাচ্ছেন কেন? রমার বরের উপযুক্ত হওয়া

চাইত, ওরা না রমাকে অজ্ঞার চোখে দেখে সেদিকে নজর রাখা দরকার।'

না, সত্যিই অজিত তাঁর কোন অভাব রাখেনি। অজিত তার ছেলে না হয়ে জামাই হয়েছে এ দুঃখও করেন না ভবনাথবাবু, ছেলে-মেয়ে-জামাই একাধারে অজিত তার সব। তাঁর অন্তর পূর্ণ হয়ে গেছে ওর প্রীতি আর শ্রদ্ধায়। ঈশ্বরের কাছে এ বিদায় তার কোন নালিশ নেই। আজ এই কপাই বার বার মনে হচ্ছে ভবনাথ বাবুর।

কিন্তু অজিত গেল কোথায়? এত বড় ঘটনার মূল যে—এই ব্যাপারের সর্কাধিনায়ক—বর সভাতে আসার পর থেকেই সে যে কোথায় গেল তার কোন খবরই নেই। লগ্ন একটু বেশী রাত্রে ছিল বলে বরযাত্রীদের আগেই খাইয়ে দেওয়া হয়েছে, সে সময়েও অজিত দাড়িয়ে তদ্বির করেছে। তারপর বর সভায় এসে এসতে সেই যে সে একবার এসে দাড়িয়েছিল তারপর থেকে আর তাকে কোথাও পাওয়া যায় নি। সবাই আশা করেছিল স্ত্রীআচারের সময় সে কনের পিঁড়ি ধরবে, অন্য ভায়রাতাইরা ডাকাডাকিও করেছিল। কিন্তু কেউ তাকে খুঁজে পায়নি।

ভবনাথ বাবুরও সেই আশা ছিল, রমা যে অজিতের বড় প্রিয়! তিনি ব্যাকুলভাবে খবর নিতে লাগলেন বার বার, 'তার কোন অসুখ করেনি ত? শরীর খারাপ বোধ ক'রে হয়ত কোথাও গুয়ে পড়েছে—খাটুনী ত কম হচ্ছেনা ক'দিন! ঔষাকে একটু খবর নিতে বল তাড়াতাড়ি—'

তারপর কোনমতে সম্প্রদান শেষ হ'তে বর-বধু
যখন বাসর-ঘরে চলে গেল তখন তিনি সারাদিনের
উপবাসের পরও—সরবৎ টুকুও মুখে না দিবে—
ছুটলেন ভেতরে—। হ্যাঁ গো আমার অজিত কোথা?
তার কি হ'ল?

গৃহিণী খবর দিলেন, তার বক্ত মাথা ধরেছে
কলে ও বাড়ীর ছাদে গিয়ে বসে আছে। কাউকে
বিরক্ত করতে বারণ করেছে—

ও বাড়ীর ছাদ অর্থাৎ পাশের বাড়ীর, এ বাড়ীর
তেতুলার বারান্দা দিয়ে ও বাড়ীর ছাদে যাওয়া চলে। দুই
পরিবারে সম্প্রীতি আছে বলে ওটাকে 'ওবাড়ীর ছাদ' বলে
ঘনিষ্ঠভাবেই অভিহিত করা হয়।

ভবনাথ বাবু আশ্বস্ত হলেন। তবু মনে হ'তে লাগল
তার সেবা করার জন্য কাউকে পাঠানো উচিত ছিল।
এ কাজ এ বাড়ীতে বরাবর রমাই করে, বড় ভামাই বুর
সেবাতে এতদিন আর কারো অধিকার ছিল না। আজ
তাকে পাঠানো সম্ভব নয়—এই কথাটাই তার বার মনে
পড়ে ভবনাথ বাবুর।

কথাটা আরও একজন যার মনে পড়ে সে
অজিত। রমার সঙ্গে তার সম্পর্কটা কেমন ক'রে
কট্ পার্কিয়ে গেছে সে-ই কথাটাই অন্ধকার ছাদের
পুরাতন আলসেতে ভর দিয়ে ভাবছিল সে। আজ
ওর বকল চল্লিশ, পুরো চল্লিশ আর রমার সত্তেরো।
পনেরো বছর আগে, যখন ওর বিয়ে হয় তখন তার
বকল ছিল মাত্র দুই। অপত্যের মতই স্নেহে তাকে

কোলে করেছে এবং আদর করেছে। অর্থাৎ রমা
যে ওর মেয়ের বয়সো, একথা প্রতিরঞ্জন না করেও
অনারাসে বলা যায়। কিন্তু আজ, অত্যন্ত লজ্জার
সঙ্গেই ওকে স্বীকার করতে হচ্ছে মনে মনে—আজ
রমা সম্বন্ধে ও যে ঈর্ষাতুর বাপা বোশ করেছে তাকে
ঠিক অপত্য-স্নেহের পরিণাম বলা যায় না। অবশ্য
প্রত্যেক বাপ-মাই ছেলেমেয়ের বিয়ের সময় বা পরে
একটা ঈর্ষা অনুভব করেন তাতে সন্দেহ নাই, তবু
মনে হয় ওর বর্তমান কালের মনোভাবের মধ্যে
নিজেকে দ্বিগুণিত করার কিছু কারণ আছে।

রমাকে ওর ভাল লাগত ছেলেবেলা থেকেই—
হরত বা অকারণে। কিশোরী এবং তরুণী শালীদের
চেয়ে কেমন একটা অহেতুক আকর্ষণ অনুভব করত
ও ঐ ছবছবেব মেয়েটির দিকেই। তারপর রমা
একটু একটু ব'রে বড় হ'তে লাগল—পাঁচ থেকে ছয়,
আট থেকে দশ। ক্রম পরা একরত্তি মেয়ে, ওর
কোলে কাঁধে চড়ে অনারাসে—আব্দার করে নিঃসঙ্কোচে।
তারি মিষ্টি হাসি ছিল রমার, তার মুখে সেই হাসিটি অক্ষুণ্ণ
রাখতে সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত আব্দার ও পূর্ণ করেছে।
তার জন্য সবাই অনুযোগ করেছে হরত—'মেয়েটার
মাথা খাচ্ছ' এমন অভিযোগও শুনে হরতের কাছে কিন্তু
কোন কথাও কান দেয়নি।

তারপর সহসা কবে কোন্ এক মস্তবলে রমা
কিশোরী হ'ল। চুল এল এগিরে কাঁধ পর্যন্ত, ক্রম
ছেড়ে শাড়ী ধরলে। কথার কথার জোব গাল রাঙ্গা
হয়ে ওঠে, আগেকার মত অকুণ্ঠদৃষ্টিতে চাইতে পারে
না সব সময়ে, প্রায়ই মাথা নত হয়ে আসে লজ্জার।
সেদিকে দেখে অজিত আর অবাক হয়, মনে হয়
এ কী সেই রমা, এক ফাঁটা এক রত্তি মেয়ে?

ভালও লাগে হয়ত—যদিও কারণটা সে ভাবে দেখবার চেষ্টা করেনা।

আর রমা—যখন ছোট ছিল তখন আব্দার করেছে, বড় হয়ে সে জোর করে। তার দিদিরা যেন কেউ নয় অজিতের, সব অধিকার তারই। এবাড়ীতে ওকে বড় করার, সেবা করার সমস্ত দায়িত্ব ও নিবিশেষে নিজের হাতে তুলে নেন, এমন কি রমার মারও সেখানে কোন কথা খাটে না। তিনি মধ্যে মধ্যে স্নেহেই অমুযোগ করেন, দিদিরা বগড়া করে কিন্তু রমা জানে তার যেখানে অধিকার সেখানে অন্য কারুর জোর খাটবে না—সে নিঃশব্দে উপেক্ষা করে ওঁদের। সে যদি অন্যত্র কোথাও কাজে বাস্ত থাকে ত অজিতকে অপেক্ষা করতে হয়, কখন তার সময় হবে তবে এসে চা ক’রে দেবে বা বাতাস করবে। অন্য কেউ হাতের কাছে থাকলেও তার কাছ থেকে কিছু নেবার উপায় নেই, কুলের মত কচি মুখখানি অভিমানে স্নান হয়ে আসবে। সে মুখের হাসি মুহূর্তের জন্য মিলিয়ে যাওয়াও সহ হয় না অজিতের।

কিন্তু তবু—সে ছিল স্নেহই, নিতান্তই শালী-ভগ্নি-পতির প্রীতির সম্পর্ক। তাতে চিন্তিত হবার, লজ্জিত হবার কিছু ছিল না। তারপর হঠাৎ একদিন অজিত ওর মনের চেহারটা দেখতে পেল। সে এই মাত্র মাসকয়েক আগে কী একটা কাজে অজিত এসেছে খবর বাড়ী। ভবনাথ বাবু অবশ্য তখনো ফেরেননি, কিন্তু তাঁর স্ত্রী দুর্গা ভাল করেই তামাইকে অভ্যর্থনা করলেন। অজিতের দৃষ্টি রমাকে বারকয়েক খুঁজে আবার শান্তদীর দিকে ফিরে এল তখন শুনে তিনি বললেন, একটু বসো বাবা, জলখাবার করে দিই। আজ ত আর তোমার

সে শালী নেই, আজ আমার হাতেই বা হয় করে খাও—’ চমকে উঠে অজিত প্রশ্ন করলে ‘রমা নেই? সে কি?’

একটু বেন অপ্রতিভভাবে হেসে দুর্গা বললেন, ‘নাই—বা রইল বাবা,’ আমরা কি কেউ নই? বে একেবারে ‘সে কি’ বলে ফেললে! সে ছুঁড়ি খবর পেলে আপসে মরবে’খন। তুমি আসবে তাত জানে না, সে গেছে ওর এক বছর জন্মদিনে নেমস্তন্ন খেতে।’

সহসা বেন অজিতের মনে হ’ল যে ওর চার পুত্র অনেকগুলো আলো নিভে গেল। এখানে আসার বেন আর কোন অর্থই রইল না। আজ প্রথম সে পরিচার বৃথাতে পারলে যে বে-কাজের জন্যই সে অশ্রু না কেন সেগুলো ছুতো মাত্র, আসলে আসে সে রমাকে দেখতে—তার সাহচর্য ভাল লাগে বলে—

বস্তুত সে যে কাজের জন্য এসেছিল তা বলাই হ’ল না। সব বেন শুগিয়ে গেল। কিন্তু দুর্গা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হবেন বলে সে তখনই উঠতে পারল না। তিনি গেলেন রাগাবরে, অজিত গিরে একাই ছাদে বসে রইল। চাকর পাখা নিয়ে বাতাস করতে এল, সে বিরক্ত হয়ে তাকে ফিরিয়ে দিলে।

তারপর, কতক্ষণ সে এইভাবে বসে এই কথাটাই ভাবছিল তার ঠিক নেই—আধঘণ্টা, একঘণ্টা, আবার পনেরো মিনিটও হ’তে পারে, এমন সময় হঠাৎ অতি পরিচিত চপল ছুটি পারের মাড়া এসে পৌঁছল ওর প্রাণে। চমকে উঠল কিন্তু চেয়ে দেখবার আগেই রমা ছুটে এসে ওর গলা জড়িয়ে ধরে এক রকম কোলের ওপরই বসে পড়ে বললে, ‘রাগ করেছেন বড়-জামাই বাবু?’

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে অজিত, ‘তুমি কোথা থেকে এসে গেলে? কই নেমস্তন্ন খেলে না?’

মাথা তুলিয়ে রমা বললে, 'কী জানি কেমন যেন আমার মনে হ'ল যে আপনি আসবেন—আর ভাল লাগল না, ভীষণ মাথা ধরেছে বলে চলে এলাম।...বলুন না, রাগ করেন নি ত? এসে দেখতে পাননি বলে?'

অজিতের মনে হ'ল একটা খুশির বন্যা বেন ওর অন্তরের দুই কূল প্রাবলিত করে বয়ে গেল। শুধু তাই নয়, মুখের অতি কাছে কিশোরী রমার সুকুমারী মুখখানি সরল, ঈষৎ উদ্ভিগ্ন দৃষ্টি মেলে ওর দিকে চেয়ে আছে—সেই মুখের ওপর অন্তর্গামী সূর্যের শেষ লাল রশ্মিটুকু পড়ে তাকে অনির্বচনীয় বনেই মনে হ'ল। মনে হ'ল এত সুন্দর বুঝি আর কিছুই নেই—

সেদিন রাত্রে অজিত ঘুমোতে পারলে না! রমা সম্বন্ধে এ মনোভাব যে তার সম্ভব তা সে কখনও ভাবতে পারে নি। ছি ছি, রমা যদি কোন রকমে ওর মনের মধ্যেটা দেখতে পেত, না জানি কি ভাবত সে! সে হয়ত দাদার মতই ভালবাসে, প্রজ্ঞা করে—আর অজিত, ছি!

সারারাত এপাশ ওপাশ করে ভোরের দিকে হজ্বিত মন স্থির করে ফেললে। শুধু যে রমার কাছ থেকে তাকে দূরে থাকতে হবে তাই নয়—বেশন করেই হোক তাকে নাপালের বাইরে পাঠিয়ে দিতে হবে।

সে প্রাণপণে বর খুঁজতে লেগে গেল। ভাল পাত্র চাই রমার—বেশন করে হোক। অনেক খুঁজে যে পাত্র পছন্দ হ'ল—রমার খানিকটা মাত্র উপযুক্ত বলে, তার ফর্দ দেখে ভবনাথ বাবু ঘাবড়ে গেলেন। রীতিমত ভয় পাবারই কথা কিন্তু তবু অজিত নিজে সেখানে কথা দিয়ে এল। প্রাণপণ চেষ্টায় খণ্ডরক বুকিয়ে দিলে যে এই

টাকাটা তার কাছ থেকে নিতে ভবনাথ বাবুর লজ্জিত হবার কারণ নেই, কারণ তিনি ত বাবুই দেখেছেন যে রমা ওর কত আদরের, তার জন্য পরমাংস কয়েই স্বপ্ন ওর। তবে ওর সম্মানের জন্য—কথাটা কারুর না জানাই ভাল।...

একটা পেচও দীর্ঘ নিশ্বাস, বেন বুকটা মুচড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল। রমার বিয়ে ঠিক হল—আজ এতক্ষণে হয়েও গেল। রাজপুত্রের মত খামী হয়েছে তার, উৎসব সমারোহের কোন ক্রটি হয় নি কোথাও, এক কথায় অজিত যা চেয়েছিল তাই হয়েছে। আজ সে নিশ্চিন্ত!

তবে?

বুকে এ পাষণ্ডতার বিসের ওর? এই নিবিড় বেদনাবোধে, এই অপরিসীম শূন্যতাবোধের কী কারণ?

ওর মনে পড়ল এ বাড়ীতে এতদিন ধরে যে ছিল প্রধান আকর্ষণ, সে আর থাকবে না। তার আদর-ষড়-সেবার সর্বপ্রথম পাত্র ছিল এতদিন অজিত, আজ অন্য লোক এসে তার হৃদয়ের সর্বপ্রধান স্থানটি অধিকার করে বসল। দুদিন পরে হয়ত আর মনেও থাকবে না অজিতের কথা। এই যে তার মাথা ধরেছে, এ সংবাদ কয়েক দিন আগে তার কানে পৌঁছেলে রমা সব কাজ ফেলে, সকলকে ফেলে ছুটে আসত ওর কাছে; কিন্তু আজ থেকেই আর তা সম্ভব হইল না। রমা চলে গেল বহুদূরে, ভয়ত ভমির হিসাবে দূর নয় তবে এ দূরত্বের হিসাব কোন মাপে পাওয়া যায় না!

কিন্তু শুধুই কি এই দুঃখ?

আর একটি বড় কারণ ওর বুকের মধ্যে খুঁজছে, যা ও ভাবতেও চায় না, ভাল করে মনে করতেও কষ্ট হয়।

রমা কি আজ থেকেই দূরে গেল? না—কয়েক দিন আগেই গেছে। যে দিন থেকে বিষেব সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেছে ওর সেই দিন থেকেই যেন এক আশ্চর্য ভাবান্তর হয়েছে। রমা যেন কী এক ধ্যানে মগ্ন, নিজেকে নিষেই থাকে সে। হরত বা নির্জনে বসে বসে সে দিবাসপ্রহ্ন দেখে, স্বপ্ন দেখে তার সুন্দর না-দেখা স্বামীকে, স্বপ্ন দেখে সে ভাবিয়াৎ ঘর-কন্নার। অবশ্য তাকে দোষ দিতে পারে না অজিত, তার জীবন, তার স্বার্থ, তার ভবিষ্যৎ অন্যত্র—আর সেই স্বপ্ন দেখাই তার উচিত; তার পক্ষে, হরত বা মানুষমাত্রের পক্ষেই স্বাভাবিক। তবু যেন কোথায় একটা আশা ছিল অজিতের। রমারই বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত, পরিশ্রান্ত অজিতের উৎসুক চোখ দুটি সমস্ত কাজের কঁকে কঁকে কার সুকুমার মুখের কৃতজ্ঞ দৃষ্টিকে খুঁজে খুঁজে বেড়ায় আর তার দেখা ন' পেয়ে হতাশার দীর্ঘ নিঃশ্বাসটা পর্যন্ত চেপে রাখবার চেষ্টা করে। যদিও তা থাকে না—এক সময় সমস্ত অন্তরটা দলে পিষে ছিন্নভিন্ন করে বেরিয়ে আসে—

আর কটা দিনও অপেক্ষা করতে পারলে না রমা! আশ্চর্য!

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে ওর—ও যা আশা করতে চায় সেইটাই হুয়াশা! রমার কী পরজ, কী যোগাযোগ আছে তার জীবনের সঙ্গে অনেকখানি বয়সে বড় ভগ্নোপতির? যা স্বাভাবিক, যা সত্য তাকে সাম্নাসাম্নি সহজভাবে দেখাই ভাল।

কথাটা মনে নেবার চেষ্টা করে অজিত, তবু মনে মনে কহরিক্ত হতে থাকে—

‘বাবা অজিত!’

‘মা? কী বলছেন, মা?’

‘জানিনা বাবা, তোমার আদরের শালিকে আমরা আর সামলাতে পারিনে। ওকে বাসর থেকে বার ক’রে আনলুম যে, সারাদিন উণেষ ক’রে আছে আড়ালে বসিয়ে ভাল ক’রে খাইয়ে দেব বলে, তা মেয়ে কিছুতেই কিছু মুখে ভুলছে না। উল্টে বিছানার মুখ গুঁজে কী কারা!’

‘কাদছে? রমা কাদছে? সে কি?’ চমকে ওঠে অজিত, ‘আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।’

হ’বাড়ীর মধ্যকার দরজা পার হ’তে গিয়েও চমকে দাঁড়ায় সে, ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, ‘একটা কাজ করতে পারেন? তাকে গিয়ে বলুন যে তার বড়জামাই বাবুর বড্ড মাথা ধরেছে, ভীষণ চটকট করছে—তাহলেই সে এখানে আসবে। আপনারা কেউ সঙ্গে আসবেন না, আমি কারণটা জেনে নিচ্ছি—’

হুগী চলে গেলেন। অজিত আবার কিরে এসে চেয়ারটার বসল। হরত এটা ঠিক হ’ল না—এতটা আশা করা হরত ওর ধৃষ্টতা, এত জোর হরত আর এখন নেই—তবু, তবু লোভ সামলাতে পারলে না অজিত পরীক্ষা করার। যদি না আসে, সে অপমান যেন কল্পনাও করা যায় না!

কিন্তু সে চিন্তার চেয়ে উদ্বেগটাই বড় হয়ে ওঠে ওর। রমা কাদছে, কেন? এমন বর তাও কি ওর পছন্দ হয়নি? না বাপ-মাকে ছেড়ে যাবার চিন্তাতেই কাদছে...

অকস্মাৎ দামী বেনারসী শাড়ীর ধস্খসানিতে সচকিত হয়ে উঠল অজিত। এ পারের শব্দ ভুল হবার নয়।

‘জামাইবাবু? আপনার অসুখ করেছে?’

এক রকম ছুটেই এসেছে রমা। কণ্ঠস্বরে সেই উৎসেগ, যার সঙ্গে বহুকাল ধরে ওর পরিচয়, যার চিন্তাতেই ওর রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। অতিকষ্টে আশ্ব-
দমন ক’রে বললে অজিত, ‘হ্যাঁ, ভাই, বড় মাখার
বদ্বর্ণা হচ্ছে—কিন্তু ওর হাতটা ধরে আগের মতই
কোলের ওপর বসিয়ে সম্মুখে অজিত প্রশ্ন করলে,
‘তোমার কি হয়েছে বলো ত? খেতে চাইছ না কেন?
শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে?’

অকস্মাৎ রমার মুখটা ভাল ক’রে দেখা গেল
না। শুধু কণ্ঠস্বরটা যেন আশ্চর্যরকমভাবে শান্ত
শোনাল, মাখাটা জিপে দেব একটু?

আজকে ওসব কাজ তোমাকে করতে নেই ভাই, ও
আপনিই সেরে যাবে—

আচ্ছা, তবে আমি যাই।

ওর হাতটা ধরে কলে ভোর করে বসিয়ে রেখে
অজিত যেন একটু গাঢ় স্বরে প্রশ্ন করলে, রমা?

সে কণ্ঠস্বরে রমা একবার শিউরে উঠল—অন্ততঃ তাই
মনে হল অজিতের? কিন্তু সে শান্ত ভাবেই উত্তর দিল,
কী?

আমার কাছে ত কোনদিন কোন কথা গোপন
করোনি ভাই,—আজ বলবে না কি হয়েছে?

আপনার শরীর ভাল নেই জামাইবাবু, ওসব কথা
এখন থাক।

রমা, তুমি সুখী হবে বলে অনেক বেছে এই পাত্র
এনেছি, এখন তোমার এই রকম দেখলে আমার মনের
মধ্যে কি হয় বুঝতে পারো ত? বলো নন্দী,—বর কি
তোমার পছন্দ হয়নি?

মূহূর্ত্ত করেক চূপ করে থেকে রমা উত্তর দিলে, সুন্দর
বর—ভাল ভাল গয়না, এত ঘটার বিয়ে, পছন্দ হবে না
কেন জামাইবাবু, আপনি যা করেছেন তাই আমার ভালই
জন্যই করেছেন। ভাল লাগাই ত উচিত। তা ছাড়া
তুনেছি ওরা খুব বড়লোক—।

সে কণ্ঠস্বর বিছাকালের জন্য অজিতকে যেন ভড়,
অনড় করে দিয়ে গেল। কোনমতে আড়ষ্টকণ্ঠে স্বর
ফুটিয়ে আঙ্গুল হয়ে সে প্রশ্ন করলে, এ সব কী বলছ রমা?
তোমাকে সুখী করবার জন্য যে অসাধ্যসাধন করলুম।
তবে কি সব বুখা হল? খুলে বলো ভাই—আমি যে আর
স্থির থাকতে পারছি না। এ সবই যে শুধু তোমার মুখে
হাসি ফুটিয়ে তোলবার জন্য—

অকস্মাৎ যেন আর্তনাদ করে উঠল রমা। চাপা অগচ
তীব্রকণ্ঠে বললে, আপনি কেন এত চেষ্টা করতে গেলেন?
কী করেছিলুম আমি, এত তাড়াতাড়ি কেন আমাকে
আপনার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন? আপনি কি
কিছুই বুঝতে পারেন না? আমি যে আর পারি না—?

তারপরই মুঢ় স্তম্ভিত অজিতকে উত্তর দেবার অবকাশ
মাত্র না দিয়ে বিশেষরূপে রমা দ্রুতপদে বারান্দা পেরিয়ে
চলে গেল আলোর দিকে, উৎসবের দিকে—তার বিবাহ
বাসরের দিকে।

পাহাড়ী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

পাহাড় শিরে সাঁওতালেবা নাচে এবং বাঁজায় ধানী,
 বিচিত্র সুর ফণে ফণে সসীরণে আসছে ভাসি।
 সুরটী-কেমন মদির মধুর—এ কি পুলক জাগায় মনে?
 হামুহানার গন্ধ যেন মৃতি ধরে বেড়ায় বনে।
 মিশে গেছে মেঘ আর পাহাড়—মিশে গেছে শিলার নরে,
 প্রকৃতির এই রঙমন্ডলে নাইক প্রভেদ চেতন জড়ে।
 গীত বরিষা হচ্ছে কুমুম—কুমুম বারে হচ্ছে গীতি—
 উঠছে পাখি নান্দ্র্য হয়ে - নান্দ্র্য পাখি হচ্ছে নিতি।
 সূর্য্যকিরণ শীতল হয়ে হচ্ছে যেন স্বরণ বারি—
 চাঁদের আলোর মন্ডরা শুনার সুখা ধরার ইচ্ছা ভারি।
 ময়ূর মুখিক, মরাল পেঁচা, সিংহ বলদ সবাই মিলে—
 যেথায় থাকে, সব পাহাড়ই কৈলাস বে এই নিখিলে।
 হরিণীদে: কি চাতনৌ—নাইকো আশা: শক্তি বলার,
 খুঁজছে যেন সঙ্গী হলে আশ্রমে কোন শকুন্তলার।
 কুগের শাবক বাহার কিবা, শোভে পটের ছবির মত
 ইহার লাসি কতই ভরত করতো তারায় মোক্ষ পদও।
 নাচ্ছে শিখা পেখম তুলে ইন্দ্ররাজার চকু তাতে—
 নাচার'বুঝি এমনি শিখাই বক্ষবধু অনকাতে।
 বলুক নীরস কঠিন কঠোর—পাখি বল বলুক যারা—
 পাখুরে এই দেশ থেকে যে নামছে সকল রসের হার।
 কোথায় পাবে বিচিত্রতা? এমন নামাস এমন আনো?
 যেখ'চি ভেবে কুনোর চেয়ে বুনো হওয়া অনেক ভাল।
 পাখি মার আমরা ছলে—হিমালয়ে মামার বাড়ী --
 যেথায় থাকি বল দেখি ভাই—কেন আমাদের নয় পাহাড়ী?
 ওই গানেতে ওই নাচেও মোদের প্রাণের যোগ বে আছে,—
 পাহাড় শিরে মেঘ ডাকিলে সমতলের জল যে নাচে।

প্রার্থনা

শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত

ভুচ্ছতা হ'তে ক্ষুদ্রতা হ'তে বর্জিত হ'তে

বাঁচাও মোরে—

ছোট নাহি হই চিন্তা কথার কাছে -

গুপ্তবর্ণের দন্ধানে ফেরা পৃষ্ঠিগন্ধের

হৃদ ধ'রে

মধুমক্ষির স্বভাবে কখনো সাজে?

আপনারে যেন চাহি চিনিবারে

বকের মাঝারে চাঞ্চিয়া দেখি

নথ রিক্ত মুক্ত নিষ্কর পানে—

দর্শন ছলনা ফাকি মিথ্যার—

গর্জ অহংকারের মেরি—

কখনো আমারে চাকচিক্যে না টানে।

মুখোমুখি চাহি—সোজা মুখি চলি—

ভাচি ও শুভ্র সবার সাথে—

নিজ কোণ টানি নিজেরে কৃপা না করি

যদি ঘিরে আসে কান-বৈশাখী—

তোমার আশিস ধরিয়া মাথে

মেঘের আড়ালে সূর্য্যে না বিশ্বরি।

শ্রীশঙ্করদেব

শ্রীহরেকৃষ্ণ যুগোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী বাঙ্গালার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। পঞ্চদশ শতকের শেষপানে আবির্ভূত হয়ে শ্রীশ্রী মহাপ্রভু বাঙ্গালার সব্বত্র আনয়ন করেন। পঞ্চদশ শতকের বাঙ্গালার সম্পদ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে পরিপূর্ণ শতাব্দীতে বিকশিত হয়ে কপে শোভায় সুগন্ধে সম্পদে বাঙ্গালাকে পবিত্র ও ধনু করিয়াছিল। এই শতাব্দীর ভারতের ইতিহাসও নানা সাধু সন্ত ও কৰ্ম্মবীরের পুণ্য জীবনকথার পরিপূর্ণ। নানক, কবীর ও ভক্তি এই শতকেই আবির্ভূত হন। আশ্চর্য্যের বিষয় আসামের ইতিহাসেও ইগার ব্যতিক্রম ঘটে না। আসামে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্তক ও প্রচারক শ্রীশঙ্করদেব খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বাহারো মতে ১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে, কাহারো মতে ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দের কাঙ্কন মাসে শঙ্করদেব আবির্ভূত হন। কেহ কেহ বলেন ১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দে শঙ্করদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। শঙ্করদেব যে শ্রীচৈতন্যদেব অপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আসাম নগরী জেলার কুসুম্বর ভূঞা নামে একজন ক্ষুদ্র ভূস্বামী ছিলেন। ইনি শক্তিউপাসকরূপে পরিচিত। বহুদিন সন্তানসন্ততি না হওয়ায় শিবপূজার ফলে পুত্রলাভ করিয়া তিনি পুত্রের নাম রাখেন শঙ্কর। জন্মরাশি অনুসারে শঙ্করের নাম গঙ্গাধর। শঙ্কর বাল্যকালেই মাতৃহীন হয়েছিলেন। স্থানীয় চতুষ্পাঠীতে শিক্ষালভের পর শঙ্করের বিবাহ হয়। একটা কন্যা প্রসব করিয়া শঙ্করপত্নী লোকান্তরিত হইলে শঙ্কর

তীর্থপর্য্যটনে বাহির হন। ষাটশ বৎসর কাল তীর্থ ভ্রমণ পূর্ব্বক শঙ্কর গৃহে প্রত্যাবর্তন হন। তীর্থপ্রত্যাগত শঙ্কর আত্মদুঃখজনের অহুঃরাধে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। রাজনৈতিক বিপর্য্যে দেশ ত্যাগ করিয়া তিনি ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে আসিয়া বাস করেন।

শঙ্করদেবের পুত্রোচিত রামগুরুর জামাতা কানীধামে বেদান্ত অধ্যয়ন কালে ব্রহ্মানন্দ ভারতীর নিকট বিষ্ণু পুরী কৃত ভক্তিরত্নাবলী গ্রন্থখানি প্রাপ্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া শঙ্করদেবকে উপহার দেন। এই সময় শঙ্করদেব শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। গ্রন্থত নিবাসী জগদীশ মিশ্র নামক কোন পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথ দেব কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া শঙ্করদেবের সাক্ষাতে ভাগবত পাঠ করিতে আসেন। দৈবক্রমে গ্রন্থপাঠ সমাপ্তির পর তিনি আসামেই স্বর্গগত হন। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণলীলা কথা শ্রবণে শঙ্করদেব এমনই মুগ্ধ হইয়া ছিলেন, যে সেই হইতে তিনি নিত্য শ্রীগ্রন্থ পাঠ এবং তাহার অনুবাদ আরম্ভ করেন।

ক্রমে তিনি স্বীয় বাসভূমির চতুষ্পার্শ্বে ব্রহ্মপুত্রের উত্তরতীরে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করেন। এই সময় সুপ্রসিদ্ধ মাধবদেব তাহার শিষ্য গ্রহণ করেন। কাম্বুজ হইয়া ধর্ম্মপ্রচারে গুরুর আসন অধিকার করায় ব্রাহ্মণগণ কেহ কেহ তাঁহার উপর খজাহস্ত হইয়া উঠেন। ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধাচরণে অহোম রাজও অগ্রসর হন, অসামান্য উৎপীড়নও আরম্ভ হয়; ফলে শঙ্করদেব কুচবিহার রাজ্য বড়পেটার গিয়া বাস করেন।

কোচরাজ নরনারায়ণের জাতি ও সেনাপতি শুক্লধ্বজের সঙ্গে শঙ্করদেবের ভাতৃপুত্রীয় বিবাহ হইলে শঙ্করদেব কোচরাজ সভায় প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ধর্ম প্রচারে তিনি কোচবিহার রাজ্যের আনুকূল্য ও সহায়তা প্রাপ্ত হন। শঙ্করদেব হিন্দীনা বিষয়ক যে ছয়খানি নাটক প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে সীতাস্বয়ম্বর নামক নাটক সেনাপতি শুক্লধ্বজের অমুরোধে রচিত। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংক্ষেপে শ্রীমদভাগবতের অমুবাদ করেন। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দের (১৪২০ শকের) ভাদ্র শুক্লা দ্বিতীয়ার কৃচবিহারে এই মহাপুরুষের তিরোধান বটে।

শঙ্করদেবের তীর্থযাত্রা কালে পুরুষোত্তমে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎকার ঘটয়াছিল, শঙ্কর দেবের চরিতলেখকগণ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। দৈত্যারি ঠাকুর ও বিজয়ধ্বজ কবির মতে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু কোনরূপ কথাবার্তা হয় নাই। শঙ্কর দেবের অপর শিষ্যের নাম দামোদর। দামোদরের শিষ্য বিজয়রাম শুক্ললোচন লিখিয়াছেন—

কণ্ঠভূষণর মুখে শুনিছে শঙ্কর।
কৃষ্ণ চৈতন্য হয় হৈছে অবতার ॥
ব্রহ্মানন্দ আচার্য্যও কহিছে পূর্বত।
ব্রহ্ম হরিদাসে পাছে কৈলা শঙ্করত ॥
সেই কথা স্মরি শঙ্কর মৌন ভৈলা।
রাম নামে গুরু নামে উচর চাপিলা ॥
অবনত হয় ছই নামিলা সাক্ষাৎ।
পূর্বাপর পুছিলাস্ত কথা যত যত।
শঙ্কর আগে না মাতিলা মহাজানৌ।
কমণ্ডলু জন চালি বুকাইলা আপনি ॥
শঙ্করেও বুঝিলন্ত সেই অমুয়ানে।
এক যে শরণ ধর্ম চৈতন্যর স্থানে।

সম্বন্ধনির্ণয় নামক একখানি গ্রন্থে ব্রহ্ম হরিদাসের নিকট শঙ্করদেব কর্তৃক শ্রীচৈতন্য সাক্ষাৎকার প্রার্থনার কথা আছে। ব্রহ্ম হরিদাস শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে শঙ্করদেবের আগমন বার্তা নিবেদন করিলে মহাপ্রভু শূদ্র শঙ্করদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকৃত হন, সম্বন্ধনির্ণয়ে এইরূপ উল্লেখ থাকায় আমরা তাহাতে সন্দেহ স্থাপন করিতে পারি নাই। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বহু শূদ্র শিষ্য ছিলেন। দাস ব্রহ্মনাথকে তিনি এতই স্নেহ করিতেন যে আপন অর্চিত গোবর্দ্ধনশিলা ও শুভ্রানন্দ দান করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। শূদ্র ব্রহ্মনাথ ছয় গোবর্মার মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়া আজিও আনন্দের পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। সুতরাং শ্রীমহাপ্রভু শঙ্করদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নাই, এই উক্তি অশ্রদ্ধের। দেখা হইয়াছিল, কিন্তু কোনরূপ বাক্যালাপ হয় নাই, ইহা সম্ভব হইতে পারে। অনেক সময় ভাবাবেশে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাক্যস্মৃতি হইত না। হয়তো শ্রীমন্দির গমনপথে বা সমুদ্র স্নানকালে উভয়ের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকিবে।

কামরূপে গিয়া শুনিয়া আসিয়াছিলাম হাজোতে
অনিকট পাহাড়শিখরে শ্রীহর্য্যাব মাধব আছেন।
কোন সময় শ্রীমহাপ্রভু হর্য্যাব দর্শনে আসাম গমন করেন। পূর্বত পারশ্বুলে একটি গুহা আছে, তাহা চৈতন্যধোপ। নামে খ্যাত। নিকটেই বরাহকুণ্ড নামে একটি কুণ্ড আছে। এই কুণ্ডে স্নান করিয়া শ্রীমহাপ্রভু রত্নেশ্বরকে শরণাগতি দান করেন। কণ্ঠভূষণ নামক এক ভক্ত এই স্থানে শ্রীমহাপ্রভু কর্তৃক ভাগবত পাঠের উপদেশ প্রাপ্ত হন। কবি কণ্ঠহার কন্দলীকে কৃপা করিয়া শ্রীমহাপ্রভু কবিশেখর ব্রহ্মকে নামধর্মের উপদেশ

প্রদান করেন। কায়রূপে কোন সঞ্জিয়া বৈষ্ণব আমাদের
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

কোন দেশের বৈরাগী কোন দেশে যায়।

কোন মুখে ভিক্ষামাগি কোন মুখে খায় ॥

আমি কোন উত্তর দিতে পারি নাই। পরে
অনিরাছি শঙ্করদেবের শিষ্য বলরামকে ত্রিপাদ
নিত্যানন্দ নাকি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।
ত্রিপাদ নিত্যানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং হেয়ান্তিতে
কথোপকথন বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। প্রশ্ন-
কর্তা বৈষ্ণব নিজেই উত্তর দিয়াছিলেন—

পূর্ব দেশের বৈরাগী পশ্চিম মুখে যায়।

শঙ্কর মুখে ভিক্ষা মাগি নিজমুখে খায় ॥

ইহার পরের আর একটি প্রশ্ন—

কোন দেশের বৈরাগী কি বলি কাটিছে রাও।

সকল জগৎ হরিময় দেখ কত দিনে সাক্ষাত পাও।

উত্তর—পূর্বদেশের বৈরাগী রাম বলিছে করিছে রাও।

হৃদয় মাঝে ঈশ্বর কৃষ্ণ আপনি নিচাষি চাও।

আসাম জোড়াজাটের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী শ্রীমান
রাজমোহন নাথ তত্ত্বভূষণ অশেষ পরিশ্রমসহকারে
“শ্রীশঙ্করদেবের বরগীত” “শ্রীমাধবদেবের বরগীত” এবং
শ্রীশঙ্করদেব বিরচিত “কালিদমন নাট” সম্পাদন ও
প্রকাশ করিয়াছেন। শঙ্করদেব ব্রজবুলিতে পদরচনা
করিয়াছিলেন। ভাষার পারিপাট্য, ভাবের গভীরতায়
এক ছন্দবদ্ধারে পদগুলি বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিগণের
পদের সঙ্গে তুলনার সমশ্রেণীর বলিয়া স্বীকার করিতে
হয়। নিম্নে দুই একটি পদ তুলিয়া দিলাম।

॥ শ্রীকৃষ্ণের রূপ ॥

॥ রাগ আশোয়ারী ॥

॥ ক্র ॥ বালক গোপালে করন্তরে কেলি।

উচারা পাঁচনী নাচে হাসে গোপ মেলি ॥

॥ পদ ॥ নীলতরু নীতপট ধট নটি বোর।
নবঘন ঘন যৈছে বিজুড়ি উজোর ॥
শিরে শিখণ্ডক দোলে গলে গজমতি।
কোটি মদন মনোমোহন মুরতি ॥
চরণে মঞ্জীর ঘুরে উরে হেমহার
শঙ্কর কহ এহ হরিক বিহার ॥

মথুরা হইতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে শ্রীরুক্মিণী প্রেরণ করেন।
নিম্নপদে শ্রীকৃষ্ণের আকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে।

॥ রাগ শ্রী ॥

॥ ক্র ॥ উদ্ধব চণ্ডহ গোকুল নাই।
হায় বিনে গোপীর তিলেক স্মৃতি নাই ॥

॥ পদ ॥ হায় চিত্ত বিস্ত হানাকু মিথ্যানা।
ধরল বিরহে গোপী কথমপি প্রাণা ॥
হানাকেসে আশে গোপী জীয়ে সমুদাই।
বহু র আশ্রয় কৃষ্ণ ভেটব ছলাই ॥
কহ কৃষ্ণ কিঙ্কর হরিক ভজ লাই।
হরি বিনে স্মৃতি বাক্য নাই কোই ॥

গোপী বিরহ ॥ উদ্ধব প্রতি গোপী গাক্য ॥

॥ ক্র ॥ মাই, মাধব বিরহে হরয় চেতন।
তমু জীবন না রহে ॥

॥ পদ ॥ চান্দ চন্দন মন্দ মনর সমীরে।
কেশব বিনে বিষ বরিষে শরীরে ॥
ঘন ঘন হানয় মদন পঞ্চবাণ।
কোকিল কুহ কুহ লেহ মের প্রাণ ॥
পঙ্কজ পাঁচ অহিত হিমবারি।
মধুকর নিকর করয় মহামারী ॥
ঐছন সমরে মধুপুরী পিউ প্রাণ।
কৃষ্ণ কিঙ্কর শঙ্কর রস ভাণ ॥

শ্রীকৃষ্ণের গোকুলে প্রত্যাগমন।

॥ রাগ কল্যাণ ॥ তাল ধরনান ॥

গোকুলে চলেছে যুগারো

নীল শরীর রঞ্জিত পীত জ্যোতি—

চাক্র হার হেম চাক্র ॥

বাওত বেণু

মেণু রেণু তনু

কানু কোতুক কর যাই।

গোপ শিশু মদ

অঙ্গ ত্রিভঙ্গিম

রূপে ভুবন ভুলাই।

সঙ্গিনী রঙ্গিনী

গোপিনী গারে

ভাবে নার জুড়াবে।

কানু কমল

অনল মুহ হেরি

চন্দ্রি লহ লহ পাবে ॥

শ্রীরাম দ্বারা

হরি রস পায়া

নায়া কর নিরঞ্জন।

এহ কৃষ্ণ

চরণ পরায়ণ

শঙ্করে হরিশূণ গান ॥

সে কি রবে অগোচরে বিস্ময় সম

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

পাতাঘেরা বনানীর ছায়াভরা প্রাণ

মোর পানে চেয়ে আছে বিরল বেলার,

তটের আঘাতে আজ তটিনীর গান

কাণে বাজে ক্ষণে ক্ষণে বাদলের বার।

অসীমকালের পথে মালা গাঁথে গাঁথে

পথ-চলা ফাঁকে ফাঁকে ক্ষণিকের খেলা,

সে মালা পরাই যারে সে যে যেতে যেতে

কোথায় হারিয়ে যায় করে' অবহেলা!

ধরণীর আলোছায়া দোলে অবিরত

অলখলোকের কথা করে কানাকানি,

আমি শুনি তাই ভাষাশরাদেব মত

মনে পড়ে সবচেয়ে প্রিয় মুখখানি।

চিনিবার অবকাশ দেখনি আমার

প্রাস্তুর সম আজ রয়েছি নীরব,

স্মৃতির বৃকে নিরে কেন ঘুম পার?

কেন মনে হ'র মোর হারিয়েছে সব?

মেঘের মেঘের রাতে মোর মনোবনে

কথা তার কলে গেছে কি জানি কখন!

আমারে সে মেয়েছিল গীতি-গুণনে

কাছে নিরে আঁকিবারে দূরের স্বপন।

কদম-কেশর সরা বরষার সাধ

কেয়া-খুঁখী-চম্পক তাহারে বে ডাকে,

কি যেন বেদনা জাগে মূহ আঁধিপাতে

আমার হৃদয় হোতে কে নিরেছে তাকে!

বাওয়া আসা পথে মোর বাহা কিছু দেখা

সবি যেন বিরচিত বিরহের হুখে,

এ জীবনে জনতার পারে বসে একা

আবেশ-অলস আশা মিছে রাখি বৃকে।

নাম ধরে ডাকিবারে পারি নাই যারে—

পর হ'রে যাব পাছে অন্তরতম,

নামহারা অনন্ত জ্যোতি পারাবারে

সে কি রবে অগোচরে বিস্ময় সম?

পুনরুজ্জীবন

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

অচ্যুতানন্দের বিলাত-যাত্রা

‘যাত্রা করিব বিলাত-যাত্রা’—

কহিল অচ্যুতানন্দ,

‘ছাড়ারে গিয়েছে সহায় মাত্রা,

আবহাওয়া খুব মন্দ ।’

যদি বলো টানি’ ঠাট্টার স্বর:

‘হেতুটা কি তা’ করার ?

এখানেই ঠাই রয়েছে প্রচুর

‘‘হাত পা ছড়িয়ে মরার !

বিলাত-যাত্রার প্রয়োজন কি ?

এ-দেশেই থাকি, জিতি আর ঠকি ;

এখানেও মেলে সখা আর সখী—

হৃদয় দিবার পাত্র ;

দেখিতে পাইবে তাকা’লে স্বপেক—

এখানেও লোক রয়েছে অনেক,

ঘর-দোর করে’ আছে অকাতরে,

জলে না তাদের গাত্র ।

জন্মভূমিরে ত্যজিবে কি তুমি

কেবল গরম বলে’ ?

দেশ নহে, ভাই, ফুল মরুমুখী—

কেলে’ দেবে বাসী হ’লে ।’

এইরূপে কথা কবো যদি শেষ—

যুক্তি হিসাবে হয় তাহা বেশ,

সংগেও উদ্ধে স্থান পাবে দেশ

এ-কথা আমিও মানি ;

দেখিবে তোমরা ভাবিলে ধানিক্,

যুক্তিটা কিছু হয়েছে বেঠিক,

তোমরা ভেবেছ তোমাদের দিক্

আমারেও দলে টানি’ ।

গরমের ভয়ে যেতেছি বিলাত —

এ-কথা সত্য নহে,

আমারো চক্ষুে স্বপ্ন-প্রপাত

রৌদ্রের দাহ সহ্যে...

কিন্তু আমার আপত্তি কেবল :

দিবালোক হেথা অতীব প্রবল,

জ্যোৎস্নাও অতি প্রখর ধবল—

অলিছে নিরন্তর বেন ;

স্পষ্ট হইয়া সবে বসে’ আছি

পরস্পরের অতি কাছাকাছি ;

কাজ আপনার গোপন করার

সাধ্য নাহিকো কেন ?

বিলাতের লোক থাকে কুরাশায়—
 তুমারপাতের মাঝে :
 আধারেই তাবা থাকে, নার, ধার,
 সকাল ছ'পর সাঁঝে...
 জমাট বরফ ঝুলিছে আকাশ—
 বিলাতী স্বর্ষ্য পড়ি' তার গ্রাসে
 বধাই শূন্য যায় আর আসে—
 রশ্মি ছোঁয় না মাটি ;
 চাঁদ ত' সেখানে নেহাত বেচারী,
 তিমে হিমায়িত হ'রে গেছে সারা ;
 শোনেনি' বিলাত, আছে তারকারা—
 ক্ষুদ্র ও পরিপাটি ।
 ভীষনে কখনো হয় না মালুম
 চক্রে স্বর্ঘ্যোদয়,
 বড়ির কাঁটাও শুধু জানা যায়
 দিনের বৃদ্ধি ক্ষয় ।—
 চোখোচোখি হ'রে দাঁড়া'বে এমন
 স্তম্ভিত লোকের নাহি কদাচন ;
 পদস্পরের দোষাঘেষণ
 করিতে পারে না কেহ ;

অচ্যুতানন্দের উচ্ছাদমন

“বিলাত-যাত্রার কতো দেরি আর ?—
 জানিতে চেও'না, ভাই ;
 বড় দমে' গেছি গুনিয়া বাণীর,
 আমাতে আমি ত' নাই !
 সব ঠিকঠাক, সময়, তারিখ,
 দিগ্‌দর্শন যন্ত্রও ঠিক ..
 মনে দেখে' স্বপ্ন খুলি হ'রে আছি :
 বিলাতি কাহাকে ঘেন চাপিয়াছি ;
 খালসী টানিছে নোঙরের কাছি...
 কাহাকু ছাড়িল জেট...

কেহ কাহাকেও চেনেনাকো ভালো—
 চিনিবে কি করে' ? দেশে নাই আলো ;
 তেল তেল' তেল' বাতি জ্বলে' জ্বলে'
 কে আর বিত্তরে মেহ !
 এ-দেশ দেখা ত' কেমন ধারাপ—
 নিঃশব্দে যায় না ঢাকা ;
 জানি এ উজার উনরের মাপ,
 কাঠার কিরূপ টাকা !
 লকা'য়ে বা' করি বহে না গোপন :
 পাগে ধরে' বেধে বহু আলাপন ;
 চোখে পড়া সরা কতো জানাতন
 নিগেছি তা' ঢের শিখে' ..
 এত দেখা শুনা, এতটা প্রণয়,
 সহিতে পারি না, সহিবার নয় :
 সে-দেশে তা' নাই ; চমিলাম তাই
 আবার দেশের দিকে ।'—
 বলিয়া অচ্যুতানন্দ
 উয়ার করিল বন্ধ ।

যন্ত্র-শব্দে ভরা তার বুক—
 সাগরের দিকে ঘুরাইল মুখ...
 কিয় কোথায় নিব্রতি, স্থখ ?—
 কাজে ত' হ'ল না সেটি !
 গঠাৎ অন্তত বাজ
 ভাঙিয়া পড়িল আত্ম—
 কহিলেন হেঁকে' স্ত্রী সুরবালা :
 'তোমারে নিরে ত' হ'ল ভারি জানা !
 জানি না, বুদ্ধি কোন্‌ ছাঁচে ঢালা,
 আকুল কতটা পাঁটি !

বেঁও না বিলাত, করিতেছি মানা,
নূতন জায়গা, কিছু নাই জানা;
বাশবনে তুমি হবে ডোম-তানা,
জীবন হইবে মাটি...

পাবে না থাকার ঠাই—
সদাই আকাশ ঢাকা থাকে মেঘে,
ঝড়ের বাতাস বহে হু হু বেগে,
চিরবর্ষণ আছে সেথা লেগে—

বৃষ্টির শেষ নাই।

সেথা যে-গর্জন করে মেঘদল—
এ-দেশের চেয়ে দ্বিগুণ প্রকল;
তহুপরি সেথা সাগরের জল

গর্জিছে বারমাস...

সে কী করল তুলিছে সাগর!—
তুনি, আতকে গারে আসে জ্বর;
ছুটিয়া সে আসে গারের উপর
করিতে মানুষে গ্রাস!

সে জলো' বাতাস সর্দির খাতে
শরীরে লাগিলে ধরিবেই বাতে;
গর্জিয়া মেঘ সাগরের সাথে

শিরায় ধরা'বে টান!

কে দিল তোমারে ঐ হস্তকর
আবহাওয়া আর লোকের খবর!—
আঁখায়ে তার বেজায় প্রথর—
বেজায় বুদ্ধিমান।

চলাকেরা করে আঁখারে তাহার...
জনে জনে বীর, ভীষণ চেহারা;
চোখে চোখে রাখে কি কড়া পাহারা
পরম্পরের প্রতি।

বুদ্ধির ক্ষোরে সব টের পায়,
ফন্দিবাজির নাহিক উপায়,
চালাকি উল্টে চালাকে চাপায়—
সহিতে পারিবে কতি?

টুপীতে টুপীতে লেগে' চোকাঠুকি
বিভোর ওহারা, প্রেম-কৌতুকী;
আলাপে বলাপে হয় সুখী দুখী

ঠিক এ-দেশের মতো;

তোমরা যা' করে। আলোর বসিয়া—
দল-কোলাহলে, রগিয়া রসিয়া,
খানিক কানিয়া, হাসিয়া, খসিয়া,
ইচ্ছা ও চেষ্টা বত,

দেখিবে সেখানে ভদ্র চাষারে
সেই কাজ অতি চটপট সারে.....
কথায় কথায় 'গেলাম বাবা রে'—

নাহি এ আর্ন্তস্বর;

আলসে'র সেথা ভারি হুঁদণা;
বন্ধু ইয়ারে ডেকে' নিয়ে বসা,
আলোচনা করা নাহি আর মণা—

এবং রূপের দর

চনিবে না; ওরা দেবে ঠেলে' ঠেলে'
সাগরে নামিয়ে, কিংবা দেবে জেলে...
হেন অমাবিক সাধু দেশ ফেলে'

বিলাত বেঁও না, হার!

তুনে'ই ত' আমি হারা'য়েছি দিশে,
একেই জর্জর বন্দীর বিবে—

বিলায়েতে মিশে' কিসে আর কিসে

কি ঘটে না বলা যায়...

কাজেই ইচ্ছা আমার

দমন করিহু এবার।"

মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ

অধ্যাপক শ্রী বোপ্রসাদ সেন এম-এ

কুচবিহার রাজবংশে মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তিনি মাত্র স্মৃত বৎসরকাল কুচবিহারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজ্যের অষ্টমবর্ষে তিনি কালী যাত্রা করেন এবং ইহার অল্প দিন পরেই পুণ্য কালীধামে পরলোক গমন করেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সুশাসন গুণে তাঁহার প্রজাবৃন্দের হৃদয় রঞ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ, বিদ্যাচর্চা ও বিদ্যোৎসাহিতার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার রাজ্যসময়ে শাস্ত্রচর্চা, সাহিত্য-সাধনা এবং সঙ্গীতাদি শিল্পকলার অনুশীলনে কুচবিহার বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

শিবেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র। আমরা কুচবিহার নগরের ১৩৫৩ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় এক প্রবন্ধে হরেন্দ্রনারায়ণের শাখাসঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ বিরাট প্রতিভাশালী নরপতি ছিলেন। বিবিধ জটিল রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি নিজে বহু গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বরচিত এবং অনুবাদিত বার ধও গ্রন্থ এপর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া তদীয় সভাপণ্ডিতগণ যে কত গ্রন্থ মূল সংস্কৃত হইতে অনুবাদ করিয়াছিলেন, অথবা মৌলিকভাবে রচনা করিয়াছিলেন তাহা বর্তমানে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তাঁহার রাজত্বকালে রচিত বহু গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কুচবিহার রাজকীয় গ্রন্থালয়ে রক্ষিত আছে। মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার পিতৃদেবের এই প্রতিভা ও

বিদ্যোৎসাহিতা বহুপরিমাণে উত্তরাধিকারহস্তে লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ তিনিও একনিষ্ঠ শক্তি-উপাসক ছিলেন। বিবিধ শক্তি-বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়া তিনিও স্বীয় সঙ্গীত-নৈপুণ্য, কবিত্বশক্তি ও ধর্ম্মানুরাগের প্রভূত পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে তাঁহার সভাপণ্ডিতগণও বহুগ্রন্থ মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। সকল বিষয়েই তিনি তাঁহার সর্ব-গুণাবিত পিতার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে আমরা এই পুণ্যলোক নরপতির ধর্ম্মানুষ্ঠান ও বিদ্যাচর্চার বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব।

শিবেন্দ্রনারায়ণ বাল্যকাল হইতেই নানা ভাষা ও শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। তদীয় সঙ্গ-ধর্ম্মিণী মহারানী বৃন্দেশ্বরী আই দেবতাকৃত “বেগারোদন্ত” পুস্তকে তাঁহার বিদ্যাভ্যাসের কথা এইরূপে উল্লিখিত আছে :—

‘পারশু আরব্য বাঙ্গলাদি বত শাস্ত্র।

ভৌমবিদ্যা মল্লবিদ্যা আদি শাস্ত্র অস্ত্র ॥

হইলে এসব বিদ্যা বিবরে পারগ।

রাজকার্য্যে মহারাজ করেন নিগোগ।’ (পৃঃ ১০)

সিংহাসনে আরোহণ করিবার পরও তাঁহার শাস্ত্রচর্চার বিরাম ছিল না। তাঁহার সভায় নানা দিগ্দেশ হইতে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত-গণ আসিয়া উপস্থিত হইতেন, এবং মহারাজ স্বয়ং তাঁহাদের সহিত শাস্ত্রালাপ করিয়া তাঁহাদিগকে যথোপযুক্তরূপে পুরস্কৃত করিতেন। তাঁহার সমসাময়িক রাজকর্ম্মচারী জয়নাথবোম্বকৃত রাজ্যোপখ্যান গ্রন্থে আছে—‘ভূপতি

কখনও মন্ত্ৰিবৰ্গ সহিত রাজকাৰ্য্যোৰ বিবেচনা এবং
বিচাৰ, কখনও বা ব্ৰাহ্মণপণ্ডিত সহ শাস্ত্ৰালাপ, কখনও
বা মন্ত্ৰলিঙ্গ আদি কৰিয়া নৃত্যগীত শ্ৰবণ ও অন্যান্য
অনন্দ উৎসবে কালচৰণ কৰেন। নিরুপ্ৰাণ ও নিরুৎসাহ
মূৰ্ছকও থাকেন না। (২৭শ অধ্যায়।) তাঁহাৰ
পিতৃদেৱে বচনাঃ অমুকৰণে তিনি অনেকগুলি সাধনবিষয়ক
সঙ্গীত বচনা কৰিয়াছিলেন ইয়া পূৰ্বেই অম্বাৰা উল্লেখ
কৰিয়াছি। তাঁহাৰ রাজত্বকালে যে সমস্ত গ্ৰন্থ বাহ্যিক
অনুষ্ঠিত হয় তাহাৰ মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য—

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী—মহোনাথ লক্ষ্যকৃত।

চণ্ডিকাৰ ব্ৰতকথা—মাদনচন্দ্ৰ দ্বিজকৃত।

অশ্বমেধ পৰ্ব—মহোনাথ লক্ষ্য কৃত।

শিবপূজা—দ্বিজ বৈষ্ণৱাধ কৃত।

আদিপৰ্ব মহাভাৰত—দ্বিজ কৃষ্ণদেৱ কৃত।

অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স হইতেই মহোনাথ শিবেন্দ্রনাথৰ
ধৰ্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। পিতা হৰেন্দ্ৰ-
নাথৰ ন্যায় তিনিও গুরুমুখে মন্ত্ৰজাতি কৰিয়া তাহাৰ
সাধনে গভীৰভাবে মনোনিবেশ কৰিয়াছিলেন। তাঁহাৰ
ৰচিত সঙ্গীতগুলিৰ মধ্যে দুইটি সঙ্গীতে তিনি ‘শ্ৰীগুৰু’
কথা উল্লেখ কৰিয়াছেন।

‘গুরুদত্ত তত্ত্ব সত্য ভাব দিবানিশি।’

‘চরণ তরণ তরীঃ কৰা শ্ৰীগুরু কাণ্ডারী :

ভক্তিপান তুইনা। দিয়া পাৰ হইব কবে।’

এইরূপ সাধনাৰ দ্বাৰা কেবলমাত্ৰ নিজৰ আত্মিক
উন্নতি সাধন কৰাই তাহাৰ উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহাৰ
প্ৰজাপুঞ্জও বাহ্যতে ধৰ্ম্মপথে থাকিয়া দুৰ্নীতি পৰিহাৰ
কৰে এবং ন্যায় ও নীতিৰ বিধান মানিৰা চলে সেজন্য
তিনি সৰ্বদা সচেত্ন ছিলেন। ‘বাজোপাখ্যান’ লেখক

জয়নাথ ঘোষ এই প্ৰসঙ্গে লিখিয়াছেন, ‘মহোনাথ শিবেন্দ্র-
নাথৰাজা হইয়া প্ৰথমতঃই প্ৰজাৰ অবস্থাৰ প্ৰতি
দৃষ্টিপাত কৰিয়া রাজকাৰ্য্য ও রাজত্ব সম্বন্ধে চিন্তিত অনিৰ্ণয়
ও অত্যাচাৰ যে সকল ছিল তাহা পৰিগ্ৰহাৰ্থে...ধৰ্ম্মসভা
নামক এক সভা স্থাপন কৰিয়া মধ্যো মধ্যো ঐ সভাতে
মন্ত্ৰিবৰ্গ সমভিষাহাৰে সভা হইয়া রাজকাৰ্য্যোৰ বিচাৰ
ও বিবেচনা কৰিতে লাগিলেন।’ (বাজোপাখ্যান,
প্ৰত্যক্ষণ ২৭ অধ্যায়)

‘বাজোপাখ্যান’ পাঠে আরও জানা যায় যে...
মহোনাথ (শিবেন্দ্রনাথৰাজ) তাঁহাৰ পিতৃদেৱেৰ আৰু
অসমাপ্ত মন্দিৰাদিৰ নিৰ্মাণকাৰ্য্য সমাধা কৰিয়াছিলেন,
এবং সমস্ত দেৱালয়ে বাহ্যতে নিত্য সেৱাপূজা, বাগবজ্জ,
হোমপূৰ্ণচৰণ প্ৰভৃতি রীতিমত অনুষ্ঠিত হয় তাহাৰ
জন্তু ব্যৱস্থাপূৰ্ণ ব্যৱস্থা কৰিয়াছিলেন। তিনি যে
শাস্ত্ৰজ্ঞ পণ্ডিতগণেৰ দ্বাৰা তত্ত্ব, পুৰাণ প্ৰভৃতি শাস্ত্ৰগ্ৰন্থেৰ
অনুবাদ কৰাইয়াছিলেন তাহাতেও তাঁহাৰ অনসাধাৰণেৰ
মধ্যে ধৰ্ম্মভাব প্ৰচাৰ কৰিবাৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ পায়।

রাজকাৰ্য্য পৰিচালনা কৰিতে কৰিতে কয়েক বৎসৰেৰ
মধ্যেই শিবেন্দ্রনাথৰাজেৰ মনে তীব্ৰ বৈরাগ্যেৰ সঞ্চার
হয়। তাঁহাৰ কোনও সম্ভাৰনা না হওৱাৰ স্বাৰ ভাতা
বজ্ৰেন্দ্ৰনাথৰাজেৰ পুত্ৰ নৰেন্দ্ৰনাথৰাজকে তিনি দত্তক
গ্ৰহণ কৰিয়াছিলেন। তিনি বখন বৈরাগ্যবেশে রাজ্য
ছাড়িয়া বাৰাণসী যাত্ৰা কৰেন তখন নৰেন্দ্ৰনাথৰাজ
নিতান্তই নাৰাজক ছিলেন। কিন্তু রাজ্যেৰ মায়া, অথবা
অন্ত কোনও চিন্তাই তাঁহাকে রাজসংসাৰে ধৰিয়া ৰাখিতে
পাৰে নাই। তদৌৰ মন্দিৰী শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণেশ্বৰী আইদেবতী
পূৰ্বোন্নিধিত বেহাৰোদন্ত গ্ৰন্থে লিখিয়াছেন—

‘সপ্তবৰ্ষ রাজ্যাধিপ রাজত্ব কৰিয়া।

সংসাৰ মায়াৰ কূপ মনেতে ভাবিয়া ॥

তুচ্ছ জানে রাজ্যকাৰ্য্য সব পৰিহরি।

প্ৰকাশে ঔদাস্তভাব মনতাপ কৰি ॥” (পৃ: ১৮)

এই মহারাজের মতে মহারাজ স্বপ্নযোগে আভাস পাইয়াছিলেন যে তাঁহার জীবনাবসানের আর বেশী বিলম্ব নাই। সেই জন্যে তিনি কালীধামে শিব ও শিবানীর দর্শনলাভের জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব হইয়া পড়িয়াছিলেন।

“অতএব রাজ্যে মোর নাহি প্রয়োজন।

কিরূপে শিবানী শিবে করিব দর্শন ॥” (ঐ, পৃ: ১২)

তাহা-ছাড়া অকালে বাতরোগের আক্রমণে তিনি ক্লান্ত ও পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাও তাঁহার রাজকাৰ্য্যে বিঘ্নিত ও কালীধামে যাত্রা করিবার অন্ততম কারণ। কালীধাত্র প্রাকালে তিনি এক্ষেপ্ট সাহেবকে নাকি এই কথাই জানাইয়াছিলেন :—

“বাতে ক্লান্ত অধৈর্য্য নিতান্ত সর্বজন।

বিশেষর দর্শনে হয়েছে মম মন ॥”

(বেহারোদন্ত, পৃ: ২০)

মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের যে সঙ্গীত সংগ্রহ কুচবিহার সাহিত্য-সভা কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দুইটি গানে কালীধামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি গানে তিনি মনকে কালীধামে বাইবার জন্য মন্ত্রণা দিতেছেন, অথচ পরবর্তী সঙ্গীতেই রামপ্রসাদো জগে গাহিয়াছেন—

“কাজ নাঞিরে মন কাশী : কেন যাব বারানসী :

যাব হরহৃদিপদতলে : ঐ রূপ ভালবাসি ॥” ইত্যাদি

(১৭ নং সঙ্গীত)

সঙ্গীতসংগ্রহের গানগুলির মধ্যে কোনটি কোন সময়ের রচনা তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এই পুস্তকে কোনও গান পূর্বে কোনও গান পরে আছে বলিয়া তাহাদের রচনাকালও যে ঐরূপ পূর্বপর হইবে এরূপ অসম্ভব করিবার কোনও কারণ নাই। আমাদের মনে হয় যে

উল্লিখিত কালীবিষয়ক দুইটি গানই মহারাজের কালী-গমনের বহুপূর্বে রচিত হইয়াছিল।

কুচবিহার সাহিত্যসভা হইতে মহারাজের যে সঙ্গীত সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মোট ৪৭টি গান আছে। তাহার মধ্যে দুইটি গানে শিবেন্দ্রনারায়ণের ভণিতা পাওয়া বুঝা যায় যে তাহা মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের রচনা। উক্ত গ্রন্থের সম্পাদক কুচবিহার সাহিত্যসভার ভূতপূর্ব সহকারী সভাপতি পরলোকগত শ্রদ্ধেয় যোবান মণশর বাকী ৪৫টি সঙ্গীত মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের রচনা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, যদিও তাহার মধ্যে কোনও কোনও গানের ভণিতার শিবেন্দ্রনারায়ণের নাম নাই। গানগুলিকে প্রধানতঃ তিনভাগে ভাগ করা যায়—(১) ইষ্টদেবী শ্রীশ্রীকালীমাতার রূপবর্ণনা বিষয়ক : (২) ইষ্টদেবতার নিকট সাধকের আত্মনিবেদন বিষয়ক এবং (৩) আগমনী বিষয়ক। সঙ্গীত রচনার শিবেন্দ্রনারায়ণ খ্রীষ্ট পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তিনি যে এ বিষয়ে বিশেষ সিদ্ধহস্ত ছিলেন তাহা তাঁহার দুই চারিটি সঙ্গীতের আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। সঙ্গীতগুলির অধিকাংশই আকারে বিশেষ বড় নহে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্গীতগুলির মধ্যেই অল্প কয়েকটি কথার সাহায্যে তিনি কালোমায়ের এক একখানি জীবন্ত ছবি আঁকিয়া ফেলিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ এই গানটি লওয়া যাইতে পারে,

“কার কামিনী একাকিনী রণে সাঝিছে :

করে অসি ভালে দ্বিজরাজ রাঝিছে :

দেখিয়া বামার রাত সুরগণ চমকিত :

পদভরে অবনৌ অর্মান কাপিছে :।

হৃদকার নিশ্বনে মনুষ্য ধলিছে : ॥”

(১২ নং গান)

গানটিতে বর্ণনার গতি সরল অথচ বাধাহীন। অলঙ্কার চাতুর্যের সন্নিবেশে ইহার গতিকে আড়ষ্ট করা হয় না। কয়েকটি মাত্র সরল কথার মধ্য দিয়াই কালীর দম্ভজ-দলনী রূপটি পরিষ্কার ছুটিয়া উঠিয়াছে।

আত্মনিবেদন বিষয়ক সঙ্গীতগুলিও সরল ভাষায় অকপট আত্মনিবেদনের মাধুর্যে সরস হইয়া আছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা এখানে একটিমাত্র সঙ্গীত তুলিয়া দিলাম।

“তারা এবার কি হবে উপায় :

আমি লৈগছি আশ্রয় :

তুমি তারা জ্ঞানহরা মহাদেবে কর :

ভজন শুবন আমি কিছুই মা নাহি জানি :

কিরূপে এড়াব আমি শমনের দার ॥

শ্রীশিবেন্দ্র ভূপে ভনে নিবেদি মা শ্রীচরণে—

অমৃতকালে পদতলে রাখিও আমার ॥ (৩০ নং গান)

কোনও কোনও সঙ্গীত প্রধানতঃ রূপবর্ণনা বিষয়ক হইলেও ভক্তির সাধক ইষ্টের নিকট আত্মনিবেদন করিয়াছেন। এই সঙ্গীতগুলিকে মিশ্রধরণের বলা যায়।

আগমনোবিষয়ক সঙ্গীতগুলির গঠন ও ভাব অন্তান্ত সাধক ও কবির রচিত আগমনো গানের অনুরূপ। ইহার মধ্যে অধিকাংশই গিরিরাজের নিকট নগেন্দ্রনাথের ধোদোক্তি অথবা গিরিনন্দিনী উনার পিতৃভাষ্যে আগমনে ধরার আনন্দোৎসবের বর্ণনা।

শিবেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গীতে আমরা কোনও দার্শনিক তত্ত্বের পঙ্কির পাই না। কোন একটি সঙ্গীতে তত্ত্বশাস্ত্রে

বর্ণিত মূল্যায়নতত্ত্বের সামান্য উল্লেখ দেখিতে পাই তিনি লিখিয়াছেন—

“সার্বত্রিকবলয়াকৃতি রূপে মূল্যায়নে স্থিতি

পদ্যবনে জায়া শিব সঙ্গো মিলিয়াছে ॥” (৪৪ নং গান)

একটি সঙ্গীতে কুচবিহারের প্রতিষ্ঠিত দেবতা রামরসেশ্বর শ্রীশ্রীমদনমোহনের রূপবর্ণনা ও তাঁহার পাদপদ্মে আত্মনিবেদন ইহাতে বুঝা যায় যে মহারাজ শক্তিসাধক হইয়াও অন্তান্ত দেবদেবীর প্রতি ভক্তিপরায়ণ ছিলেন।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে ভাষার ও ভাবে মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ সঙ্গীতরচনার তাঁহার মহামুগ্ধ পিতৃদেবের পদ্যক অনুরণন করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে উভয়ের সঙ্গীতের মধ্যে বোধে সাদৃশ্যও লক্ষিত হয়। তাহা হইলেও শিবেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গীতে দেশভাষ্যের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত কম থাকায় তুলনায় তাঁহার রচনা অধিকতর মার্জিত বলিয়া মনে হয়। দেশীয় ক্রিয়াপদের ব্যবহার তিনি যথাসম্ভব এড়াইয়া গিয়াছেন। ফলে কোনও কোনও সঙ্গীতের রচনার স্থানীয় ভাষার কিছু মাত্র প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। উদাহরণস্বরূপ একটা সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

রাখিছে মনুজপুরে দম্ভজদলনী।

বামিনী জনমে জেন নহরিছে দামিনী ॥

হরহরি পদতলে : বিরাজিছ কুতুহলে ॥

বেন খেতাক্রহ পর : শোভে নীলনলিনী।

ভববিঘ্ন নিঘ্ন কর : মনের মানস পুর—

কলান্তক ভরহর : কামান্তক মোহিনী ॥

(১৩ নং গান)

দ্রষ্টব্য—অনিবার্য কারণে অনিল ভট্টাচার্যের উপন্যাস “উপনদী” এ মাসে বাহির হইল না।

পূর্বরাগের আগে

শ্রীসুখাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

শীতের ভোর—সোনালী রোদ্দুরের মিঠে আমেজ, শিশির-ভেজা চক্কে বাসের উপর টলটলে বিন্দুগুলি যেন সন্তকোটা অতীতকাল। পুরু ড্রেসিং গাউন্স গায়ে কয়েকটি বাংলার বারান্দা থেকে নেমে পরিতোষ বাগানের দিকে এগিয়ে এল। মেজাজে গেছে চড়ে, বস আসেনি, প্রাণরাসের আরোহণ দেবী হয়ে বাজে। এ রকম অনিয়ম ও ডিসিপ্লিনহীনতা সে কিছুতেই বরণাস্ত করে না। নিজের ঘড়ির কাঁটার মত কাজ করে, সবার কাছে আশা করে ঠিক সেই রকম নিয়মাবলি। তার উপর কাল থেকে শরীরটা ম্যাকমেজে, কুইনাইন মেগাক্রিন সবেও শ্রীহার সঞ্চিত ম্যালেরিয়ার বিষ মাঝে মাঝে সজোরে তাড়া দিয়ে জানিয়ে দিয়ে যায় তাদের গোপন অভিসারের ইতিহাস। তিনটে কক্ষ, দুটো লেপের প্রবল আলিঙ্গনেও, সে আনাবিল প্রেমকম্পনের শাস্তি হয় না, উত্তাপ বেড়ে চলে। পাইপ মুখে পাইচারী করতে করতে তার দৃষ্টি চলে গেল ঐ হৃদয়-প্রসারী আলো বাতাস বৈচিত্র্যরাঙা বাইরের দিকে, সামনে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের পর পাহাড়, ধূসর ধানী, তার মাঝে নেমেছে একটি ক্ষীণজলধারা রূপালী স্রোতের মত। জালের ভরা ঘোবনের দিনে তার ময়ূরের মত সাতরঙা পেশমতোলা রূপের বাহার যে দেখেছে সেই মনেছে, প্রতিটি অঙ্গ উদ্ভাস তরঙ্গমুখর, প্রতিটি ভঙ্গী কুলভাঙনের নেশায় পাগল। ছোট পাহাড়ী নদী, বেন একটি ঠোটকোলানো অভিমানিনী মেয়ে, বছরের ন'মাস ঘুমিয়ে পড়ে রূপের কাঠির ছোঁয়ায়, বর্ষার তিনমাস

জঙ্গে ওঠে সোনার কাঠির জীরনে, নাচে, গায়, হাসে। নামটিও তেমনি, ময়ূরাক্ষী।

পরিতোষ জব্বর ইঞ্জিনিয়ার, কলকাতার বড় কাজ ছেড়ে এখানকার ছোটকাজ নিয়েছে ইচ্ছে করে, তার স্বপ্নের সঙ্গে খাপ খায় বলে। কাজ তার শুধু দিনের পেশা নয়, রাতের নেশাও বটে। কত অশান্ত নিশীথ রাতে অতলু করনার ডাল সে বুনেছে, কেমন করে এই প্রগলভার হরন্ত ঘোবনকে ফাদে বাঁধবে, এর সুকর ক্ষীরধারা নেবে লুটে, বীর্ধ্যবতী হবে অমুর্ক্ষী বক্সা বহুক্ষরা, জাগবে মাটি, বাঁচবে মানুষ খেয়ে পরে। শ্রীহীন হ্রীহীন দুর্গতদেশে লক্ষীর বাঁপি ভরে উঠবে ধানের সোনার শীষে, নিরঞ্জন মূর্ধে হুটি অঙ্গ, একটু আশা।

বস এসে সেলাম করে পাড়াল, উর্দ্ধিপরা তকমা জাঁটা, নিঃসৃত। কড়া মনির, হাতঘড়ির দিকে দৃষ্টি চলে গেল, ঠিক একত্রিশ মিনিট লেট—একটা রাত্রজনোচিত সুসভ্য ধমক মুখে এসে হঠাৎ ধমকে গেল তার মুখের দিকে চেয়ে, তার গালে বেন নিঃড়েনেওরা চড়ের মার, সর্বস্বারা সর্বনাশের আভাস, খেমে গিয়ে বলে—উমু কাঁহাকা, আধাঘটা দেবী, এক রূপেরা ফাইন্। একটা প্রতিবাদ করলে না সে, চুপ করে চলে গেল লোকটা, বিবর্ণ কোলা চোখের এককোণে একটু সজল রেখা—জোয়ান্ কালো মরদ, পেশীবহন সন্তোজ, হারিয়েছে তার দৃপ্ততা, রুদ্ধবীর্ধ্য সিংহের মতো।

পরিতোষ বারান্দায় গিয়ে উঠল, কনকনে ঠাণ্ডা, পা হটো ঢেকে দিলে একটা রাগে। বস স্থির দাড়িয়ে



অকম্পিত হাতে আশু এগিয়ে দিলে বেকফাষ্টের ট্রেটা, সমৃদ্ধময়িত সুগন্ধি চা, আঙাপোচ, দুটুকরো মাখন-জেলি মাখানো রুট, পরিজ। খেতে খেতে গরম মেজাজ্ নরম হয়ে এল; পরিতোষ মনে মনে স্বীকার করলে এমন প্রভুবৎসল কশ্মিষ্ঠ-চাকর সে বহুদিন পায় নি। কনফার্মড্ ব্যাল্চনার পরিতোষকে কিছুই দেখতে হয় না। যেমন সাহসী তেমনি সং, ভদ্র কারদাহরুস্ত, বিনয়নন। বছর খানেক থেকে একটু বদলেছে বেদিন থেকে কমরু নিয়ে এসেছে ঘরে মুলীকে, সকালবেলা কচিং কদাচিং দুএক মিনিট লেট হয়ে যায়, রাতে দুএক দিন ছুটি চেরেছে সকাল সকাল, ইন্ধিতে ভঙ্গীতে একটু রঙ্গীন্ মনের ছাপ, দুএককলি দুর্কোষ্য সাঁওতালী ভাষার গান। কাছের দিক থেকে কিছু একদিনও কাকি নেই, নিটোল নিকাপ। পরিতোষ হাসলে—আদিম মানুষের অনাদি জৈববৃত্তির ঠাত থেকে কারো কি নিস্তার নেই। কেন যে সে নিজের বিয়ে করেনি তা নিজেই জানে না। সুরূপ সুদর্শন বিস্তালী উচুপায়াধারী বিলাত আমেরিকা ফেরত বড় ইঞ্জিনিয়ারের পাত্তী ছুটতে কোন দেশেই দেয়ী হয় না, কন্ডাকুমারী বাংলা দেশে ত নয়ই, বিয়ে করার আন্তরিক তাগিদ পায় নি মন থেকে। কত অনুচারা ও তাদের মায়েরা চারের আসর সরগরম করে তাকে ঘিরেছিল বিলেত থেকে ফিরে এসে মোটা চাকরী নেওয়ার পর, সে কথা মনে করলে আজ হাসি পায়। চাঁচাছোলা, আঁকাবাঁকা, কত ধাঁড়ে, কত পোজে কতপন্থী গান সে মরিয়া হয়েই শুনেছে, কত সেতার এসরাজে কসরত, শঙ্করী মধিপুরী কথাকণী বোলপুরী নাচের ঢং, তার হিসার রাখতে হলে চাঁচাড্ হিসাবনবীশকে ডাকতে হয়। কুমারীদের ছি ও মহাশু প্রকৃতনিমবেগুন সুতো ব্রাউনি লেডীকেনী

চন্দ্রপুলি থেকে সিলোনকারী মেক্সিকান্ ক্রাই, হাওয়াইয়ান্ পুডিং পর্যন্ত সে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় খেয়েছে, কবিশুরু কাকে কলাইন্ ফিকে আশীর্বাদ করেছিলেন, কে পেয়েছে গীতবিতানে কটা মেডেল, ইন্সটিউটে কটা প্রাইজ তাও হাসিমুখে দেখতে হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ বা দিবি গোরবরণ, কেউ বা তন্নী শ্যামা কেউ করে চাকুরী। কাকর সিঁড়রে অধর, লাল ঠোঁট, পালিশ করা চিবন্ নোখ, দেখেছে কত ফ্যাশানের কত শাড়ী, কানের কত ডল, কত ছাঁদের করবীবন্ধন, শুনেছে কত গতিপ্রগতির বুকনি, বেন সব রূপোলীপাতেমোড়া দামী তর্দাদেওয়া সুরতি পান যার সাময়িক সুগন্ধ দেহকে তাতায়, মনকে হাতায়, কিন্তু গভীরভাবে নাড়ায় কিনা কে জানে। অতম্বর এত আয়োজনের মাঝেও সে কিরকমে অবিকৃত রূপে অক্ষত যৌবন, অখলিত কোমর্যা অটুট রাখল সেইটাই তার কাছে আশ্চর্য লাগে। শেষের দিকে অনুচারা ক্রমশাই নবোচ্চ হয়ে উঠল, মায়েরা হলেন রুচা। নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ কমে এল বালিগঞ্জী সূসভ্য সমাজে, টেনিস্ লনে তাকে পার্টনার করার জন্য আর কাঁড়াকাড়ি হয় না, কথা লোকানুফি চলে না লুক ফুক মনে ড্রিংক্রমের গানের ফাঁকে। তার প্রিমিয়ম কমে আসে। শেষ পর্যন্ত শুধু মিলি রাইই অপূর্ক অধ্যবসার নিয়ে হাল ছাড়ল না।

সেদিন সন্ধ্যায় সে বেরিয়েছিল উপলবহলা নদীর ধার বেয়ে বেয়ে গাঁয়ের দিকে, সামনে মশানজোড়ের পাহাড়, আনত আকাশের শীলাভ ছায়া পড়েছে চঞ্চল বনের আঁচলের উপর, দূরে মহামাতাল সাঁওতালদের মাদলের শব্দ। ঝঠাৎ মনে পড়ল কমরু আজ অসুখ বলে ছুটি নিয়ে এসেছে, খবর নিয়ে গেলে হয়, এবেলা কিরকম আছে। ঘুরতে ঘুরতে সে এসে দাঁড়ালো একটা নিকোনো ঘরের আঙ্গিনায়, ওক্তক্ বক্ বক্, সাদা পালিশকরা

মেওয়াল, লতাপাতা বাব ময়ুর আঁকা। দাওয়ায় ছেঁড়া কাঁধার উপর শুয়ে জরতপ্ত বেহঁশ কমর। পাখরে কোঁদা নিকব কালো একটি দৌরাঙ্গী নেয়ে, বোবনআনত বস্ত্রী, খোঁপায় গোঁজা লালকুল, সারাদেহের অগুতে অগুতে একটা আসন্ন সৃষ্টির রহস্যগৌরব, তার নাখাটি কোলে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে কপালে ছল দিচ্ছে। সাহেবকে সে চিনত, সমাজে সে নিজেকে শুছিয়ে সংবত করে সমগ্রমে জানাল—কমর আজ ছপুর থেকে বেহঁশ হয়ে আছে—সাহেব যদি দয়া করে ডাক্তারের ব্যবস্থা করেন, কথা কইতে কইতে নাখার খোঁপার লালকুলটা যেন মূলীর মুখে রেণু মাখিয়ে দিল। পরিতোষ অবাক হয়ে চেয়ে রইল। সত্যি, এইত সেদিন তার অর হরেছিল, কেই বা তার নাখার হাত বুলিয়ে দেয়, কেই বা তার দরদভরা চোখদুটো দিয়ে চেয়ে থাকে তার তপ্ত মুখের দিকে সারা বিশ্বের বেদনা নিয়ে। বেরিয়ে এসে হেসে ফেলে সে—হায়রে নোড় বাধার স্বপ্ন। বাংলোর কিরে এল—বৈকালো ডাকে এসেছে চিঠির ডাড়া। একটা লিখেছেন সুদূর গাঁ থেকে পিসীমা পেট্রোম্যাক্সের জলজলে আলোর সে পড়ে ফেলল—বাবা পরিতোষ, তোমার বাপ মা কেউ নেই, আমার পিতৃবংশের তুমিই একমাত্র বাতি—এত বয়সেও বিয়ে করলে না—সত্যি কি আমার বাপপিতেমোরা এক গণ্ডুষ জল পাবে না—দোহাই আমার তুমি এসব মানোনা জানি, বিলেতফেরত বড় সাহেব, কিন্তু তোমার কোলে পিঠে মাছুষ করেছি চারমাস বয়স থেকে যখন তোমার মা আমার কোলে তোমায় দিয়ে চলে গেলেন, পরীব পিসীর একটা কথা রাখো—ডাগরডোগোড় দেখে একটা বিয়ে করো, থাকে খুশী তোমার, পিতৃহীন বন্ধার থাকুক। এই পিসীমাই মায়ের আর্ন্তমানে নিজের বুকের দুধ দিয়ে বাচিয়েছিলেন, আট বছর পর্যন্ত মাছুষ করেছেন, বতদিন

না তার বাপ তাকে কলকাতায় রেখে পড়াবাব বন্দোবস্ত করেন। তারপরেও কত গ্রোয়ের বন্ধে পুছোর ছুটিতে নিয়মিতভাবে পিসীমার ঘেহ অকনের নোচে আশ্রয় নিয়েছে, পুছুর নদীতে কত স্নান সঁাতাব, আমজানজামকলের কাড়াকাড়ি, আসত গোরী, পাশের বাড়ীর খাড়ী মেয়ে কত খেলা তার সঙ্গে, পুছুর থেকে বউ বউ অম্বি। খচ করে উঠল মন শতাব্দীর একচতুর্থাংশ কেটে গেছে তার পরে, সুখগ্রন্থের ইতিহাস বেয়ে, কি পেরেছে সে, গোরী... আজ সে কোথায়, কি রকম তাগাতাবিঙ্গ পরে নোটা মোটা গিনিবানী হয়ে কতগুলি সম্রানের জননী কে জানে। কলেজে পড়া শুরু করে আর সে গ্রামে যায় নি। তার বাপের বড়াহুহুম—পিসীমার শত কান্নাতেও হাকিম নড়েননি, হুকুম ত নহই; শুধু সাগরপারে বাবার আগে লুকিয়ে সে কয়েক ঘণ্টার স্বপ্ন এসেছিল, তখন সে আর পিসীমার আঁচল-বেঁবা বালক নয়, দৃপ্ত তরুন পৃথিবীজয়ের স্বপ্ন চোখে। পিসীমা ঠেঁকে বলেন—তোমার বাপ এমনি পাষণ বে একদিনের জন্যও এই পাঁচবছরে আসতে দিলে না। আসবার সময় পুছুরধারে আমগাছের নাচে গোরী দাঁড়িয়েছিল। সন্তমূলিতমোবনা শ্রামলা মেয়ে, কালো দাঘির মত ডাগর চোখের ভাষা, তেমনি অস্তল। শোনা যায় পিসীমা নাকি একদিন অতি দ্বিধার সহিত রাশভারী বড় ভাইকে বলেছিলেন—‘আচ্ছা দাদা, মুখুযোদের গোরীকে বউ করলে’ কেনন হয়—বড় ভাব ছুটিতে। পরিতোষ তখন ম্যাট্রিক দিয়েছে, গোরী সবে এগারো, পরিতোষ অবশ্য এ সব কথা কিছু শোনেনি, গোরীও না, পিসীমার মনের আকাশকুসুম। সেকালের নামকরা সমাজসংস্কারক উনারপহা, মিল্ বেহাম্ ম্যালথাস পড়া নোতিবাগীশ হরিমোহনবাবু এমনি উচ্চহাসি হেসেছিলেন যে পিসীমা একেবারে চুপ।

পরিতোষ তখনি জবাব লিখে দিলে—পিসীমা, আমি যে কাজে হাত দিয়েছি তাতেই আমার সব ঢেলে দিয়েছি, যা গড়ে উঠছে সেই আমার মানসপুত্র, অগ্রহীনের মুখে উঠবে ছোটো অন্ন, জলধীন পাবে জল,—তাতেই কি তোমার পূর্বপুরুষদের তর্পণ হবে না—

পিসীমা কৈদেকেটে আবার লিখলেন—বাবা, আমি অত বড় কথা বুঝি না, তুই বিয়ে কর, তোর রাঙা বউ দেখে আমি মরি। এই সেদিন তোর জরের খবর পেয়ে কৈদে মরি, ছুটে যেতে পারলুম না—তবু যদি বোমা থাকিত, ধানতাম সেবা বড় করবার একজন আপন লোক আছে। মায়েদের মেহ, বোয়েদের ভালবাসাদরদ না পেলে মানুষ সত্যিকার বড় হয় না, অবজ্ঞা কারসান বাবা, ভেবে দেখিস গরীব পিসীর কথাগুলো। পরিতোষ আর জবাব দেয় নাই শুধু সে ভাল আছে জানিয়ে দিয়েছিল মাসিক মণি-অর্জারের কুপনের নীচে।

সেই পরিতোষ আজ যেন কিছুটা দুর্বল মনে করছে নিজেকে, কিসের যেন অভাব। ভারতে, ইউরোপে, আমেরিকায়, জীবনে কত মেরেকেই দেখেছে, কেউ কেউ হস্ত তাকে কামনা করেছে। বাংলা দেশের মিনমিনে মেয়েদের কথা ছেড়ে দিলেও, সাগর পারে কত জীবন-উজ্জল মেয়েদের সান্নিধ্য সে পেয়েছে। নাইট-ক্লাবের নাচের আসরে সে নেচেছে, প্রোমেনাদ ডেকে নরইজিয়ান ফ্লোরিডের ফোটাফুঁড়ি আলোর মাখে বেড়িয়েছে, পেলবতমুতটসীমায় সুইমিং পুলে নেমেছে মিল্ড সঁতারে, কই কোন দিনত সে নিজেই সেটিমেন্টে দুর্বল মনে করেনি, আজ এই যশানছোড়ের শ্রমানে কি অকাল বসন্ত এল, শাল-মহুয়া বনের লাল ফুলের রংএ রোমাটিক হয়ে উঠল। না, না এসব দুর্বলতার সে প্রশ্রয় দেবেনা, কাজই তার জীবনের চরমব্রত, প্রেমসীর অপ্রচোদ তার জন্য

নয়, প্রেম ত একটি সাময়িক বিলাস, শিরায় উপশিরায় ঝায়ুতে তরীতে লাকলাফি দাপাদাপি সবই এণ্ডোক্রাইন উচ্ছাসের ফাস, রক্তের কেমিক্যাল প্রতিক্রিয়া, বায়োলজীর দাবী, এত সহজে মনে কাবু হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ। নাঃ, উঠতে হল এ মাসের সার্বেস ও কালচারে দামোদর ভ্যালী পুনর্গঠন সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন তথ্য বেরিয়েছে, পড়া দরকার; 'বয়' বলে সে ডাক দিলে। 'জী হজুর' বলে কীণ সাড়া এল ঝজুসী ঝাউগাছের তলা থেকে—চুপ করে বসে আছে লোকটা বিবাদধির মুখে। নাঃ এ রকম করে চলেনা, সে যমকে উঠল—ইধার আও। সে উত্তর দেয় না, মালা কাছে ছিল, ভরে ভরে বলে—হজুর কাল রাতে ওর বউ মারা গেছে। শুনেছিল বটে কিছুদিন আগে মূলো মা হয়েছে, বয় ছুটি নিয়েছিল হিসাব করে ছবটার জন্ত, এক মিনিটও এদিক ওদিক হয়নি। 'বউ মারা গেছে' কথাটা যেন পরিতোষকে একটা সম্বোরে চাবুক মারলে। হি, হি, তাকে শুধু শুধু বকেছে, মনে হোল যেন মারা বিশ্বের বিরহীদের বেদনা নিয়ে ধুলোর নুটুচ্ছে এক জোরান মরদ, সামনে নিস্ত্রাণ পাথরকোদা লালফুল গৌজা যৌবনউজ্জল মেয়েটির শেষ চিহ্ন; কয়েক দিনের একটা শিশুর অবস্থা কান্না। তার দিকে সে চাইতে পারলে না, অপরাধীর মত ভারী গলায় বলে—তোমার আজ ছুটি।

বয় চলে গেল চাপরাশী এসে সেলাম করে দিলে এক জরুরী টেলিগ্রাম। রিভার রিসার্চ ইন্সটিটিউটের বড় সাহেব আসছেন ময়ূরাক্ষীর মোহনা পরিদর্শনে—সঙ্গে দুজন মার্কিন বিশেষজ্ঞ—টেনেসিভ্যালির করিতকর্ণা লোক। একটু অপ্রসন্ন মনেই সে উঠল। যেতে হবে একশ মাইল দূরে বর্জমানের গঙগ্রামে, টেনে যাওয়ার সুবিধা নেই,

অগত্যা ভাঙ্গাচোরা খানারোদল পথ ভেঙ্গে বীরভূমের
রাঙ্গামাটি বেয়েই পাড়ি দিতে হবে মোটরে।

আমছোড়া ঘাটে বধন সে পৌছিল, তখন শীতের ছপুর
গড়িয়ে অপরাহ্নে পৌঁছেছে। আশ্বিন-রাঙ্গা দিনের
শেষ, গ্রামের পর গ্রাম, ধুলোর পর ধুলো, দিগন্ত বিস্তারিত
নাঠ। মোটরের স্পীড সে বাড়িয়ে দিলে। টুইন্
কার্বুরেটর গর্জন করে উঠল। রাজপথের রাছোচিত
অভ্যর্থনার পিঠে কোমরে বেদনা যেন বাড়তেই লাগল,
কপালও বেশ গরম, মাথাটা গুলিয়ে বাচ্ছে। তার পরের
কথা কিছুই মনে নেই। আবছা আলোর সাথে আধো
জাগা আধো সুপ্তির ক্ষণ ছায়ার মাঝে একটা রহস্যময়
বেদনাপ্রসূত অনুভূতির একটা অস্পষ্ট স্মৃতি সিনেমার ছবির
মত—যেন কে তার আতপ্ত কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে,
স্নেহমন্দির একটু পরশ, চোখের দৃষ্টি মমতার উপছিরে
পড়া, হৃ-একগাছি চুল আলগোছে লাগছে বুকের উপর,
একবার একটা উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের কোমল ছোঁওয়া যেন
সে অনুভব করল। তারপর সব কালোর পর্দায় ঢেকে
গেল। আর কিছু মনে নেই।

সকাল নটার সে ফিরে গেলে তার নৃপ্ত চেতনা, অরের
ঝোঁকে চালাতে চালাতে তার গাড়ী রাস্তার বাইরে পড়ে
অকর্মণ্য হয়ে বার। সঙ্গে চাপরাশী অতিকণ্ঠে লোকজন
ডেকে অচেতন তাকে নিয়ে তোলে গ্রামের ডাকবাংলোর।
যে পুকুরে কসে রানী কাঁচত কাপড় আর বাগুগীতরু
চণ্ডী ঠাকুর ধরতেন মাছ তারই পাড়ে নার রের ডাকবাংলো।
পরিতোষ উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো রাত্রে তাকে
শুশ্রূষা করেছিল কে—কিন্তু শুনে গ্রামের ডাক্তার,
চাপরাশী ও চৌকিদার ছাড়া আর কেউ আসেনি।

তিন মাস পরে কলকাতা থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে বধন
ঐ অঞ্চলেরই এক অনতিশিক্ষিতা গীতের ডাগর মেয়েকে
হঠাৎ বিয়ে করে ফেললে তখন সবাই উঠল আশ্চর্য্য হয়ে,
কেউ বলে—এবে অতি বড় ঘরগী না পার ঘর—কেউ বলে
পাগল। মিলি রায় বলে, ক্যাড।

শুধু পিসীমা তাঁর শত আশীর্বাদ জানিয়ে লিখলেন—
একবার ছুজনে আসিস বাবা। গরীব গোরো পাঠিয়েছিল
ছগাছা সাধা শাখা, পূর্ণ প্রোতীর চিহ্ন।

কর্ম

ডাঃ শ্রীনীলাল দে

পথ বলে পড়ে আছি চির চিরন্তন,
প্রাণহীন জড় যথা হীন নিশ্চেতন।
পথচারী বুকে ধরি ধস্ত মন প্রাণ,
অলক্ষিতে করি তবু কর্ম সমাধান।

হাসি

ডাঃ শ্রীনীলাল দে

বিজলীর ছটা সম লাভণ্যের হাসি,
টেনে আনে স্বর্গের অপরূপ রাশি।
বিকাশিত কী বিচিত্র আনন্দ স্বরূপ,
কণিকের মানি হীন অনন্তের রূপ।

রাজপরিবারের সংবাদ

শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর গত ৭ই সেপ্টেম্বর এলগিন, নাসিং হোম হইতে বাহির হইয়াছেন। ৮ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ৯ই সেপ্টেম্বর তিনি কুচবিহার পৌঁছেন। দীর্ঘ-রোগভোগের পর মহারাজের স্বীয় রাজধানীতে আগমনে রাজ্যবাসী সকলেই আনন্দিত হন। ১৩ই ও ১৪ই সেপ্টেম্বর মহারাজ বাহাদুর ষ্টেট কাউন্সিলের দুইটি জরুরী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং ১৬ই সেপ্টেম্বর দার্জিলিং গমন করেন।

কাশ্মীরের মহারাজার আমন্ত্রণে শ্রীশ্রীমহারানী সাহেবা রাজকুমার গৌতম নারায়ণের সহিত কাশ্মীর গমন করিয়াছেন।

মহারাজকুমার ইন্দ্রজিতেন্দ্রনারায়ণ রাজধানীতেই অবস্থান করিতেছেন।

স্থানীয় সংবাদ

কুচবিহারে হিন্দু মুসলমান সম্প্রতি—

বাংলা দেশে দিকে দিকে হিন্দু মুসলমানে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য দেখা দিয়াছে। কলিকাতায় এই মনোমালিন্য এক ভয়ানক দাঙ্গার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অত্যন্ত সুখের কথা এই যে কুচবিহার রাজ্যে হিন্দু মুসলমান বরাবরই পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্বাপন্ন হইয়া বাস করিতেছে। মুসলিম লীগ ঘোষিত

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিনে বা ঈদ উপলক্ষ্যে কুচবিহার রাজ্যের কোথাও কোনরূপ সাম্প্রদায়িক গোলযোগ দেখা দেয় নাই। কলিকাতার শোচনীয় দাঙ্গাহামার পরে পাছে কুচবিহারে কোনরূপ গোলযোগ ঘটে সেই ভয় কর্তৃপক্ষ পূর্ব হইলেই সতর্ক পুলিশ ও সামরিক পাহারার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জনসাধারণও উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে লইয়া শান্তিকমিটি স্থাপন করিয়া পরস্পরের সম্প্রতি বন্ধুত্ব রাখিয়াছিলেন।

মহারাজ রাজরাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু-বার্ষিকী—

গত ১লা সেপ্টেম্বর মহারাজ রাজরাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুবার্ষিকী দিন গিয়াছে। এই দিন প্রাতে কেশবা-শ্রমে মহারাজের সমাধিস্থলে বিশেষ উপাসনা হয়; নববিধান ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত কেশবনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই উপাসনা পরিচালনা করেন। সহরের গণ্য মান্ত অধিবাসী রাজকর্মচারীগণ এই উপাসনার যোগ দিয়াছিলেন। বিকালে মদনমোহন ঠাকুর বাড়ীতে রাজেন্দ্রনারায়ণের সেবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

সরকারী কর্মচারীদিগের মাগ্গী ভাতা বৃদ্ধি—

কুচবিহার রাজ্যের ননগেজেটেড সরকারী কর্মচারীগণ বর্তমান দুর্শ্বাল্যতার জন্য মাগ্গী ভাতা (dearness allowance) পাইয়া থাকেন। বৃদ্ধি শেষ হইলেও জিনিষপত্রের দুর্শ্বাল্যতা কমে নাই; বরং বহু খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই বিবেচনার রাজসরকার সম্প্রতি সকল নন-গেজেটেড কর্মচারীদিগের মাগ্গী ভাতা বাড়াইয়া দিয়াছেন।

বহরমপুর ও স্থানীয় কলেজের ফুটবল খেলা—

বহরমপুর কলেজ হইতে একটি ফুটবল টিম খেলিবার জন্য কুচবিহার আসিয়াছিল। এই টিমের সহিত স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেজের ফুটবল টিমের দুইদিন খেলা হয়। প্রথমদিন ১৪ই সেপ্টেম্বর উভয় পক্ষ দুইটি করিয়া গোল করায় খেলা অসমাপ্তভাবে শেষ হয়। দ্বিতীয় দিন ১৫ই সেপ্টেম্বর শেষ সময়ে বহরমপুর টিম একট

গোল করিয়া জয়ী হয়। খেলা রাজবাড়ীর মাঠে হয়। উভয় দিনই বহু দর্শক খেলা দেখিতে আসেন; মহারাজ ভূপ বাহাদুর এবং মহারাজকুমার উভয় দিনই প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত খেলার মাঠে উপস্থিত ছিলেন।

মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুবার্ষিকী—

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু-বার্ষিকী গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে প্রাতঃকালে মহারাজের সমাধিস্থলে একটি উপাসনার ব্যবস্থা হয়। বৈকালে হাইকোর্টগৃহের সম্মুখস্থ মহারাজের মন্দির মূর্তির নিকটে একটি জনসভা আহত হয়; এই সভায় মহারাজের মূর্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

শোক-সংবাদ

পরলোকক বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী—

কুচবিহার স্টেট প্রেসের হেড্ ক্লার্ক বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া সম্প্রতি ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৬৬ বৎসর হইয়াছিল। বিষ্ণুবারু স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ এবং সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কর্মস্থলেও তাঁহার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। কুচবিহার দর্পণের সহিত ইনি প্রথমাবধি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার অকস্মাৎ তিরোধানে তদীয় শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

দেশবিদেশের কথা

নরেন্দ্রমণ্ডল ও শাসনতান্ত্রিক প্রগতি—

ভারতের রাজন্যবর্গ সমগ্র ভারতের শাসনতান্ত্রিক প্রগতি ও স্বাধীনতার পক্ষপাতী। নিজ নিজ রাজ্যে শাসনসংস্কার প্রবর্তন করিয়া প্রজাবর্গের সহযোগিতায় রাজ্য শাসন করিতেও তাঁহারা আগ্রহী। কতকগুলি কাগজে একটি সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল যে, নরেন্দ্রমণ্ডলের চ্যাম্পেনার একটি গোপন সাক্ষীর প্রচার করিয়া রাজন্যবর্গকে ভারতের শাসনতান্ত্রিক প্রগতিতে বাধা দিতে নির্দেশ দিয়াছেন। এই সম্পর্কে নরেন্দ্রমণ্ডল হইতে একটি প্রেস নোটি প্রচার করিয়া জানান হইয়াছে যে, এই সংবাদ সর্বৈব মিথ্যা ও বিদ্রোহপূর্ণ। চ্যাম্পেনার এইরূপ কোন সাক্ষীর প্রচার করেন নাই; বরং তিনি রাজন্যবর্গকে অবিলম্বে নিজ নিজ রাজ্যে প্রতিনিধিস্বত্ব শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। প্রত্যেক রাজ্যের স্থানীয় অবস্থানুসারে প্রজাসাধারণের যোগে গণ-তান্ত্রিক শাসনসংস্কার বাহাতে প্ররোচিত হয় তাঁহার উপর জোর দিয়া চ্যাম্পেনার বলিয়াছেন যে, রাজন্যবর্গকে সর্বপ্রকারে প্রজাসাধারণের সেবায় এবং দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

মহীশূরের নূতন দেওয়ান—

বড়নাটের শাসনপরিষদের ভূতপূর্ব সদস্য শ্রী রামস্বামী মুদালিয়ার মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রী রামস্বামী অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ এবং শাসনকার্যে দক্ষ ও বিচক্ষণ; আমরা নিশ্চিত যে তাঁহার নিয়োগে মহীশূর রাজ্য আরও উন্নতি লাভ করিবে। এক

সংবাদে প্রকাশ নরেন্দ্রমণ্ডলের চ্যাম্পেনারের আশ্রয় স্থায় রামস্বামী আলোচনা-কমিটির (Negotiating Committee) সদস্যপদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

বাংলা সরকারের “মোর” পরিকল্পনা—

ময়ূরাক্ষী নদীতে বাধ দিয়া ও খাল নির্মাণ করিয়া এই নদীর জল সেচের জন্য ব্যবহার ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের নিমিত্ত বাংলা সরকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। সিউড়ীর নিকটে ১২০০ ফুট দীর্ঘ একটি বাধ নির্মাণ করা হইবে এবং এখান হইতে দুইটি খাল কাটিয়া সমগ্র ময়ূরাক্ষী উপত্যকার সেচের ব্যবস্থা করা হইবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে বীরভূম জেলার পাঁচ কোটি মণ অধিক ধান্য উৎপন্ন হইবে এবং প্রায় ৪০০০ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হইবে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে তিন বৎসর সময় লাগিবে এবং ইহাতে প্রায় দাত কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

লবণ-কর রদের সম্ভাবনা—

কেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই লবণ-কর রদের কথা বিবেচিত হইতেছে। মন্ত্রীরা গান্ধী আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে শীঘ্রই এই কর রদ করা হইবে। এই কর রদ হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ১ কোটি টাকা কমিয়া যাইবে; তথাপি বাইতেছে যে অন্য উপায়ে এই ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা হইবে।

সিদ্ধুর রাজনীতি—

কিছুদিন ধাবত সিদ্ধুর রাজনীতি অতি পঙ্কিল ও বিসর্পিত গতিতে চলিতেছিল। সিদ্ধু ব্যবস্থাপরিষদের ৬০ জন সদস্যের মধ্যে ২৭ জন লীগ দলভুক্ত, ৩ জন ইউরোপীয় লীগদল সমর্থক এবং ৩০ জন বিরুদ্ধপক্ষীয়। সিদ্ধুতে লীগ মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; এই মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে তনাস্হা প্রস্তাব আনীত হওয়ার পর চারিজন মন্ত্রী এবং পরিষদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার পদতাগ করেন। লীগদল হইতে কোন স্পীকার নির্বাচন করিয়া পরিষদের কার্য-নির্বাহ করা সম্ভব না হওয়ার সিদ্ধুর গভর্নর পরিষদ ভাঙ্গিয়া নতুন নির্বাচনের আদেশ দিয়াছেন। এই নির্বাচনে লীগদল ও বিরোধদলের প্রকৃত শক্তিপরীক্ষা হইবে।

শোকসংবাদ

পরলোক লালগোলার মহারাজা—

লালগোলার মহারাজা স্যার যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় গত ১৮ই আগষ্ট ১৯৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ দাতা ছিলেন;

জীবনে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। বহরমপুর হাসপাতাল, লালগোলা স্কুল ও লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান তাঁহার দানে পুষ্ট হইয়াছে। তিনি বঙ্গসাহিত্যের একজন অকৃত্রিম স্নহৎ ছিলেন; বহু সাহিত্যিককে তাঁহার দানের পুস্তক প্রকাশের জন্য তিনি অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

পরলোক প্রমথ চৌধুরী—

বাংলা সাহিত্যে “বীরবল” নামে পরিচিত সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সমালোচক প্রমথ চৌধুরী সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৮ বৎসর হইয়াছিল। প্রথম যৌবনেই তিনি সাহিত্য সাধনা আরম্ভ করেন; কিন্তু ১৯১৪ সালে “সবুজপত্র” পত্রিকা বাহির করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। বাংলা গদ্য সাহিত্যে তিনি এক বিশিষ্ট রচনা ভঙ্গীর প্রবর্তন করেন; ইহা “বীরবল” টাইল নামে পরিচিত। তাঁহার রচনাসমূহের মধ্যে “চার ইয়ারী কথা”, “নীল লোহিতের আদি কথা” “সনেট পঞ্চাশৎ”, “বীরবলের হালধাতা” প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

সাময়িক প্রসঙ্গ

কলিকাতার দাঙ্গা—

মুসলিম লীগ গত ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস (Direct Action Day) ঘোষণা করে এবং এই দিবস পালন করিবার জন্য মুসলমান সমাজকে আহ্বান করে। প্রকাশ থাকে যে, এই দিন মুসলমানগণকে মুসলিম লীগের পাকিস্থান আদর্শ বুঝাইয়া দেওয়া হইবে এবং মুসলমানগণ শান্তিদূর্ণভাবে হরতাল পালন করিবেন। বাংলা সরকার ১৬ই আগষ্ট ছুটির দিন বলিয়া ঘোষণা করেন। ঐ দিন অত্যন্ত কলিকাতার হিন্দু মুসলমানে ভীষণ দাঙ্গা বাড়িয়া উঠে; মুসলমানগণ লাঠি ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কলিকাতার রাস্তাপথে মিছিল করিয়া বেড়ায় এবং হিন্দুদের সঙ্গে তাহাদের সংঘর্ষ হয়। ৪৫ দিন ধারত কলিকাতার উপর দিয়া এক নারকীয় হত্যাকাণ্ড ও বেপরোয়া লুটতরাজ চলিতে থাকে; স্ত্রীপুরুষ শিশু নির্বিশেষে কত লোক যে এই দাঙ্গায় নিহত ও আহত হইয়াছে তাহার সঠিক সংখ্যা হস্ত কখন দিনই পাওয়া যাইবে না; এ পর্যন্ত যতদূর হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় পাঁচ হাজার লোক নিহত এবং পনের হাজার লোক আহত হইয়াছে। পুলিশ সহরের শান্তিরক্ষা করিতে একেবারেই অপরাগ হয় এবং শেষ পর্যন্ত মিলিটারীর সাহায্যে সহরের দাঙ্গানা আবৃত্তাধীনে আনা হয়। দাঙ্গা আরম্ভ হইবার পর একমাস অতীত হইল; কিন্তু আজিও কলিকাতার সহরে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় নাই। সহরে সশস্ত্র আইন জারী হইয়াছে,

১৪৪ ধারা অনুযায়ী চাউনিংয়ের অধিক ব্যক্তির একত্র সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে; কিন্তু এখনও মাঝে মাঝে গুপ্ত আক্রমণ ও গুপ্ত হত্যার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কলিকাতার স্কুল কলেজ সব বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; কলিকাতা ছাড়িয়া অনেক লোক অন্যত্র পলাইয়া গিয়াছে; কলিকাতার মুসলমানপ্রধান অঞ্চল হইতে হিন্দুগণ হিন্দু প্রধান অঞ্চলে, এবং হিন্দুপ্রধান অঞ্চল হইতে মুসলমানগণ মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ইহাতে ত হিন্দুমুসলমান সমস্যার সমাধান হইবে না; বাংলা দেশ, তথা ভারতবর্ষ, হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই নিজ বাস ভূমি; একই জল বায়ু আলো, একই শস্যসম্পদ উভয়ের প্রাণস্বরূপ; একই দেশে উভয় সম্প্রদায়কে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে হইবে। পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, অবিশ্বাস দূর করিয়া দেশে পুনরায় শান্তি ও প্রোতির আবহাওয়া আনিতে হইবে। ইহা যত দ্রুত সম্ভব হয় দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল।

এই দাঙ্গা সম্বন্ধে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বলিয়াছে যে, মুসলিম লীগ নেতৃবর্গের উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা ও বিবৃতি এবং বাংলা সরকারের অব্যবস্থা এই দাঙ্গার জন্য দায়ী। অপর পক্ষে মুসলিম লীগের অভিমত এই যে, কলিকাতার মুসলমানগণ সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ছিল; হিন্দুগণই তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া দাঙ্গার সৃষ্টি করে। দাঙ্গার তদন্তের জন্য ভারতীয় ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার প্যাট্রিক্

শিল্পকে লইয়া একটি তত্ত্ব কমিশন গঠিত হইয়াছে।
শীঘ্রই এই কমিশন কাজ আরম্ভ করিবেন।

কেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত সরকার—

বড়গাটের আহ্বানে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত
জহরলাল নেহেরু অন্তর্ভুক্ত সরকার গঠনের তার লইয়া-
ছিলেন এবং মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মিঃ জিন্নাকে
পাঁচজন সদস্য মনোনয়ন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।
মিঃ জিন্না পণ্ডিত নেহেরুর এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান
করায় কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আপাতত বারোজন সদস্য
লইয়া অন্তর্ভুক্ত সরকার গঠন করিয়াছেন। এই বারো
জন সদস্যের নাম এবং তাঁহাদের দপ্তরগুলি এইরূপ:—

- (১) পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু—পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ
রিলেশন্স বিভাগ।
- (২) সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল—স্বরাষ্ট্র বিভাগ।
- (৩) ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ—কৃষি ও খাদ্য বিভাগ।
- (৪) মিঃ রাজাগোপালাচাৰী—শিল্প ও সরবরাহ বিভাগ।
- (৫) মিঃ শরৎচন্দ্র বসু—খনি, পুষ্ঠ ও বিদ্যুৎসরবরাহ
বিভাগ।
- (৬) মিঃ জগজীবন দাস—শ্রম বিভাগ।
- (৭) মিঃ আসফ আলি—বানবাহন বিভাগ।
- (৮) স্তার সাফাৎ আহম্মদ খাঁ—শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও
শিল্পকলা বিভাগ।
- (৯) সৈয়দ আগা জহির—আইন, ডাক ও বিমান
বিভাগ।
- (১০) ডক্টর জন মাধাই—অর্থ বিভাগ।
- (১১) সর্দার বনদেব সিং—দেপার্টমেন্ট বিভাগ।

(১২) মিঃ সি, এইচ, ভাবা—বাণিজ্য বিভাগ।

আরও দুইজন মুসলমান সদস্য পরে নিয়োগ করা
হইবে।

অন্তর্ভুক্ত সরকার গত ২রা সেপ্টেম্বর কার্যভার গ্রহণ
করিয়াছেন। সকল সদস্য এখন পর্যন্ত কার্যভার
গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অন্তর্ভুক্ত সরকারের
ভাইস-প্রেসিডেন্টরূপে পণ্ডিত নেহেরু অনুপস্থিত সদস্যগণের
দপ্তরগুলির পরিচালনা করিতেছেন। মুসলিম লীগের
জনা এখনও দরজা খোলা রহিয়াছে এবং লীগ সম্মত হইলে
অন্তর্ভুক্ত সরকারের অদল বদল করিয়া পাঁচজন লীগ সদস্য
গ্রহণ করা হইবে।

কার্যভার গ্রহণ করিয়া পণ্ডিত নেহেরু বোষণা
করেন যে, অন্তর্ভুক্ত সরকারের সদস্যগণ স্ব স্ব দপ্তরের
কার্য স্বতন্ত্রভাবে চালাইতে ব্যস্ত না থাকিয়া যাবতীয়
গুরুতর বিষয় সম্মিলিতভাবে আলোচনা করিবেন এবং
বোধ দায়িত্ব লইয়া বোধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন।
অন্তর্ভুক্ত সরকারের নেতারূপে প্রথম বেতার বক্তৃতায়
পণ্ডিত নেহেরু বলেন যে, দ্রুত স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে
লইয়াই তিনি ও তাঁহার সহকর্মীগণ নূতন জাতীয় গভর্ণমেন্টে
যোগদান করিয়াছেন এবং ভারত বাহাতে আভ্যন্তরীণ ও
আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে
পারে তাঁহারা সেই ভাবে কাজ করিয়া বাইবেন। ভারতের
সাধারণ মানুষের (common man) দুঃখভরণ বাহাতে
দূর হয়, তাহাদের জীবন ধারণের মান বাহাতে উন্নত হয়
সেই জন্য নূতন সরকার উদ্যোগী হইবেন, এই কথাও
পণ্ডিত নেহেরু বোষণা করেন। জাতীয় সরকারের সাধু
ইচ্ছা অগ্রযুক্ত হউক, আমরা ইহাই কামনা করি।

পুস্তক-পরিচয়

প্রথম প্রণাম—উপন্যাস—লেখক শ্রীঅপূর্ণরূপ
ভট্টাচার্য—প্রকাশক রবীন্দ্র
পাবলিশিং হাউস। মূল্য
দুই টাকা।

শ্রীযুক্ত অপূর্ণ বাবু যুবক। উপন্যাসভঙ্গিতে এই তাঁহার প্রথম পাদচারণা। উপন্যাসে ‘প্রথম প্রণাম’ তাঁহার প্রথম অবদান। ভূমিকার লেখক বলিয়াছেন ‘কাব্য জগতের আবেষ্টনীর মধ্যে থেকেও দৈনন্দিন জীবনোপাধিপত্যে যে সব চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে তাদের সমষ্টিগত অন্তর্ভবনের আলেখ্য হচ্ছে এই ‘প্রথম প্রণাম।’ এই অন্তর্ভবনের নায়িকা অশোকা। কলকাতা জীবনে সহপাঠী সমীরকে সে ভালবাসিয়াছে। কিন্তু ভ্রাতৃ যুবক সমীরের সহিত তাঁহার বিবাহ সম্ভব হইল না। তাঁহার বিবাহ হইল আনন্দবানী ডাক্তার যুবক প্রণবের সহিত। কিন্তু সে সমীরকে ভুলিতে পারে না। সমীরের বাগান বাড়িতে গোপনে তাঁহাদের বিবাহ চলে। এদিকে প্রণবের বন্ধু রমানাথ বধন অকস্মাৎ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইল তখন তাঁহার অসহায় বিধবাপত্নী সরমার সমস্ত দায়িত্ব প্রণব হেফাজত এবং সানন্দে গ্রহণ করিল। সরমার সহিত প্রণবের সম্পর্ক ঠিক ভাইবোনের সম্পর্ক। কিন্তু অশোকার তাহাতে ঈর্ষার সীমা নাই।

অশ্বরের আগুনে জ্বলিতে জ্বলিতে সে জুড়াইতে চাহিল সমীরের কাছে। কিন্তু সমীর এদিকে তাহাদের ক্লাসের সব চেয়ে ভাল মেয়ে মণিকার প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। ঈর্ষার ও হতাশার অশোকার প্রাণ ক্রিপ্ত হইয়া উঠিল। প্রণবকে সে কিছুতেই বিবাহ করিতে পারিল না। অবশেষে তাহার ভুল ভাবিল বধন সরমার গৃহে বাইয়া স্বচক্ষে দেখিল সরমা অশ্রুসিক্ত চক্ষে তাহার মৃত স্বামীর আলোকচিত্রের পূজা করিতেছে। অতপ্ত অশোকা সরমাকে নিজ বাড়িতে লইয়া আসিল এবং প্রণবের সেবা ও ভালবাসার আপনাকে নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া আপন পাপের প্রাশ্চিত্ত করিল।

চরিত্রগুণিত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে লেখক বোধে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন এবং আখ্যানভাগের বর্ণনায় পাঠকের কৌতুহল সর্বদা জাগাইয়া রাখিতে পারিয়াছেন। ভাষা ও বর্ণনার ভঙ্গীও চিত্তাকর্ষক। কিন্তু প্রণব ও সরমার সম্পর্ক লইয়া আমাদের একটু সংশয় থাকিয়া যায়। যুবক ডাক্তার প্রণব পত্নীর ভালবাসা পায় নাই; সরমা যুবতী ধিবা। তাহারা পরস্পরকে ঠিক তাই বোনের মতই ভালবাসিল। অনেক দিন অনেক সময় তাহারা একত্রে কটাইয়াছে। তাহাদের ভালবাসা কি সজ্ঞানে বা নিষ্ঠানে এক যুগ্মের জন্য ও ভ্রাতৃত্বগত প্রেমের সীমা লঙ্ঘন করে নাই?

উন্নত আশা :-

লেখকের 'প্রথম প্রণয়' খুঁজি আমরা যেমন
অনিশ্চিত হইছি, তখন 'উন্নত আশা' আশা দিতে
নেই। পঞ্চাশের সময়ের
গট-কিনার এই উন্নত আশা। নতুন সূত্র
ও নতুন আশা উভয়েই দেখা যায়, ছবিগুলি
কিনার সোয়া নিবন্ধিত। দৈনিক কুস
হাতে উভয়ের মধ্যে তালিকা। নিউ সূত্র
একদিনের কোনও একটা কণা অভিমানী অলঙ্কার
হয়। যে কত জন্ম, প্রাপ্য গুণে। কতও অসুখ
সূত্র তাহা দূর করিতে পারিতেছে না। ইহা এই যথা
অবার দুঃখের মধ্যে কল্যাণী অসুখ। অলঙ্কার ও সূত্র
যে কত নে দাঁড়াইয়া নানা গুণে সৃষ্টি করিয়া তুলিল।
অবশেষে সূত্র তার একনিষ্ঠ তপস্বী হয়ে। পরা
হলে কোনও নিবন্ধিত প্রাণ একটা লোকের উদ্ধার করিতে
হইবে। অলঙ্কার নিজের জীবন বিপন্ন করে এবং পঞ্চাশ
একজন লোক তাহাকে উদ্ধার করে। দৈনিক সেখানে

আন্তরে মেলা। নিউ সূত্র অলঙ্কার অলঙ্কার
আনা হয় অলঙ্কার। সূত্র তার অলঙ্কার সেখানে সে
হইয়া উঠিল। তারই সেইখানে সূত্র তার কল্যাণ
পিতামাতা আর অলঙ্কার গুণে। পিতামাতার মিলিত
আন্তরে যথা উভয়ের বিবাহ স্থাপন হইল।

এই পুস্তকের আশাভাগ কোথাও অসুখ উঠে
পারে নাই। ঘটনাবলি আগাগোড়া ছাড়া ছাড়া রহিয়া
গিয়াছে। সূত্র তার পিতা অলঙ্কার লঙ্কার চাউনের
দাস্য। মনুষ্যের মন্য লঙ্কার মার্কেট করিয়া কপি
উঠিয়াছেন। তাহার জন্ম প্রকৃতি অন্য বিকৃত হইয়া
তাহার একমাত্র মন্য সূত্র তার অভিমানী বাড়া ছাড়া
চলিয়া যায়। কিন্তু এই চরিত্র অসুখ হইয়া দেখে
অলঙ্কার (অলঙ্কার) নষ্ট ও মারাত্মক মন্য হইয়া যে বিকৃত
প্রাণে অসুখ করিয়াছেন তাহার কোনও প্রয়োজন ছিল
চরিত্রগুলির মধ্যে সূত্র তার মন্য, দৃঢ়তা এবং পবিত্র
পাঠকের মন্য গভীর দেখা দিতে পারে। লেখক অলঙ্কার
চরিত্র তেমন নিপুণভাবে সূত্র হইতে পারেন নাই।